বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ

শোভন সংস্করণ

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মণ্ডল এণ্ড সন্স

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মণ্ডল শোভন সংস্করণ
Bangla Sanbad Patro O Bangalir Nabajagaran
By Dr Partha Chattopadhya
1988

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ৫০·০০ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীশীতলচন্দ্র সামুই
দি গৌতম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯/এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

শোভন সংস্করণের ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণের একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণ এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না, অনেকদিন ধরে অনুরোধ আসছিল এই বইটির একটি শোভন সংস্করণ প্রকাশের জন্য। কারণ সুলভ সংস্করণটির কাগজ ও বাঁধাই সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী ছিল না। এই গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রথম পত্রের অতিরিক্ত পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া সাংবাদিকতা ছাত্রদের জন্যও গ্রন্থটি অবশ্য পাঠ্য। তবে একথা মনে রাখতে হবে গ্রন্থটি ছাত্রপাঠ্য বা রেফারেন্স বই হিসাবে রচিত হয়নি। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষণার জন্য আমাকে পি. এইচ. ডি. দেন। কাজেই গবেষকের দৃষ্টিতেই একটি যুগের ইতিহাসকে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে গবেষণার কাজ আরও এগিয়েছে। আরও তথ্য পাওয়া গেছে এবং শোভন সংস্করণে এই নতুন তথ্যগুলির সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। এই বিশাল গ্রন্থটি পড়তে গেলে পাঠকেরও গবেষকের মন নিয়ে পড়তে হবে। যদিও আমি সমস্ত রকমের লেখায় সাধারণ পাঠকের বোধগম্য সহজ ও ঋজু ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী তবু এই দীর্ঘ গ্রন্থ পড়ার মত অনেকে পরিশ্রম স্বীকার করতে নাও পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের অনুরোধ করব তাঁরা যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে যে কোন অধ্যায় পড়েন, তাহলেও একটি বিশেষ বিষয়ের উপর তৎকালীন সংবাদপত্রের ভূমিকা জানতে পারবেন।

মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্স এর শঙ্কর মণ্ডল এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে সাধারণ পাঠক, ছাত্র ও গবেষকদের চাহিদা পূরণ করেছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। মণ্ডল অ্যাণ্ড সন্স এর কর্মী জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রুফ দেখেছেন ও নির্ঘণ্ট করে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই।

বিসি ১১৮, সল্টলেক সিটি
কলিকাতা-৭০০০৬৪

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়
১ বৈশাখ ১৩৯৫

শ্রীমতী মণিকা চট্টোপাধ্যায় কে

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

অধ্যাপক সিডনি কোবরে তাঁর বিখ্যাত 'ডেভলেপমেন্ট অব আমেরিকান জার্নালিজম' গ্রন্থে বলেছেন, সংবাদপত্র যুগের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবাদপত্রের চরিত্র ও সাংবাদিকতার ধারা পরিমাপ করতে গেলে ইতিহাসের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটেই তার বিচার করা উচিত।'[১]

একারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংবাদপত্রের মূল্যায়ন করতে গেলে গোটা শতাব্দীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের পর্যালোচনা প্রয়োজন। একমাত্র এই সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পটভূমিতেই বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকার যথাযথ পরিমাপ সম্ভব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নবতর চেতনা ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটে এবং এই নবতর চেতনা (awareness) চিন্তা ও ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনকে (innovation) গ্রহণ করায়। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ আসে সমাজ পরিবর্তন (social change)। সমাজ পরিবর্তনের জন্য জাতির আকুল আকাঙ্ক্ষা যে ভাবে দ্রুত কথায় ও কর্মে মূর্ত হয়ে উঠেছিল ঐতিহাসিকেরা তাকে সেদিন ইউরোপীয় নবজাগরণের সঙ্গেই তুলনা করেছিলেন। এই নবজাগরণ কোন অবাঙমানস গোচর ধারণা নয় বা রোমান্টিক কোন ভাবকল্পনা নয়। সেটি একটি সামাজিক লক্ষণ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণেরই প্রতিক্রিয়া।

গণমাধ্যম আবিষ্কৃত হওয়ার পর সব সমাজেই সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অনুঘটক (catalyst) হিসাবে কাজ করে থাকে, কিন্তু গণমাধ্যমের এই অনুঘটক ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাকৃত (deliberate) নাও হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে আমেরিকায় অষ্টাদশ শতকে সমস্ত সংবাদপত্রই তৎকালীন সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করেছে। এবং সংবাদপত্রে এই সব পরিবর্তনের কথা প্রকাশিত হওয়ার ফলে নিঃসন্দেহে পরিবর্তন পরিব্যাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সংবাদপত্রগুলিই যে এই সব সমাজ পরিবর্তনের মুখ্য পরিবর্তন প্রতিভূ (change agent) হিসাবে কাজ করেছে তা বলা যায় না, আমেরিকায় সংবাদপত্র সামাজিক বিবর্তনেরই একটি অংশ। সংবাদপত্র সেখানে সমাজকে তার ইচ্ছামত কোন গতিপথে পরিচালিত করে নি। তাই ১৭৮৩ সালে যখন প্রথম আমেরিকান দৈনিক সংবাদপত্র **The Pennsylvania Evening Post and Daily Advertiser** প্রকাশিত হয়, ঐতিহাসিকেরা তাকে বলেছেন, দৈব দুর্ঘটনা। এটি স্বাভাবিক সাংবাদিকতা বিবর্তনেরই ফলশ্রুতি। জনগণের ক্রমবর্ধমান সংবাদ বুভুক্ষা মেটাবার জন্য ও কিছু লোকের অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি।[২] এমনকি তারও আগে ১৬৯০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বেঞ্জামিন হ্যারিস যখন প্রথম আমেরিকান সংবাদপত্র **"Publick Occurences"** প্রকাশ করেছিলেন তখনও সমাজ সংস্কারের কোন বিশেষ দায় নিয়ে তিনি যে সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং হ্যারিসের সামনে সেদিন সংবাদের মুখ্য বিষয়

ছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের সংঘর্ষ ও উপনিবেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ নানান ঘটনা—দুর্ঘটনা।

কিন্তু সেদিক থেকে বাংলা সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল সংস্কার ও পরিবর্তন। পরিবর্তন অর্থে শুধু বদল নয়, বাঞ্ছিত ও ঈপ্সিত লক্ষ্যে সমাজকে পরিচালনা। পরিবর্তন যদি একটি দুটি সংবাদপত্রেরই শুধু কাম্য হত তাহলে তাকে গোটা সমাজের চরিত্রলক্ষণ বলে অভিহিত করা যেত না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে উনিশ শতকের প্রায় সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে একটি সুর ধ্বনিত। সেই সুর হল—সমাজকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছে দিতে হবে এবং এই লক্ষ্যে পৌছবার জন্য জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। একটি বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর প্রতি এই যে বার বার ইঙ্গিতময়তা এবং লক্ষ্য অর্জনের অভীষ্ট সম্পর্কে বার বার সোচ্চার ঘোষণা, একে সাংবাদিকতার শাস্ত্রে পরবর্তীকালে Advocacy journalism বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক নৈর্ব্যক্তিকতার (objectivity) সঙ্গে এই "অ্যাডভোকেসির" বিরোধ আছে এবং সংবাদপত্রের পক্ষে বস্তুনিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে মন্ময়তা প্রধান (subjective) অ্যাডভোকেসির প্রশ্রয়দান কতখানি মহৎ তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সাংবাদিকতার সেই ঊষালগ্নে যখন সংবাদ-পত্রের ধ্যানধারণা অনেকের কাছেই স্পষ্ট প্রতিভাত নয়; তখন সামাজিক প্রয়োজনের দাবিই ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই বাংলা সংবাদপত্র সর্বাগ্রে সেই দাবিই পূরণ করেছে। প্রফেশন্যাল আদর্শ (বস্তুনিরপেক্ষতা) ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রথম থেকেই গড়ে উঠেছে এবং ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকে গড়ে ওঠা ইংরাজ চালিত ইংরাজি সংবাদপত্রে যার প্রকাশ ঘটেছে, বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। বাংলা সংবাদপত্র গোটা উনিশ শতক জুড়ে মোটামুটি 'মিশনই' থেকে গেছে। ইংরাজি সংবাদপত্রের মত পেশাদার প্রকাশকের হাতে বাংলা সংবাদপত্র পড়েনি। এবং তা পড়েনি বলেই বাংলা সংবাদপত্রের "অ্যা ডভোকেসি" চরিত্র দীর্ঘকাল ধরে বজায় থেকেছে।

এই পটভূমির কথা মনে রেখেই বাঙালির নবজাগরণের সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের ঐতিহাসিক সংযোগের মূল্যায়ন করা উচিত। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাস মুখ্যত বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস।[৩] কারণ বাঙালির নবজাগরণ ও বাংলা সংবাদপত্রের সূচনা প্রায় একই সময়। এবং এই নবজাগ্রত সামাজিক ও রাষ্ট্রীক জীবনের পটভূমিতে বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষা, যুগভাবনা, মনন ও মনীষা বাংলা সংবাদপত্রকে অবলম্বন করে কি ভাবে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে তা দেখানোই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।[৩]

প্রারম্ভ

বাঙালরি নরজাগরণের ইতিহাসে ১৮১৪ থেকে ১৮১৮ এই চারটি বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে রামমোহন রংপুরের চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন (১৮১৮)।[৪] আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠা হয় (১৮১৫)। বাঙালির পাশ্চাত্য শিক্ষার শুভারম্ভ হয় হিন্দু কলেজের মাধ্যমে (১৮১৭) এবং প্রতিষ্ঠিত হয় বংলা সংবাদপত্র (১৮১৮)।

১৮১৪ সালে রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর বয়স ৪২। সেদিন তিনি বিভিন্ন শাস্ত্র পারঙ্গম। পাটনায় অধ্যয়ন করেছেন আরবী ও ফারসী, কাশীতে সংস্কৃত। বৌদ্ধ ধর্মের অন্তরস্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে ছুটে গেছেন দুর্গম তিব্বতে। বেশ কয়েক বছর ইংরেজের অধীনে কাজ করে ইংরাজি ভাষাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। সে সময় তাঁর মনে যুক্তিগ্রাহ্য, পৌত্তলিকতা বিরোধী এক ধর্মমত প্রবল হয়ে উঠেছে। তাঁর বিখ্যাত ফারসী গ্রন্থ 'তুহফাৎ উল-মুওয়াহিদ্দীন' (১৮০৪)[৫] ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। রামমোহন সেদিন পরিশীলিত চিন্তা ও মার্জিত মনের অধিকারী, অতীত ঐতিহ্য ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ অথচ মোহগ্রস্ত তামসিক সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন নন। সমস্ত দিক থেকে জাতীয় জাগরণে নেতৃত্ব দেবার পক্ষে তিনি উপযুক্ত ব্যক্তি। কলকাতায় এসে রামমোহন সমাজ বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। 'তিনি তাঁহার সমুদয় অবকাশ ও অর্থ, শরীর ও মন জন্মভূমির হিত-সাধন ব্রতে উৎসর্গ করিলেন। যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার অন্য কার্য ছিল না, চিন্তা ছিল না।'[৬]

রামমোহনের কলকাতায় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির নবজাগরণের শুভ সূচনা হল। চিন্তায় ও মননে বাঙালির সংস্কার-মুক্তির পথ প্রশস্ত হতে লাগল। নব-উদ্ভূত বাঙ্গালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ ও ধনিকগোষ্ঠী একই সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করলেন। সতীদাহ প্রথা রদ আন্দোলন ও ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রামমোহন বাঙালির মনোজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারার মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাবজগতে এই সংঘর্ষ পরবর্তীকালে গোটা শতাব্দীর বাঙালির মানসকে আলোড়িত করেছে। ধর্ম-সংস্কার, শিক্ষা ও স্বাধিকার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। এই 'জাতীয় চেতনা' পরবর্তীকালে রাষ্ট্রভাবনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র দিগদর্শন প্রকাশিত হয় ১৮১৮ সালের এপ্রিলে[৭]। বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় এর পরের মাসে ২৩ মে শনিবার দিন[৮]। রামমোহনের কলকাতা আগমনের চার বছরের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে যায়। অবশ্য রামমোহনের কলকাতা আগমন

এবং প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। এই দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু আশ্চর্যভাবে পরস্পরের পরিপূরক। রামমোহনের কলকাতা আগমনের পর তাঁর সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সংবাদ দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য সংবাদপত্রের দরকার ছিল। আবার অন্যদিকে নব্যশিক্ষিত ও সদ্য সুপ্তোত্থিত জাতির জ্ঞান বুভুক্ষা মেটাবার জন্যও সংবাদপত্রের প্রয়েজন দেখা দিয়েছিল। সমাচার দর্পণ এই দ্বিবিধ দাবিই পূর্ণ করেছে। শুধু তাই নয়, রেনেশাঁসের চিন্তা ও সামাজিক আন্দোলনের ধ্যান-ধারণা বাঙালি সমাজের কাছে পৌছে দেবার একমাত্র উপযোগী মাধ্যম যে বাংলা সংবাদপত্র এই বোধ সমাজ নেতাদের মধ্যে জাগ্রত করে দিয়েছে। সমাচার দর্পণের অনুসরণে অচিরেই বাংলা ভাষায় একের পর এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। সব সংবাদপত্রই যে প্রগতিশীল চিন্তার অনুসারী ছিল তা বলা যায় না। তবে বাঙালির মানসমুক্তির আন্দোলন থেকে অধিকাংশ সংবাদপত্রই দূরে থাকতে পারে নি। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, উনিশ শতকে যেসব বাঙালি মনীষী চিন্তায় ও কর্মে রেনেশাঁসের মশাল প্রজ্জলিত করে গেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন সংবাদপত্রের প্রকাশনা বা সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রের ও সাময়িকপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনীষীদের একটি তালিকা দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)—ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী,বঙ্গদূত
২। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৬)—সমাচার দর্পণ
৩। নীলরত্ন হালদার (১৮০২-১৮৫৫)—বঙ্গদূত
৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)—সমাচার চন্দ্রিকা
৫। দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)—বঙ্গদূত
৬। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (১৭৯৯-১৮৫৯)—জ্ঞানান্বেষণ, সম্বাদ ভাস্কর, সম্বার রসরাজ, হিন্দুরত্নকমলাকর
৭। প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮)—অনুবাদিকা। বঙ্গদূত
৮। তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫)—বেঙ্গল স্পেক্টেটর
৯। রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮)—জ্ঞানান্বেষণ
১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)—সংবাদপ্রভাকর, সংবাদ রত্নাবলী, পাষণ্ডপীড়ণ, সংবাদ সাধুরঞ্জন
১১। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৫৫)—বেঙ্গল স্পেক্টেটর, সংবাদ সুধাংশু
১২। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)—জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, মাসিক পত্রিকা
১৩। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৭৮)—জ্ঞানান্বেষণ
১৪। রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮)—বেঙ্গল স্পেক্টেটর
১৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)—তত্ত্ববোধিনী
১৬। রামপ্রসাদ রায় (১৮১৭-১৮৬২)—তত্ত্ববোধিনী

১৭। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬)—সোমপ্রকাশ
১৮। মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮)—সর্বশুভকরী
১৯। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)—বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী
২০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)—তত্ত্ববোধিনী, সর্বশুভকরী, সোমপ্রকাশ
২১। রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)—তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ
২২। প্যারীচরণ সরকার (১৮২৩-১৮৭৫)—এডুকেশন গেজেট
২৩। লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪)—অরুণোদয়
২৪। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)—তত্ত্ববোধিনী
২৫। ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৮)—শিক্ষদর্শন ও সংবাদসার, এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ
২৬। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)—এডুকেশন গেজেট
২৭। হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)—গ্রামবার্তা প্রকাশিকা
২৮। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)—বঙ্গদর্শন
২৯। বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)—অবোধবন্ধু
৩০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)—বঙ্গদর্শন
৩১। কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৯৪)—সুলভ সমাচার, ধর্মতত্ত্ব, বামাবোধিনী, ধর্মসাধন বালকবন্ধু ও পরিচারিক
৩২। কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)—বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা, সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা বিবিধার্থ সংগ্রহ, পরিদর্শক
৩৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৬)—ভারতী, তত্ত্ববোধিনী
৩৪। শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১)—অমৃতবাজার পত্রিকা
৩৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৪২-১৯২৩)—তত্ত্ববোধিনী
৩৬। দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮)—অবলা বান্ধব
৩৭। অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)—সাধারণী, নবজীবন
৩৮। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)—সমদর্শী, সোমপ্রকাশ, সমালোচক, তত্ত্বকৌমুদী, সখা, মুকুল
৩৯। যেগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪)—আর্যদর্শন
৪০। মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২)—অমৃতবাজার পত্রিকা

এছাড়াও আরও বেশ কিছু বাঙালি মনীষী ইংরাজি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেমন কৈলাশ চন্দ্র বসু (১৮২৭-১৮৭৮)—দি লিটারারি, গিরীশ চন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-১৯২৫) ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) দি বেঙ্গলী, কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪) ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১) হিন্দু প্যাট-রিয়ট ও নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮১৪) ন্যাশানাল পেপারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই কৃতবিদ্য বাঙালিরা ইংরাজী সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত থাকলেও মাতৃভাষা চর্চা থেকে দূরে থাকেননি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার আগে দীর্ঘ আট বছর মাদ্রাজে কাটিয়েছেন (১৮৪৮-৫৬) ইংরাজি সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসাবে।

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের গোড়পত্তন করেন অষ্টাদশ শতকে কলকাতার ইউরোপীয় বসবাসকারীরা। ১৮৭০ সালের ২৯শে জানুয়ারী জেমস অগস্টাস হিকি সাপ্তাহিক ইংরাজি সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার প্রকাশ করে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার ইতিহাসের শুভ সূচনা করেন। এরপর থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কলকাতায় বহু ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এই ইংরাজি সংবাদপত্রগুলিই বাংলা সংবাদপত্রের আদি প্রেরণা। গেজেট, স্পেক্টেটর, প্রভাকর (ইংরাজি 'সান'-এর বাংলা) দর্পণ (ইংরাজি মিররের বাংলা) প্রভৃতি বাংলা সংবাদ-পত্রের নামগুলিই ইংরাজী সংবাদপত্রের অনুসৃতির প্রমাণ বহন করে। কিন্তু নাম ও কারিগরি রীতির দিক থেকে প্রভাব থাকলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলা সংবাদপত্রগুলি বিদেশী সম্পাদিত ইংরাজি সংবাদপত্রের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। সাংবাদিকতার দিক থেকেও উভয়ের লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমটির উদ্দেশ্য মনোরঞ্জন এবং মুনাফা অর্জন। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য: সমাজ-সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার। ভাগ্যান্বেষী, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় একদল বিদেশী ঔপনিবেশিকের হাতে মুখ্যত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সংবাদপত্রের পত্তন হয়েছিল তা কিভাবে দেশীয় জনগণের হাতে এসে জ্ঞান ও তথ্য প্রসারের এক শক্তিশালী গণ-মাধ্যমে (মাস মিডিয়ায়) পরিণত হল সে ইতিহাসটি অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পের মত সংবাদপত্র প্রকাশের জন্যও ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয়। যেমন শিক্ষিত পাঠকশ্রেণী, ছাপাখানার বিজ্ঞাপন, যোগাযোগ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় ইংরাজি সংবাদপত্রের পক্ষে এই সব সুবিধাগুলি ধীরে ধীরে সহজলভ্য হয়ে উঠছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূল কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতা অচিরেই ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। অবশ্য পলাশীর আগে থেকেই কলকাতায় ইংরাজি জানা ইউরোপীয়দের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠছিল। ১৬৯০ সালে কলকাতার প্রতিষ্ঠা, তার আট বছরের মধ্যে ১৬৯৮ সালে কোম্পানী এক সনদ বলে সুতানুটি গোবিন্দপুর ও কলকাতার ওপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন।

১৭১৫ সাল থেকে ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সী নাম দিয়ে কলকাতায় ইংরেজদের মোটামুটি একটি স্বাধীন প্রশাসনিক এলাকা চালু হয়ে যায়। ১৭২৭ সালে ইংরাজরা কলকাতায় একটি মেয়র আদালতও স্থাপন করেন।[৯]

পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৫৮ সাল থেকে কলকাতার জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ১৭৯৮ সালে দেখা যায় কলকাতায় বাড়ির সংখ্যা ৭৮৭৬০। জনসংখ্যা ৭০০,০০০।[১০] ১৭৮৪ সালে কলকাতায় ৩০০ জন কোম্পানী কর্মচারী, ১৩০০ জন মিলিটারী অফিসার ও আরও ৩০০ জন বেসরকারী বিদেশী থাকতেন। এই শেষোক্ত ৩০০ জনের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ পর্তুগীজ, ইতালিয়ান ও জার্মান। এছাড়া কোম্পানীর পাঁচ হাজার সৈন্যের এক হাজার অন্তত কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল।[১১]

১৭৮০ সালের মধ্যে কলকাতা পুরোপুরি একটি ব্রিটিশ কলোনীর রূপ নেয়। ভাগ্যান্বেষী এই সব নতুন ঔপনিবেশিক ও সরকারী চাকুরিয়াদের জীবনযাপনের কোন উপকরণেরই সেদিন কলকাতায় অভাব ছিল না। এমন কি স্বামীসন্ধানের জন্য কিছু কিছু ইংরেজ কন্যাও জাহাজে করে কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়ত।[১২] ১৮১৩ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা প্রেসিডেন্সীতে প্রায় ১২২৫ জনের মত ইওরোপীয় বসবাস করছেন।[১৩] এঁরা অধিকাংশই বাণিজ্যকর্মে নিয়োজিত। কলকাতায় এই বাণিজ্যিক গুরুত্বের ফলেই এই শহরে প্রথম সংবাদপত্র গড়ে উঠেছিল যেমন বাণিজ্যিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই আমেরিকার বোস্টনে ঔপনিবেশিকরা সর্বপ্রথম মার্কিন সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

সংবাদপত্রের পাঠক তৈরি হলেও সংবাদপত্র প্রকাশের উপযোগী ছাপাখানার অভাবে কলকাতায় ১৭৮০ সালের আগে সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হয় নি। ১৬৭৪ সালে বোম্বাইয়ে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭২ সালে মাদ্রাজেও ছাপাখানার পত্তন হয়েছিল। কিন্তু ১৭৭৮ সালের আগে কলকাতায় কোন ছাপাখানা ছিল না। ১৭৭৮ সালে হিকি দু' হাজার টাকা দিয়ে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭৯ সালে চার্লস উইলকিন্‌সের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় সরকারী ছাপাখানার পত্তন হয়।[১৫]

বেসরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশকে কোম্পানীর কর্তারা সুনজরে দেখেন নি। ১৭৬৬ সালে কোম্পানীর জনৈক জার্মান কর্মচারী উইলিয়ম বোলটস সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য একটি ছাপাখানার প্রয়োজনীতা সর্বপ্রথম অনুভব করেন। কিন্তু বোলটস তাঁর মনোভাব প্রকাশ করা মাত্র কোম্পানীর কুনজরে পড়েন এবং তাঁর ওপর বহিষ্কারের আদেশ জারী করা হয়।[১৬] অবশ্য বোলটস-এর মন্দ ভাগ্যের জন্য তিনি নিজেও বহুলাংশে দায়ী। হল্যানডের আমস্টারডারমে জন্ম জার্মান উইলিয়াম বোলটস ১৭৫৬ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ক্লাইভের সঙ্গে কাজ করেছেন বছর এগারো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাইটার, কুঠিয়াল, কাউন্সিলের সহপ্রধান ধাপে ধাপে সম্মানীয় পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন বোলটস। কিন্তু তাঁর সততার খ্যাতি ছিল না। তাঁর সম্পর্কে প্রধান অভিযোগ, তিনি কোম্পানির স্বার্থ না দেখে নিজে ব্যক্তিগত

ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে দু'হাতে টাকা কামাচ্ছেন। এ অভিযোগ কোম্পানির প্রায় সব কর্মচারীর বিরুদ্ধে ছিল। স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংস, কেউই দুর্নীতির অভিযোগ থেকে বাদ যান নি। কিন্তু বোলটসের ভাগ্য মন্দ ছিল, তিনি কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে যে বছরটায় তিনি ছাপাখানা শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করে কলকাতার কাউনসিল হাউসের দেওয়ালে নোটিশ লটকে দিয়েছিলেন, সেই ১৭৬৬ সালটিতে ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের ভিত খুব মজবুত ছিল না। বকসারের যুদ্ধের পর ক্লাইভ সবে দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা করদানের শর্তে বাংলা বিহার ওড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেছেন (১২ আগস্ট, ১৭৬৫)। এই নতুন দায়িত্বভার গ্রহণের মুহূর্তে সরকারের বৈরী কোন এক ব্যক্তির হাতে মুদ্রাযন্ত্রের মত শক্তিশালী এক প্রচার যন্ত্র তুলে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কাজেই বোলটসের উপর ভারত ত্যাগের আদেশ অনিবার্য ভাবেই এসে পড়ে এবং ভগ্নমনোরথ বোলটস ভারত ত্যাগ করেন। চলে যান ইংলণ্ডে। কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি ছাপাখানার চিন্তা ত্যাগ করেন নি! হিকি আর এক ধাপ এগিয়ে সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোম্পানীর কর্তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সংবাদপত্রের প্রতি সরকার তথা প্রশাসন যন্ত্রের বীতরাগ এবং পরিণামে সংঘর্ষ বিশ্বের সাংবাদিকতার ইতিহাসে কোন নতুন ঘটনা নয়। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর বেঞ্জামিন হ্যারিস প্রথম মার্কিন সাময়িকপত্র 'পাবলিক অকারেন্স' প্রকাশ করলে পত্রিকাটিকে বন্ধ করার জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা হয়েছিল।[১৭]

ব্রিটিশ উপনিবেশ আমেরিকার রাজপ্রতিনিধিরা গোড়া থেকেই চান নি যে কলোনীতে ছাপাখানা আসুক, মুদ্রিত বই ও পত্রপত্রিকা জ্ঞানের প্রসার ঘটাক, চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনুক। বরং সপ্তদশ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত আমেরিকায় ছাপাখানা আসে নি বলে ভারজিনিয়ার গভর্নর বার্কলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ১৬৭১ সালে বলেছিলেন: ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে আমাদের এখানে কোন ফ্রি স্কুল আর ছাপাখানা নেই। প্রার্থনা করি, ও দুটোর কোনটাই যেন আগামী একশ বছরের মধ্যে না আসে।[১৮]

কারণ শিক্ষাইতো আনে অবাধ্যতা, প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরোধিতা। ছাপাখানা এগুলোকেই ফলাও করে প্রকাশ করে। সরকারের অবমাননা করে। ঈশ্বর আমাদের ও দুটো থেকে দূরে রাখুন।

ইংলণ্ডেও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার উষালগ্ন থেকে সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশকদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেখানে অলিভার ক্রমওয়েলের (১৬৪৯-১৬৬০) মত গণতন্ত্রীও সংবাদপত্রকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। আবার দ্বিতীয় চার্লসের (১৬৬০-১৬৮৫) মত উদারমতাবলম্বী রাজতন্ত্রীও সংবাদপত্রের প্রতি উদার মত পোষণ করতে পারেন নি। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে সংবাদপত্রের যাত্রাশুরুর যুগে সংবাদপত্রের অবস্থা সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন।

'The liberty to print—sometimes it must be said, violently abused was never conceded for long, the newsbooks being subjected to licensing for the greater part of the time. Individual publications that offended parliament were supressed, many authors and printers were fined and imprisioned ; and the mercuries or hawkers (including "womenmercuries") who sold them in the street were at times treated by authority as common rogues for whiped or sent to gaol. Oliver Cromwell suppressed the licensed press from October 1649 to june 1650, and again from September 1655; and for a time (as later under Charles II) the only newsbooks issued were official journals, Altogether journalism from 1641 to 1660 was dangerous trade, but a surprising number of men braved the risk, scores of different newsbooks being produced, of which a few continued publication for years.[১৯]

ভারতে আগত ইংরাজ শাসকরাও স্বদেশীয়দের মত সেই একই মুদ্রাযন্ত্রাতঙ্ক রোগে ভুগছিলেন। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার হায়দ্রাবাদের নিজাম ক্যাপটেন সিডেনহামকে ইউরোপ বিজ্ঞানের অগ্রগতির কিছু নিদর্শন নমুনা হিসাবে আনতে বলেছিলেন। ক্যাপটেন নিজামকে তিনটি জিনিস উপহার দেন। একটি বায়ুচালিত পাম্প, একটি মুদ্রাযন্ত্র আর একটি যুদ্ধরত মানুষের মডেল। সিডেনহাম চীফ সেক্রেটারিকে চিঠিতে এই উপহারের কথা উল্লেখ করলে চীফ সেক্রেটারি তাঁকে অত্যন্ত ভৎসনা করে লেখেন, ক্যাপটেন একজন নেটিভ প্রিন্সের হাতে মুদ্রাযন্ত্রের মত বিপদজনক বস্তু তুলে দিয়েছেন। তখন ক্যাপটেন চীফ সেক্রেটারিকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, নিজাম ওই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি কোন আগ্রহ দেখান নি। চীফ সেক্রেটারি স্বয়ং দেখে আসতে পারেন যে নিজামের রত্নাগারে ভাঙাচোরা অবস্থায় মুদ্রাযন্ত্রটি পড়ে আছে।[২০]

তবু এই প্রতিকূলতার মধ্যে জেমস অগাস্টাস হিকি ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্র 'দি বেঙ্গল গেজেট' যে বিনাবাধায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন তার একটা কারণ কলকাতার গবর্নর পদে তখন ওয়ারেন হেষ্টিংস। দ্বিতীয়বার রাজত্ব চালাবার পর ক্লাইভ ১৭৬৭ সালের জানুয়ারিতে ভারত ত্যাগ করেন। তারপর পাঁচ বছরের জন্য যে দুজন গবর্নর হয়েছিলেন তাঁদের কোন বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেবার মত ক্ষমতাই ছিল না। এই দুজন হলেন ভেরেলস্ট (১৭৬৭-৬৮) ও কারটিয়ার (১৭৭০-৭২)। ১৭৬৯-৭০ সালে সর্বনাশা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে যায়। হেষ্টিংস দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন ১৭৭২ সালে এবং এই বছর থেকেই তিনি কলকাতার গবর্নর হন। হেষ্টিংস ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টাতেই কলকাতায় ছাপাখানার পত্তন ও বিকাশ ঘটে। কোম্পানির

কর্মচারী ও হেস্টিংসের বিশেষ প্রিয় চার্লস উইলকিনস কীভাবে পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় বাংলা কাঠের অক্ষর খোদাই করে হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ ছাপিয়েছিলেন সেকথা যথাসময় আলোচনা করা যাবে। ১৭৭০ সালে হেস্টিংস কলকাতায় সরকারী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সুতরাং হিকিকে প্রেস প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে খুব বেশি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় নি। তাছাড়া ১৭৮০ সালে ইংলণ্ডেও সংবাদপত্রের স্বাধিকার মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় জেমসের (১৬৮৫-১৬৮৮) রাজত্বের অবসানের পর তৃতীয় উইলিয়ম ও মেরির (১৬৭৯-১৭০২) উদারনীতি সংবাদপত্র বিকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। কুইন অ্যান (১৭০২-১৭১৪) ও তাঁর পরবর্তী হ্যানোভার বংশের রাজত্বকালেও সংবাদপত্রের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে। ড্যানিয়েল ডিফো, (দি রিভিউ, ১৭০৪), রিচার্ড স্টীল (টাটলার, ১৭০৯) জোসেফ অ্যাডিসন (টাটলার), ডাঃ জনসন (র‍্যামবলার, ১৭৫৭) সে সময়কার ইংলণ্ডের সাংবাদিকতার আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।[২১] ওই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ১৭১১ সালে ব্রিটেন থেকে ৪৪০০ কপি সংবাদপত্র প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত ও প্রচারিত হত। ১৭১৩ সালে এই মিলিত প্রচার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪ লক্ষ। ১৭১৭ সালে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১ কোটি ১৩ লক্ষ।[২২] ১৭২৬ সালে প্রকাশিত ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সাপ্তাহিক 'ক্রাফটসম্যান' যার পরবর্তীকালে নামকরণ হয় 'কানট্রি' জার্নাল, বা 'দি ক্রাফটসম্যান' তার সাপ্তাহিক প্রচার ছিল দশ হাজার।[২৩] ১৭১১ সালের দিকে দৈনিক স্পেক্টেটরের প্রচার ছিল ৩ হাজার।[২৪]

প্রচার সংখ্যার এই দ্রুত বৃদ্ধি সংবাদপত্রের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তারই প্রমাণ। সংবাদের জন্য যে তৃষ্ণা স্বদেশে ইংরেজদের অধিগত হয়ে গিয়েছিল ভারতে তা নিবারণের কোন উপায় ছিলনা। কলকাতার ঔপনিবেশিক ইংরাজ চাতকপক্ষীর মত চেয়ে থাকেতেন গঙ্গার ঘাটের দিকে, কবে সেখানে স্বদেশের জাহাজ এসে ভিড়বে এবং পাওয়া যাবে তিন থেকে ছয় মাসের পুরানো কিছু সংবাদপত্র! ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সমাজ জীবনে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজন আছে মনে করেই হয়ত হিকির প্রস্তাবিত সংবাদপত্রের ওপর জন্মলগ্নেই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় নি।

তবে জেমস অগস্টাস হিকি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে এসেছিলেন নেহাতই দায়ে পড়ে। সাংবাদিক হবার মত মানসিক প্রস্তুতিও তাঁর ছিল না। ছিলেন জাহাজ ব্যবসায়ী। ১৭৭৫-৭৬ সালের দিকে জাহাজ ডুবির ফলে দেনার দায়ে তাঁকে সর্বস্বান্ত হয়ে জেলে যেতে হয়। জেল থেকে বার হয়ে তিনি নতুন ব্যবসা হিসাবে একটি প্রেস করলেন। তারপর মাথায় এল সংবাদপত্র স্থাপনের পরিকল্পনা। অবশেষে 'বেঙ্গল গেজেট' আত্মপ্রকাশ করল। হিকির এই কাগজের পাঠক ছিল প্রধানতঃ বণিক, ব্যবসায়ী ও বেসরকারী ইউরোপীয়রা। পাঠকদের মধ্যে সংবাদ বুভুক্ষা থাকলেও বিদেশী টাটকা সংবাদ সে সময় সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। স্থানীয় সংবাদও সপ্তাহান্তে প্রকাশের

আগেই লোকমুখে প্রচারিত হয়ে যেত। ঔপনিবেশিকদের সমাজ ক্রমবর্ধমান হলেও তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। সামাজিক খবরাখবর তারা সংবাদপত্র ব্যতিরেকেই পেতে পারত।

এ সমস্ত কারণে সুচতুর ব্যবসায়ী হিকি তাঁর সংবাদপত্রে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন ও চুটকি খবরকেই মুখ্য করে তুলেছিলেন। হিকি নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন সাংবাদিক বৃত্তির প্রতি তীব্র অনুরাগ বা প্রবণতা কোনটাই তাঁর ছিল না। শুধু আত্মার স্বাধীনতা কেনবার জন্যই তাঁর সংবাদপত্র প্রকাশ।

"I have no particular passion for printing of newspapers. I have no propensity : I was not bred to a slavish life of hard work, yet I take a pleasure in enslaving my body in order to purchase freedom for my mind and soul."[২৫]

হিকি মনে করতেন, একজন ইংরাজের অস্তিত্বের পক্ষে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। একথা তিনি প্রধান বিচারপতি স্যর এলিজা ইমপের আদালতে দাঁড়িয়ে বলেও ছিলেন।[২৬]

হিকি তাঁর কাগজে সুইডিশ মিশনারি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে খোদ গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের পত্নী কাউকেই আক্রমণ করতে ছাড়েন নি। ১৭৮১ সালের ২১ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের বন্ধু কর্নেল টমাস ডিন পিয়ারস গঞ্জাম থেকে হেস্টিংসকে লিখেছিলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আপনার ধৈর্য দেখে। হিকির মত লোক প্রতি শনিবার এই যে এক কুড়ি করে কুৎসা প্রকাশ করছে, আপনাকে তা বরদাস্ত করতে হচ্ছে···।[২৭]

হিকির গেজেট সম্পর্কে একজন লেখক মন্তব্য করেছেন :

"It soon took to catering for the lowest tastes, and gradually went from bad to worse in this objectionable direction, and admitted contributions which, while hyppocratically affecting to teach and uphold public and private morality, in reality pandered to the impulses of the pruient and the vicious."[২৮]

এই সবের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে হিকির সঙ্গে হেস্টিংসের বিরোধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। হিকি মানহানির দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হন এবং ৮০ হাজার টাকা জামিন দিতে না পারায় হাজত বাস করেন। বিচারে তার দু'হাজার টাকা জরিমানা ও এক বছরের জেল হয়।[২৯]

সাংবাদিকতার সুশোভন আদর্শ প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রতিফলিত না হলেও একদিক থেকে হিকির গেজেটের প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উইলিয়াম বোলটসের নিদারুণ হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার পর হিকিই প্রথম সচেষ্ট হয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে অচিরেই কলকাতায় এবং ভারতের প্রতিটি বড় বড়

শহরে সংবাদপত্র প্রকাশের সমারোহ শুরু হয়ে যায়। হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের নয় মাস পরেই আর একজন ব্যবসায়ী বি. মেসিঙ্ক 'ইণ্ডিয়া গেজেট' প্রকাশ করেন। ১৭৮০ সালের নভেম্বর মাসে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রকাশিত হয়। ১৭৮০ থেকে ১৮১৮ সালের মধ্যে কলকাতা থেকে নয়খানি ইংরাজি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হল : (১) বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০), (২) ইণ্ডিয়া গেজেট (১৭৮০), (৩) বেঙ্গল জার্নাল (১৭৮৫), (৪) দি ক্যালকাটা ক্রনিকল (১৭৮৬), অর ওরিয়েণ্টালস্টার (৫) দি ক্যালকাটা গেজেট (১৭৮৪), (৬) ক্যালকাটা কুরিয়র (১৭৯৫), (৭) ইণ্ডিয়া অ্যাপলো (১৭৯৫), (৮) বেঙ্গল হরকরা (১৭৯৮), (৯) দি রিলেটর (১৭৯৯)। এছাড়া মাসিক ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অফ ক্যালকাটা অ্যামিউজমেণ্ট (১৭৮৫) ও ক্যালকাটা ম্যাগাজিন (১৭৯১) নামে দুটি ম্যাগাজিনের নামও পাওয়া যায়।

বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের এক শতকের মধ্যেই মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকেই সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়ে যায়। ১৭৮৫ সালের ১২ অক্টোবর মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় 'মাদ্রাজ কুরিয়র'। ১৭৮৯ সালে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয় 'বোম্বে হেরাল্ড'। এই সমস্ত সংবাদপত্রের মালিকানা, পরিচালনা, সম্পাদনা সবই পুরোপুরি বিদেশীদের হাতে ছিল। সংবাদপত্রের পরিচালকেরা ছিলেন মুখ্যত ব্যবসায়ী। বেঙ্গল গেজেটের জেমস অগস্টাস হিকি এবং বেঙ্গল জার্নালের উইলিয়ম ডুনে ছিলেন ছাপাখানা ব্যবসায়ী। ইণ্ডিয়া গেজেটের দুই মালিকের মধ্যে বি. মেসিঙ্ক ছিলেন থিয়েটার কোম্পানীর মালিক, পীটার রীড লবণ ব্যবসায়ী। সংবাদপত্রের মালিকানা সরকারী কর্মচারী কিংবা ব্যবসায়ীদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এর ফলে সংবাদপত্র হয় চটকদার খবর বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের বাহন হয়েছে না হয় বণিক সমাজের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। জন পামার নামে ধনী ব্যবসায়ী 'ক্যালকাটা জার্নাল, প্রকাশের সময় নিজের উদ্দেশ্য গোপন করেন নি। তিনি এমন একটি কাগজ চেয়েছিলেন, যার দ্বারা শহরের ব্যবসায়ী সমাজের বাবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।[৩০]

এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে কলকাতার এই ইউরোপীয় পরিচালিত ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে যতই কণ্ঠ সোচ্চার করুক আসলে অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই শ্রেণীস্বার্থ এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়া মোটেই অভিপ্রেত ছিল না।

ক্যালকাটা জার্নাল এই সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন :

"...each of them professing to have the earliest intelligence of great events and each of them promising their portion of orginal disquisition. But with the exception of two oı three most, of these journals are found however to have no sentiment, either of the public or of their own, on the leading features of the times, no earlier intelligence of great event than that which they have copied from

their "brother editor" of the preceding day and no more of original disqnisition than has been first echoed from the prints of Europe to those of india, and then In sevenfold repetition, from one to the another, till the weekly round has been completed.[৩১]

শুধু পূর্বোক্ত সংবাদপত্রগুলি নয়, যিনি এই সমালোচনা করেছেন, সেই ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক বাকিংহামও বলেছেন, তাঁর কাগজ সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাত না।[৩২]

এই ইংরাজি সংবাদপত্রগুলির প্রচার বাঙালিদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। তার বড় একটা কারণ অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশক পর্যন্ত দেশে ইংরাজি জানা লোকের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত বাঙালির ইংরাজি জ্ঞান মোটামুটি কিছু ইংরাজি শব্দ মুখস্থ করার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল।

১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এদেশের লোকদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইংরাজি শিক্ষা দেবার জন্য চিৎপুর, ধর্মতলা, শিয়ালদহ, বৈঠকখানা অঞ্চলে ফিরিঙ্গিরা কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের মধ্যে চিৎপুরে শেরবোর্ন সাহেবের ও ধর্মতলার ড্রামণ্ড স্কুলের খ্যাতি ছিল। সাধারণত এসব স্কুলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেরাই ইংরাজি শিখত। দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রমুখেরা এই শেরবোর্ন স্কুলেই পড়েছেন। তবে এই সব স্কুলে সাধারণ মানুষের ছেলেরা কখনও যেত না এবং ছাত্রের অভাবে মেমসাহেব মহিলাদের চালিত স্কুল উঠেও গিয়েছে।[৩৩]

সুতরাং সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের কিছু কিছু ব্যক্তি ইংরাজি জানলেও ইংরাজি তখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনায়ত্ত ছিল। দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর ইংরাজি-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় লিখেছেন, কলকাতার বাইরে নবদ্বীপে রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ পাল, ও প্রতাপচন্দ্র পাল এই ক'জন মাত্র ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন। বাকিংহাম নিজেই বলেছেন, তাঁর ক্যালকাটা জার্নালের ২০টির বেশি দেশী গ্রাহক ছিল না। তাছাড়া সে যুগের তুলনায় সংবাদপত্রের দামও ছিল অত্যন্ত বেশি। প্রতি সংখ্যা ক্যালকাটা জার্নালের দাম পড়ত এক টাকা করে।[৩৪] ইংরাজি সংবাদপত্রের প্রচারও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। একটি কারণ যোগাযোগের অসুবিধা। ট্রেন ও টেলিগ্রাফ তখন ভারতবর্ষে আসে নি। ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিল। ডাকমাশুলও ছিল বেশি। ১৭৮৪ সালের ২ ডিসেম্বরের খবরে জানা যাচ্ছে যে ৫½ থেকে ৬½ সিক্কা ওজনের প্যাকেট ব্যারাকপুর, হুগলী, চন্দননগরে যেতে লাগে ৫ আনা। ঢাকা ও কটকে ২৫ আনা। দিনাজপুরে ১ টাকা ৪ আনা।[৩৫]

অবশ্য আগে থেকে লাইসেন্স নিলে বাৎসরিক বিল মিটিয়ে দেবার চুক্তিতে গ্রাহকদের কাছে ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো যেত।[৩৬] কিন্তু ডাকমাশুল যে প্রচারের অন্তরায় তা

বাকিংহাম অনুধাবন করেছিলেন। ১৮১৯ সালে বাকিংহাম গবর্নর জেনারেলকে একটি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, সংবাদপত্রের ওপর ডাকমাশুল তুলে দিলে পত্রিকার প্রচার বাড়বে।[৩৭]

তবে এই প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও অনেক ইংরাজি সংবাদপত্র মুনাফা করেছে। তাদের আয় ছিল বিজ্ঞাপন থেকে। ক্যালকাটা জার্নালের বাৎসরিক আয় ছিল বছরে ছ'হাজার থেকে আট হাজার টাকা। বাকিংহামের সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল চার লক্ষ টাকা। অথচ বাকিংহাম কপর্দকহীন ভাগ্যান্বেষী পর্যটক হিসাবেই কলকাতায় এসেছিলেন। ক্যালকাটা জার্নালের ৪০০টি শেয়ার তার মধ্যে ৭০ শেয়ার কেনেন ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, সরকারী অফিসার ও অন্যান্যরা। শেয়ার হোল্ডাররা তিনমাস অন্তর মোটা ডিভিডেণ্ট পেতেন। ক্যালকাটা জার্নালের যে ৩০ হাজার টাকা দেনা ছিল, তা পত্রিকা প্রকাশের তিন মাসের মধ্যেই শোধ দেওয়া হয়।[৩৮] প্রচুর ডাক-মাশুল সত্ত্বেও এই পত্রিকা ডাকযোগেও বিভিন্ন অঞ্চলে যে যেত তার প্রমাণ ক্যালকাটা জার্নালের কর্তৃপক্ষকে বছরে ডাক ব্যয় মেটাতে হত ৩০ হাজার টাকার মত।[৩৯] এক কপি ক্যালকাটা জার্নাল পাঠাতে ডাকব্যয় পড়ত পাঁচ ছ' টাকা। তৎকালীন ডাক ব্যবস্থায় মাশুল নির্ধারণের নীতিও ছিল অদ্ভুত। কলকাতার পোস্টেজে শুধু গঞ্জাম পর্যন্ত কাগজ পাঠানো যেত। গঞ্জাম থেকে দূরে কোথাও কাগজ পাঠাতে গেলে আবার নতুন করে ডাক খরচ দিতে হত।[৪০]

অবশ্য সব সংবাদপত্রই মুনাফা করতে পারে নি। বেঙ্গল হরকরার একলক্ষ টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিল। ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয় এবং সেজন্যই পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে পরিচালন ব্যয়ভারও বহন করতে হত যথেষ্ট। বেঙ্গল হরকরার সম্পাদকের বেতন ছিল ৮০০ টাকা। সাবএডিটর ৩০০ টাকা। দুই থেকে তিনজন রিপোর্টার ২০০ থেকে ৩০০ টাকা বেতন পেতেন। সেদিনের তুলনায় টাকার অঙ্ক কম নয়। ১৮৪৩ সালে বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদক অক্ষয় দত্ত মাত্র ৪০ টাকা বেতন পেতেন। 'হরকারুর' প্রিনটিং অফিসে গ্যাসের আলো জ্বলত।[৪১] কলকাতার ২০ মাইলের ইংরাজি পত্রিকার প্রচার মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল। এতকথা বলার উদ্দেশ্য এটাই দেখানো যে ১৮১৮ সালে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের সময় পর্যন্ত ইংরাজি সংবাদপত্র বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসাবে সাফল্য লাভ করলেও, তার সঙ্গে বাঙালি সমাজের কোন নাড়ীর যোগ ছিল না। অষ্টাদশ শতকের কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজি সংবাপত্রগুলি বাঙালি সমাজ, জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীন ছিল।

অথচ কলকাতায় বসবাসকারী ঔপনিবেশিক ও সিবিলিয়ানদের মধ্যে যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কারও আগ্রহ একেবারে ছিল না তা ঠিক নয়। তাহলে ১৭৮৪ সালে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না।

১৭৭০ থেকে ১৭৮৩ সালের মধ্যে অন্তত দশজন এমন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীর নাম

করা যেতে পারে যাঁরা ভারতে নেহাৎ চাকুরির উদ্দেশ্যে এসে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। এবং প্রাচ্য ভাষাচর্চায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এঁদের নাম ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ব্যুৎপত্তির তালিকা দিয়ে দেখান হল :[৪২]

নাম :	ভাষালত ব্যুৎপত্তি	কর্মক্ষেত্র	প্রাচ্যবিদ হিসাবে প্রধান কাজকর্ম
চেম্বারস	পারসি	সুপ্রীম কোর্ট	এশিয়াটিক সোসাইটি
রবারট—		বিচারক	অনুবাদক
কোলব্রুক	সংস্কৃত	সুপ্রীম	অনুবাদক এশিয়াটিক সোসাইটি
হেনরি		কাউনসিল	
ডানকান—	পারসি বাংলা ও	রেসিডেন্ট	সমাজ সংস্কারক ; গবেষক :
জোনাথান	সংস্কৃত	বেনারস	এশিয়াটিক সোসাইটি
এডমানস্টোন—	বাংলা পারসি ও	পারসিয়ান	অনুবাদক এশিয়াটিক সোসাইটি
লিয়েল-বি	পারসি	সেক্রেটারি	
ফরসটার—			
হেনরি পি.	বাংলা	ক্যালকাটা	প্রথম আধুনিক বাংলা
		মিনট	অভিধান
গিলক্রাইস্ট	উর্দু	অধ্যাপক ফোরট	অনুবাদক, উর্দু অভিধান
জন বি.		উইলিয়ম কলেজ	ও ব্যাকরণ, এশিয়াটিক সোসাইটি
হালহেড	বাংলা সংস্কৃত	সুপ্রীত কোরট	প্রথম অধুনিক বাংলা ব্যাকরণ
ন্যাথেনিয়েল বি	পারসি	বিচারক	
হানটার	উর্দু	ফোরট উইলিয়ম	অনুবাদক, এশিয়াটি
উইলিয়ম		কলেজের অধ্যাপক	সোসাইটি,
		ও গ্রন্থাগারিক	
জোনস	সংস্কৃত পারসি	সুপ্রীম কোরটের	অনুবাদক এশিয়াটিক
উইলিয়ম	আরবি	বিচারপতি	সোসাইটি
	পারসি	ডাইরেকটর	অনুবাদক, গবেষক, এশিয়াটিক সোসাইটি
উইলকিনস	সংস্কৃত বাংলা	কোম্পনি প্রেস,	
চালর্স		কলকাতা	

১৭৮৪ সাল থেকে এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে প্রাচাবিদ্যার বিরাট চর্চা সুরু হয়েছিল। এই প্রাচাবিদদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রাচীন শাস্ত্র গভীরভাবে অনুধ্যান করে হিন্দুদর্শন ও নানান হিন্দু বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে মিঃ জোনাথান ডানাকান তো বার বার বলতেন যে হিন্দু আইন, সাহিত্য ও ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য অবিলম্বে একটি হিন্দুকলেজ স্থাপন করা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত প্রাচ্যবিদদের কেউ সংবাদপত্র প্রকাশ বা

সম্পাদনার সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করেন নি। করলে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রত্যুষেই ভারতচিন্তা হয়ত সংবাদপত্রেও উপজীব্য হয়ে উঠল। কিন্তু তা হয়নি। সত্যিকারের ভারতীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল আরও পরে ১৮১৮ সালে। যদিও এই পত্রিকা প্রকাশের পিছনেও ভারততত্ত্ববিদ্ বিদেশীদেরই প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির বুদ্ধিজীবীরা যে অর্থে ভারততত্ত্ববিদ, শ্রীরামপুরের মিশনারিরা সে অর্থে নন। একথা ঠিক অষ্টাদশ দশকের ভারততত্ত্ববিদদের অনেকেই ভারতীয় ভাষা চর্চা শুরু করেছিলেন চাকুরির খাতিরে। পরে তাঁরা ভাষার প্রেমে পড়ে যান এবং ভাষার অতলে পৌছে শাস্ত্রের মণি মাণিক্যের সন্ধান পেলে তখন তাঁদের এই গবেষক সত্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু শ্রীরামপুরের মিশনারিরা মুখ্যত ধর্মপ্রচারক এবং প্রচারণার কাজে সহায়ক হবে বলেই তাঁদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা। এবং ওই কারণেই জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে তাঁরা প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কলকাতায় না হয়ে মফস্বল শহর শ্রীরামপুর থেকে কেন কাশিত হয়েছিল বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস পাঠকের মনে সে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সন্ধান পাওয়া যাবে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাজ বাংলা দেশে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপনেই বিশেষ আগ্রহী ছিল। এই উভয় আধিপত্য কায়েম করার জন্যই আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বাঙালির সমাজ ও ধর্মজীবনে হস্তক্ষেপ করার তারা পক্ষপাতী ছিল না। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা বিহার ও ওড়িষার দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৭২ সালে ১৩ এপ্রিল থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংস ফোরট উইলিয়ম ইন বেঙ্গলের গবর্নর হন। লর্ড নর্থের রেগুলেটিং অ্যাকটের বিধান অনুসারে ১৭৭৪ থেকে ১৭৮৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত হেষ্টিংস ছিলেন 'গভর্নর জেনারেল অব দি প্রেসিডেন্সি অব ফোর্ট উইলিয়ম ইন বেঙ্গল।' হেষ্টিংসের পর গবর্নর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬—১৭৯৩) কর্ণওয়ালিশের পর স্যর জন শোর (১৭৯৩-৯৮) তারপর লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮—১৮০৫)। ওয়েলেসলীর পর স্যর জর্জ বার্লো (১৮০৫-৭) ও লর্ড মিনটো (১৮০৭-১৩) মারকুইজ অব হেষ্টিংসের শাসন সুরু হয় ১৮১৩ সালে। চলে ১৭২৩ পর্যন্ত।

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে মাকুইস অব হেষ্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত ভারতীয়দের মনে বিজাতীয় চিন্তাধারার প্রবর্তনা দূরে থাক বরং দেশীয় ভাষা সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার প্রতিই বিদেশী শাসকরা অধিকতর উৎসাহ দেখিয়েছেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস স্বয়ং ভারতীয় সংস্কৃতির অনুধ্যানে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করে গেছেন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনের জন্য কোম্পানীর অফিসারদের প্রাচ্যভাষা চর্চায় উৎসাহিত করেছেন।[৪৩] হেষ্টিংসের উৎসাহেই ১৭৭৮ সালে ন্যাথেনিয়েল হ্যালহেড বাংলা ভাষার

ব্যাকরণ—Grammar of the Bengali Language প্রকাশ করেন। ওই বছরই চার্লস উইলকিন্স হুগলির পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়েঅক্ষর কাটিয়ে সর্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। একথা ঠিক যে হেষ্টিংস মনীষী ছিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই তিনি প্রশাসকদের ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলতে চেয়েছিলেন। বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পিছনেও এই প্রশাসনিক স্বার্থ ছিল। হেষ্টিংস ভেবেছিলেন যে এই নতুন ছাপাখানা ইংরাজী আইন গ্রন্থ ও সরকারী অনুজ্ঞার বাংলা অনুবাদ প্রচারের পক্ষে সহায়ক হবে। বাস্তবিকই তাই হয়েছিল। হ্যালহেডের গ্রামার ছাপা হবার পর ১৭৮৫ সলে ছাপা হয় জোনাথন ডানকানের ইমপে কোড এর বাংলা। ১৭৯৩ সালে প্রকাশিত হয় কর্ণওয়ালিস কোডের বাংলা অনুবাদ।

১৮০০ সালের ১০ জুলাই ওই প্রশাসনিক স্বার্থেই লর্ড ওয়েলেসলী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেছিলেন। এই ধরনের কলেজ স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা হেষ্টিংসের মাথায় আসে। শুধুমাত্র সিভিল সার্ভেন্ট গড়ে তোলাই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল না। কোম্পানীর তরুণ ইংরাজ কর্মচারীরা যাতে প্রাচ্য সংস্কৃতি ও তার ধ্যান ধারণা সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত হতে পারে ওয়েলেসলীর মনে সেই উদ্দেশ্যই ছিল। তা না হলে এই কলেজের ছাত্রদের আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত পড়াবার কোন প্রয়োজন ছিল না।[৪৪]

ফোরট উইলিয়ম কলেজ কার্যত প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার কেন্দ্রেই পরিণত হয়েছিল এবং মারকুইস হেষ্টিংসের রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রশাসন ইংরেজ রাজকর্মচারীদের এই প্রাচ্যমুখীনতার প্রতিই উৎসাহ দেখিয়ে এসেছেন।

"until the administration of Marquess Hastings, Orientalists had been encouraged to pursue high culture scholarly interests and were urged to adopt the classical Sanskritic culture as the model for Hindu regeneration......the notion of projecting the "golden age" of the Hindus into the future by rehabilting their existing institutions was a favourite literary theme for students and professors at the College of Fort William. The impetus for this thought came from the evolving Orientalist view of Hinduism in which the decadence of contemporary Hindu Culture had to be reconclied with the new discoveries of a glorious past civilisation. The Indian Govermment encouraged the students at Fort William to speculate freely on the problem of renaissance among the Hindus. Such intellectual awarness contributed to cultural responsiveness and produced civil servants."[৪৫]

সুতরাং এই পরিমণ্ডলের মধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন খ্রীষ্টান মিশনারিদের ব্রিটিশ ভারতে অবাধে ধর্মপ্রচারে অনুমতি দিতে চাননি। তাঁরা ভেবেছিলেন এর ফলে দেশীয়

জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মাবে। মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে দেশীয় জনসাধারণ বিশেষ করে নব উদ্ভূত বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ ও ধনিকগোষ্ঠী ব্রিটিশ রাজকে সর্বতোভাবে সমর্থন করতে এগিয়ে এসেছিলেন।[৪৬] ব্রিটিশ সরকার ভেবেছিলেন মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ইংরেজ রাজত্বের প্রতি ভারতীয়দের বিশ্বাসকে খর্ব করবে।

দ্বিতীয়তঃ আরও একটি কারণে ইংরেজ প্রশাসকরা ইওরোপীয় মিশনারিদের ব্রিটিশ ভারতে ধর্মপ্রচারে অনুমতি দিতে পারেননি।

১৭৯৩ সালে ফ্রান্স ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্র ছিল অস্ট্রিয়া, প্রুসিয়া, স্পেন ও হল্যাণ্ড। কিন্তু এই মৈত্রী বন্ধন দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ১৭৯৮ সালে ওয়েলেসলী যখন বাংলা প্রেসিডেন্সীর গভর্নর হয়ে এলেন, তখন ইংলণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ একা এবং যুদ্ধের গতি ফরাসীদেরই অনুকূলে। ওয়েলেসলী স্বভাবতই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রখর দৃষ্টি রাখছিলেন যে এমন কোন বৈদেশিক চিন্তাধারা ভারতে এসে না পড়ে যার ফলে ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোন বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হবে। তাই বেসরকারী ইওরোপীয় মিশনারীদের আগমনের দ্বার এদেশে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ মিশনারিদের ছদ্মবেশে ফরাসী গুপ্তচর বা র‍্যাডিক্যাল পন্থী ইংরেজদের এদেশে আগমনের সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল।

আর তাছাড়া ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে ক্রমাগত বিপর্যয়ের পর এমন গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও নেপোলিয়নের বিজয় অভিযানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকি ১৭৯৮ সালে কলকাতার ইংরাজী সংবাদপত্রগুলিতে পর্যন্ত সেই গুজবের কথা প্রকাশিত হয়।[৪৭]

১৭৯৮ সালের ১৮ জুন ও ২৬ নভেম্বর সিলেক্ট কমিটি ইংলণ্ড থেকে গবর্নর জেনারেলকে ভারতে যে গোপন পত্র লেখেন, তাতে জানিয়েছিলেন ওয়েলেসলী যেন নেপোলিয়নের সম্ভাব্য ভারত আক্রমণ সম্পর্কে সজাগ থাকেন।[৪৮]

এইসব কারণেই ভারতে মিশনারীদের আগমনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। এমনকি বেসরকারী ইওরোপীয়দেরও ভারতে বসবাসের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হত ও বহু টালবাহানার পর তাদের লাইসেন্স দেওয়া হত। বছরে ৮।১০ টির বেশী লাইসেন্স ইস্যু করা হত না।[৪৯]

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনারী যিনি এসেছিলেন তার নাম রেভাঃ জন টমাস (১৭৫৭-১৮০১)। ১৭৮৩ সালে একজন চিকিৎসক হিসাবে এদেশে প্রথম আসেন ও ১৭৮৪ সালে ইংলণ্ড ফিরে যান। ১৭৮৬ সালে টমাস আবার বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের বাসনা তাঁর মধ্যে প্রবলতর হয়। তিনি মুন্সী রামরাম বসুর কাছে প্রবল আগ্রহ নিয়ে বাংলা শেখেন, নবদ্বীপে গিয়ে সংস্কৃতও শিক্ষা করেন। কিন্তু টমাস বুঝেছিলেন এদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য ইনষ্টিটিউশন গড়ে তুলতে না পারলে তা কিছুতেই ফলপ্রসূ হবে না। এই কাজে সমমর্মী উপযুক্ত সহকর্মীর

খোঁজে তিনি ১৭৯২ সালে পুনরায় ইংলণ্ড ফিরে যান। ইংলণ্ডে তাঁর সঙ্গে উইলিয়ম কেরীর আলাপ হয়। কেরী ভারতে না এসেও হিদেনদের মধ্যে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের জন্য উতলা হয়ে উঠেছেন এবং কোটারিং শহরে 'The Particular Baptist Society for propagating the Gospel amongst the Heathen' নামে সমিতি গঠন করেছেন। কেরী ও টমাসের মিলন বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে উত্তরকালে নতুনভাবে আবর্তিত করেছে। টমাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ১৭৯৩ সালের ১৩ জুন কেরী-পত্নী ডারোথি, শ্যালিকা ক্যাথারিন, পুত্র ফেলিকস, উইলিয়ম পিটার ও সদ্যজাত জ্যাবেজকে নিয়ে একটি ডেনিস জাহাজে চড়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে উত্তাল মহাসমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এই অভিযাত্রী দলের সঙ্গে ছিলেন টমাস।

কিন্তু তাঁদের এই অভিযান বাধাহীন হয়নি। একমাস আগেই তাঁরা যাত্রা করতেন। কিন্তু মে মাসে এক ব্রিটিশ জাহাজে উঠে বসার পর জাহাজের ক্যাপটেন যখন জানতে পারেন, তাঁরা মিশনারি তখন তিনি কেরী পরিবারকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেন। তাই বাধ্য হয়ে একমাস পরে তাঁরা একটি ডেনিস জাহাজে করে কলকাতা রওনা হন।[৫০]

১৭৯৯ সালের ২৪ মে স্বেচ্ছাব্রতী খ্রীস্টান মিশনারি জশুয়া মার্শম্যান সদলবলে কেরীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তাঁদের ভাগ্যেও অনুরূপ অভ্যর্থনা জুটেছিল। কোন ব্রিটিশ জাহাজ তাঁদেরও নিতে রাজি হয়নি। অবশেষে একটি আমেরিকান জাহাজে তাঁরা স্থান পান। কেরী মার্শম্যানকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এমবারকমেন্ট ফরমে তাঁরা যেন কিছুতেই 'মিশনারি' কথাটি না লেখেন। কিন্তু মার্শম্যান সত্য গোপন করতে রাজি হননি। কেরীর মত প্রকাশ্যে অবতরণ তাঁদের ভাগ্যেও ঘটল না। তাঁরা জাহাজের ক্যাপটেনের সহায়তায় একটি নৌকা যোগাড় করে সোজা গিয়ে উঠেছিলেন শ্রীরামপুরে (১৩ অক্টোবর)। শ্রীরামপুর তখন ডেনিশ উপনিবেশ। ব্যাপটিস্ট মিশন শ্রীরামপুরকেই মিশনারি আন্দোলনের পক্ষে অধিকতর নিরাপদ জায়গা বলে মনে করেছিলেন। ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশন লণ্ডনের ডেনিশ কনসালের কাছ থেকে শ্রীরামপুরের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি সুপারিশপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সুপারিশপত্রটুকুই সেদিন মার্শম্যানের বড় সম্বল ছিল। তার জোরেই তিনি ডেনিশ কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভ করেছিলেন।

এদিকে মার্শম্যানের সদলবলে জাহাজে থেকে পলায়ন ও শ্রীরামপুরে আশ্রয় লাভ ইত্যাদি ঘটনার ফলে ওয়েলসলীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে মার্শম্যান ফরাসী গুপ্তচর। ওয়েলেসলী আমেরিকান জাহাজের ক্যাপটেনকে আদেশ দিয়েছিলেন যে পলাতক মিশনারিদের ফিরিয়ে না আনলে তাঁর জাহাজের মাল খালাশ করতে দেওয়া হবে না। অবশেষে কলকাতার এক প্রভাবশালী ইংরাজ ডেভিড ব্রাউন মারফৎ ওয়েলেসলীর এই ভুল ধারণা ভাঙে এবং বিষয়টির ওখানেই নিষ্পত্তি হয়।[৫১]

১৭৯৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর কেরী তাঁর সন্তক্রীত মুদ্রণ যন্ত্রটি নিয়ে শ্রীরামপুরে এসে মিশনারিদের সঙ্গে মিলিত হন। ছ'বছর ধরে কেরী কলকাতা, ব্যানডেল, নদীয়া, সুন্দরবনের দেবহাট্টা, মালদহের মদনাবাটী প্রভৃতি স্থানে চাকরি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ১৭৯৪ সালে মালদহের মদনাবাটীর নীলকুঠিতে চাকরি করার সময় তিনি বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ ও ব্যাকরণ তৈরি করেছিলেন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

কিন্তু বাংলা টাইপের অভাবের জন্য কেরী মুদ্রণের কাজে হাত দিতে পারেননি। ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটিকে কেরী একটি চিঠিতে মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রাকর পাঠাতে লিখেছিলেন।[৫২] ইতিমধ্যে খবর পেলেন কলকাতায় চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকার মিলে একটি দেশীয় টাইপ ফাউন্ড্রি তৈরি করেছেন।[৫৩] তখন কেরী ইংলণ্ড থেকে তৈরি টাইপ আনার সংকল্প ত্যাগ করেন। ১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারী শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হয়।[৫৪] মিশন প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই কেরী পঞ্চানন কর্মকারকে শ্রীরামপুর মিশনে নিয়ে আসেন। ১৮০০ সালের ১৮ মার্চ ওয়ার্ড নিজের হাতে টাইপ সাজিয়ে ওল্ড টেস্টামেন্টের কিছু অংশের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।[৫৫] বাংলা হরফের প্রথম কারিগর পঞ্চাননের সঙ্গে তাঁর জামাতা মনোহরও শ্রীরামপুর আসেন। ১৮০৩-০৪ সালের মধ্যে পঞ্চাননের মৃত্যু হয়। পঞ্চাননের শিল্প কুশলতা মনোহরের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে বর্তেছিল। মনোহর ১৮৫৩ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ও ভারতের পনেরটি প্রাদেশিক ভাষা ও চীনা ভাষায় হরফ তৈরি করে যশস্বী হন।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ১৮১৮ সালের মধ্যে শুধু বাংলা হরফে ৩৬টি পুস্তক, একটি সংস্কৃত পুস্তক ও ওইসব মুদ্রিত পুস্তকের আরও ১২টি সংস্করণ প্রকাশ করেন।[৫৬] এর মধ্যে সবই যে প্রচারধর্মী পুস্তক তা নয়। রামরাম বসু কৃত হরকরা বা 'গসপেল মেসেঞ্জার', এবং ঐ লেখকের 'জ্ঞানোদয়ের' মত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে লেখা বইও যেমন আছে, বাইবেলের বিভিন্ন অংশের অনুবাদও তেমন আছে। তেমনি আছে রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ। ব্যাপটিস্ট মিশন ফোরট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যতালিকার উপযোগী যেসব বই (যথা রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত, পুরুষ পরীক্ষা, বত্রিশ সিংহাসন,) প্রকাশ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে মিশনারী প্রচারের নামগন্ধ ছিল না। শুধুমাত্র জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের তালিকাও কম নয়। যেমন (১) জ্যোতিষ, (২) গুরু দক্ষিণা, (৩) বিশ্বকোষ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের প্রচেষ্টা হিসাবে ফেলিক্স কেরী সংকলিত বিদ্যাহারাবলী, পদার্থ-কৌমুদী, ভূগোল গ্রন্থের অনুবাদ, জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়, ফেলিকস কেরীর 'ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ' প্রভৃতি।

তবে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। অবশ্য যে বিরোধের মধ্য দিয়ে মিশনারিরা ভারতে এসেছিলেন

পরবর্তীকালে সে বিরোধের অবসান হয়েছিল। ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজকর্মে কোন বড়রকম বাধার সৃষ্টি করা হয়নি। বরং ১৮০১ সালের ৮ এপ্রিল কেরীকে ফোরট উইলিয়ম কলেজের বাংলা অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কেরী এই পদ গ্রহণ করেন। কেরীর মাধ্যমে ফোরট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ফোরট উইলিয়ম কলেজ শ্রীরামপুর প্রেসে একাধিক পুস্তক ছাপতে দেন আবার মিশন প্রকাশিত পুস্তকের বহু কপি কিনে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

এইসব অনুকূল পরিবেশ দেখেই জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনুভব করেছিলেন, একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ স্কুলপাঠ্য মুদ্রিত পুস্তক সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর চাহিদা দেখা যাচ্ছে।

"It appeared that the time was ripe for a native newspaper, and I offered the missionaries to undertake the publication of it··· The jealousy which the Government had always manifested of the periodical press appeared however to present a serious obstacle.[৫৭]

অবশ্য এই মুহূর্তে পত্রিকা প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে সরকারের যে আনুকূল্যটুকু তাঁরা লাভ করেছিলে তা হারাতে মিশনের অনেকেই রাজি ছিলেন না। বিশেষ করে কেরীর এই উদ্যোগে সায় ছিল না। তাঁর মত আরও অনেকের ভয় ছিল যে বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হলে সরকার তাকে কখনই বরদাস্ত করবেন না। সংবাদপত্র সম্পর্কে ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠির মনোভাব তাঁদের জানতে বাকী ছিল না। ১৭৯৪ সালে বেঙ্গল জার্নালের সম্পাদক উইলিয়ম ডুনেকে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৭৯৮ সালে বেঙ্গল হরকরার সম্পাদক চার্লস ম্যাকলিনকেও বিতাড়িত হতে হয়। ১৮২৩ সালে ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক বাকিংহামের ভাগ্যেও একই ঘটনা ঘটে। যেখানে স্বদেশীয়দের দ্বারা চালিত ও সম্পাদিত ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারী মনোভাব এতখানি কঠোর সেখানে বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে এই আশঙ্কা অহেতুক ছিল না।

এতএব ঠিক হয়েছিল 'টেষ্ট কেস' হিসাবে প্রথমে একটি নির্দোষ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে সরকারের মনোভাব কী তা দেখে নেওয়া হবে। এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন ডঃ জশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

"It was resolved therefore to feel the official pulse by starting a monthly magazine in the first instance and the Dig-Dursun appeared in April 1818.[৫৮]

বাংলা প্রথম সাময়িকপত্র দিগদর্শনের জন্ম এইভাবেই হয়েছিল। দিগদর্শন দু' সংখ্যা বার করার পর কাউন্সিলের মেম্বারদের কাছে পাঠানো হয়। যখন দেখা গেল কোথাও থেকে আপত্তি উঠল না, তখন ঠিক হল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা

হবে। ইংরাজী সংবাদপত্র Mirror of News-এর অনুকরণে নাম ঠিক হল 'সমাচার দর্পণ'। এবারেও কেরী প্রবল আপত্তি করলেন। মার্শম্যান ও ওয়ার্ড কেরীর আপত্তি শুনলেন না। পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় চলতে লাগল। এমনকি পত্রিকা প্রকাশের আগের দিন যখন মিশনের বৈঠকে পত্রিকার প্রুফ শীট অনুমোদনের জন্য নিয়ে আসা হল তখনও কেরী পুরাতন বক্তব্যে অনড়। তখন মার্শম্যান বৈঠকে বলেছিলেন, কাল সকালেই দর্পণের অনুবাদের কপি নিয়ে তিনি কলকাতা যাবেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট এডমোনস্টোন ও চীফ সেক্রেটারীকে অনুবাদটি দেখাবেন, যদি তাঁরা আপত্তি করেন তাহলে তিনি কাগজ বন্ধ করে দেবেন।[৫৯]

কাগজ বন্ধ করতে হয়নি। সরকারের তরফ থেকে আপত্তি ওঠেনি। মার্শম্যান উৎসাহ পেয়ে হেষ্টিংসকে কাগজের একটি কপি পাঠিয়েছিলেন। হেষ্টিংস তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। হেষ্টিংস কাগজ দেখে এত খুশী হয়েছিলেন যে নিজে হাতে প্রশংসাপত্র লিখে সম্পাদককে পাঠান। এখানে নবজাগরণের পটভূমিতে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করা দরকার। একটি হল, ব্রিটিশ রাজশক্তির সহযোগিতা। মারকুইস হেষ্টিংসের বদলে যদি কোন অনুদার গবর্নর জেনারেল সে সময় ক্ষমতায় থাকতেন তাহলে বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ মহাজাগরণের সেই শুভ মুহূর্তে ঘটতে পারত না। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, শ্রীরামপুরের মিশনারিদের সাংবাদিকতার প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠা। মূলতঃ ধর্ম প্রচারক হয়েও সমাচার দর্পণকে তাঁরা কোনদিনই প্রচার পত্রিকা করে তোলেননি। তাকে খাঁটি সংবাদপত্রের রূপ দিয়েছেন। মধ্যে মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ ও কটাক্ষ আছে বটে কিন্তু কোথাও তা প্রকট হয়ে সংবাদপত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ম্লান করেনি। দর্পণ যদি সংবাদিক ধর্মভ্রষ্ট হয়ে ধর্ম পত্রিকা হত তাহলে মধ্য শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তবৃত্তির উদ্বোধনে তার কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকত না। সমসাময়িক একটি খ্রীষ্টান পত্রিকার ভাষায়:

"The Durpan occupies a sort of neutral position. Though edited by a Christian it does not enforce on the attention of its readers either the doctrines or the claims of the Christian revelation".[৬০]

দর্পণ অপেক্ষা মিশনারিদের ইংরাজী মাসিক Friend of India-তে খ্রীষ্টান ধ্যানধারণার প্রকাশ আরও স্পষ্ট ছিল। সমাচার দর্পণকে সরাসরি প্রচারের মাধ্যম না করার একটি কারণ মিশনারিরাও দেশীয়দের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার হোক এটাই বড় করে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করতেন, এই শিক্ষার আলোকেই হিন্দুদের 'মানসিক অন্ধকার' কাটবে এবং তারা যত বেশী বাইরের জ্ঞানলাভ করবে তত বেশী খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরক্ত হবে। শ্রীরামপুর মিশনারিরা প্রাচ্যবিদদের মত হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতেন না। আপন ধর্মমতের ব্যাপারে তাঁরা অন্ধ ছিলেন এবং

মনে করতেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মই ভারতবর্ষ ও চীনকে অজ্ঞান তিমিরান্ধকারে রেখে দিয়েছে।[৬১]

তাই তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন,

"The illumination and future happiness of India must form to the Christian Philanthropist a most imporant object of desire and expetation."[৬২]

অবশ্য শ্রীরামপুর মিশনারিদের হিসাব যে একেবারে ভুল ছিল তা বলা যায় না। নব্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তীকালে শিক্ষিত বাঙালির খ্রীষ্টধর্মান্তরের ঘটনা যথেষ্ট ঘটেছিল। শ্রীরামপুর মিশনও প্রায়ই হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করতেন। কিন্তু প্রতিটি ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া আছে, তেমনি এদেশে মিশনারি কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও রামমোহনের উদার যুক্তিগ্রাহ্য নিরীশ্বর ধর্ম আন্দোলনের (তত্ত্বের দিক দিয়ে যা প্রচলিত খ্রীষ্টমতের কাছাকাছি) আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামপুরের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাচার দর্পণই রামমোহনকে শেষ পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে। সমাচার দর্পণের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েই রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ করেছিলেন। তার কিছু কাল পরেই প্রকাশ করেছিলেন, সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)। এই কৌমুদীর সঙ্গে সংঘর্ষেই আবার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকার প্রকাশ। এবং দেখা গিয়েছিল, রামমোহন সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে সংবাদপত্রকে যেভাবে বেছে নিয়েছিলেন উত্তরকালে সেই ঐতিহ্য এক প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবজাগরণের কালের সংবাদপত্র

সমাচার দর্পণ থেকে অমৃতবাজার পর্যন্ত বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রগুলির গতি প্রকৃতির বিবরণ। প্রকাশরীতি, স্বকীয়তা, প্রচার ও সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্বের আলোচনা।

১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে যে পত্রিকাগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেগুলি হল :

১.	সমাচার দর্পণ	২৩ মে, ১৮১৮
২.	সম্বাদ কৌমুদী	৪ ডিসেম্বর, ১৮২১
৩.	সমাচার চন্দ্রিকা	৫ মার্চ, ১৮২২
৪.	বঙ্গদূত	১০ মে, ১৮২৯
৫.	সংবাদ প্রভাকর	২৮ জানুয়ারি, ১৮৩১
৬.	জ্ঞানান্বেষণ	১৮ জুন, ১৮৩১
৭.	সম্বাদ ভাস্কর	মার্চ, ১৮৩১
৮.	বেঙ্গল স্পেক্টেটর	এপ্রিল, ১৮৪২
৯.	তত্ত্ববোধিনী	১৬ আগস্ট, ১৮৪৩
১০.	এডুকেশন গেজেট	৪ জুলাই, ১৮৬৫
১১.	সোমপ্রকাশ	১৫ নভেম্বর, ১৮৫৮
১২.	অমৃতবাজার পত্রিকা	২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮
১৩.	সুলভ সমাচার	১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (১৮৭০)

এই তালিকার মধ্যে তত্ত্ববোধিনীকে সংবাদপত্র বলা যায় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আকাশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আপন মন্তব্য ও মতামতের দ্বারা যে ঝড় তুলেছিল তাতে করে তাকে সংবাদপত্র আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। অনুরূপভাবে বিদ্যাদর্শন (জুন ১৮৪২) সর্বশুভকরী (৪ মে ১৮৫০) অরুণোদয় (১৮৫৬) বিদ্যোৎসাহিনী (১৮৫৬) বামাবোধিনী (১৮৬৩) বঙ্গদর্শন (১৮৭২) ভারতী (১৮৭৭) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার অবদানের কথাও এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। তবে যেহেতু আমাদের আলোচনা প্রধানতঃ সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে সেইহেতু সংবাবপত্রের মূলবৃত্ত থেকে আমরা বিচ্যুত হতে চাই না।

সমাচার দর্পণ :

সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যা বার হয় ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১২২৫, ইং ২৩ মে ১৮১৮। সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান। তিন কলমে ছাপা চার পৃষ্ঠায় এই সংবাদপত্রটির প্রথম

পৃষ্ঠায় জানানো হয় যে কয়েক মাস হল শ্রীরামপুর ছাপাখানা থেকে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করা হয়। সেই পুস্তক "মাসে মাসে ছাপাবার ইচ্ছাও" তাঁদের ছিল। "কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মত হইল না এই কারণে যদি সে পুস্তক মাস মাস ছাপা হয় তবে কাহারো উপকার হইবে না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।" এখানে মাসিক পুস্তক বলতে দিগদর্শনকে বলা হয়েছে। এবং যেহেতু মাসিক পত্রিকার সংবাদমূল্য অত্যন্ত কম সেহেতু একটি বিশুদ্ধ সংবাদপত্র হিসাবে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁরা ত্বরান্বিত হয়েছিলেন এটি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া দিগদর্শন প্রকাশের পিছনে প্রত্যক্ষ কারণের কথাও আগের পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। সমাচার দর্পণের ওই প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল ওই পত্রিকায় সাত ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হবে।

(১) জজ, কালেকটর ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের সংবাদ।
(২) সরকারী আদেশ।
(৩) ইওরোপের অন্যান্য দেশের নূতন সমাচার।
(৪) বাণিজ্যের নূতন নূতন বিবরণ।
(৫) জন্ম মৃত্যু বিবাহ সংবাদ।
(৬) ইওরোপের সৃজনাত্মক ক্রিয়াকর্মের বিবরণ। ইংলণ্ডের ছাপা নূতন পুস্তকের বিবরণ।
(৭) ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বিদ্যা ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের বিবরণ।

সমাচার দর্পণ প্রতি শনিবার ভোরবেলা প্রকাশিত হত। মাসিক চাঁদা ছিল দেড় টাকা। অর্থাৎ প্রতিসংখ্যা ছ আনা বা বর্তমানের ৩৭ পয়সা। সেযুগের মুদ্রণ ব্যয়ের তুলনায় দাম এমন কিছু বেশী ছিল না। প্রথম সংখ্যায় বিজ্ঞপ্তি ছিল যে যাঁরা শ্রীরামপুর প্রেসে নাম ঠিকানা পাঠাবেন তাঁদের দু সপ্তাহ বিনামূল্যে এই কাগজ পাঠানো হবে। কিন্তু পরের এক বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায় অন্তত তিন মাস সমাচার দর্পণ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সমাচার দর্পণে সংবাদ প্রকাশের ধারা ও বিষয় অনুসারে দেখা যাচ্ছে সংবাদপত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। সরকারী খবর বা অফিসিয়াল নিউজ, নিয়োগ ও বদলি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম মৃত্যু বিবাহ সংবাদ যে কোন সংবাদপত্রের পক্ষেই অত্যাবশ্যক বিষয়। এছাড়া পুস্তক সমালোচনা এবং বিদেশী খবর ছিল দর্পণের এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সমাচার দর্পণের বার্তা সম্পাদনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হত[১] এবং প্রথম বাঙালি সাংবাদিকেরা প্রধানতঃ ফোরট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক গোষ্ঠী থেকেই এসেছিলেন। দর্পণের প্রথম পৃষ্ঠায় "দর্পণে মুখ সৌন্দর্যমিব কার্যবিচক্ষণাঃ বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সমাচারস্থ দর্পণে" এই শ্লোকটি লেখা থাকত। এটি ওই সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রভাব বলেই মনে হয়। কারণ দর্পণের সপ্তম সংখ্যা থেকে শ্লোকটি ছাপা হতে থাকে। প্রথম ছয়টি সংখ্যায় ওই শ্লোক ছিল না। সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় উপযুক্ত সংস্কৃত শ্লোক লেখা পরে একটি

ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রেই একটি না একটি সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ থাকত।

সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যায় বিভিন্ন খবরের হেড লাইন: (১) মশলা বিক্রয়ের ইস্তাহার (২) কোম্পানির কাগজের বাজার ভাও। (৩) ওলাওঠা. (৪) যুবরাজের কন্যার মরণ, (৫) বাণিজ্যের সমাচার, (৬) মারিচ ওপদ্বীপের ঝড়, (৭) মান্দরাজ, (৮) ইংলণ্ডে নতুন কর, (৯) সর্প কর্তৃক ছাগভক্ষণের বিবরণ, (১০) হিন্দুস্থানে তুলার বিবরণ, (১১) ইস্তাহার।

প্রথম সংখ্যায় খবরের প্রধান্য থাকলেও পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে সমাচার দর্পণে দেশবিদেশের খবর প্রাধান্য পেতে থাকে। সেযুগে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংগ্রহের সূত্র ছিল বিদেশী সংবাদপত্র যা জাহাজের সঙ্গে এদেশে আসত।

দর্পণের দ্বিতীয় সংখ্যা (৩০মে ১৮১৮)তেই তথ্যমূলক বিদেশী সংবাদ ছিল 'ইংলণ্ডের রাজার জয়'। ১৮১৭ সালে ইংলণ্ডের বাজেট সংক্ষেপে ছাপা হয়েছিল। 'বাণিজ্য' এই শিরোনামে চীনে বাংলার তুলা রপ্তানির খবর ছাপা হয়েছিল। সমাচার দর্পণে কোম্পানির ঋণপত্রের সুদ ও ডিবেঞ্চারের হারের খবর নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকায় পাঠকসাধারণের মধ্যে পত্রিকাটির তথ্যমূল্য বাড়তে থাকে। এটি সহজেই অনুমেয় যে, সমাচার দর্পণ প্রকাশের আগে এইসব তথ্য বাংলা ভাষায় পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক পাঠক রুচিকে আকর্ষণের জন্য গসিপ বা অত্যাশ্চর্য খবর ও চুটকি জাতীয় খবরের প্রয়োজন ছিল।

যেমন ১৮১৮ সালের ৬ই জুনের খবর:

স্কটলণ্ডের আশ্চর্য :—

'স্কটলণ্ড দেশে এক স্ত্রী এক পুরুষ এক গ্রামবাসী দুইজন এক দিবসে এক সময়ে মরিল সেই দুইজন এক দিবসে এক সময়ে পূর্বে জন্মিয়াছিল এবং এক ধাত্রী সেই দুইজনের সূতিকা সংস্কার করিয়াছিল ক্রমে ঐ দুইজন বর্দ্ধমান হইয়া উনবিংশতি বর্ষে ঐ স্ত্রী-পুরুষে বিবাহ হইয়াছিল তাহারা এক শত বৎসর আরোগে বাঁচিয়া এক দিবসে এক সময়ে মরিয়া এক কবরে রহিয়াছে।'

কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাচার দর্পণে ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল তা নব্য-শিক্ষিত বাঙালির কাছে দেখা দিয়েছিল এক আশীর্বাদ রূপে। আধুনিক সার্জারি বিদ্যার পরিচয়। (চিকিৎসকের কথা, ৮ আগস্ট, ১৮১৮), স্পেনের সম্রাট কর্তৃক প্রজাদের উপর উৎপীড়নের সংবাদ (স্পানিয়া ১৪ নবেম্বর, ১৮১৮), বাগ্মী ও স্বাধীনচেতা দার্শনিক ডেমস্থিনিশের বিবরণ (ডেমস্থিনিশ নামে গ্রীকেরদের এক আচার্য, ২৮ নবেম্বর, ১৮১৮), দক্ষিণ আমেরিকার বিবরণ (৩০ জানুয়ারি, ১৮১৮) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংবাদ দর্পণের পাতায় স্থান পাওয়ায় তার সাংবাদিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তবে কমারসিয়াল বা পপুলার সংবাদপত্র রূপে সমাচার

দর্পণকে গড়ে তোলাটাই বোধহয় উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে ১৫ মে, ১৮১৯-এর দর্পণে তারই আভায পাওয়া যায়।

'এই সমাচার দর্পণে কেহ কেবল রাজকীয় সমাচার জানিতে চাহেন কেহ প্রাচীন ইতিহাস কেহ চোর-ডাকাতির সমাচার কেহ যুদ্ধাদির বিবরণ কেহ জন-বিবাহ মরণ প্রভৃতি সমাচার জানিতে বাসনা করেন। অতএব নানা লোকের নানা অভিপ্রায় এক ব্যক্তির অভিমত সমাচার দিলে অন্যের অনভিমত হয় এই প্রযুক্ত সকলের অভিমত সকল প্রকার কিঞ্চিৎ সমাচার লিখিয়াছি।'

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার উদ্বোধন এবং মনোরাজ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিপ্লব বহ্নিকে প্রজ্বলিত করাই ছিল রেনেশাঁস আন্দোলনের বড় অবদান। সমাচার দর্পণ জ্ঞানের নব নব চেতনার বাতায়ন পথ খুলে দিয়েছিল।

ষ্টিম জাহাজ আবিষ্কার সে যুগের এক বৈপ্লবিক ঘটনা, ১৮১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি সমচার দর্পণ সর্বপ্রথম খবর দেয়, 'ইংলণ্ডে এক ব্যক্তি ভাগ্যবান এক মহা জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছেন সে জাহাজ কেবল বাষ্পের দ্বারায় চলে। তাহাতে পালের প্রয়োজন নাই। —এ ভাগ্যবান ব্যক্তি ঐ নৌকা লইয়া ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ আমেরিকা গিয়াছেন।'

আর একটি খবর: 'পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল ও কমলা লেবুর বোঁটা ও তাহার সমান নীচ স্থানের মত পৃথিবীর যে দুইস্থান তাহার নাম কেন্দ্র সে দুই প্রকার উত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিণ কেন্দ্র।' ১৮১৯ সালের সুমেরু অভিযানের বৃত্তান্ত দর্পণে প্রকাশিত হয়। সমাচার দর্পণে দেশ বিদেশের কথা স্থান পেত এবং ফলে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে পাঠকের মনে স্বচ্ছ ধারণা জন্মাত। ইংলণ্ড আমেরিকা সম্পর্কে নিয়মিত খবর ছাড়া ব্রহ্মদেশের খবরও বার হত। জ্ঞানচর্চায় দর্পণের প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে ঔষধসার সংগ্রহ প্রকাশ করলে এ খবরের উল্লেখ করে দর্পণ লেখেন—

'ইওরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাংলা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমাদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইওরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বঙ্গভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্টও উপকার হইবে।' (৫ জুন, ১৮১৯)

সমাচার দর্পণকে পুরোপুরি ভারতীয় পত্রিকা বলতে কোন আপত্তি দেখা যায় না। মিশনারি প্রচার এই পত্রিকায় প্রচ্ছন্ন ছিল। উপরন্তু হিন্দু বাঙালির আশা আকজ্ঞার সঙ্গে এই পত্রিকা নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছিল। ভারতীয় শাস্ত্র চর্চাতেও দর্পণ উৎসাহ দিয়ে গেছে।

'এই বাঙ্গালা দেশে অন্য শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিত্তবান হইতেছেন ভিন্ন প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও

ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই। কিন্তু পশ্চিমে কাশী প্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরের সাহেব লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুক্ত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।' (শ্রীরামপুরের টোল ২০ মারচ ১৮১৯)

প্রথম দু'বছেরর সমাচার দর্পণের ফাইল যা বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে সেগুলির মধ্যে মিশনারী প্রচার চোখে পড়েনি। বরং রামমোহন সম্পর্কিত খবরাখবরও দর্পণ সে সময় প্রকাশ করেন। যেমন—

নূতন পুস্তক

শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় অথর্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্যকৃত তাহার টীকা বাঙ্গালাভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন (২৭ মারচ ১৮১৯)
আর একটি খবর :—

বেদান্তমত

৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন।

আমরা শুনিয়াছি যে সেই সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামী মরণান্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্যে কালক্ষেপ কর্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনারদের মতানুযায়ী বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাহিলেন (২২ মে ১৮১৯)।

সমাচার দর্পণ ১৮১৯ সালের ১২ জুন তারিখের পত্রে খিদিরপুরে দেওয়ান মতিচন্দ্রের ঘরে বৈদান্তিকদের আলোচনার আর একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করেন। ১৮১৯ সালের ১০ই জুলাই পত্রে প্রয়াগ তীর্থের বর্ণনা ও ইতিহাসও ছাপা হয়েছে। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দুর্গোৎসব, চড়ক, প্রভৃতি হিন্দু উৎসবের প্রচুর বিবরণ দর্পণে ছাপা হয়। সমাচার দর্পণ প্রথমদিকে যে উগ্র হিন্দু বিরোধী ছিল না তার একটি প্রমাণ ১৮৩২, ২১ জানুয়ারি প্রকাশিত সম্বাদ তিমির নাশক পত্রিকার এক প্রতিবেদনে পাওয়া যায় :

'সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ ধর্মদ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমাদিগের ধর্মের দ্বেষ আছে বহু দিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগদেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে অনেকে তাহার আদর করিলেন।'

রামমোহনের সঙ্গে সমাচার দর্পণের বিরোধ বাধে ১৮২১ সালে। আমরা ব্রাহ্মণ

সেবধি ও সংবাদ কৌমুদী সম্পর্কে আলোচনার সময় ওই বিরোধের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করব।

১৮৩২ পর্যন্ত সমাচার দর্পণ সপ্তাহে একবার শনিবার করে প্রকাশিত হত। ১৮৩২ সালের ১১ জানুয়ারি থেকে সপ্তাহে দুবার শনিবার ও বুধবার প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ডাকমাশুল বৃদ্ধির ফলে ১৮৩৪ সালের ৮ নভেম্বর থেকে আবার সপ্তাহে একবার করে প্রকাশিত হয়।

১৮৪০ সালের ১ জুলাই মার্শম্যান গবর্ণমেন্ট গেজেটে সম্পাদনার চাকরি নিলে দেখা শোনার অভাবে সমাচার দর্পণ বন্ধ হয়ে যায় (১৮৪১, ২৫ ডিসেম্বর)। এরপর ১৮৪২ সালের জানুয়ারি কলকাতা থেকে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সমাচার দর্পণ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয়।[২] তবে এই পর্যায়ে বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তৃতীয় পর্যায়ে শ্রীরামপুর মিশন আবার দর্পণ পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৮৫১ সালের ৩ মে দর্পণ আবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু মার্শম্যান সাহেবের সম্পাদনা, ত্যাগের পর সমাচার দর্পণের পূর্বগৌরব আর ফিরে আসেনি। সংবাদ প্রভাকর সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দর্পণ টিকে থাকতে পারেনি। তার সামাজিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে "১২৫৯ (১৮৫৩) সালের অগ্রহায়ণে সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে।" (সংবাদ প্রভাকর। ১২৬০, ১ বৈশাখ)।

সমাচার দর্পণ এক কথায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে নতুন প্রাণস্পন্দন নিয়ে আসে। উনিশ শতকের আর একটি সংবাদপত্র তার মূল্যায়ন করেছেন এইভাবে; "সমাচার দর্পণে বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা এখানকার ভূরি ২ জ্ঞানার্থি জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়াতে ত্বরায় তদুপকার বুঝিতে পারিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাহার ব্যবহার দ্বারা স্বদেশীয় জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইলে তাহার কিয়ৎকাল পরেই এতদ্দেশীয় যোগ্য ও স্বদেশহিতৈষি মহাশয়েরা স্বয়ং স্বদেশ ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে নানা বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বহু দর্শন ও বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে ২ দেশের সৌভাগ্য ও সদ্ব্যবস্থার উদয় হইতে আরম্ভ হইল ফলে এদেশে যখন সংবাদপত্রের সৃষ্টি না হইয়াছিল তখন সাধারণ বা স্বদেশের উপকারার্থ ব্যাপারের প্রসঙ্গ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের তদর্থ উৎসাহ প্রকাশ করা দূরে থাকুক দেশের অনিষ্ট যাহা আপনাকে ভোগ করিতে হয় তাহার নিবারণ নিমিত্ত উৎসাহ প্রায় কাহারও ছিল না কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচারারম্ভ হইলে তদ্দারা দেশ বিদেশের বিবরণ ও সাময়িক ঘটনা ইত্যাদির পরিজ্ঞান হওয়াতে সকলের সাহস হইল এবং কি উপায়ে স্বদেশের জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় তদর্থ যত্ন হইল।"

"সংবাদপত্র এতদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি

ক্রমে ২ এদেশের লোকদিগের জ্ঞানালোচনা দ্বারা মানসিক সংস্কার কি পর্যন্ত বিভিন্ন হইয়াছে তাহা এখন বিবেচনা করিলে বিস্ময় জন্মে এতদ্দেশের পূর্বতন সতীধর্ম অর্থাৎ পতির পরলোকান্তে স্ত্রীলোকের সহগমন বা অনুগমন ধর্মশাস্ত্র সম্মত এবং ধর্মশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভক্তি প্রযুক্তি অত্রত্য লোকদিগের মধ্যে তাহা অতি পবিত্র ও পরম পুণ্য কর্ম বলিয়া আবহমানকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক তদ্বিষয়ের দোষ উদ্ভাবিত হইয়া তাহা নিবারিত হইলে সংবাদপত্রে এ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা ক্রমে ২ এক্ষণে অত্রত্য জনগণের মনে সংস্কারের এক প্রকার পরিবর্তন হইয়াছে যে এখন প্রায় সকলেই সতীধর্ম ভয়ানক জ্ঞান করিয়া তাহাতে ধর্ম বুদ্ধির বৈপরীত্য ঘোরতর নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করিয়া থাকেন।"

"সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে তদ্বারা দেশের উপকার সম্ভাবনা অনেকে বুঝিতে পারিলেন এবং সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের উৎসাহ দেওয়াতে সেই উৎসাহ অন্যান্য ভূরি ২ ব্যক্তির সংবাদপত্র প্রচারে উৎসাহ জন্মাইবার কারণ হইল এবং তাহাতে এই মহানগরী মধ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে অতীত ও বর্তমানে ৭৭ খানা সংবাদপত্র প্রচার হয়।" (সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৪ এপ্রিল ১৮৫১)।

ব্রাহ্মণ সেবধি ও সম্বাদ কৌমুদী

সমাচার দর্পণের সঙ্গে রামমোহনের বাদানুবাদের ফলে ব্রাহ্মণ সেবধি ও সম্বাদ কৌমুদীর প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ সেবধি: **The Brahmunical Magazine: The missionary and the Brahmun**কে সংবাদপত্র বলা যায় না। ১৮২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পুস্তিকা আকারে এই দ্বিভাষিক পত্রটির অন্তত তিনটি সংখ্যা প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২১, ৪ ডিসেম্বর সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় অবশ্য সংবাদপত্রের সমস্ত চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ ছিল। ব্রাহ্মণ সেবধি ও সম্বাদ কৌমুদী বাঙালির মালিকানায় দ্বিতীয় সাংবাদিক প্রচেষ্টা। প্রথম প্রচেষ্টা করেছিলেন বেঙ্গল গেজেটের প্রকাশক।

আগেই বলেছি ১৮২১ সালের আগে পর্যন্ত রামমোহনের সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনারিদের কোন সংঘর্ষ হয়নি। বরং মিশনারিরা রামমোহনের পৌত্তলিকতা বিরোধী ধর্ম আন্দোলনের ফলে এই আশা করেছিলেন যে রামমোহনের এই মতবাদ ভারতীয়দের খ্রীষ্টান করে তুলতেই সাহায্য করবে।

১৮১৫ সালে বেদান্ত গ্রন্থ[৩] নামে রামমোহন বেদের অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং গ্রন্থের ভূমিকায় পৌত্তলিকতার তীব্র সমালোচনা করেন। সব শেষে লেখেন, "বস্তুত কারণ এই যে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সম্মুখে রাখাতে তাহাকে পূজা এবং আহারাদির নিবেদন করাতে অত্যন্ত প্রীতি পাওয়া যায়।

প্রায়শ আমাদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত করিয়া সর্বসাক্ষী সদ্রূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্ত নিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাহাদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম।"[৪]

এই কারণে শ্রীরামপুর মিশনারীরা রামমোহন সম্পর্কে প্রথম দিকে সদয় ছিলেন। অন্তত ১৮২০ সাল পর্যন্ত রামমোহন সম্পর্কে মিশনারিদের ধারণা পরিবর্তিত হবার কোন কারণ ছিল না।[৫]

এমন কি জার্মান ধর্মযাজক দেওকর স্মিট প্রমুখ ব্যক্তিরাও মনে করেছিলেন রামমোহনকে দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।[৬]

১৮২০ সালে 'ব্রজমোহন' ছদ্মনামে রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ পৌত্তলিক সম্বাদ' প্রকাশিত হলে ১৮২০ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেন।

রামমোহন ১৮২০ সালে 'দি প্রিসেপটস অফ জিসাস, দি গাইড টু পিস অ্যাণ্ড হ্যাপিনেশ' নামে একটি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই বইতে খ্রীষ্টান মিশনারিদের প্রচারিত যীশুর অলৌকিক অংশকে বাতিল করে খ্রীষ্টতত্ত্বের প্রকৃত মহিমার কথা বলা হয়। বলা বাহুল্য বইটি গোঁড়া পাদ্রীদের পছন্দ হয়নি। ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে মার্শম্যান রামমোহনকে আক্রমণ করে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লেখেন। যে দেওকর স্মিট একদা রামমোহন সম্পর্কে এত আশাবাদী ছিলেন, তিনিও লিখলেন, রামমোহনের এই গ্রন্থ সত্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

আত্মপক্ষ সমর্থন করে রামমোহন পর পর তিনটি পুস্তিকা রচনা করে মিশনারিদের জবাব দিয়েছিলেন। এই পুস্তিকা তিনটির নাম (১) অ্যান অ্যাপীল টু দি খ্রীষ্টিয়ান পাবলিক, (২) সেকেণ্ড অ্যাপীল টু দি খ্রীষ্টিয়ান পাবলিক ও (৩) ফাইনাল অ্যাপীল টু দি খ্রীষ্টিয়ান পাবলিক। রামমোহন তাঁর এই পুস্তিকার দু খণ্ড বিলাতে পাঠিয়েছিলেন। এতে কলকাতার মিশনারীরা আরও চটে যান। সে সময় কোম্পানীর চিকিৎসক, মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ ও হিন্দু কলেজের শিক্ষক গোঁড়া খ্রীষ্টান ডাঃ টাইটলার রামমোহনকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে ১৮২৩ সালের ৩ মে একটি ব্যক্তিগত চিঠি দেন। রামমোহন জবাবে লিখেছিলেন, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার অধিকারী ব্যক্তির পত্র ছাড়া অন্যের পত্রের তিনি জবাব দেন না। টাইটলার তখন বেঙ্গল হরকরায় একটি পত্র লেখেন। রামমোহন তার উত্তর দিলে হরকরা ছাপেননি।[৭]

অবশ্য তার আগেই সমাচার দর্পণের সঙ্গে রামমোহনের বিরোধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮২১ সালের ১৪ জুলাই সমাচার দর্পণ একটি 'বেনামী' চিঠি ছাপেন। চিঠিটি পরোক্ষভাবে রামমোহনকে চ্যালেঞ্জ করেই লেখা। তাতে বেদান্ত ন্যায় মীমংসা সাংখ্য পুরাণ তন্ত্র ও পুনর্জন্ম অসংগতি কোথায় তা বিবৃত করে তার উত্তর আহ্বান করা হয়।

"কোন বিজ্ঞব্যক্তি দূর দেশ হইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করা হইবেক।"[৮]

রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মা এই ছদ্মনামে তার উত্তর পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু মিশনারীদের সত্যি সত্যি 'কোন স্বাস্থ্যকর তাত্ত্বিক আলোচনার ঢেউ তোলার মত সাংবাদিক আগ্রহ ছিল না! তবে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে ১৮২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর দর্পণ লিখলেন, 'পত্র প্রেরকদের প্রতি নিবেদন। শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ শর্মা প্রেরিত পত্র এখানে পৌছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বাপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিস্কৃত করিয়া কেবল ষড় দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন, তার ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতে হানি নাই।'[৯]

অজিজ্ঞাসিতাভিধান অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক অজুহাতে এই পত্র সমাচার দর্পণ প্রকাশ না করায় রামমোহন ১৮২১ সালে দ্বিভাষিক পত্র ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ করেন।[১০] পত্রিকার প্রথমে সংখ্যা ১, সংখ্যা ২ এই রকম লেখা থাকত। কোন তারিখ থাকত না। শুধু ১৮২১ সালটি লেখা থাকত। ১ম সংখ্যায় এই পত্র প্রকাশের কারণ হিসাবে রামমোহন লেখেন:

"শতার্ধ বৎসর হইতে অধিককাল্ল এদের ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচারণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু তদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন ন না প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দায় ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপসা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের ঔৎকর্য্যের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে যে সকল দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিশনারিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি

দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এইরূপ ধর্মউপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্যও করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন তাহাতে যদি সেই দুর্বল তাঁহাদের অধীন হয় তবে তাহার মর্মান্তিক কোনমতে অন্তঃকরণেও করেন না। এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমদের অতিশয় শিষ্টত্য ও হিংসা ত্যাগকে ধর্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ যাহা সর্বপ্রকারে অনৈক্যতার মূল হয়।"

* * * * *

"সম্প্রতি শ্রীরামপুরের মিশনারি ছাপাতে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের অযুক্তি সিদ্ধ দোষোল্লেখের লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন সে সকল প্রশ্নকে ও তাহার প্রত্যেক উত্তরকে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাতে সম্পূর্ণ ছাপান গেল পরে পরে উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তরকে এইরূপে ছাপান যাইবেক।" ইতি

ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম সংখ্যায় সমাচার দর্পণে প্রকাশিত চিঠিখানি ও তার উত্তর (যা রামমোহন দর্পণে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁরা ছাপেননি) ছাপা হয়। পত্র এবং উত্তর উভয়ই ধারাবাহিকভাবে দুই সংখ্যা পর্যন্ত চলে। ব্রাহ্মণ সেবধিতে রামমোহনের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার ৩৮ সংখ্যায় ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। রামমোহন আশা করেছিলেন, ব্রাহ্মণ সেবধিতেই তাঁরা প্রতিবাদ পাঠাবেন এবং ইংরাজী ও বাংলায় উভয় ভাষাতেই তা রচিত হবে। কিন্তু তা যখন হল না তখন ওই ইংরাজী লেখারই প্রত্যুত্তর ব্রাহ্মণ সেবধিতে প্রকাশ করা হয়।

ব্রাহ্মণ সেবধির রচনাগুলি শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে লিখিত হয়।[১১]

সম্বাদ কৌমুদী

১৮২১ সালের নবেম্বরে সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয়।[১২] সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে রামমোহন যে প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্গারিটা বারনস সম্বাদ কৌমুদী সম্বন্ধে লিখেছেন: **Raja Ram Mohan Roy's organ, the Sambad Kaumudi in which he mostly published theological discussions refuting a statemant made by the Serampore Missioneries in their Sumachar Durpan concerning both Christianity and Hinduism.**[১৩]

মনে হয় লেখিকার এই উক্তি ব্রাহ্মণ সেবধি সম্পর্কে হবে। কৌমুদীতে রামমোহনের ধর্মতত্ত্ব আলোচনা প্রধান্য পেত ঠিক কথা নয়। কৌমুদীর কোন সংখ্যা এখন পাওয়া

যায় না। তবে বিভিন্ন গবেষকের উদ্ধৃত বিবরণীতে জানা যায় কৌমুদীর প্রথম সংখ্যাতেই তার স্বত্বাধিকারীরা সংবাদপত্রটির উদ্দেশ্য জানিয়ে দেন।[১৪]

বাংলা প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য সব প্রতিষ্ঠিত বাংলা সংবাদপত্রে সম্বাদ কৌমুদীর স্বত্বাধিকারীগণ সসম্মানে জানাচ্ছেন, এই কাগজের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ। "এই পত্রিকা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব দেওয়া হইল, তাহা পড়িলেই আমার দেশবাসিগণ বুঝিতে পারিবেন যে যদিও আমরা উহা পরিচালনা করিব (সুতরাং এটি আমাদের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে) তথাপি প্রকৃতপক্ষে ইহা 'জনসাধারণেরই পত্রিকা' যেহেতু যে কোনও জনকল্যাণকর বিষয়ে দেশবাসিগণ তাঁহাদের অভাব অভিযোগ ইংরাজী ভাষায় ছাপাইয়া প্রতীকার না পাইবেন তাহা এই পত্রিকায় ছাপাইতে পারিবেন।"

১ম সংখ্যা : দরিদ্র অথচ ভদ্র হিন্দুর সন্তানদিগের জন্য বিনা বেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত গবর্নমেন্টের নিকট অনুরোধ।

২য় সংখ্যা : মফঃস্বলের জিলা ও প্রাদেশিক আদালতগুলিতে জুরির দ্বারা বিচার প্রবর্তনের জন্য গবর্নমেন্টকে অনুরোধ।

৩য় সংখ্যা : সকল সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টিয়ানদের কবরখানার জন্য (গবর্নমেন্ট) বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুদের শবদাহের জন্য মাত্র একটি শ্মশানঘাট থাকার দরুন হিন্দুরা প্রতিদিন যে অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহার প্রতীকারার্থ গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন।

ঐ সংখ্যা : দেশীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা যথাযথ চিকিৎসার অভাবের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে, বিশেষত স্ত্রীলোক ও শিশুরা কারণ তাহারা সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া দেশীয় হাসপাতালেও যাইতে পারে না অথচ অবস্থার গতিকে সাহেব ডাক্তারও ডাকিতে পারে না। ইহাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য গবর্নমেন্টের নিকট অনুরোধ করা হইতেছে যেন ইহাদের নিমিত্ত এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাহাতে সাহেব ডাক্তারদিগের চিকিৎসা ইহাদের পক্ষে সহজলভ্য হয়।

দেশীয় বৈদ্যদের ইউরোপীয় চিকিৎসকের অধীনে রাখার জন্য সম্বাদ কৌমুদীতে অনুরোধ জানানো হয় (৪র্থ সংখ্যা)। কারণ তার ফলে পাশ্চাত্য প্রণালীতে চিকিৎসা শিখে দেশীয় পরিবারের রোগী দেখতে তাঁরা সক্ষম হবেন।

চতুর্থ সংখ্যা—ধনীদের অযোগ্য ব্যাপারে ধনব্যয়ের নিন্দা ও যুক্তিমূলক শিক্ষার নিমিত্ত পিতৃদত্ত ধনের সদ্ব্যয়।

৫ম সংখ্যা : দরিদ্রের অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাবের প্রতি দেশীয় ধনীদের মনোযোগ আকর্ষণ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা : মহানগরীর ধনী হিন্দুদের প্রতি নিবেদন যে, স্বামীর মৃত্যুর পরে অসহায় অবস্থার জন্য বহু বিধবা যে অসহনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করেন, তাহার কথা সহৃদয়তার সহিত স্মরণ করিয়া এদেশে সম্প্রতি গবর্নমেন্টের আদেশে প্রতিষ্ঠিত সিবিল ও মিলিটারী উইডোজ ফাণ্ডের অনুরূপ একটি সমিতি যেন প্রতিষ্ঠান করেন।

প্রথম দিকে রামমোহনের সঙ্গে কৌমুদীর খাতায় কলমে কোন যোগ ছিল না মনে হয়। ১৮৩২ সালের সম্বাদ তিমির নাশক কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের উৎপত্তি নামে একটি প্রবন্ধ ছাপেন। তাতে কৌমুদীর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রামমোহনের নাম নেই। পত্রিকাটি লিখেছেন :

"সমাচার দর্পণে কতকগুলি প্রেরিত পত্র প্রথম প্রকাশ হয় তাহাতে এ প্রদেশীয় ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি শ্লেষ প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি সৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয়। কিছুদিন পরে শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তজ ঐক্য হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশ করেন তাহার মূল্য দুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগর মধ্যে ঐ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতুক হিন্দুর নিউস পেপার হইয়াছে ইহাতে বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল ঐ কাগজ সৃজন সময়ে জেমস কালডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়া দিলেন যে যতদিন ঐ কাগজের গ্রাহক দ্বারা ব্যয়ের আনুকূল্য না হয় তবে আমি সাহায্য করিব দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুক্ত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাঁহার কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজ প্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম হানি ও হিন্দু সমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্গুনে সমাচার চন্দ্রিকা নামক কাগজের সৃষ্টি করেন ইহাতে কৌমুদী ও চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল শেষ দত্তজ কৌমুদী কাগজ ত্যাগ করেন পরে কৌমুদীর অনেক দুর্দশা হইয়াছিল সে অনেক কথা অর্থাৎ কৌমুদী হিন্দুমত হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইল মধ্যে এক বৎসর পড়িয়া যায় শেষ একজন ঐ নামধারণ করিয়া পুনর্বার কাগজ করে এইমত কতককাল গেলে এক্ষণে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদী নামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কতক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয় নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এতদিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন…"।[১৫]

এই প্রবন্ধে কোথাও রামমোহনকে সম্বাদ কৌমুদীর অন্যতম পরিচালক বলা হয়নি। ভাবানীচরণের সঙ্গে রামমোহনের সংঘর্ষের ফলেই যে ভবানীচরণ সম্বাদ কৌমুদী ছেড়ে ছিলেন তাও প্রবন্ধে বলা নেই। সম্পাদক ভবানীচরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয় সহকারী সম্পাদকের। এবং এই সহকারী সম্পাদকের পিছনে রামমোহনের সমর্থন থাকতে পারে। কারণ সতীদাহ প্রথা রদ আন্দোলনের রামমোহনই প্রবক্তা। সেই

সঙ্গে সম্বাদ কৌমুদীর পরিচালক মণ্ডলীর অধিকাংশই রামমোহনের নেতৃত্বে এই প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্দীপিত তা অনুমান করা কঠিন নয় এবং তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষেই তিনমাসের মধ্যে রক্ষণশীল ভবানীচরণকে কৌমুদী ছাড়তে হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদপত্রে সেকালের কথার দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্মসভার অতীত সম্পাদক বাবু ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনাচরিত দৃষ্টান্ত পবিত্র চরিত্র বিবরণ নামে সম্বাদ তিমির নাশকের একটি প্রতিবেদনের উল্লেখ করেছেন। ঐ প্রতিবেদনে আছে ভবানীচরণের চন্দ্রিকা প্রকাশের পর কৌমুদীর অংশীদাররা "কৌমুদীপত্র সম্পাদনে অশক্ত হইয়া তাহা মৃত রামমোহন রায়ের হস্তে ন্যস্ত করত চন্দ্রিকা পত্রের উন্নতি বোধার্থ বিবিধ উত্তম করিতে লাগিল।"[১৬]

যতদূর মনে হয় সমাচার চন্দ্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কৌমুদীর অবস্থা পড়ে যায়। কারণ দেশের জনমত তখনও প্রচলিত ধর্মসংস্কার ও সংরক্ষণশীলতার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। প্রগতিশীল চিন্তা তখন সবে দানা বেঁধে উঠছে। তাদের শিবির সংহত নয়। এই অবস্থায় রামমোহন কৌমুদী পত্রিকাটি দেখাশোনার ভার নিয়ে থাকবেন। ১৮৩৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সমাচার দর্পণে প্রকাশিত চন্দ্রিকার রিপোর্টে সম্বাদ কৌমুদীকে মৃত রামমোহন রায়ের অধীনে বলে অভিহিত করা হয়েছে। সম্বাদ কৌমুদীর সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন :

(১) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮২২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮২২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি।
(২) গোবিন্দচন্দ্র কোঙার—১৮২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত।
(৩) আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়—১৮২৯ পর্যন্ত।
(৪) রাধাপ্রসাদ রায়—১৮৩২ থেকে।

সম্বাদ কৌমুদীর লাইসেন্সের জন্য যাঁরা দরখাস্ত করেন তার মধ্যে জনৈক গোবিন্দচন্দ্র গৌর ও আনন্দগোপাল মুখার্জীর নাম রয়েছে। জাতীয় মহাফেজ খানার নথিপত্রে এই দুই নামই পাওয়া যায়।

ব্রজেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাময়িক পত্রে উল্লেখ করেছেন, কৌমুদী ১৮৪৩ পর্যন্ত জীবিত ছিল। কিন্তু ১৮৩৮ সালের ৩১ মার্চ সমাচার দর্পণে 'কস্যচিৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশ ভিলাষী দর্পণ পাঠকস্য' তাঁর পত্রে সে সময় চালু সমাচার দর্পণ, জ্ঞানান্বেষণ, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ গুণাকর, সংবাদ সুধাসিন্ধু প্রভৃতি কাগজের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সম্বাদ কৌমুদীর কোন উল্লেখ নেই।

সমাচার চন্দ্রিকা

সমাচার চন্দ্রিকার গোড়াপত্তনের ইতিহাস পূর্বেই বিবৃত করা হয়েছে। প্রধানত এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সংরক্ষণপন্থী হিন্দু জনমত গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রগতিমুখী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রবল দ্বন্দ্ব

হিসাবে চিহ্নিত হলেও চন্দ্রিকার সাংবাদিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সামাজিক আন্দোলনে গোঁড়ামির দিকটি বাদ দিলে চন্দ্রিকার অর্থনৈতিক চিন্তা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধিকার চিন্তা এবং দেশীয় শিক্ষা প্রসারে আগ্রহ সৃষ্টি প্রভৃতি অবদানের কথা অস্বীকার করা যায় না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চন্দ্রিকা নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিল।

দ্বিতীয়ত রেনেশাঁসের বৈশিষ্ট্য তার একমুখীনতা নয়। নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার দ্বন্দ্ব, পরস্পরবিরোধী ভাবধারার সংঘর্ষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, রক্ষণশীলতা ও প্রগতিমুখীনতা প্রভৃতি নানান পরস্পরবিরোধী টানাপোড়েনে গণ্ডকের খরস্রোতে ভাসমান প্রস্তর খণ্ডের মত উৎক্ষিপ্ত হতে হতেই বাঙ্গালী ভাবনা শালগ্রাম শিলায় পরিণত হয়েছে। এদিক দিয়ে প্রতিক্রিয়ারও একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। তা প্রগতিমুখীনতাকে বাধা দিয়ে দিয়ে তাকে আরও দুর্বার করে তোলে।

আর তাছাড়া ভবানীচরণ প্রথম বাঙ্গালী কলামিস্ট। বাংলা সংবাদপত্রের সেই উষালগ্নে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সাময়িক রচনার মধ্যেও সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক সরসতা প্রবর্তন করেছিলেন। 'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবু বিলাসের' লেখক ভবানীচরণের রসদৃষ্টি ছিল, রসসৃষ্টির ক্ষমতাও ছিল। তিনি নিজে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। ভাল ইংরাজী বলতে পারতেন। ইংরাজের অধীনে মুৎসুদ্দির কাজ করে ইংরাজ চরিত্র ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন যথেষ্ট।

ভবানীচরণ সম্পর্কে জর্জ স্মিথ বলেছেন, 'a man of extraordinary powers of intellect and humour and of the greatest energy and master of a Bengali style of surpassing ease and elegance. He was Brahmin of the Brahmins.[১৭]

কলুটোলার ২৬নং গৃহ থেকে চন্দ্রিকা যন্ত্রে চন্দ্রিকা ছাপা হত। এর অর্থ চন্দ্রিকার নিজস্ব প্রেস ছিল। ভবানীচরণ পুস্তক প্রকাশনাও খুলেছিলেন। ১৮৩১ সালের ২ মে একটি বিজ্ঞাপনে জানা যাচ্ছে চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রায় ৫টি বই মজুদ রয়েছে।

সাপ্তাহিক সমাচার চন্দ্রিকার প্রথম প্রকাশ ৫ মার্চ ১৮২২।

১৮২৪ সালে সমাচার চন্দ্রিকা প্রাত্যহিক কাগজ হিসাবে প্রকাশিত হয়। "রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ প্রাতঃকালে আড়কুলি সীতারাম ঘোষের স্ট্রিট ৫৩ নম্বর ভবনে প্রকাশিত হয়।" চন্দ্রিকা সাপ্তাহিক, দ্বি-সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৮২৪ সালের নিয়মাবলীতে লেখা সমাচার চন্দ্রিকা প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। ইহার কলেবর ডিমাই দুই ফর্মা। তলায় কার্য সম্পাদক হিসাবে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম, মুদ্রক ছিলেন শ্রী জে. এন. রায়।

তবে সমাচার চন্দ্রিকা দৈনিক হিসাবে বেশীদিন চলেনি। ১৮৩১ সালের ৫ মে জনৈক পাঠক প্রস্তাব করেন যে চন্দ্রিকাকে আবার দৈনিক করতে। কিন্তু চন্দ্রিকা সন্দেহ প্রকাশ করেন যে তাতে পত্রিকা বিক্রী হবে না। চন্দ্রিকার সে সময় দাম

ছিল প্রতি সংখ্যা আট আনা। ১০ পৃষ্ঠার কাগজ প্রকাশিত হত। ১৮৫৩ সালের ১২ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্রের তালিকা অনুসারে জানা যায় যে চন্দ্রিকা সে সময় অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

সমাচার চন্দ্রিকার শিরোনামে লেখা থাকত—

"সদা সমাচারজুষাং কল্পিকা
পরার্থ চেষ্টা পরমার্থ দায়িকা
বিজন্ততে সর্বমনোহনুরঞ্জিকা
শ্রিয়া ভবানী চরণস্ত চন্দ্রিকা ॥"

সমাচার চন্দ্রিকা রক্ষণশীলতাকে সংবাদপত্রের পলিসি বা নীতি হিসাবে গ্রহণ করে। ভবানীচরণ সমাচার চন্দ্রিকাকে ধর্মসভার মুখপত্র করে তুলেছিলেন। চন্দ্রিকায় ধর্মসভায় চাঁদাদাতাদের নাম ছাপা হত। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরাজী শিক্ষা অবিধেয় এবং হীন বর্ণদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত নয় ইত্যাদি মতবাদও চন্দ্রিকা প্রচার করে। সতীদাহ প্রথার সমর্থনে চন্দ্রিকার সংগ্রাম ছিল নিরবচ্ছিন্ন। ১৮৭৭ সালে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় মেরিবেনকে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করলে ১৮৭৭ সালের ১১ জুন চন্দ্রিকা লিখেছিলেন, 'পৃথিবীতে কতরকমের বাতুল আছে, ইনিও এক প্রকার বাতুল।'

সমাচার চন্দ্রিকার রক্ষণশীল মতবাদ বিশেষ করে সতীদাহ প্রথার সমর্থনে তার মতামতের প্রতি এক শ্রেণীর ইংরাজদেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং প্ররোচনা ছিল। উনিশ শতকের প্রগতিশীল ভাববিপ্লবে যেমন বাঙালির মনকে ইংরাজরা উদ্দীপ্ত করেছেন আবার এক শ্রেণীর ইংরাজ পশ্চাদমুখীনতার প্রতি প্ররোচনাও যুগিয়েছেন। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে রামমোহনের সঙ্গে উইলসনের আদর্শগত দ্বন্দ্বের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ধর্মসভার সঙ্গে উইলসনের গভীর যোগাযোগ ছিল। সতীদাহ প্রথার সপক্ষে ধর্মসভা যে পালটা আন্দোলন করেছিলেন তার প্রতি উইলসনের সমর্থন ছিল। উইলসন গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন আইন করে সতীদাহ বন্ধ করলে পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে বাঙ্গালী বিদ্বৎসমাজের মধ্যে যে জাতীয় উন্মেষ দেখা দিয়েছে তা গুরুতর ভাবে ব্যাহত হবে।[১৮]

তবে সমাচার চন্দ্রিকার পিছনে যে সমস্ত ইংরাজ রাজকর্মচারীর সহানুভূতি ছিল তাঁরা সকলেই যে উইলসনের মত আদর্শগত কারণেই হিন্দু রক্ষণশীলতার সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন তা মনে হয় না। মেজরিটির সঙ্গে তালে তাল দিয়ে জনমতকে খুশি রেখে প্রশাসনকে নির্বিঘ্ন করে রাখার চিন্তাও হয়ত কারও মনে দেখা দিয়েছিল।

সমাচার চন্দ্রিকার প্রকাশের সময়ই জেমস কালডর আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। 'ঐ কাগজ সৃজন সময়ে জেমস কালডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন যে যতদিন ঐ কাগজের গ্রাহক দ্বারা ব্যয়ের আনুকূল্য না হয় তবে আমি সাহায্য করিব।'[১৯]

সমসাময়িক লেখক লিখছেন :

"The Samachur Chandrica is printed in the Bengalee character and may be considered as the principal native Tory journal being supported by its advocacy for the continuance of the burning of Hindoo widows, in which course we regret to say that it was encouraged and supported by several of the East India Company's servants, who even supplied it with specious arguments in favour of its infernal doctines. These persons who indeed, hold high situations under Government, are now urging on the Chundrica to protect an alarming language, against the free resort of Europeans to India; and any person acquainted with the Bengalees will readily comprehend how eagerly they will follow avdise, if they think it will tend to their pecuniary interest and if it be recommended by those in authority."[২০]

বঙ্গদূত

সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশের জনমত দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। অনতিকালের মধ্যে এই দুই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত আরও বাংলা পত্রিকা গড়ে ওঠে।

১৮২৯ সালের ১০ মে প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক সাপ্তাহিক বঙ্গদূত পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি প্রকাশিত হয় সংবাদ প্রভাকর। ১৮৩২-এর অক্টোবরে সম্বাদ তিমির নাশক। ১৮৩১ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় দ্বিভাষিক (ফারসি ও বাংলা) সভারাজেন্দ্র ও বাংলা সাপ্তাহিক সম্বাদ সুধাকর। তিমির নাশক ও সভারাজেন্দ্র সংরক্ষণবাদের দিকে ঝোঁকে, বঙ্গদূত ও সম্বাদ সুধাকর প্রগতিপন্থার দিকে। সংবাদ প্রভাকর সংরক্ষণশীলতা দিয়ে শুরু করলেও পরে ধর্মসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

বঙ্গদূতের মাসিক মূল্য ছিল এক টাকা। প্রতি রবিবার ভোর বেলা কাগজটি প্রকাশিত হত। পত্রিকার শিরোনামে লেখা থাকত :

"সংগোপনেগ্ন বিবৃতিং দূতাঃ
সর্বোনতত্র সুজনাহিত মুভ্যুপেতাঃ।
কিজ্ঞাখিলার্থকল্পনাদ্বহ দেশভূত প্রজ্ঞাময়ং
বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ।
অন্যে অন্যে দূতগণ, সামান্য যে বিবরণ,
সেইমাত্র কহে সংগোপনে।

তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে,
মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে ॥
অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন
স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার, সমুচ্ছয়, প্রকাশ করিয়া কয়
হিতকারী এই বঙ্গদূত ॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

"প্রথম বৎসরে ইহার সম্পাদক ছিলেন—নীলরত্ন হালদার; দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় কাগজখানি প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সকলেই মাস তিনেকের জন্য ইহার স্বত্বাধিকারীও ছিলেন।"[২১]

নীলরত্ন হালদার এক বছর পরে বঙ্গদূতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন। সম্বাদ তিমির নাশকের মতে সতীদাহ নিয়ে মতভেদই তাঁর বঙ্গদূত ত্যাগের কারণ, 'সতীদ্বেষী হইতে আদেশ হয় তাহাতেই ত্যক্ত হইয়া ত্যাগ করিলেন।'[২২] আবার অপর পক্ষে ভোলানাথ সেন ধর্মসভার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মসভা ত্যাগ করে "বঙ্গদূতের এডিটর নাম প্রকাশ করিলেন।"[২৩] ভোলানাথ সেন, রিফর্মার পত্রিকার বাংলা 'অনুবাদিকার' সম্পাদকও হয়েছিলেন।

নীলরত্ন হালদার ও ভোলানাথ সেনের পরস্পর শিবির বদল আপাত বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির মনন ও সমাজের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নড়ে উঠলেও দ্বিধা দ্বন্দ্বের আলো আঁধারিতে অনেকে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। আবার বিশ্বাসের রঙ যেখানে ফিকে হয়ে বসেনি সেখানে নানান প্রলোভন চিন্তার রাজ্যে পালাবদল ঘটিয়ে দিয়েছে। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'সতী বিপক্ষিদের' দান গ্রহণ করেছেন আবার মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের কাছে গিয়ে বলেছেন 'বিপক্ষের দান অজ্ঞানতো গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং এমন প্রতিজ্ঞাত করিতেছি তাদৃশ দান আর কখন গ্রহণ করিব না। অতএব আমার দিগের চিরকালের যে বিত্ত বৃত্তি আছে তাহা দিয়া মান রক্ষা করুন।'[২৪]

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মত ব্যক্তিও সতীদাহের প্রশ্নে কোন পক্ষে যাবেন তা নিয়ে প্রথম দিকে দোনামনা করেছেন। ভোলানাথ সেন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। বঙ্গদূত ও অনুবাদিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি পৌত্তলিকতা বিরোধী মতাদর্শের প্রবক্তা। অথচ সমাচার চন্দ্রিকা ঠাট্টা করে লিখেছেন,

"অপিচ এক্ষণে যে কয়েকজন বাঙ্গালী সম্বাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে শ্রীযুত ভোলানাথ সেনকে ইংরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু তিনি রিফারমর নামক ইংরেজী ভাষায় এক সমাচার পত্র প্রচার করিতেছেন এবং ঐ পত্রের মধ্যে দেবদেবীর পূজার দ্বেষ সম্বলিত প্রেরিত পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব সে সকল পত্র লেখক এবং কচি নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা ঐ সেনজার বাটীতে

গিয়া মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক। এবং সেনজা সপরিবারে কি প্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহং জীবিতং মম। আগতাসি সদা দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি।"[২৫]

শুধু ভোলানাথ সেন নয় উনিশ শতকের বহু বাঙালি চরিত্রে এই বিরোধাভাস চোখে পড়ে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, কালীনাথ মুনসী প্রমুখ রামমোহন অনুগামীদের সকলের বাড়ীতেই প্রতিমা পূজা হত। খ্রীষ্টান হবার পরও ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান ঘোচেনি এমন উদাহরণও বিরল নয়। তিমির নাশক লিখছেন, বঙ্গদূত নাকি পরে 'রঙ্গভূত' নামে সমাজে পরিচিতি লাভ করেছিল। বঙ্গদূতের উদার প্রগতিশীল মতবাদের জন্য রক্ষণশীলদের ঈর্ষা ও উপহাসের এটাই ছিল ফলশ্রুতি।

বঙ্গদূতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধের প্রতিফলন। বাঙালির অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবিতেও বঙ্গদূত শামিল হয়েছে। কিন্তু সতীদাহ প্রথার ব্যাপারে প্রচলিত জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্যই হোক বা বাংলা সংবাদপত্রের স্বাভাবিক রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যই হোক বঙ্গদূতের গৌরবশশী যে ১৮৩৯ সালেই আগেই অস্ত গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। এক কালের পরিচালকদের আর্থিক সাহায্যও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৩৯ সালের ১৫ জুন জ্ঞানান্বেষণ লিখেছেন, 'বহুকালাবধি বহু কষ্টে শ্রেষ্ঠে অর্থাভাবে সপ্তাহিক বঙ্গদূত নাম এক পত্র মৃতপ্রায় হইয়াছিল তাহাতে প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিন্তু সম্প্রতি সে মৃত কলপপত্র ভস্ম উপলক্ষ করিয়া পুনর্বার সজীব হইয়াছে আমরা বোধকরি পাঠকবর্গরা ইহা জ্ঞাত নহেন।[২৬]

সংবাদ প্রভাকর

সংবাদ প্রভাকর ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ অর্থাৎ ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়। ১২৬৩ সালের ১ বৈশাখ সংবাদ প্রভাকর লিখছেন :

'হে সর্বময় সর্বেশ্বর, অদ্য তোমার কৃপায় এই প্রভাকরের বয়স ২৬ ছাব্বিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। বাঙ্গলা ১২৩৭ সালের ২৬ মাঘ শুক্রবাসরে ইহার জন্ম হয়, তৎকালে সপ্তাহে কেবল একবার করিয়াই প্রকাশ হইত পরন্তু ১২৪৩ সালের ২৭ শ্রাবণ বুধবারবধি ১২৪৬ সালের ৩০ জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত সপ্তাহে বারত্রয়িকরূপে প্রকটিত হইয়া তৎপর দিবসেই অর্থাৎ ঐ সালের ১ আষাঢ় অবধি অদ্য পর্যন্ত ক্রমশঃ সপ্তদশ বৎসর দৈনিকরূপে প্রকাশ হইতেছে।'[২৭]

১৮৫৯ সালের ২২ জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হলে তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরের সম্পাদক হন। মাঝখানে কিছুদিন কলকাতার বাইরে থাকার জন্য ঈশ্বর গুপ্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে পারেননি। এই ব্যবধানটুকু ছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত আমৃত্যু সংবাদপত্র সেবা করে গিয়েছেন। ভবানীচরণ ও গৌরীশঙ্করের মত ঈশ্বর গুপ্তও

ছিলেন সর্বক্ষণের সাংবাদিককর্মী। সংবাদ প্রভাকর শুধুমাত্র সংবাদপত্রই ছিল না পরবর্তীকালের সাহিত্য সাময়িকীর অঙ্কুর সংবাদ প্রভাকরেই বিকশিত হয়ে ওঠে। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন কবি। তাঁর কবিধর্ম ও সাংবাদিক ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সূক্ষ্ম বিভেদ রেখাও তিনি কোনদিন মানেন নি। কখনও তিনি সংবাদকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন। গুরুগম্ভীর সমাজ চিন্তাকে ছন্দোবদ্ধ করে পত্রিকাতে প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাগুলিই যেন প্রভাকরের সম্পাদকীয়।

যেমন আলেকজাণ্ডার ডাফ সম্পর্কে তাঁর সেই কবিতাটি যা ১৮৫২ সালের ২২ মে তারিখে প্রকাশিত হয় স্মরণ করা যেতে পারে :

হেদো বনে কেঁদো বাঘ
রাগ ধরে আছে।
আঁক কোরে ধোরে খায়
ছেলে পেলে কাছে।

অথবা আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের বক্তব্য :

"হ্যাদেহে ছেলের বাপ
উপদেশ নাও
সন্তানের শিক্ষা হেতু
সাবধান হও
মূর্খ হোয়ে ঘরে রই সেবরং ভালো
অন্ধকারে বেঁচে থাক কার্য নাই আলো।"

অথবা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজপক্ষ সমর্থন করে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতাতে সম্পাদকীয় স্তম্ভেই প্রকাশিত হয় :

হে নাথ করুণাময় নিবেদন তাই
তবে পদে ইংরাজের জয় ভিক্ষা চাই
এই ভাবে রক্ষা কর, এই অধিকার
ভারতে বিভ্রাট যেন নাহি ঘটে আর

শুধু পদ্যে কেন—শুষ্ক প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় এবং সামান্য নোটিশ রচনাতেও ঈশ্বর গুপ্তের সরস বক্র সাহিত্যিক সজীবতা পাঠকেদের মন জয় করেছিল। বিশেষ করে রক্ষণশীল পাঠকদের তো বটেই।

দ্বিতীয়ত ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কাগজে একটি সাহিত্যিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকনাথ অধিকারীর প্রথম রচনা ১৮৫৩ সালের ১৪ মার্চ সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা ১৮৫৩ সালে ২-৬ চৈত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ছাত্রদের রচনায় বিশেষ উৎসাহ

দেওয়ার জন্য তাঁদের রচনার পাশে সম্পাদকীয় টিপ্পনী লেখা থাকত 'সকলে অনুকম্পা পূর্বক নয়নপাত করুন ছাত্রের রচিত।' ২৩।৫।১৮৫৭ তারিখে প্রভাকরে প্রকাশিত কস্যচিৎ প্রভাকর হিতেচ্ছু জনস্য নামে এক অনুরাগী পাঠক প্রভাকরের ছাত্র লেখকেদের ১৪ জনের একটি তালিকা দিয়ে অনুরোধ করেছেন সম্পাদক যেন তাঁদের আবার লিখতে অনুরোধ করেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ঈশ্বর গুপ্ত ভবানীচরণের মতই প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিলেন। একথা ঠিক, ত্রিশ দশকে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রচণ্ড ভাব বিপ্লবের বিপরীত দিকে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। উদারপন্থী ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল না। বয়সের দিক থেকে তিনি ইয়ং বেঙ্গলদের সমসাময়িক ছিলেন (জন্ম ১৮১২)। সুতরাং বয়োঃ ধর্মের দিক দিয়েও উগ্রপন্থা বা প্রগতিশীল পন্থার যে কোন একটিকে গ্রহণ করাই হয়ত তাঁর উচিত ছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য তিনি উপযুক্ত ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রতিভাজাত স্বভাব কবিত্বের ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব আপনাতে আপনি বিকশিত হয়। সামাজিক পরিমণ্ডল ও পারিপার্শ্বিকতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এইসব কারণে ইংরাজীয়ানার প্রতি অত্যাগ্রহ, মোহ, বিজাতীয় অনুকরণ ও সামাজিক ভ্রষ্টাচার প্রভৃতির প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের তীব্র বিদ্বেষ গড়ে উঠেছিল। এর ওপর সাহিত্যধর্মে তিনি ছিলেন পুরো স্যাটায়ারিস্ট। স্যাটায়ারিস্টের তীব্র তীক্ষ্ণ চোখে স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ কবির সাবজেক্টিভ দৃষ্টি ও সাংবাদিকের অবজেকটিভিটির সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছে; পরিণামে সাংবাদিক দৃষ্টিভঙ্গীই জয়লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত প্রথম যুগে রক্ষণশীলতার প্রতি সমর্থন থাকলেও পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্তের সান্নিধ্যে এসে তিনি উদারমতের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। অন্তত এর ফলে সংবাদ প্রভাকর স্ত্রী শিক্ষার অনুরাগী হয়ে ওঠেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন,

"আগে মেয়েগুলো ছিল
ভাল ব্রত ধর্ম কর্তো সবে
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে।"

কিন্তু সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে বেথুন পাঠশালার উদ্বোধনের যে বিবরণ দিচ্ছেন তাতে বেথুন সাহেবকে অভিহিত করেছেন 'মহাত্মা' বলে।

"মহাত্মাবর শ্রীযুক্ত ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথিউলি সাহেব গত সোমবার পূর্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা সময়ে পাঠশালার কর্মারম্ভ সূত্রে আপনার উদারচিত্তের ভাণ্ডার খুলিয়া সদভিপ্রায় সম্বলিত সদ্বক্তৃতা রূপ অমূল্য রত্ন সকল বিতরণ করত সকলকে সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত করিয়াছেন।" (৯ মে ১৮৪৯)

শুধু তাই নয়, একদা ইয়ং বেঙ্গলদের প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষ ছিল। চল্লিশ

দশকের শেষ প্রান্তে এসে তাও প্রশমিত হয়। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে দক্ষিণানন্দনের বদান্যতার প্রশংসা করে লেখেন, 'অচিপ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত যখন সে সময়ে এই ব্যাপারে প্রসঙ্গ হইবেক তখন সর্বাগ্রেই দক্ষিণাবাবুর নাম উল্লিখিত হইবেক।' ৯ মে ১৮৪৯।

সংবাদ প্রভাকর অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে প্রগতিশীল মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন এবং রাজকার্যে উত্তরোত্তর দেশীয় ব্যক্তিদের নিয়োগ, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার, কৃষক ও জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি, নীলকরদের অত্যাচার প্রভৃতি ব্যাপারে সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর এই মধ্যপন্থী হিন্দু উদারনৈতিক মতবাদ উত্তরকালে তাঁর শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বর্তেছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে সাধারণ বাঙালি যখন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অনুকরণের দাস হয়ে ওঠে এবং মাতৃভাষাকে অবহেলা করতে শুরু করে তখন মধ্যপন্থী প্রতিক্রিয়ার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। সমাচার চন্দ্রিকা সতীদাহ রদ আন্দোলনের বিপক্ষে যেভাবে দাঁড়িয়েছিল, বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে মনে প্রাণে সমর্থন না করলেও ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর, সেভাবে দাঁড়ায়নি। ঈশ্বর গুপ্ত বিধবা বিবাহ নিয়ে কৌতুক করেছেন কিন্তু বিধবা বিবাহ বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করেন নি।

র‍্যাডিক্যাল ও কনজারভেটিভ উভয় গোষ্ঠীর দ্বারাই ঈশ্বর গুপ্ত এজন্য তিরস্কৃত হয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র এনকোয়ারার একদা সংবাদ প্রভাকরকে দোষারোপ করে বলেছেন এই কাগজটি অশোভন রচনায় পরিপূর্ণ। (indecencies his columns abound with), আর যে যুক্তি তাঁরা প্রচার করেন, তাও হাস্যকর (absurdities), সুতরাং তাঁদের সিরিয়াসলি নেওয়া যায় না। "The absurdities they advocate prevent us from being serious with them. The indecencies they bring forward disarm us and render us incapable of handling them."[২৮] আবার সংরক্ষাপন্থী সংবাদ তিমির নাশক লিখেছেন,

'সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয়, তাহার কিরণ বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল নচেৎ তাহাতে মুন্সীয়ানা বা বিদ্যা বুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিকদিগকে অনেক কটূ কহিয়াছিল তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না সুতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল পড়িয়াছিল। এক্ষণে তিনি ধর্মদ্বেষী হইয়াছেন যদি তাহার এতাদৃশ প্রবলতা এখন থাকে তবে জানি বৈদ্যপোর ক্ষমতা অথবা তাহার মুরুব্বির যোগ্যতা।"[২৯]

এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের তারিখ ১৮৩২। অর্থাৎ সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের মাত্র এক বছর পরে। সুতরাং তত্ত্ববোধিনী সভা পর্যন্ত (১৮৪৮) যাওয়ার দরকার নেই, প্রারম্ভেই প্রভাকর ধর্মসভাপন্থী সংরক্ষণবাদীদেরও মন জুগিয়ে চলতে পারেনি।

সংবাদ প্রভাকর হেতুয়ার দক্ষিণদিগস্থ গলির মধ্যে ৪৪/৩নং ভবন থেকে প্রকাশিত হয়। দৈনিক প্রভাকরের বার্ষিক অগ্রিক মূল্য ছিল দশ টাকা। রবিবার ছাড়া প্রতিদিন কাগজটি প্রকাশিত হত।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রের চিঠিপত্র কলমে নামহীন ও ছদ্মনামে চিঠি ছাপানোর বিশেষ রেওয়াজ ছিল। এই সমস্ত চিঠিপত্রের বক্তব্যের সঙ্গে ওই বিশেষ সংবাদপত্রের নীতির এত মিল ছিল যে অনেক সময় মনে হতে পারে চিঠিপত্রগুলি সম্পাদকীয় বিভাগেরই প্রণোদিত। অনেক বেনামী চিঠিপত্রে পত্রলেখকের দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিও থাকত। সংবাদ প্রভাকর এই চিঠিপত্র কলমগুলি নিয়ন্ত্রিত করে একটি নীতি নির্ধারিত করেন। ১৮৪৭ সালের ৫ জুন প্রভাকরে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে প্রভাকরের পলিসির পরিচয় পাওয়া যায়।

"বিদেশীয় পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা বিবেচনা করেন যে, তাঁহারা ছাইভস্ম যাহা পাঠাইবেন তাহাই সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবেক, এই অভিপ্রায়ে যাঁহার মনে যাহা উদয় হয় তিনি তাহাই লিখিয়া পাঠান, কিন্তু সম্পাদকেরা কত সাবধানে কার্য সম্পন্ন করেন তাহা বিবেচনা করেন না, ছাইভস্ম বিষয় সকল প্রকাশ করণের জন্য সমাচার পত্রের সৃষ্টি হয় নাই, যে সমুদয় বিষয় সাধারণের উপকার ও হিতজনক আমরা কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকি, নিন্দাজনক কুৎসিত বিষয় কখনই প্রকটিত করি না, বিশেষতঃ পরগ্লানি প্রকাশে অতিশয় দুঃখবোধ করিয়া থাকি, কোন কোন পত্রপ্রেরক রাজকর্ম সংক্রান্ত কোন কোন প্রধান ব্যক্তির ব্যবহার দোষ লিখিয়া প্রেরণ করেন, সেই সকল পত্র সাধারণের স্বগোচর করাতে একপ্রকার উপকার হইয়াছে বটে, কারণ তদদ্বারা রাজপুরুষেরা সমুদয় বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, ফলত তাহার নিশ্চিতানিশ্চিত না জানিতে পারিলে আমরা কি প্রকারে তৎপ্রকটনে সাহসী হইতে পারি? আদৌ পত্রপ্রেরকের প্রতি বিশ্বাস চাই, তাহা না হইলে কোনমতেই তাঁহার প্রেরিত পত্রের প্রতি প্রত্যয় হইতে পারে না, অতএব বিদেশীয় অজ্ঞাতকুলশীল পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগ্যে বিনয়পূর্বক জ্ঞাত করিতেছি তাঁহারা অনর্থক পরিশ্রম গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষের বিপক্ষে বৃহৎ বৃহৎ পত্র রচনা পূর্বক আমারদিগের নিকট পাঠাইবেন না।"

সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের দুবার সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল। দুবারই এর ফলে প্রভাকরের বিক্রয় পড়ে যায়।[৩০] ১৮৩২ সালের ফেব্রুয়ারি ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাকরের সম্পাদনাভার ত্যাগ করে সংবাদ রত্নাবলীতে চাকরি নেন। সে কাজও কিছুদিন পরে ছেড়ে দিয়ে পুরী চলে যান। পুরীতে তিনি তিন বছর দিলেন। সেখান থেকে আবার কলকাতায় ফিরে পাথুরিয়াঘাটার কানাইলাল ঠাকুর ও গোপালচন্দ্র ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্ট বারত্রয়িকরূপ সংবাদ প্রভাকর পুনঃপ্রকাশ করেন। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন থেকে প্রভাকর দৈনিকে পরিণত হয়। সম্ভবত ১০৫০ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গিয়েছিলেন। সে সময় প্রভাকর

সম্পাদনার ছেদ পড়েছিল। ১৮৫১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে তিনি আবার প্রভাকরের সম্পাদনা গ্রহণ করেন।

ঐদিন প্রভাকরের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল :

"এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্বসাধারণ জনগণ সমীপে নিবেদন এই যে আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনপূর্বক পুনর্বার সংবাদ প্রভাকর এবং সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্রের সম্পাদকীয় কার্যের ও যন্ত্রাদির সম্বন্ধীয় আর আর সমুদয় কর্মের সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি, এই অবধি বিল ও পত্রাদিতে আমি আপনি আমার নাম স্বাক্ষর করিব যে সকল মহাশয়েরা পূর্বে আমাকে সর্বতোভাবে সকল বিষয়ে যথোচিত স্নেহ বিতরণ করত উপকৃত করিতেন অধুনা ভদ্রমহাশয়েরা তদনুরূপ করুণা প্রকাশে কৃপণতা করিবেন না।"

শ্রী ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর এবং সাধুরঞ্জন সম্পাদক
মহানগর কলিকাতা
সংবাদ প্রভাকর যন্ত্রালয়
১০ পৌষ, ১২৫৭। ১ জানুয়ারী, ১৮৫১

ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সাংবাদিক ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ হয়েছিল। সম্বাদ ভাস্কর প্রসঙ্গে আমরা তার পরিচয় যথাসময়ে দেব। তবে এই প্রবল বিরোধিতার অন্তরালে সুযোগ্য প্রতিপক্ষের প্রতি গৌরীশঙ্করের যে প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় গৌরীশঙ্করের শেষ সম্পাদকীয় রচনায়। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু সংবাদ শুনে গৌরীশঙ্কর সম্বাদ ভাস্করে লিখেছেন :

"তাঁহার (ঈশ্বরচন্দ্রের) গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যু শোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য শয্যাগত।

প্র। কতদিন?

উ। একমাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরশঙ্কর ভট্টাচার্য এই দুটির নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, আর যদি প্রভাকর সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোকের প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"[৩২]

তার কিছুদিন পরেই গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হয়। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ পত্রিকাটি চালান।

জ্ঞানান্বেষণ

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে জ্ঞানান্বেষণের গুরুত্ব প্রধানতঃ দুটি কারণে। এক, ত্রিশ দশকে ইয়ং বেঙ্গল দলের সমাজচিন্তার প্রতিফলন এই কাগজে পাওয়া যাবে। ত্রিশ

দশকের প্রগতিপন্থী জনমত গড়ে তোলার যে চেষ্টা রামমোহন, প্রসন্নকুমার, দ্বারকানাথ প্রমুখেরা করেছিলেন, জ্ঞানান্বেষণে এসে তা আর একটি মোড় নেয়। দ্বিতীয়তঃ এই পত্রিকার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর অসাধারণ প্রতিভাশালী সাংবাদিক শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গৌরীশঙ্কর প্রথমদিকে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সংবাদপত্রে সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝাত চারজনকে—ভবানীচরণ, গৌরীশঙ্কর, ঈশ্বর গুপ্ত আর অক্ষয় দত্ত। গৌরীশঙ্কর, ঈশ্বর গুপ্ত ও অক্ষয় দত্ত সম্পর্কে যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে। জ্ঞানান্বেষণ প্রসঙ্গে, তার প্রকাশক দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-১৮৬৮) সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। দক্ষিণারঞ্জন ১৮৩১ সালে জ্ঞানান্বেষণ প্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর। সম্পাদক গৌরীশঙ্কর পরিপূর্ণ যুবক, বয়স ৩২। দক্ষিণারঞ্জনের বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু পরস্পরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে বয়সের পার্থক্য গোষ্ঠী গঠনের পথে অন্তরায় নয়। গৌরীশঙ্করের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্যেরও ছিল না। দক্ষিণারঞ্জন যখন বর্ধমানের বিধবা মহারানী বসন্তকুমারীকে রেজিষ্ট্রী করে বিবাহ করেন তখন গৌরীশঙ্কর সে বিবাহের সাক্ষী ছিলেন।[৩৩] দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃত ও ফরাসী পণ্ডিত শ্রীপরমানন্দ মুখার্জীর পুত্র। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু স্কুলের ছাত্র। ইংরেজীতে যথেষ্ট দখল। ডিরোজিওর সংস্পর্শে এসে হিন্দু কলেজের যে কয়জন ছাত্র চিন্তার ক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যালপন্থী হয়ে ওঠেন, দক্ষিণারঞ্জন তাঁদের পুরোধা। জ্ঞানান্বেষণকে তিনি ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র হিসাবেই দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন।

সংরক্ষণপন্থীরা এ কারণে জ্ঞানান্বেষণের আবির্ভাব সুনজরে দেখেননি। তাঁরা যথারীতি দক্ষিণারঞ্জনের নামে ও গৌরীশঙ্করের নামে কুৎসা রটনা করেন। সংবাদ তিমিরনাশক লেখে :

"সন ১২৩৮ সালের ৫ আষঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নাটুরে ভাট মদ্যপায়ীকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকাম্বর মহাশয়কে কটূ কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারই দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জনকয়েক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।"[৩৪]

এখানে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে অবশ্য দক্ষিণানন্দন ঠাকুর বলা হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র। কিন্তু মাতমহ পরিবারের বংশমর্যাদা ব্যতিরেকেই তিনি আপন

বিদ্যা ও প্রতিভার দ্বারাই স্বনামধন্য এবং হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন উচ্চপদে নিযুক্ত থেকেছেন। তিনি কলকাতার কালেকটর নিযুক্ত হয়েছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজার সেক্রেটারি, মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান ও অযোধ্যার শঙ্করপুরে তালুকদার নিযুক্ত হন। স্ত্রী-শিক্ষায় তাঁর প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রতিষ্ঠিত ভিকটোরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ি তৈরির জন্য তিনি আট হাজার টাকা দান করেন এবং যে সম্পত্তি দান করেন তার পরিমাণ দশ হাজার টাকা। সুতরাং সংবাদ তিমিরনাশকে যে দক্ষিণারঞ্জন একরকম ভিলেন হিসাবে চিত্রিত, সেই দক্ষিণারঞ্জন সম্পর্কে ১৮৪৯ সালে সংবাদ প্রভাকর লিখছেন,

"শুদ্ধ এই মাত্র কহিতেছি, হে দেশস্থ ভ্রাতাগণ, আপনারা দক্ষিণারঞ্জনবাবুর এতৎ মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া মানব জন্মের সার্থকতা করুন।"[৩৫]

জ্ঞানান্বেষণের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের (১৮১০-১৮৫৮) নামও উল্লিখিত হয়েছে।[৩৬] রসিককৃষ্ণ ডিরোজিওর ছাত্র ও ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা। ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জনের চেয়েও উগ্রপন্থী। (১৮৩১ সালে ২৩ আগস্ট রসিককৃষ্ণ প্রমুখ সাতজন ইয়ং বেঙ্গল রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের বাড়ি থেকে নিষিদ্ধ মাংস পাশের বাড়িতে ছুঁড়ে মারেন)। দক্ষিণারঞ্জন সরকারী চাকরি গ্রহণ করলে জ্ঞানান্বেষণের দায়িত্ব বর্তায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিকের ওপর। ১৮৩৩ থেকে তাঁরা জ্ঞানান্বেষণকে দ্বিভাষিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশ করতে থাকেন।[৩৭]

১৮৩৯ সালের মার্চে গৌরীশঙ্কর জ্ঞানান্বেষণ ছেড়ে তাঁর নিজস্ব সাপ্তাহিক সম্বাদ ভাস্কর প্রকাশ করেন। গৌরীশঙ্করের জ্ঞানান্বেষণ ছাড়ার পিছনে কোন আদর্শগত কারণ ছিল না। কারণ সম্বাদ ভাস্কর প্রকাশের খবর জ্ঞানান্বেষণ খুশি মনেই নিয়েছেন।

"পূর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি (গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ) ভাস্কর নামক সংবাদ কাগজ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ সংবাদপত্র অতি উত্তম হইয়াছে এবং অতি সুপরামর্শ বিহিত নানাবিধ আছে তজ্জন্য আমারদিগের দেশস্থ লোকেরা ঐ সংবাদ কাগজে সাহায্য করিবেন।"[৩৮]

জ্ঞানান্বেষণ সম্পর্কে দক্ষিণারঞ্জনের জীবনীকার কয়েকটি নতুন তথ্য দিয়েছেন।[৩৯] দক্ষিণারঞ্জন হিন্দু কলেজ ত্যাগ করার পর জননীর উত্তরাধিকার সূত্রে একলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হন। অর্থের প্রতি তাঁর মমতা ছিল না। সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ হতে পারে মনে করে নিজ ব্যয়ে জ্ঞানান্বেষণ নামক একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। "১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে জ্ঞানান্বেষণ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়া, প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষকাল শিক্ষিত হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।" তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র ও হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মধ্যে মধ্যে এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। প্রথম বছর এই পত্র বাংলায় ও পরের বছর থেকে ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।

"এই পত্রে সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম বিরুদ্ধ আচার ব্যবহারাদিরও নিন্দা থাকিত, এই লইয়া দক্ষিণারঞ্জনের পিতার সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটে। দক্ষিণারঞ্জন এই সময়ে পিতার উপর অভিমান করিয়া কিছুদিন সার্কুলার রোডে তাঁহার গুরু ডিরোজিওর বাসস্থানের সন্নিকটে একটি বাটি ভাড়া লইয়া তথায় অবস্থান করেন।" ১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণ বন্ধ হয়ে যায়। জ্ঞানান্বেষণের প্রকাশের পিছনে যে উদ্দেশ্যের কথা বিবৃত করা হয়েছিল তার মধ্যে পত্রিকাটির গুরুত্বের বিষয় অবহিত হওয়া যাবে।

উদ্দেশ্যগুলি হল: "(১) এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদ বেদান্ত মনুমিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা দ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিব। দ্বিতীয়ত, এই যে এতদ্দেশ নিবাসী অনেকেই আপন আপন জাতিবাহিত ধর্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু মহাশয়েরা এমত কর্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্তব্য নহে ইহা কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ, এই যে ভূগোল প্রভৃতি যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বহুদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে, তথাপি সে অতি বিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশুবোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বহুদেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। এবং অন্য অন্য বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না। ইতি—"[৪০]

জ্ঞানান্বেষণ বেশিদিন যে চলেনি তার কারণ গৌরীশঙ্করের এই পত্রিকা ত্যাগ। দক্ষিণারঞ্জন চাকরি নিয়ে আগেই চলে গিয়েছিলেন। রসিককৃষ্ণও সাংবাদিকতার চেয়ে ডেপুটি কালেকটরের পদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।[৪১] সংরক্ষণপন্থীদের তীব্র আক্রমণ যেমন ছিল, ভাস্কর ও প্রভাকরের প্রতিযোগিতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল সুপরিচালনার অভাব।

ক্যালকাটা কুরিয়র ১৮৪০ সালের ১৬ নভেম্বর লেখেন:

"The Gyannaneshun Native Newspaper has we regret to hear, been given up for want of public support. It existed about ten years and was for some time ably conducted by a number of college students. In its palmy days it was a legitimate organ of the educated Hindoos, but since the retirement of Baboo Russickrishna Mullick, and Duckinanunden Mookherjee, who originally established the paper, merely with a view of keeping alive a sprit of liberal enquiry

amongst the Hindoos and combating the prejudices of the orthodox party, it exhibited many symptoms of dotage and decay, till in the course of the present week it died a natural death."

সম্বাদ ভাস্কর ও সম্বাদ রসরাজ

চল্লিশ দশকের উদারনৈতিক চিন্তাধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে যে সংবাদপত্রটির মাধ্যমে জনজীবনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে তোলে, সে পত্রিকাটির নাম 'সম্বাদ ভাস্কর'। ঈশ্বর গুপ্তের মত গৌরীশঙ্করও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কিশোর বয়সে মাতৃহীন গৌরীশঙ্কর এক রাতের অন্ধকারে ভাগ্যান্বেষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। শ্রীহট্ট ছিল তাঁদের পৈতৃক বাড়ি। গৌরীশঙ্কর পনের বছর বয়সে নবদ্বীপে এসে জনৈক অধ্যাপকের গৃহে আশ্রয় পান। সেখানে সংস্কৃত টোলে তাঁর শিক্ষা। আপন পাণ্ডিত্যে অধ্যাপক উপাধিও তিনি লাভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত গৌরীশঙ্কর এর পর কলকাতায় এসে শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত হন।

অপর একটি জীবনীবৃত্তান্ত অনুসারে গৌরীশঙ্করের শিক্ষা নৈহাটির নীলমণি ন্যায় পঞ্চাননের চতুষ্পাঠীতে।[৪২] কিন্তু শিক্ষা যেখানেই হোক গৌরীশঙ্কর পাশ্চাত্য বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন না। রামমোহনের সমসাময়িক কলকাতায় আরবান এলিটদের তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে সংরক্ষণপন্থী মানসিকতা গড়ে ওঠাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। গৌরীশঙ্কর প্রথম দিকে এই সংরক্ষণপন্থার প্রতিই ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তারপরে তিনি সতীদাহ প্রথা রদ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। ইয়ং বেঙ্গল দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং বয়সের পার্থক্য উভয়ের সৌহার্দ্যের পক্ষে কোন অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। তারপর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে র‍্যাডিক্যাল ও উদারপন্থীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ অব্যাহত থাকে। গৌরীশঙ্কর তাঁর সম্বাদ ভাস্করের নীতি সম্পর্কে লিখেছেন,

"...সমাচার পত্রের প্রয়োজন এই যে তদ্দ্বারা সাধারণের জ্ঞানশিক্ষাদি বিবিধ উপকার হইবে, ভাবশুদ্ধ লিখন পঠনে সাধারণে সুখানুভব করিবেন, রাজা যদি অবিচার করেন, তবে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা লিপি নৈপুণ্য দ্বারা জানাইবেন রাজ্যেশ্বর অবিচার করিতেছেন, রাজা বিপক্ষে যদি কোন ষড়যন্ত্র হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।" (সম্বাদ ভাস্কর, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৪)

গৌরীশঙ্করের সাংবাদিক নির্ভীকতার তুলনা ছিল না। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধেও লেখনীধারণ করতে তিনি ইতস্ততঃ করেননি। এ সম্পর্কে গর্ব করে গৌরীশঙ্কর লিখছেন :

"আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ

এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমার দিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্নমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লর্ড বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের সমুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি, এখন আমরা আপনারদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি ইহাতে দানবকেই ভয় করি না দানব কোথায় আছেন, আর সদ্বংশ্য যুব হিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ করেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যাত্রারম্ভ হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভাষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বান্ধবগণের সমুখে দণ্ডায়মানবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভাষা হয়, তাহার অর্থই আমার দিগের অভিপ্রেত, সে কবিতা এই 'এহি জ্ঞান মনুষ্যাণাম জ্ঞান তিমিরং হর' দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর, গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালে ব্যক্ত করিয়াছি "বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন। দয়া সত্য উভয়েকে করিয়া স্থাপন।। লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার। একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥" এই কবিতা দ্বারাই আমার দিগের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে এইক্ষণেও সেই ভাবের বাহক আছি, সহস্র ২ কি লক্ষ ২ লোক যদি আমার দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তথাচ আমরা বালিকাদিগের বিদ্যালয়ের অনুকূল বাক্যই করিব।···(সম্বাদ ভাস্কর, ২৬ মে ১৮৪৯)

'ধনীর হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি'—কবিতায় এই তত্ত্ব প্রকাশ যতখানি সহজ সংবাদপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে এই অভিযোগ দায়ের করা ততখানি সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করে উনিশ শতকের সামন্ততান্ত্রিক অভিজাততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে এই অভিযোগ লেখা সহজসাধ্য ছিল না।

কিন্তু ভাস্কর তার জন্মলগ্ন থেকেই এই সাংবাদিক নির্ভীকতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। ভাস্করের প্রথম প্রকাশ ১৮৩৯ সালের মার্চ। ১৮৪০ সালের নবেম্বর পর্যন্ত শ্রীনাথ রায় ভাস্করের সম্পাদক ছিলেন। অবশ্য ভাস্করের যাবতীয় সম্পাদনা গৌরীশঙ্করই করতেন।[৪৩] গৌরীশঙ্করের নির্ভীক লেখনীর দায়ভাগ হিসাবে শ্রীনাথ রায়কে নিদারুণ দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে ঘটনাটি অভিনব।

আন্দুলের একজন ব্রাহ্মণ জনৈক বৈষ্ণবের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিলে আন্দুলের রাজা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুজন ব্রাহ্মণকে ধর্মসভা থেকে বহিষ্কৃত করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ করে সম্বাদ ভাস্করে প্রকাশের জন্য একটি চিঠি এসেছিল এবং এই চিঠির সঙ্গে আন্দুল রাজপরিবারের আরো অনেক কেচ্ছাকাহিনীর কথা ছিল। কিন্তু ভাস্কর সম্পাদক ঐ চিঠি না ছাপিয়ে আন্দুলের রাজার কাজের সমালোচনা করে একটি চিঠি ছাপেন। এর ফলে ১৮৪০ সালের ৯ জানুয়ারী পটলডাঙ্গার

চৌমাথা থেকে আব্দুল রাজা প্রেরিত কুড়ি পঁচিশজন গুণ্ডা শ্রীনাথ রায়কে ধরে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে মারধোর করে। এর ফলে শ্রীনাথ রায়ের হাত ভেঙে যায়।

...the arm was pounded with an iron bar till it was broken at the wrist, and then hot fire balls were appiled to different parts of the person his arms were tied behind his back, an iron bar is introduced between them and by twisting it about an effort has made to wrench his shoulders out of joint.[৪৪]

পরবর্তীকালে সম্বাদ রসরাজ পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার জন্য একাধিকবার মানহানির দায়ে গৌরীশঙ্কর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের যেখানে সংশয় ছিল সেখানে গৌরীশঙ্কর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে বিদ্যাসাগরের হাত শক্ত করেছেন। বহু বিবাহ রোধ আন্দোলনেও ভাস্কর পুরোভাগে। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের মত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড সমর্থন ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অনাদর অবহেলা ঈশ্বর গুপ্তের মত গৌরীশঙ্করও সহ্য করতে পারেন নি।

"বালকদিগের কথায় প্রয়োজন কি বড়২ বাড়ী বড়২ ঘোড়া গাড়ী আরোহি রাজা বাবুদিগের মধ্যে অনেকের যদি বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লিখিতে হয় তবে যেমন অমনি গলদঘর্ম হইয়াছে আপনারদিগের নামাক্ষর পর্যন্ত শুদ্ধ লিখিতে পারেন না অতএব বালকেরা যে শুদ্ধ লিখিবে ইহা সুদূর পরাহত।"[৪৫] গৌরীশঙ্করের সাংবাদিক লেখনীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সে লেখনী ব্রহ্মাস্ত্রের মত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পড়ত। তিনি যা লিখতেন সোজাসুজি লিখতেন। কোন ভণিতা বা বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নিতেন না। ভাষার মারপ্যাচে 'এও হয় অও হয়' গোছের সাংবাদিক কাপুরুষতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। সেই প্রবল ব্রিটিশ ভক্তির যুগে তিনি ব্রিটিশকে প্রতারক বলতেও পেছপা হননি। 'এদেশীয় লোকেরা আর ব্রিটিশ প্রতারণায় ভ্রান্তিযুক্ত হইবেন না' (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭)। বিদেশী সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভাস্করে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হত। কলকাতা পুলিশের ডি. সি. মেকান সাহেব মারা যাওয়ার পর ১৮৪৯ সালের ২৮ জুন ভাস্কর লিখেছিল :

"মেকান সাহেব বিপদ গ্রস্ত লোকদিগকে অর্থাৎ চোর ডাকাইত, দাঙ্গাবাজাদি দোষিদিগকে উপার্জনশীল পুত্রবৎ জ্ঞান করিতেন, অপহৃত দ্রব্যাদি যাহারা ক্রয় করিত তাহারা মেকান সাহেবের হাতে পায়ে ধরিয়া বলিত দশ টাকায় দশ হাজার টাকার বস্তু ক্রয় করিয়াছি তিনি যদি বিপক্ষে হয়েন তবে তাহারদিগের ব্যবসায় চলে না, তাহাতে মেকান সাহেব ঐ সকল দ্রব্যাদি দেখিয়াও ছাড়িয়া দিতেন কিছু লইতেন না, পরে ঐ সকল লোকেরা তাঁহার বাটীতে যাইয়া বিবিকে এবং সাহেবের কন্যাদিগকে সেলাম করিয়া আসিত. মেকান সাহেব যত অপহৃত বস্তু ধৃত করিয়াছেন কলিকাতার

পোলীসের জন্মে কেহ তত বহুমূল্য বস্তু দেখেন নাই, মেকান সাহেব ঐ সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদি ধৃত করিয়া অগ্রে আপন বাটীতে লইয়া যাইতেন, বিবি দেখিতেন, কন্যারা দেখিত, জামাতারাও বহুমূল্য হীরা মুক্তা সোণা-রূপা শাল ইত্যাদির মূল্য বলিয়া দিতেন, মেকান সাহেব হাড়পেখের বোঝা অমূল্য বস্তু আপন ঘরে রাখিতেন না, তৎক্ষণাৎ পোলীসের তোষাখানায় পাঠাইয়া দিতেন, বোধ হয় পোলীসের ভাণ্ডারে অলক্ষ্মী আছে, মেকান সাহেব যাহা পাঠাইতেন, পোলীসের তোষাখানায় প্রবিষ্ট মাত্র তাহা ভাঙ্গা চৌকী, ছেঁড়া বালিশ, পোকাধরা সিন্দুক হইয়া যাইত…"

ধর্ম সম্পর্কে ভাস্করের যে গোঁড়ামি ছিল না তা আগেই বলা হয়েছে। ভেকধারী ভণ্ড পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর বরাবরই বিরূপতা ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের মেকি সাহেবের প্রতি যতখানি বিদ্রূপ ছিল মেকী ভারতীয়ের প্রতি ততখানি ঘৃণা ছিল না। কিন্তু গৌরীশঙ্কর ভেকচিহ্ন তসর গরদ হরিনামের মালা ও নামাবলীর আড়ালে কাপুরুষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এই পণ্ডিতেরা অর্থলোভে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে স্বাক্ষর করলেও কার্যক্ষেত্রে পালিয়ে গেছেন। ১৮৫৪ সালে অধ্যাপক চন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রায়শ্চিত্ত করে খ্রীষ্টান থেকে হিন্দু হন। গোঁড়া হিন্দুরা এটিকে সুনজরে দেখেননি। ভাস্কর লেখেন: যে সকল হিন্দু বালকেরা খ্রীষ্টান হয় তাহার দিগের অধিকাংশই অজ্ঞান ও জাতীয় দরিদ্র সন্তান তাহারা যদি হিন্দুকূলে আনুকূল্য পায় তবে কি খ্রীষ্টিয়ান দলে মোটা চাইলের অন্নাহারে প্রাণ ধারণ করে।[৪৬]

১৮৪৬ সালে ভাস্কর কলকাতার শোভাবাজার বালা-খানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভাট্টাচার্যের নিজ ভবন থেকে ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে প্রতি মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনিবার ভোরবেলা প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি যে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল তা সাপ্তাহিক থেকে দ্বি-সাপ্তাহিক তারপর বারত্রয়িকে উত্তীর্ণ হওয়াই তার প্রমাণ। ভাস্করের গ্রাহক সংখ্যাও সেকালের বাংলা সংবাদপত্রের অনুপাতে যথেষ্ট ছিল। ভাস্কর গর্ব করে বলতেন, আমাদের যত গ্রাহক ইংরাজিপত্র সম্পাদকও এত গ্রাহক দেখাইতে পারিবেন না।[৪৭]

তবে গৌরীশঙ্করের এই পরিচ্ছন্ন উদার শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব সম্বাদ রসরাজে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র লাভ করেছিল। ঈশ্বর গুপ্তের পাষণ্ড পীড়ন ও গৌরীশঙ্করের সম্বাদ রসরাজ মুখ্যত কেচ্ছাকাহিনী-প্রধান 'পপুলার' সংবাদপত্রের রূপ নেয়। ঈশ্বর গুপ্তের ক্ষেত্রে না হয় বুঝতে পারি, তাঁর চরিত্রে স্ব-বিরোধিতা ছিল তাছাড়া কবিয়ালের মনন ধর্মে শ্লীলতা-অশ্লীলতার শোভনতা-অশোভনতার সীমারেখা খুব স্পষ্ট থাকে না। কিন্তু গৌরীশঙ্কর মহাভারত ও ভাগবদগীতা ও চণ্ডীর অনুবাদ করেছিলেন, বালক শিক্ষার গ্রন্থ জ্ঞানপ্রদীপ লিখেছেন। বালকদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য 'নীতিরত্ন' গ্রন্থ লিখেছিলেন। তিনি কি করে সম্বাদ রসরাজের কুরুচিকর সংবাদিকতায় মেতে উঠলেন তা দুর্বোধ্য। ১৮৩৯ সালের ২৯ নবেম্বর রসরাজ প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসাবে কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ও ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম

থাকত কিন্তু আসল সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর। সম্বাদ ভাস্করে যেমন সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল শ্রীনাথ রায়ের পর ভূদেব ভট্টাচার্যের।

ভাস্কর ও রসরাজ একই প্রেস থেকে ছাপা হত। ১৮৫০ সালের ৫ মার্চ সম্বাদ রসরাজে লেখা 'এই সম্বাদ রসরাজ প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার প্রাতঃকালীন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য দ্বারা ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হয়।'

সম্বাদ রসরাজে ব্যক্তিগত কুৎসা সেসময় কলকাতার সমাজজীবনে এক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রসরাজ কাকে আক্রমণ করবে তা নিয়ে ভি আই পি-রা যে সদা সন্ত্রস্ত থাকতেন তার প্রমাণ পাওয়া য়ায় রসরাজ তুলে দেবার সঙ্কল্প ঘোষণা করার পর সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে। চিরকাল পলুলার প্রেস শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়েয় দ্বারা নিন্দিত ও ঘৃণিত। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীঈশ্বর গুপ্ত নিজেও সর্বদা বিদগ্ধ রুচির পরিচয় দিয়ে যাননি কিন্তু তৎসত্ত্বেও রসরাজের চরিত্র তাঁর কাছে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয় হয়নি। তিনি সংবাদ প্রভাকরের বিনিময় কপি পর্যন্ত সংবাদ ভাস্করকে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সংবাদ প্রভাকর লিখেছিল, রসরাজ দেখা দূরে থাকুক, যাঁহার দিগের বিছানায় ঐ নিন্দিত পত্র দেখিতে পাইতাম তাঁহার দিগের বিছানায় বসিতেও লজ্জাবোধ করিতাম।[৪৮]

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদিকতার ধারা সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভের জন্য সম্বাদ রসরাজের কিছু কিছু লেখার উদ্ধৃতি দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রসরাজে প্রকাশিত চিঠিপত্রে, কিছু কিছু প্রতিবেদনে এই পত্রিকার চরিত্র স্পষ্ট। যেমন একটি পত্রে জনৈক গোলোকনাথ মল্লিককে উদ্দেশ করে এক সামাজিক কেলেঙ্কারির বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রসরাজ সম্পাদক মহাশয়ের কি হইল গোলোকনাথ মল্লিকবাবু আত্মীয় লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিতে ২ যে এদিকে পরামর্শ শেষ হইয়া উঠিল, পুত্রবধূ অবলা তুমি শ্বশুর তাঁহাকে বলাৎকার করিয়াছ ঐ স্ত্রীলোক পাপ ভয়ে এই গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, তুমি পুরুষ হইয়াও পাপ মোচনের ভয় কর না, কি চমৎকার, তুমি যে কর্ম করিয়াছ তোমার পুত্র যদি অজ্ঞান হইতেন তবে এমত বিষয়ে তোমার মুণ্ডচ্ছেদ করিতেন, তিনি ব্রাহ্ম এই কারণে জ্ঞান বলে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অস্ত্র ধারণ করেন নাই, তিনি শান্ত মূর্তি সত্যবাদিনী স্বস্ত্রীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন। সিন্দুর পার্টির বারোএয়ারি দল (২২মে ১৮৪৯)

নাম না থাকলেও সম্পাদকীয় দায় দায়িত্ব থেকে গৌরীশঙ্কর নিষ্কৃতি পাননি। এবং মানহানির দায়ে গৌরীশঙ্করকে দুবার কারাগারে যেতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গৌরীশঙ্কর তাঁর লেখনীকে সংযত করেননি এবং তৃতীয়বার বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে গৌরীশঙ্কর ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৬৩ সংখ্যায় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং এমন কতকগুলি ঘটনার কথা লেখেন যা রাজার পরিবারবর্গকে বিশেষভাবে আহত

করে। মহারানী সুপ্রীম কোর্টে মানহানির মকদ্দমা আনবার আবেদন করলে গৌরীশঙ্কর রসরাজ পত্রিকা বন্ধ করে দেন।

নিছক মুনাফা প্রবৃত্তি বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য গৌরীশঙ্কর রসরাজ প্রকাশ করেছিলেন বলে মানা যায় না। সাংবাদিকতার এই পপুলার ফরমটি নিয়ে তিনি একসপেরিমেন্টে মেতে উঠেছিলেন বলেই মনে হয় কারণ সম্বাদ ভাস্করে যাঁর বলিষ্ঠ লেখনী জাতীয় মুক্তির পথকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল রসরাজের মধ্যে তাঁর এই চারিত্রিক অধঃপতন কোন আকস্মিক পরিণতি নয়। গৌরীশঙ্কর হয়ত গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে এইভাবে দুঃসাহসী লেখনী চালানোর ফলে সামাজিক মঙ্গল অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে। যাঁদের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। বিশেষ করে কমলকৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কেও তাঁর শ্রদ্ধার কথা আগেই বলেছি। সম্বাদ রসরাজের অন্তিম সংখ্যায় তিনি নিজেই লিখে গেছেন, "দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর যাঁহার সদগুণগণ পরিগণনা কালে আমার প্রখরা লেখনীও পরিহার স্বীকার করে এবং শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যিনি কনিষ্ঠ হইয়াও সর্বাংশে ঐ জোষ্ঠের ন্যায় বিশিষ্টাচারে গৌরব গরিষ্ঠ হইয়াছেন এবং অন্যান্য মান্যবর দলপতি মহাশয়গণ যাঁহারা দাম্যমানাদি সর্বগুণে মাণ্যগণ্য ধন্যলাভ করিয়াছেন, ২৮ অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজপাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন, বাস্তবিক আমি তাঁহার দিগের বিপক্ষে অন্তঃকরণেও কটাক্ষ করি নাই, তথাচ বন্ধু বিচ্ছেদ শোকে আমার ঘন ২ দীর্ঘ নিশ্বাস হইতেছে, বান্ধবেরাই যদি বিপক্ষ হইলেন, বিশেষে আমার সর্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব।"

গৌরীশঙ্করের এই আক্ষেপকে আন্তরিক বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে কারণ চারিত্রিক দার্ঢ্যই এই খর্বাকার ব্রাহ্মণ সাংবাদিকের প্রধান সম্পদ ছিল। তাঁর মতামত নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করতে তিনি কখনও ইতস্ততঃ করেননি, আর তাছাড়া মুনাফা বৃত্তির দ্বারা তিনি যে চালিত হয়েছিলেন তাও মনে হয় না; কারণ যদিও সম্বাদ রসরাজের প্রচার সংখ্যা ক্রমশ উর্ধ্বগামী হয়েছিল তবু সেযুগে কোন বাংলা পত্রিকারই পত্রিকা বিক্রয় থেকে খুব লাভ করা সম্ভব ছিল না। গৌরীশঙ্কর নিজে ওই প্রবন্ধে লিখেছেন যে তিনি বিশ হাজার টাকা লোকসান দিয়েছেন।

সংবাদ প্রভাকর (৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭) লিখেছিল, তাঁদের অনুরোধে কমলকৃষ্ণ আর সুপ্রিম কোরটে আবেদন করেননি।

এই ঘটনার দুবছর পরে ১৮৫৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গৌরীশঙ্করের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৬১ সালে তাঁর ছেলে ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য আবার সম্বাদ রসরাজ প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্ষেত্রমোহনও কাগজের চরিত্র বদলাননি। ফলে আবার ক্ষেত্রমোহনকে ৫০০ টাকা জরিমানা ও তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

বেঙ্গল স্পেক্টেটর

উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকার মধ্যে বেঙ্গল স্পেকটেটর সব থেকে স্বল্পায়ু নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। ১৮৪২ সালে তার উদয়, ১৮৪৩ সালের নবেম্বরে অস্ত। কিন্তু মানুষের মত পত্রিকার ক্ষেত্রেও জীবনমূল্য আয়ুতে নয়, কল্যাণপ্লুত কর্মে। জ্ঞানান্বেষণের মাধ্যমে ইয়ং বেঙ্গল দল যে ভাবনার সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন বেঙ্গল স্পেকটেটরের মাধ্যমে তারই পুনরায় প্রতিফলন ঘটে। ১৮৪০ সালের মধ্যেই জ্ঞানান্বেষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহী নায়কদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, সিভিল সারভিসে যোগ দেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তীও পরবর্তীকালে মুনসেফ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ ভারতীয়দের কভেনেনটেড ব্রিটিশের সমমর্যাদা দিয়ে নিয়োগের দাবিতে সোচ্চার হলেও সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেননি। ইংরাজ বণিকের সহকারী হিসাবে ব্যবসায় শিখে তিনি স্বাধীন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আর. সি. ঘোষ অ্যাণ্ড কোম্পানী পত্তন করে যান। বেসরকারী স্বাধীন বৃত্তির জন্যই হোক বা কলকাতায় বরাবর থাকবার জন্যই হোক রামগোপাল জ্ঞানান্বেষণে যে সাংবাদিকতা শুরু করেছিলেন জ্ঞানান্বেষণ বন্ধ হয়ে যাবার পরও তিনি তা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। ১৮৪২ সালের এপ্রিলে রামগোপাল ঘোষ তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় মাসিক বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রকাশ করেন। পরে পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক হিসাবে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে প্রথম সংখ্যায় বলা হয়:

"অস্মদ্দেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির উপযোগি বিষয় সকল আমার দিগের সাধ্যানুসারে কিঞ্চিৎ আন্দোলন করণার্থে আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্যত হইয়াছি এবং যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসন কারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ এবং ইংলণ্ড দেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমাদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধে কথা শ্রবণে যে দোষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্নমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদন পূর্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমার দিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্ব স্ব হিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনার দ্বারা উৎসাহাবলম্বন-

পূর্বক, আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমাদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎ পত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দ্বারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম ও বানিজ্যাদির বৃদ্ধি আয় রাজ্যশাসন কার্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্বপ্রকারে উন্নতি হয়। আমারদিগের এমৎ আশ্বাস হইতেছে যে যাঁহারা এই অভিপ্রায় উত্তম জ্ঞান করেন তাঁহারা অবশ্যই আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আমরা শিক্ষিত বন্ধুগণের নিকটে এই মিনতি করি যে তাঁহারা এই পত্রদ্বারা আপনার দিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি করত এক বাক্য হইয়া যথাসাধ্য সৎকর্মের উদ্যোগ করুন।"[৪৯]

বেঙ্গল স্পেকটেটর জ্ঞানান্বেষণের মত দ্বিভাষিক পত্রিকা। ইংরাজী ও বাংলা পাশাপাশি স্থান পেত। প্রভাকর ও ভাস্করের মত বেঙ্গল স্পেকটেটরের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল না। দেশহিত, দেশের অভাব-অভিযোগ ইংরেজের কর্ণগোচর করা, দেশের শিক্ষিত জনমতকে সুসংহত করাই ছিল এই পত্রিকার লক্ষ্য।

একটি তথ্য থেকে জানা যায় বেঙ্গল স্পেকটেটরের প্রবর্তক রামগোপাল ঘোষ হলেও এ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র।[৫০]

বেঙ্গল স্পেকটেটরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এই পত্রিকার বিজ্ঞপ্তিতে লেখা থাকত :

"এতৎপত্র ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়া আপাততঃ মাস মধ্যে একবার প্রকাশিত হইবে কিন্তু যেসকল ব্যক্তিদিগের কর্তৃত্বে ইহা নির্বাহ হইবে তাহাদিগের এতদ্দ্বারা অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা নাই অতএব গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া অধিকার প্রকাশ হওয়ার ব্যয় উৎপন্ন হইলে একবারের অধিকও প্রকাশ হইবেক। এতৎপত্রের মাসিক মূল্য ১ মুদ্রা মাত্র।"

লালদীঘির পূর্বে ৫নং ঘরে শ্রীবনমালী দাসের নিকট গ্রাহক হবার পত্র পাঠাতে বলা হত। সম্ভবত এই বনমালী দাস পত্রিকাটির কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

বেঙ্গল স্পেকটেটরে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ চিঠিপত্র প্রকাশিত হত। বিতর্কমূলক চিঠিপত্র এই কাগজের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। কে, ওয়াই, প্রভৃতি বেনামে এইসব চিঠি লেখা হত। চিঠিগুলি সমসাময়িক বিষয়ের ওপর লেখা।

'মফস্বলের রাজকীয় কর্মালয়ের একস্থানে স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা' থেকে 'খ্রীষ্টিয়ান ধর্মরক্ষার্থে এতদ্দেশীয় রাজস্বের অন্যান্য ব্যয়ের প্রতিবাদ' প্রভৃতি ছিল এইসব চিঠির উপজীব্য। অধিকাংশ চিঠিই দীর্ঘ ও সুলিখিত। এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে বেঙ্গল স্পেকটেটরের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বিধবার পুনর্বিবাহ' সংক্রান্ত চিঠিখানি উল্লেখ-যোগ্য। এই চিঠির পত্রপ্রেরকের নাম নেই কিন্তু চিঠির বিষয়বস্তু বৈপ্লবিক। পত্র লেখক এই দীর্ঘচিঠির প্রথম ছত্রেই বলছেন: "যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর

পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষমা না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সরলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র।"

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটি বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন ১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে।[৫১] এই প্রস্তাব লেখার আগে বিদ্যাসাগর অসংখ্য শাস্ত্র ঘেঁটে বিধবা বিবাহের সপক্ষে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। কিন্তু তার তেরো বছর আগে বেঙ্গল স্পেকটেটরের ঐ পত্রলেখক এই আলোচনার সূত্রপাত করে গিয়েছিলেন। পত্রলেখক নারদ শঙ্খ লিখিত যাজ্ঞবল্ক্য ও হারীত প্রভৃতি মুনিগণের স্ব স্ব সংহিতায় প্রকারান্তরে পুনর্ভূব বিধবা বিবাহের প্রতি সমর্থনের কথা উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবা বিবাহ পুস্তিকাতেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য বিদ্যাসাগরের রচনা আরও বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ কিন্তু আশ্চর্যভাবে বেঙ্গল স্পেকটেটরের ওই পত্রের সঙ্গে ভাবগত মিল।

বেঙ্গল স্পেকটেটর বিভিন্ন স্থানে সংবাদদাতা নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে ইংরাজ রাজকর্মচারীদের নানাবিধ শোষণ ও প্রতারণার খবর আশা করতেন। ১৮৪৩ সালের ১ অকটোবর স্পেকটেটর লিখছেন, সংবাদদাতারা কি করিতেছেন জানি না তাঁহারা যদি কুলি এজেন্টের কর্মালয়ে প্রত্যহ গমন করেন ও দফাদারদিগের নিকট গমন করত উহাদিগের কৃতকর্মের সমাচার দেন তবে অনেক উপকার দর্শে। কিয়দ্দিবস হইল আমরা তিনটি প্রতারণার ব্যাপার শুনিয়াছি। উচ্চকর্ম ও প্রধান জীবিকার উপায় চল্লিশ দশক থেকে ক্রমশ ভারতীয়দের হাত থেকে চলে যেতে শুরু করলে কলকাতার বাঙালি সমাজের অর্থনৈতিক জীবনে আবার বিপর্যয় নেমে আসে। ১৮৪৩ সালে কলকাতায় দুর্গোৎসবের সংখ্যাও কমে যায়।[৫২] এই নিদারুণ আর্থিক অবক্ষয় থেকে মুক্তির জন্য বেঙ্গল স্পেকটেটর সংগ্রাম করেন। রাইয়তদের দুর্দশা, কুলিদের দেশান্তর প্রেরণ প্রভৃতি সমস্যায় স্পেকটেটর বহু আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। বাংলা শিক্ষার ব্যাপারেও স্পেকটেটর সোচ্চার হয়েছেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলা শিক্ষাদান ও কলকাতায় বাংলা পাঠশালা স্থাপনের দাবিও স্পেকটেটর করে গেছেন।

রাজা দক্ষিণারঞ্জনের জীবনীকার লিখছেন, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও কিছুকাল বেঙ্গল স্পেকটেটরের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। জর্জ টমসন এই পত্রিকায় অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এক বছর পরে পত্রিকাটির প্রায় এক হাজার টাকা লোকসান দাঁড়ায়। এই আর্থিক ক্ষতিই পত্রিকাটির উঠে যাবার কারণ।[৫৩]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে প্রচলিত অর্থে সংবাদপত্র বলা যায় না। যদিও সংবাদ এ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রচারিত হত। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সংবাদ-নির্ভর পত্রিকা ছিল না। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এই পত্রিকাটি ছিল ধর্মভিত্তিক সাময়িকপত্র। পত্রিকার

প্রথম সংখ্যাতেই (১ ভাদ্র ১৭৬৫ শক) বলা হয়েছে "বৈষয়িক সম্বাদপত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশেতে প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলক্ষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত হইল, এবং সর্বসাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান-আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।"

তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক মুখপত্র হিসাবে তত্ত্ববোধিনীর প্রকাশ। কিন্তু শুধু সোসাইটি জার্নাল বা সাংগঠনিক মুখপত্র কিংবা 'ধর্মপত্রিকা' হিসাবে তত্ত্ববোধিনীকে দেখলে ভুল করা হবে। তত্ত্ববোধিনী যে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল তা প্রধানত ধর্মীয় সংস্কার মুক্তির আন্দোলন।

১৭৬১ শক বা ১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারই ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য। ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ (১৮৪৩) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং তার আগের বছরই তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে মিলন সাধিত হয়েছিল (বৈশাখ ১৭৬৪)। রামমোহনের ধর্মচিন্তাকে দেবেন্দ্রনাথ বৃহত্তর ধর্ম আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। এই ধর্মোপলব্ধি সাধারণ্যে প্রচারের জন্যই একটি পত্রিকার প্রয়োজন হয়েছিল।

"এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয় একখানি পত্রিকা অতি আবশ্যক হইল। আমি ভাবিতাম তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্ম সমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না, তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বুদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে (১৮৪৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।"[৫৪]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মুখ্যত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু তত্ত্বকথা প্রচার ও তত্ত্ববোধে সাহায্য ছাড়াও এই পত্রিকা প্রথম থেকেই উনিশ শতকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মৌলধর্ম সংবাদ পর্যালোচনা ও সমালোচনা পত্রিকার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথ পত্রিকা প্রকাশের যে উদ্দেশ্যের কথা তাঁর আত্মজীবনীতে ব্যক্ত করেছেন, তত্ত্ববোধিনীর প্রথম সংখ্যায় সেই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করা হয়েছিল।

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় বলা হয়—

"কোন নতুন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎ পত্রিকা সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূরস্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য সর্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনী এবং উন্নতি কি প্রকারে হইবেক? অতএব তাঁহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

"অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈব-বিপাকে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

"মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার অর্থ জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

"পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সারমর্ম সংগৃহীত হইবেক।

"বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

"কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

"এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাঁহারদিগের বন্ধুগণের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাঁহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।"

অবশ্য এই ভূমিকাটি পড়লে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব নয়। পত্রিকার রচনারম্ভের শুরুতেই একমেবাদ্বিতীয়ং এবং প্রথম পৃষ্ঠাতে তাত্ত্বিক প্রবন্ধ স্থান পেলেও সমসাময়িক বিভিন্ন চিন্তা ধরে সম্পাদকীয় বিশেষ প্রবন্ধও পত্রাকারে এ পত্রিকায় স্থান পায়। এমনকি অর্থনৈতিক প্রবন্ধও এ পত্রিকায় স্থান পেয়েছে। ১৭৯২ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের উন্নতি' নামে একটি প্রবন্ধে বাঙালির হাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেই বলে আক্ষেপ করা হয়েছে। আবার

১৮০০ শকের ভাদ্র সংখ্যায় প্যারিস প্রবাসী জনৈক বাঙালি একটি ইংরাজী চিঠি প্রকাশ করে তত্ত্ববোধিনীর নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঐ পত্রে বাঙালিকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপযুক্ত করে চরিত্র গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "National liberty is an object which every individual is bound to strive after and fight for."

আবার শিক্ষা সম্পর্কেও স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস, স্ত্রী শিক্ষা, বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা প্রভৃতি সমসাময়িক শিক্ষা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এসব বাদ দিলেও ধর্ম আন্দোলনের বার্তাবহ হিসাবেও তত্ত্ববোধিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। ১৮৪২ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের মিলন ঘটে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মুখ্যত ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনেরই মুখপাত্র হয়ে ওঠে। তবে ব্রাহ্মধর্মে উপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত ও বেদমন্ত্র পাঠ ও বেদান্তের তত্ত্বগত প্রচারের দিকটি বড় করে তোলা হলেও এই ধর্ম আন্দোলনের যেটি পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সেটি হল যুক্তি নির্ভর পরিশীলিত মানসিকতার জয় ঘোষণা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত সংরক্ষণপন্থী এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত হিন্দুও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার কথা বাদ দিলেও এই ধর্ম আন্দোলন গোষ্ঠীগত ভাবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ধ্যান ধারণাই আপন সদস্যদের মধ্যে উদ্দীপিত করে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাস দীর্ঘকালের। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি জীবিত ছিল। সুতরাং এই দীর্ঘ ৮৯ বছরে একাধিক সম্পাদকের দ্বারা পত্রিকাটি সম্পাদিত হয়েছে। সম্পাদক তালিকায় ছিলেন: অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মোট তিন দফায়), অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (দু দফায়), হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (দু দফায়), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের মধ্যে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত সম্পাদক তালিকায় ছিলেন ১। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮৪৩—১৮৫৫)। ২। নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৫—১৮৫৯)। ৩। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯ ডিসেম্বর—১৮৬২ মার্চ, এপরিল ১৯০৯—এপরিল ১৯১০। এপরিল ১৯১৫—জানুয়ারি ১৯২৩) এই পর্যায়ে তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় কাজ করেন। ৪। অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫—এপরিল ১৮৬৭, এপরিল ১৮৬৯—১৮৭২) ৫। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (এপরিল ১৮৬৭—এপরিল ১৮৬৯, এপরিল ১৮৭৭—সেপটেম্বর ১৮৭৭)।

১৮৪৩ থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনা কালটি (১৮৪৩—৫৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য জগতে কি পরিবর্তন

ঘটাইয়া দিলেন তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।"[৫৫]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক সময় ৭০০ জন গ্রাহক ছিল, তাহা কেবল একা অক্ষয়বাবুর দ্বারা। অক্ষয়কুমার দত্ত যদি সে সময় পত্রিকা সম্পাদনা না করিতেন তাহা হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এরূপ উন্নতি কখনই হইতে পারিত না।"[৫৬]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাঙালীর মনের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্ববোধকে বুদ্ধিগোচর করিবার গুরুভার লইয়াছিলেন অক্ষয়কুমার এবং সেই জন্যই সে যুগে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলেই তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। মাত্র ২শ বর্ষকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করিয়া তিনি বাঙালীর মনের প্রান্তরে যে রোশনাই জ্বালাইয়াছিলেন, তাহার আলোকচ্ছটা ১৯শ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী জীবনের বিচিত্র রহস্যকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিয়াছিল।"[৫৭]

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—'৮৮৬)-কে সাংবাদিকতায় এনেছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত। অভিজাততান্ত্রিক কলকাতার সমাজে ঈশ্বরগুপ্তের মতই অক্ষয়কুমার ভাসতে ভাসতে এসেছেন। সাংবাদিকতার প্রতি আশৈশব অনুরাগ তাঁর ছিল না। কিন্তু ছিল যুক্তিগ্রাহ্য মননশীলতা, নানান জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পাঠে সুসংস্কৃত মন। উপযুক্ত জলসিঞ্চনের জন্য উর্বর ক্ষেত্র অপেক্ষা করছিল। ঈশ্বরগুপ্তই তাঁর সে অভাব পূরণ করলেন। অক্ষয়কুমারের দাদা হরমোহন সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞাপন দেখতেন। প্রভাকরের জন্য বিজ্ঞাপন নিতে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর কাছে যেতেন। এই সূত্রে অক্ষয় দত্তের সঙ্গে তাঁর আলাপ এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।[৫৮] এই ঈশ্বরগুপ্তই তাঁকে দিয়ে জোর করিয়ে প্রভাকরের জন্য ইংলিশম্যান থেকে সংবাদ অনুবাদ করিয়ে নেন। অক্ষয়কুমারের দ্বিধা ছিল। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত প্রতিভা চিনতেন। তিনি দেখলেন অক্ষয় দত্তের গদ্য রচনা চমৎকার। যে ওজস্বিনী গদ্য রচনায় দত্ত মহোদয় অখিল বঙ্গদেশকে বিমোহিত করেন এই সেই গদ্য রচনার সূত্রপাত।[৫৯] তত্ত্বরঞ্জিনী তথা তত্ত্ববোধিনী সভায় ঈশ্বরগুপ্তের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তিনি এই সভার সভ্যও হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্রই অক্ষয়কুমারকে তত্ত্ববোধিনী সভায় নিয়ে যান ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।[৬০]

তবে অক্ষয়কুমার যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সম্পাদক হয়েছিলেন তা রীতিমত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে। 'বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' এই বিষয়টি অবলম্বন করে একটি প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল সম্পাদক পদ প্রার্থীদের। অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়। তিনি ৩০ টাকা বেতনে গ্রন্থ সম্পাদক হিসাবে নিয়োগপত্র পান। অক্ষয়কুমারের রচনা দেবেন্দ্রনাথের ভাল লেগেছিল তবে তাঁর মতামতের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এক হতে পারেননি। "তাঁহার এই রচনাতে গুণ দোষ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুরা; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুট

মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মত বিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মত বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা ক'রতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ। ফলত আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাপত্রই ছিল, তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথম সেই অভাব পূরণ করে।"[৬১]

অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর দেবন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। একেশ্বর বাদী মতাদর্শে উভয়েই আস্থা স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধি নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিজে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি অক্ষয়কুমারের রচনা কেটে দিতেন। গোষ্ঠী বা শিল্পপতি চালিত সংবাদপত্রে মালিক বা এস্টাব্লিশমেন্টের সঙ্গে সম্পাদকের মতাদর্শের সংঘর্ষ সাংবাদিকতার ইতিহাসে বিরল নয়। মধ্যবিত্ত অক্ষয়কুমারের চাকুরি থেকে পদত্যাগ সম্ভব ছিল না। বারো বছর পরে তিনি যে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তা দুরারোগ্য শিরঃপীড়ার জন্য। তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর জন্য ৫০ টাকা বৃত্তি ধার্য করা হয়েছিল।[৬২]

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্য তা প্রধানতঃ তত্ত্বগত। প্রথম কথা, ধর্মতত্ত্বের কচকচির চেয়ে বিজ্ঞান দর্শন আলোচনা তাঁর কাছে অধিকতর লোভনীয় ছিল। বিজ্ঞান চেতনার ফলে ব্রাহ্ম ধর্মের হৃদয় সর্বস্ব 'সাবজেকটিভ' রূপটি তাঁর কাছে কখনও বড় হয়ে ওঠেনি। বেদকে তিনি অভ্রান্ত বলে মনে করতে পারেননি এবং যা বিশ্বাস করতে পারেননি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েও তা তিনি নিজ নামে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করতে রাজি হননি। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম স্ত্রীলোকদের ফুলচন্দন দিয়ে নিরাকার ব্রহ্মের পূজা করার অনুমতি দিয়েছিলেন এই মনে করে যে স্ত্রীলোকরা নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা কিছুতেই উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারবেন না। কিন্তু যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার এই ভাবের ঘরে চুরি সমর্থন করতে পারেননি। বেদকেও তিনি মনুষ্য বিরচিত গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি। এমনকি ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান না বলে তিনি বিচিত্র শক্তিমান বলতেন। কারণ ঈশ্বরের সর্বশক্তি সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ ছিল।[৬৩]

অক্ষয়কুমারের সম্পাদকীয়ের মধ্যে কোন ভণিতা ছিল না। প্রতিটি প্রবন্ধ ছিল যুক্তিনির্ভর এবং তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিল। "অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারীদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ, তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রাদিগে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও।"[৬৪]

এই স্বার্থহীন, সংশয়হীন, ঋজু স্পষ্ট ভাষণই ছিল অক্ষয়কুমারের বৈশিষ্ট্য।

অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনীর মাধ্যমে বাংলা সংবাদপত্রের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষায় নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নানান উচ্চাঙ্গের বিষয় স্থান পাওয়াতে তত্ত্ববোধিনী ইংরাজী শিক্ষিত সমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

"ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল পীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।"[৬৫]

তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি উচ্চমানের না হলে ছাপা হত না। প্রবন্ধ নির্বাচনের জন্য পাঁচজন সদস্যের একটি পেপার কমিটি স্থাপিত হয়েছিল। একজন সদস্য অবসর গ্রহণ করলে সে জায়গায় অন্য সদস্য মনোনীত হত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে পেপার কমিটির সদস্য ছিলেন।[৬৬]

কমিটির অন্যতম সদস্য রাধাপ্রসাদ রায় রামমোহনের পুত্র ও দেবেন্দ্রনাথের সহপাঠী। তিনিই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে একটি মুদ্রাযন্ত্র দান করেছিলেন।[৬৭]

তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধ নির্বাচনের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করা হত। প্রবন্ধ নির্বাচনী কমিটির একসঙ্গে সদস্য থাকতেন পাঁচজন। কোন পদ শূন্য হলে মনোনয়ন হত। এঁদের বলা হত গ্রন্থাধ্যক্ষ। কোন গ্রন্থাধ্যক্ষ বা অপর কোন ব্যক্তি প্রবন্ধ পাঠালে কমিটির অধিকাংশ সদস্য মনোনয়ন করলে তবেই তা ছাপা হত। এমনকি বিদ্যাসাগর কোন প্রবন্ধ দিলেও তা কমিটির অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদন নিয়েই প্রকাশ করা হত। অক্ষয়কুমার দত্তের নিজের লেখা প্রবন্ধগুলি আনন্দকৃষ্ণ বসুর কাছে দেখে নির্বাচনের জন্য পাঠানো হত। বিদ্যাসাগর আনন্দকৃষ্ণের বাড়ি যেতেন। আনন্দবাবুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর অক্ষয় দত্তের প্রবন্ধগুলি দেখে দিতেন। অক্ষয়বাবু এই ঘটনা জেনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ করতে চান। আনন্দকৃষ্ণ 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করে দেন। অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসেন

এবং বলে আসেন, বিদ্যাসাগর যেন ভবিষ্যতেও তাঁর লেখাগুলি দেখে দেন। এরপর ১৭৭০ শকের ২৩ শ্রাবণ অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে বিদ্যাসাগরকে পেপার কমিটির অন্যতম সদস্য করে নেওয়া হয়।

তত্ত্ববোধিনীর লেখাগুলি আসত অক্ষয় দত্তের কাছে। তিনি প্রথমে সেগুলি পড়ে নিজস্ব মতামত লিখে কমিটির সদস্যদের কাছে মতামতের জন্য পাঠাতেন। তারপর সব মতামত এসে গেলে সম্পাদক রচনাটি ছাপা হবে কি বাতিল করা হবে ঠিক করতেন। যেমন রাজনারায়ণ বসুর একটি রচনা সম্পর্কে কমিটির অভিমত জানা যাচ্ছে।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ অভিপ্রায়ে একটি পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা এতৎ পুস্তক সমভিব্যাহারে পাঠাইতেছি।

তত্ত্ববোধিনী সভা — শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
৭ বৈশাখ ১৭৬৯ — গ্রন্থ সম্পাদক

পত্রিকায় প্রকাশ যোগ্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিলে ভাল হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পর্কে কমিটির অভিমত—

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দেখিবেন তাহা অতি সুচারুশুদ্ধ ভাষায় পরিপাটীরূপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। এতদ্ভিন্ন আমাদিগকে পূর্বকার আচার ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্শন মহাভারতে পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাতে সন্ধ্যায় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি—

তত্ত্ববোধিনী সভা — শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
২০ পৌষ ১৭৭০ — গ্রন্থ সম্পাদক।

*গ্রন্থ সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন ইহা অবশ্য প্রকাশ কর্তব্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

অতিসুললিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয় তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

অক্ষয় দত্তের জীবনীকার লিখেছেন: তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কি দেশীয় কি বিদেশীয় কি হিন্দু কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান কি

ব্রাহ্মকৃত বিদ্যা মাত্রে প্রায় সকলেই গ্রাহক হইতে লাগিলেন। যাঁহাদিগের অবস্থা কিছু মন্দ, তাঁহারা সিকি বা অর্ধমূল্যে পত্রিকা পাইবার আশায় কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট আবেদন করিলেন।[৬৮]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ দ্বিতীয় বর্ষ তত্ত্ব-বোধিনীতে (১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক) প্রকাশিত এই মন্তব্যটি ঃ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অদ্য নূতন বৎসরে সংপ্রবেশ করিলেন। এই পত্রিকার জন্মদিবসাবধি দিন দিন এই সভার উন্নতি বোধ হইতেছে, প্রতি মাসে ইহার প্রকাশের পরে সভ্য শ্রেণীর সংখ্যা অধিক হইয়া আসিতেছে, পূর্বে এ সভার সভ্যগণের যে সংখ্যা ছিল, এই অষ্টমাস মধ্যে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। পূর্বে যাঁহারা পরমেশ্বরের উপাসনার নাম শ্রবণে বিরক্ত হইতেন এইক্ষণে তাঁহারা এই পত্রিকা পাঠ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার তাৎপর্য অবগত হইয়া তাহার প্রচার বিষয়ে সাহায্য প্রদানে আগ্রহী হইতেছেন, এবং অনেক ব্যক্তি প্রতিমার আরাধনাদি কাল্পনিক ধর্ম বিসর্জন পূর্বক বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।

এদেশে কোন বিষয়ে যাহা সাধারণ সাহায্যের প্রতি নির্ভর করে তাহা সম্পন্ন হওয়া যে কিরূপ দুষ্কর তাহা সকলেরই বিদিত আছে। এই হেতু এ পত্রিকা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবার পূর্বে কৃতকার্য না হইবার প্রতি অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য ইহার পরমায়ু এক বৎসর নির্দিষ্ট করা গিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান হইতেছে যে সে আশঙ্কার সময় অস্ত হইতেছে এবং বিদ্যালোচনার বাহুল্য দ্বারা লোকের অন্তঃকরণে প্রচুর রূপে জ্ঞানের উদ্রেক হইতেছে। অতএব ভরসা হয় যে স্বদেশীয় লোকের সাহায্য দ্বারা ইহার জীবনের পূর্ব সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক দীর্ঘায়ু প্রদানে শক্য হইবে। (১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক)।

অক্ষয়কুমারের পর তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক হন ১৮৫৯ থেকে। ১৮৫৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা উঠে গেলে পেপার কমিটি ও গ্রন্থাধ্যক্ষ সভাও রহিত হয়ে যায়।

এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও নবীনচন্দ্র সেনের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা প্রকাশিত হয়। সরকারী পত্রিকা হিসাবে এডুকেশন গেজেটের জন্ম শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু পরবর্তী কালে গেজেটের মালিকানা ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অধিকারে আসে। ভূদেবের বিখ্যাত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। হেমচন্দ্রের 'ভারত বিলাপ' কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সারা দেশে চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভূদেব জীবনীতে লিখছেন, একবার একখানি

বাংলা সংবাদপত্রে গবর্নমেন্টের কোন কাজ সম্পর্কে অযথা মন্তব্য প্রকাশিত হলে শিক্ষা বিভাগের দক্ষিণ বিভাগীয় ইনস্পেক্টর শ্রীহজসন প্র্যাটকে ভূদেব বলেছিলেন, 'গভর্নমেন্টের উচিত তাঁদের নীতি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেবার জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করা। প্র্যাট বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' ইহারই ফলে ৪ জুলাই ১৮৫৬ তারিখ থেকে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ প্রকাশিত হয়।[৬৯]

প্র্যাট চেয়েছিলেন ভূদেবই এই কাগজের সম্পাদক হন। কিন্তু গবর্নমেন্ট এই ব্যাপারে ভারতীয়দের বিশ্বাস করতে পারেননি। তাঁরা সম্পাদক নিযুক্ত করেন, লণ্ডন মিশনের ডবলিউ ওব্রায়েন স্মিথকে। তবে স্মিথ সাহেব সম্পাদক হলেও কাগজের সব কিছু দেখা শোনা করতেন সহ-সম্পাদক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি প্রতি মাসে দুশ টাকা করে সরকারী ভরতুকি পেত।

মিঃ স্মিথ ১৮৬৬ সালের জানুয়ারিতে দেশে ফিরে গেলে শ্রীকানাইলাল পাইন ও শ্রীব্রহ্মমোহন মল্লিক অল্প কিছুদিন গেজেটের সম্পাদক হয়েছিলেন। ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে প্যারীচরণ সরকার মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হন। ১৮৬৮ সালের ৩১ জুলাই প্যারীচরণ সরকার গেজেটের সম্পাদক পদ ত্যাগ করেন। প্যারীচরণের সম্পাদক পদ ত্যাগের কারণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নীতিগত বিরোধ এবং সে কারণে ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ।

৮৬৮ সালের মে মাসে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনের কাছে একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বহুলোক হতাহত হয়। রেলকর্তৃপক্ষ হতাহতের সংখ্যা অনেক চেপে যান। প্যারীচরণ তখন তাঁর পত্রিকায় ওই দুর্ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রকাশিত কতগুলি রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি তদন্তপ্রধান (investigative) রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১২৭৫ বাংলা সনের ১০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাঁর ওই রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে সরকারী মহলে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। ওই রিপোর্টে লেখা হয় দুর্ঘটনার পর নৃশংসভাবে আহতদের দেহও নিহতদের সঙ্গে এক সঙ্গে লোপাট করে পদ্মাতে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হতাহতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অপহৃত হয়।

এই রিপোর্টটি প্রকাশের জন্য প্যারীচরণের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়। প্যারীচরণ উত্তরে লিখেছিলেন: এডুকেশন গেজেট সম্পাদনার ব্যাপারে এমন কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি যে তিনি তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস মত কিছু লিখতে পারবেন না।

এই বাদানুবাদের পরিণতি হিসাবে প্যারীচরণ ৩১ জুলাই তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ৮ আগস্ট তা গৃহীত হয়।

প্যারীচরণের পদত্যাগের পর ভূদেবকে এরপর লেঃ গবর্নর গেজেটের সম্পাদকের চাকুরি নিতে বললে ভূদেব বলেছিলেন, "লেফ্টনেন্ট গভর্নর বাহাদুরের কথা অবশ্যই আমার শিরোধার্য, কিন্তু জিনিসটি আমাকে অগ্নি সংস্কার করিয়া দিবেন। বাবু প্যারীচরণ সরকার যে পাত্র উচ্ছিষ্ট করিয়া ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিলেন, তাহা

'ঠিক' সে অবস্থায় আমি কুড়াইয়া লইব না। আমাকে দিতে হইলে উহার ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করিয়া এডুকেশন গেজেটের 'সম্পূর্ণ স্বত্ব' দিতে এবং সম্পাদকের বেতন বলিয়া গবর্নমেণ্ট এক্ষণে যে মাসিক তিনশত টাকা দিতেছেন, অতঃপর তাহা গ্রাণ্ট ইন এড (সাহায্য) স্বরূপ দিতে হইবে। এইরূপে 'সংস্কার' হইলে উহা লইতে আমার আপত্তি থাকিবে না।"[৭০]

লেঃ গবর্নর ভূদেবের প্রস্তাবে সম্মত হন। এডুকেশন গেজেটের স্বত্ব ভূদেবকে দিয়ে দেওয়া হয়। মাসিক সরকারী সাহায্য ৩০০ টাকাও ভূদেবকে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৮৯৯ সালে এই সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে ২০০ করা হয়েছিল। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল এডুকেশন গেজেটের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৭১] ভূদেবের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থেকে ভূদেবের সম্পাদনায় গেজেট প্রকাশিত হতে থাকে। ভূদেব মোটামুটি কাগজের যে পলিসি বা নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তা হল এই : তাঁর কাগজ মোটামুটিভাবে সরকারকে সমর্থন করবে। অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত কোন সংবাদে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কোন ভ্রান্ত খবর বার হলে গেজেটে প্রকৃত তথ্য জানানো হবে। "কারণ তাহা হইলে রাজকর্মচারী এবং প্রজাসাধারণের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা দাঁড়ায়, বিরুদ্ধতা স্থায়ী হইতে পারে না এবং রাজকার্য পরিচালনায় হঠকারিতা ঘটার সম্ভাবনা কমিয়া যায়, লোকলজ্জার খাতিরে সাধারণ রাজকর্মচারীরাও উত্তম রূপে কার্য করিতে থাকেন।"[৭২]

সে যুগের অন্যান্য বাঙালি সম্পাদকের মতই ভূদেবের ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু এই সমর্থন সত্ত্বেও সমসাময়িক ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় ব্রিটিশ রাজপুরুষদের আচার ও ব্রিটিশ নীতির প্রতি তীব্র আক্রমণ হানা হচ্ছিল ভূদেব তা থেকে দূরে ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মধ্যপন্থী। আক্রমণাত্মক নয়, গঠনমূলক সমালোচনাই তাঁর কাম্য ছিল। ভূদেব বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশ সরকার যদি দেশবাসীকে ও দেশীয় সংবাদপত্রকে বিশ্বাস করেন তাহলে শাসক ও শাসিত উভয়ের পক্ষেই তার পরিণাম মঙ্গলজনক হবে। ভূদেব এজন্য রাজশক্তির সহযোগিতা চেয়েছিলেন।

১৮৭৩-৭৪ সালের (১২৮০ বঙ্গাব্দ) ৬ এপ্রিল (২৫ চৈত্র) ভূদেব এডুকেশন গেজেটে লিখেছেন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে বিশ্বাস করলে তারা গভর্নমেণ্টের দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠবে। জনগণের মনে গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাও দূর হবে। ওই বছরেই আর একটি প্রবন্ধে ভূদেব লিখেছেন, 'বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলির অনেক ত্রুটি আছে সত্য। ইহারা অনুকরণ প্রিয়, অতএব দুর্বল। ইহারা ইংরাজীয় অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিয়া আছে, সুতরাং অপুষ্ট এবং অনাদৃত। কিন্তু

ইহাদিগের ত্রুটি সংশোধনের উপায় গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট কর্মচারী এবং দেশীয় কর্মচারী দিগের আয়ত্তাধীন - এবং সেই উপায় ইহাদিগের প্রতি অনাদর প্রদর্শন নহে।'[৭৩]

এডুকেশন গেজেট সরকার সমর্থক পত্রিকা হওয়াতে তার পাঠক সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ১৮৬৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর গেজেট পাঠ করে জানা যায় তখনও পর্যন্ত ৮৫০ জন গ্রাহক ছিল (বার্ষিক মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। তবে তার মধ্যে ২০৮ জন মাত্র কিছু কিছু অগ্রিম মূল্য দিয়েছিলেন। বাকীদের বিনা মূল্যেই কাগজ পাঠানো হত। ভূদেব মালিকানা গ্রহণ করে যাঁরা টাকা দেননি তাঁদের কাগজ পাঠানো বন্ধ করে দেন। ছোটলাট গ্রে অবশ্য প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে এক কপি করে গেজেট কিনতে নির্দেশ দিয়ে দেন। এর ফলে কিছু গ্রাহক সংখ্যা বাড়ে।

এডুকেশন গেজেটের সরকার সমর্থনের পিছনে যুক্তি ছিল। ভূদেব লেখেন: "যে সমস্ত সংবাদপত্র নিরন্তর গভর্নমেন্টের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়, উচ্চশ্রেণীর পাঠক সমাজে তাহার কিছুমাত্র আদর নাই। এই সকল সংবাদপত্র প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতির সংস্কার না করিয়া গভর্নমেন্টর কোন কোন সৎকার্যের প্রতিও সাধারণের বিরাগ জানাইতে পারে। আপনাদের অভাব আপনাদের অসুবিধা ও আপনাদের দুরবস্থা জ্ঞাপন করাই এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দুঃবস্থা জ্ঞাপনের সময় ধীরতা বা বিবেকের সীমার বহিশ্চর হওয়া বিধেয় নহে, এবং তাহা হইতে গেলে বিবেচক পাঠক ও গভর্নমেন্ট উভয়েরই বিরাগ ভাজন হইতে হয়।"[৭৪]

ভূদেব গেজেটের প্রথম সংখ্যায় তাঁর নীতি ঘোষণা করেন। কোন মত, কোন দল, কোন পক্ষ অবলম্বন করার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। সকল মতেই সকল দলেই সকল পক্ষেই কিছু সত্য এবং কিছু মিথ্যা থাকে--কিছুতেই সত্য অথবা মিথ্যা সম্পূর্ণ অবিমিশ্রভাবে থাকে না। আমরা সত্যের দিকেই থাকিতে চেষ্টা করিব—অসত্য ভিন্ন আর কিছুরই ভয় করিব না—কারণ আশৈশব আমাদিগের এই মহাবাক্যে বিশ্বাস আছে 'সত্যমেব জয়তে।'[৭৫]

এডুকেশন গেজেটে ভূদেব সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। গেজেটে বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ-নির্ভর রিপোর্ট লেখার জন্য ভূদেব বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করেছিলেন। যেমন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্মচারী পুলিন বিহারী ভাদুড়ি লিখতেন বাণিজ্য বার্তা। উকিল দ্বারকানাথ চক্রবর্তী লিখতেন হাইকোর্টের খবর। ভূদেব নিজে লিখতেন নানান প্রবন্ধ ও ফিচার। নানান অদ্ভুত ঘটনা, প্রাকৃতিক বিবরণ, লোককীর্তি ইত্যাদির নতুন ও পুরাতন খবর, এছাড়া থাকত কবিতা।

প্যারীচরণ সরকার যখন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক তখন থেকেই এডুকেশন গেজেটে কবিতা প্রকাশের রেওয়াজ ছিল। ভূদেব সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর প্রথম কয়েকমাস কোন কবিতা প্রকাশিত হয়নি। ১২৭৫ সালের ১৭ মাঘ সংখ্যার গেজেটে হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' প্রকাশিত হল। সেই শুরু।

অক্ষয়কুমার সরকার লিখছেন : ১২৭৫ সালে এডুকেশন গেজেট মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হস্তে আসিল। তৎপূর্বে প্যারীবাবুর আমলে এডুকেশন গেজেটে পদ্য প্রকাশিত হইত। ভূদেববাবু কাগজখানি লইয়া অবধি কয়েক মাস ধরিয়া, উহাতে একটিও পদ্য প্রকাশিত করিলেন না। ১২৭৫ সালের ১৭ মাঘ, সম্পাদক বড় বড় অক্ষরে বলিলেন যে, এখন হইতে পত্রে লব্ধনামা সুলেখকগণের রচিত পদ্য প্রকাশিত হইবে। তাহাই হইল, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের পদ্য এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেইদিনই প্রকাশিত হইল হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ'। তাহার আরম্ভ "আবার গগনে কোন সুধাংশু উদয় রে।"[৭৬]

এ সম্পর্কে শ্রীসজনীকান্ত দাস লিখেছেন :[৭৭] "কবিতাবলীর সূত্রপাত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১৭ মাঘের সংখ্যায় হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' প্রকাশে। এই সময়ে নানা হাত ঘুরিয়া গবর্মেন্ট আশ্রিত এই পত্রিকাটি মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের রীতি ছিল না। ভূদেব সম্পাদক হওয়ার পরেও কয়েক সংখ্যায় কোনও কবিতা ছিল না। ভূদেবের দ্বিতীয় জামাতা উত্তরপাড়া নিবাসী হাইকোর্টের উকিল বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের কাব্যের ভক্ত ছিলেন, এই সূত্রে উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। বামাচরণের যত্নে ও উৎসাহে ভূদেব শেষ পর্যন্ত 'এডুকেশন গেজেটে' কবিতা ছাপিতে রাজী হন এবং ১৭ মাঘ, ১২৭৫ তারিখের পত্রেই ঘোষণা করা হয়—'এখন হইতে পত্রে লব্ধনামা সুলেখকগণের রচিত পদ্য প্রকাশিত হইবে।' সেই সংখ্যাতেই হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' বাহির হয়। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে (১৮৭০) কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ পর্যন্ত এডুকেশন গেজেটে উহার সর্বসমেত চৌদ্দটি কবিতার মধ্যে মোট তেরটি এই তারিখে বাহির হয়।"

১৮৮৮ সালের মধ্যে এডুকেশন গেজেটে হেমচন্দ্রের এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়।

১। হতাশের আক্ষেপ	...	১২৭৫	মাঘ
২। জীবন সঙ্গীত	...	১২৭৫	২ ফাল্গুন
৩। বিধবা (বিধবা রমণী)	...	১২৭৫	১৬ ফাল্গুন
৪। যমুনা তটে	...	১২৭৫	২৮ চৈত্র
৫। কোন একটি পাখীর প্রতি	...	১২৭৬	২৬ বৈশাখ
৬। লজ্জাবতী (লজ্জাবতীলতা)	...	১২৭৬	১৬ শ্রাবণ
৭। মদন পারিজাত	...	১২৭৬	২৭ চৈত্র
		১২৭৭	৩ বৈশাখ
৮। ভারত বিলাপ	...	১২৭৭	২৮ বৈশাখ
৯। জীবন মরীচিকা	...	১২৭৭	৩০ বৈশাখ
১০। প্রিয়তমার প্রতি	...	১২৭৭	১৫ আষাঢ়
১১। ভারত সঙ্গীত	...	১২৭৭	৭ শ্রাবণ

১২।	গঙ্গার উৎপত্তি	...	১২৭৭	৫ কার্তিক
১৩।	ভারতপক্ষীর প্রতি (চাতক পক্ষীর প্রতি)	...	১২৭৭	২৯ কার্তিক
১৪।	গন্ধের মৃণাল	...	১২৭৭	৬ ফাল্গুন
১৫।	প্রলয়	...	১২৭৮	১০ আষাঢ়
১৬।	উন্মাদিনী	...	১২৭৮	১০ শ্রাবণ
১৭।	অশোকতরু	...	১২৭৮	১০ ভাদ্র
১৮।	কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ	...	১২৭৮	১৪ ভাদ্র
১৯।	ভারত কামিনী	...	১২৭৮	৩১ ভাদ্র
২০।	কালচক্র	...	১২৭৮	২৬ ফাল্গুন

উপরিউক্ত তালিকা থেকে দেখা যাবে যে হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৪ বঙ্গাব্দের (১৮৭০) ৭ শ্রাবণ। কিন্তু কবিতাটি ওই বছরের প্রথমেই প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়েছিল। ভূদেব ওই কবিতায় রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়ে তা ছাপতে সাহস করেননি। তখন হেমচন্দ্র 'ভারত বিলাপ' লিখলেন। তাতে আক্ষেপ করে লিখলেন যে তিনি ভয়ে ভয়ে লিখছেন। ভূদেব এই কবিতা পড়ে বোধ হয় নিজের আচরণে লজ্জিত হয়েছিলেন। তখন ২৮ জ্যৈষ্ঠ 'ভারত বিলাপ' তারপর ৭ শ্রাবণ সংখ্যায় 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটি ছাপা হয়। এরপর যে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা অক্ষয়কুমার সরকারের রচনা পড়ে জানা যায়।

"প্রসিদ্ধ ভারত সঙ্গীত' বোধ করি ৭৭ সালের প্রথমেই প্রেরিত হইয়া থাকিবে। এরূপ পদ্য প্রকাশিত করিতে ভূদেববাবু হেমচন্দ্রকে নিরস্ত করেন। কবি, কোন উত্তর না দিয়া 'ভারত বিলাপ' লিখিলেন। তাহাতে আক্ষেপ করিলেন :

ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার;

কবির আক্ষেপে সম্পাদকও আক্ষিপ্ত হয়ে "ভারত সঙ্গীত" প্রকাশিত করিলেন। তখন ভারত সঙ্গীতের শীর্ষস্থানে, 'ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের' ইত্যাদি কৈফিয়ৎ ছিল না। কবিতার মধ্যেই শিবাজীর নাম ছিল—এখন নাই।

"শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলি
শিবাজি, নয়নে হানিয়ে বিজলি।"

এইরূপ ছিল, এই পদ্য প্রকাশিত হওয়ার পর মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে সকল কথা পরে বলিতেছি। সরকার বাহাদুর বিশেষ করিয়া এই পদ্যটির অনুবাদ করাইলেন। অনুবাদক রবিনসন যখন শব্দের অনুবাদে লিখিলেন ফরেনার আর শিবাজীর স্থানে লিখিলেন শিউজি ছোটলাট বাহাদুর স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ভূদেববাবুর কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, -কেন এমন পদ্য এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়? ভূদেববাবু বলিলেন, প্রকাশিত না করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া

যায় না। কবিতাতে ঐতিহাসিক ভারতবাসীর এক সময়ের মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার উপর কবিতাটি বড় সুন্দর, এমন কবিতা প্রেরিত স্তম্ভে স্থান দেওয়া যে মন্দ, তাহা কিরূপে বুঝিব? শিবাজী নাম কবিতাতে স্পষ্ট আছে, অনুবাদক ফরেনার করিয়া আরও গোল বাড়াইয়াছেন। এই কৈফিয়তে গবর্নমেণ্ট সন্তুষ্ট হইলেন,—তবে অনুবাদক বেচারাকে ত্রুটি স্বীকার করিতে হইল।"

হেমচন্দ্র ছাড়াও নবীনচন্দ্র সেন এডুকেশন গেজেটে কবিতা লিখতেন। 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কিছু কবিতা এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র, রাঙ্গকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখেরাও বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন।

এডুকেশন গেজেটের একটি উল্লেখযোগ্য কলম ছিল সাহিত্য সমালোচনা। তৎকালীন প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই গেজেটে সমালোচিত হয়েছে। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত সমালোচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম—অভেদী: টেকচাঁদ ঠাকুর (১৬।৬।১৮৭১)। জামাইবারিক: দীনবন্ধু মিত্র (২৬।৪।১৮৭২)। বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব: রামগতি ন্যায়রত্ন (২২ ভাদ্র ১২৭৯ ও ভাদ্র ১২৮০)। সেকাল আর একাল: রাজনারায়ণ বসু (১৮।১২।১৮৭৪)। বৃত্র সংহার: হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২।২।১৮৭৫), উদভ্রান্ত প্রেম (১৪।১।১৮৭৬)। কবি কাহিনী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৫।১১।১৮৭৭)। অবকাশ রঞ্জিনী: নবীনচন্দ্র সেন (২৭।৯।১৮৭৮)। এই সাহিত্য সমালোচনাগুলি নিঃসন্দেহে বাঙ্গালী পাঠককে সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করে তুলেছিল।

এডুকেশন গেজেটের নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল—

১। সম্পাদকীয়
২। সম্পাদকের লেখা প্রবন্ধ
৩। সাপ্তাহিক সংবাদ
৪। রাজকার্যে নিয়োগ
৫। পত্র প্রেরকের প্রতি সম্পাদকের মন্তব্য
৬। পাঠকদের পত্র
৭। কবিতা
৮। বিবিধ
৯। বিভিন্ন বিজ্ঞাপন
১০। শিক্ষা সংক্রান্ত।

মাঝে মাঝে প্রকাশিত হত বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, জীবনী, নানা বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিধি, ঐতিহাসিক আলোচনা।[৭৮]

এডুকেশন গেজেটের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মডারেট, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কনজারভেটিভ। এডুকেশন গেজেট ৭ জুন ১৮৭২ তারিখে 'বাঙ্গলা সম্বাদপত্র রাজ্যের ইষ্ট কি অনিষ্ট করিতেছে' এই শিরোনামে লিখছেন: "রাজনীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের

বিচারে আমাদের অধিকার আছে কিন্তু এই অধিকার শিষ্টাচার সম্মত প্রণালীতে রক্ষা করিতে হয়। রাজকার্য বিষয়ের বিচারকালে রাজপুরুষগণের অভিপ্রায় লইয়া বিতণ্ডা করিলে কোন ফললাভ নাই।"

উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি ছিল মুখ্যত মতামতধর্মী—নিউজ বা সংবাদ অপেক্ষা ভিউজ বা মতামতেরই ছিল সেখানে প্রাধান্য। এই মতামত প্রকাশের ব্যাপারে অবজেকটিভিটি বা নিরপেক্ষতাকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া হত না। মতামত ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাবজেকটিভ বা সম্পাদকীয় লেখকের আপন মতাদর্শের ওপর নির্ভরশীল।

এই ধারার মধ্যে দুজন সাংবাদিক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। একজন ভূদেব মুখোপাধ্যায় অপরজন সুলভ সমাচার সম্পাদক কেশব সেন। সম্পাদকীয় বা সাংবাদিক প্রবন্ধের মধ্যে আবেগধর্মীতার বদলে এরা যুক্তি নির্ভরতা, বিশ্লেষণ ধর্ম ও বস্তু নিষ্ঠার প্রবর্তন করেন। উগ্র জাতীয়তাবাদকে এঁরা কখনই সমর্থন করেননি। ইংরাজদের প্রতি এঁরা কেন শ্রদ্ধাশীল তাও তাঁরা যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন।

অবশ্য কেশব সেন ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় দুজনেই মানসিক দিক থেকে দুই প্রান্তের অধিবাসী। একজন উদারপন্থী ব্রাহ্মণ অন্যজন রক্ষণশীল হিন্দু। এডুকেশন গেজেট মূলতঃ রক্ষণশীল পত্রিকা। কিন্তু এই রক্ষণশীলতা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত, আবেগ তাড়িত নয়। যেমন এডুকেশন গেজেট রাজ্যভাতা বিলোপ সমর্থন করেননি, কেননা গেজেট মনে করতেন 'আমাদের দেশে উচ্চপদস্থ লোক যত থাকিবে, সামাজিক উন্নতির পথে ততই ভাল হইবে। উচ্চপদস্থ লোক যত না থাকিবে ভারতবর্ষান্বেষী সাহেবদের পক্ষে ততই মঙ্গল হইবে।' (৮ নভেম্বর ১৮৭২, ৪র্থ খণ্ড)

আবার এদেশে রাজকীয় পদে ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি সমর্থন করলেও প্রধান পদগুলিতে ইংরাজ কর্মচারীদের নিয়োগই গেজেট যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। কারণ দেশীয় রাজকর্মচারীদের শিষ্টাচার, কোমলতা ও অমায়িকতা প্রভৃতি গুণ নেই। ইংলণ্ডের রাজপুরুষ সামঞ্জস্য করতে পারেন। এদেশীয় রাজপুরুষেরা তা পারেন না। আবার অন্যদিকে এডুকেশন গেজেট গত শতাব্দীতে যে সব চিন্তা করে গেছেন বর্তমানের রাষ্ট্র চিন্তা ও সমাজ ভাবনার মধ্যে সেইসব চিন্তাই প্রতিফলিত হয়েছে। এই দূরদর্শিতা বাংলা সাংবাদিকতার পক্ষে পরম সম্পদ। যেমন ভাগীরথী নদীর বহমানতা রক্ষার জন্য এডুকেশন গেজেটই প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন (১৫ নভেম্বর ১৮৭২)। এই ভাবনারই পরিণতি আজকের ফারাক্কা ব্যারেজ। প্রতিটি রাজ্যে মাতৃভাষাই যে রাজ্যে শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত একথাও গেজেট সে যুগে বলেছিলেন (১৫ নবেম্বর ১৮৭২)। বলেছিলেন, ইংরাজীর ওপর অত্যধিক জোর দেবার দরকার নেই। 'যে পরিমাণে ইংরাজিতে অধিকার জন্মিলে রাজপুরুষদিগের নিকটে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করা যায় বা অন্য শাস্ত্র অধ্যয়নের ক্ষমতা জন্মে, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট' (৭ ডিসেম্বর ১৮৭৭)। ডিগনিটি অব লেবর বা শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে আজকাল

যেসব কথাবার্তা শোনা যায় গেজেট তার জন্য বহুকাল আগে থেকেই আন্দোলন করেন। ১০ মে ১৮৭২ সালে ভদ্র সন্তানের ছুতার মিস্ত্রীর কাজ শেখায় 'আনন্দ' প্রবন্ধে গেজেট আনন্দ প্রকাশ করেন। ভদ্রলোকের শিল্পকার্য শেখার পক্ষে গেজেট ওই সংখ্যায় তাঁদের বক্তব্য রাখেন। গেজেট কারিগরি ও যুক্তিমূলক শিক্ষার সমর্থক ছিলেন (১৯ জুলাই ১৮৭২, শিক্ষা বিধানের নূতন ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য)।

সৎ সাংবাদিকতার অর্থ নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা। কিন্তু যেহেতু সাংবাদিক সামাজিক জীব সামাজিক আলোড়ন তাঁকেও মথিত করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পাদককেও কোন না কোন সম্প্রদায়কে সমর্থন করতে হয়। এছাড়াও আছে গ্রাহক ও পাঠকদের দাবি। তাঁদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করলে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে এডুকেশন গেজেটের বক্তব্য: আপন সম্প্রদায়কে সমর্থন করেও সম্পাদক যেন কর্তব্যচ্যুত না হন।

"পত্রিকা সম্পাদকের পক্ষে বস্ত্র পরিধান করা যেমন অবশ্যকর্তব্য, কর্তব্যপরায়ণ হওয়াও তেমনি অবশ্যকর্তব্য। অথচ গ্রাহকগণের মনের কথা বলাও কর্তব্য। যে ভাগ্যবান ব্যক্তির আপাত বিরুদ্ধ এই দুটি কার্যকে মিলাইয়া করিবার স্বাভাবিক শক্তি আছে, তিনিই পত্রিকা সম্পাদকের যথার্থ যোগ্য।

"পত্রিকা সম্পাদক জজের ন্যায় হইতে পারেন না, জজেরা নির্মল উদাসীন থাকেন, নিরবিচ্ছিন্ন উকীলও হইতে পারেন না, উকীলেরা কেবল যুক্তি মার্গানুগামী হয়েন। পত্রিকা সম্পাদককে স্বদলস্থ ব্যক্তিদের হৃদয়ের যুক্তি অভিপ্রায় কামনা প্রভৃতি অনেক অবস্থাই দেখাইতে হয়, আপনার হৃদয়কে স্বকীয় সম্প্রদায়স্থ সকল হৃদয়েরই দর্পণ স্বরূপ করিতে হয়। এইটি প্রকৃতির বলে করিতে পারিলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়, যত্নের দ্বারা করিলে আংশিকরূপে হয়, কিছুতেই করিতে না পারিলে সম্পাদকতা কার্য পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।" (২৬ ডিসেম্বর ১৮৭৩)

সোমপ্রকাশ

সোমপ্রকাশের প্রকাশ কাল ১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর। তার তিন মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে দুজন দিকপাল বাঙালি সাংবাদিকের—ঈশ্বর গুপ্ত আর গৌরীশঙ্কর। অক্ষয় দত্ত তত্ত্ববোধিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন ওই বছরের আগস্ট মাসে, সমাচার চন্দ্রিকা, ভাস্কর ও তত্ত্ববোধিনী তখন চলছে কিন্তু তাদের সে পূর্ব গৌরব নেই। বাঙালির জাতীয় জাগরণের আর এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এক সজীব ঋজু বলিষ্ঠ সাংবাদিক লেখনীর ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। সোমপ্রকাশের আবির্ভাব সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকেই মিটিয়েছে। বাংলা সংবাদপত্রের জগতে এ শূন্যতাকে পূর্ণ করেছেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তাঁকে সহায়তা করেছেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।[৭৯]

এই পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ পত্রিকাটির মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়। ঈশ্বর গুপ্ত গৌরীশঙ্করের মত দ্বারকানাথও ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত

ছিলেন না। তাঁরও শিক্ষার পটভূমি ছিল সংস্কৃত। ১৮৪৪ সালের জানুয়ারিতে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি 'বিদ্যাভূষণ' পদবী লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি অধ্যাপনাও করেছিলেন। ১৮৫৬ সালে যখন তিনি সোমপ্রকাশ প্রকাশ করেন তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে শোভনতা ও শালীনতার প্রতি তাঁর সহজাত নিষ্ঠা ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত ও গৌরীশঙ্করের মত লেখনীকে তিনি অসংযত করতে পারেননি। তাঁর সমালোচনা, তীব্র তীক্ষ্ণ ছিল এবং সমসাময়িক সাংবাদিকতার ধারা হিসাবে তীব্র বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করতেও তিনি ইতস্ততঃ করেননি। প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীকে তিনি 'শবপোড়া মড়াদাহের দল' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁর ভাষা শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি।

সাংবাদিকতা দ্বারকানাথের রক্তের মধ্যেই ছিল। দ্বারকানাথের বাবা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভাকর সম্পাদনায় ঈশ্বর গুপ্তকে সাহায্য করতেন। হরচন্দ্রই দ্বারকানাথের সাহায্যে ১৮৫৬ সালে কলকাতায় তাঁদের বাড়িতে একটি ছাপাখানা করেছিলেন। এই ছাপাখানা থেকে (১ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, চাঁপাতলা) ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর সোমবার সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হয়।[৮০]

ইষ্টবেঙ্গল রেলের দক্ষিণ শাখা খোলা হলে দ্বারকানাথ সোমপ্রকাশের অফিস ও ছাপাখানা দেশের বাড়ি চাংড়িপোতায় নিয়ে যান।[৮১]

সোপ্রকাশ প্রকাশের ব্যাপারে দীর্ঘকালের পরিকল্পনা ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন, সোমপ্রকাশ স্থাপনের প্রস্তাব বিদ্যাসাগরই দ্বারকানাথকে দেন। সারদাপ্রসাদ নামে একজন বধির পণ্ডিতের ভরণ-পোষণ যোগাড় করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য ছিল। আরও কয়েকজন এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলেছিলেন। কিন্তু কাগজ বার হলে আর কাউকে পাওয়া গেল না। এমনকি সারদাপ্রসাদও এলেন না। দ্বারকানাথের ওপর সব দায়িত্ব গিয়ে বর্তাল।[৮২]

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, দ্বারকানাথই ছাপার খরচ বহন করেন, তবে বিদ্যাসাগর যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার প্রমাণ শিবনাথ শাস্ত্রীর আর একটি লেখায় পাওয়া যায়।

"ইহার কিছুদিন পরেই আমার পিতা কলিকাতা বাঙ্গালা পাঠশালার কর্ম হইতে বদলী হইয়া আমাদের গ্রামের হার্ডিঞ্জ মডেল বাঙ্গলা স্কুলের হেড পণ্ডিতের কর্ম পাইয়া গ্রামের বাড়ি চলিয়া যান। তখন আমাকে সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের লেনে আমার মাতুল মহাশয়ের বাড়ি রাখিয়া যান। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বদাই আসিতেন এবং আমার মাতুলের সহিত কি পরামর্শ করিতেন। পরে শুনিলাম সোমপ্রকাশ নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইবে তাহার পরামর্শ চলিতেছে।"[৮৩]

১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে দ্বারকানাথ তাঁর স্বগ্রাম চাংড়িপোতাতে সোমপ্রকাশ প্রেস উঠিয়ে নিয়ে যান। ১৮৬৫ সালের ২ জানুয়ারি দ্বারকানাথ সোমপ্রকাশের

সম্পাদনা ভার কিছুদিনের জন্য মোহনলাল বিদ্যাবাগীশের হাতে ন্যস্ত করেন। সে সময় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সোমপ্রকাশের মূল্য ছিল মাসিক এক টাকা। বার্ষিক ১০ টাকা। পত্রিকার ওপরে দেবনাগরীতে লেখা থাকত: প্রবর্তাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

সোমপ্রকাশ রায়তদের নবলব্ধ চেতনাকে জাগ্রত করেছেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোমপ্রকাশ তীব্র সংগ্রাম করেছেন। নীলকরদের অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছেন। দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি ব্রিটিশ করনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। শিল্পোদ্যোগের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

সোমপ্রকাশের সামাজিক মতাদর্শ ছিল উদারনৈতিক। হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক উদারনৈতিক মানবতাবাদী জীবনদর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হয়েও যে কারণে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনদিন ব্রাহ্ম হন নি। আবার হিন্দু পৌত্তলিকতার প্রতিও তাঁর আত্যন্তিক নিষ্ঠার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মতাদর্শে অনুপ্রাণিত সোমপ্রকাশ ব্রাহ্ম ও হিন্দুকে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে স্বীকার করেন নি। ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের প্রসারতারও তাঁরা সমর্থক ছিলেন। আবার পূজা উপলক্ষে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সোমপ্রকাশ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

সহযোগী বাংলা পত্রিকার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সোমপ্রকাশ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ইংরাজী শিক্ষার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে রূঢ় মন্তব্য করেছেন। বিজ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সোমপ্রকাশের অবদান সবচেয়ে বেশী করে স্মরণীয়।

আরও একটি কারণে সোমপ্রকাশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হল পত্রিকাটি ভার্নাকুলার প্রেস আইনের শিকার হয়ে পড়ে। পত্রিকা প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এক বছর বন্ধ থাকার পর পত্রিকাটি আবার মুচলেকা দিয়ে প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশ সম্পাদকের পক্ষে এই মুচলেকা প্রদানের ঘটনাটুকু গৌরবজনক নয়। এ সম্পর্কে কোথাও কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জাতীয় মহাফেজখানার দলিল ঘেঁটে আমি যে তথ্যটুকু উদ্ধার করেছি সেটুকু হল এই: ১৮৭৮-৮০ দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ চলে। সে সময় ভার্নাকুলার প্রেস আইন চালু হয়ে গেছে। আইন অনুসারে দেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন মন্তব্য সরকারের অসন্তুষ্টি বিধান করলে জেলা শাসক ও পুলিশ কমিশনার সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মুদ্রককে ডেকে মুচলেকা লিখিয়ে নিতে পারেন।

১৮৭৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সোমপ্রকাশের কাবুল সংবাদদাতা লেখেন যে, কাবুলে শীঘ্রই ব্রিটিশ সৈন্য যাবে এবং ইয়াকুব খান যদি ব্রিটিশের বশ্যতা স্বীকার না করেন তাহলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কাবুলের সিংহাসনে অন্য ব্যক্তিকে বসাবেন। এই কথা লিখে সংবাদদাতা যে মন্তব্য করেছিলেন সেই মন্তব্যটি পড়ে লর্ড লিটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

হন। সরকারী অনুবাদক ওই মন্তব্যের ইংরাজী অনুবাদ যা করেছিলেন তা হল এই :

"Perhaps Cabul too, after so long will become a slave kingdom like Gwalior, Jeypur, Baroda and others. The English are not satisfied with making us only slaves of slaves (but), they have intended to reduce all the Kings of Asia to slavery by and by. Too much greed killed the weaver. The after results of it are often steeped in poison."[৮৪]

১৮৭৯ সালের ১০ মার্চ ভারত সরকারের সচিব সোমপ্রকাশের ওই ডেসপ্যাচের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন যে গত ছ মাস ধরে সোমপ্রকাশে এমন সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, 'which transgressed the very widest limits of legitimate criticism.'

সুতরাং ১৮৭৮ সালের নবম আইন অনুসারে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।[৮৫] তদনুসারে বাংলা সরকার ১৮৭৯ সালের ১০ মার্চের ৩৪৫ নং সরকারী আদেশ অনুসারে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন সোমপ্রকাশের কাছে হাজার টাকার জামিন ও মুচলেকা চাইতে। দ্বারকানাথ মুচলেকা দেন কিন্তু জামিন দিতে না পারায় কাগজ বন্ধ করে দেন। পরে দ্বারকানাথ গবর্নরের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—

'that he will keep the conduct of the paper entirely in his own hand. That his paper not again be made medium for the publication of disloyal sentiments.'

দ্বারকানাথ একটি দরখাস্তও দিয়েছিলেন। দরখাস্তটি এখনও জাতীয় মহাফেজ খানায় রয়েছে। তাতে তিনি বলেন, তিনি তাঁর কাগজ—

'in strict accordance of loyality, moderation and just, honest and independent criticism' অনুসারে চালাবেন। এই দরখাস্তখানি বাংলা সরকারের সচিব সিমলায় ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলে সোমপ্রকাশ চালাবার জন্য আবার অনুমতি আসে। ১ এপ্রিল ১৮৮০ সাল থেকে সোমপ্রকাশ অবার নব পর্যায়ে কলকাতা মির্জাপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[৮৬]

ভার্নাকুলার প্রেস আইন বাতিল করার জন্য ১৮৮১ সালের ৭ ডিসেম্বর বড়লাটের কাউনসিলে বিল ওঠে। লর্ড রিপন তখন বড়লাট। লর্ড রিপন আইনটি তুলে দেবার সময় বলেছিলেন যে এটা তাঁর পক্ষে খুবই সন্তোষের কথা যে তাঁর সময়ই আইনটি স্ট্যাটু বই থেকে তুলে দেওয়া হল।[৮৭]

দ্বারকানাথ স্বাস্থ্যহানির জন্য ১৮৭৩ সালের ১ জুলাই মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৮৬ সালের ২৩ আগস্ট জব্বলপুরের

সাতনায় দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। কিছুকাল আগে তিনি সেখানে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়েছিলেন। নবপর্যায়ের সোমপ্রকাশ দ্বারকানাথ বেশী দিন সম্পাদনা করে যেতে পারেননি। তাঁর পুত্র উপেন্দ্রকুমারই পত্রিকাটি দেখা শোনা করতেন। দ্বারকানাথ বাইরে থেকে সম্পাদকীয় পাঠাতেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর একমাস পরে ১২৯৩ সালের ১২ আশ্বিন উপেন্দ্রকুমার পত্রিকাটির স্বত্ব একটি ট্রাসটির হাতে সমর্পণ করেছিলেন। ট্রাসটি বোরডে ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রায় কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র দত্ত।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পরও সোমপ্রকাশ তার পূর্বেকার পলিসি থেকে বিচ্যুত হয়নি। ইলবার্ট বিলের সময় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ মূহূর্তে সোমপ্রকাশে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারারই প্রতিফলন ঘটে। যেমন ইলবার্ট বিল সম্পর্কে সোমপ্রকাশ বলে এই বিলটি পাশ হওয়ায় ভারতবাসীর সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়েছে (১৫ মাঘ ১২৯০)। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে যে সেকুলার চিন্তাধারার প্রবর্তন হয় সোমপ্রকাশ তাকে স্বাগত জানান এবং কংগ্রেসকে 'নতুন শক্তির আবির্ভাব' বলে অভিহিত করেন। (২৭ পৌষ ১২৮৩)।

অমৃতবাজার

বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সাপ্তাহিক পত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হয়নি। পত্রিকা প্রকাশের পিছনে ছিল সম্পূর্ণ পারিবারিক প্রয়াস। শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ বসন্তকুমার সাহিত্য বিজ্ঞান ও কৃষি সম্পর্কে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শিশিরকুমার মাত্র তিন শত টাকা সঙ্গে নিয়ে যশোহর জেলার অখ্যাত জনপদ মাগুরা থেকে কলকাতা আসেন ও একটি কাঠের প্রেস সংগ্রহ করেন। শুধু তাই নয়, গ্রামে প্রেসম্যান ও কমপোজিটার পাওয়া যাবে না বলে শিশিরকুমার নিজে প্রেসের যাবতীয় কাজ শিক্ষা করেছিলেন। তারপর প্রেসটি গ্রামে আনা হলে বসন্তকুমার সর্বপ্রথম 'অমৃত প্রবাহিনী' বলে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাখানি বেশী দিন চলেনি এবং বসন্তকুমারেরও অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। এর পর শিশিরকুমারের মধ্যে সংবাদপত্র প্রকাশের তীব্র ইচ্ছা জাগে। সাংবাদিকতায় তাঁর অনুরাগ ছিল, অভিজ্ঞতাও ছিল। এর অগে তিনি হিন্দুপ্যাট্রিয়ট পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে কতকগুলি চিঠি লিখেছিলেন।[৮৮] এ সময় শিশিরকুমার ও তাঁর মেজদা হেমন্তকুমার ইনকাম ট্যাকসের ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি করতেন। তাঁরা উভয়েই ঠিক করলেন পুরোপুরি সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করবেন। সরকারী চাকরি ছেড়ে সাংবাদিকের অনিশ্চিত জীবন বরণ করে নেওয়ার দৃষ্টান্ত সে যুগে বিরল, তা ছাড়া শিশিরকুমারের এই প্রয়াসের পিছনে বড় রকমের অর্থানুকূল্যও ছিল না।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকার

প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক মূল্য ছিল পাঁচ টাকা, তিন টাকা ডাকমাশুল। প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল।

"আপনার পরিচয় আপনি দেওয়া বিষম বিপদ, এই জন্য বোধ হয় পূর্বকালে ভদ্রলোকের পরিচয় ভাটেরা দিত। সংবাদপত্র সম্পাদকদের নিকট এটি ক্ষেত্রতত্ত্বের পঞ্চম প্রতিভা। এই দায় হইতে একবার কোন প্রকারে উদ্ধার হইতে পারিলে আর অধিক চিন্তার বিষয় থাকে না। এক প্রকার করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া দিতে পরিলেই হয়।

"অনেকে গ্রন্থ লিখিয়া ভূমিকায় ব্যক্ত করেন যে তাঁহাদের গ্রন্থ লিখিবার কারণ বন্ধুগণের, কি স্বপ্নের আদেশ। কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে অত্র পত্রিকা প্রকাশ বিষয়ে স্বপ্নও দেখি নাই, বন্ধু কর্তৃক আদিষ্টও হই নাই।…আমাদের পত্রিকায় কারুর কুৎসা ও নিন্দা যে থাকিবে না এরূপ বলিতে পারি না, ও এক্ষণে বলিলেও পরে কথা রক্ষা করিতে পারিব না, কারণ তাহা হইলে ভূমণ্ডলের সমুদয় সম্পাদক একত্রিত হইয়া আমাদিগকে সমাজচ্যুত ও একঘরিয়া করিবেন। বিশেষতঃ গালি ও নিন্দা সংবাদপত্রের জীবন, শুদ্ধ সংবাদপত্র কেন, গালি ও নিন্দা চর্চা রহিত করিলে মনুষের মধ্যে পরস্পরের কথোপকথনও রহিত হইবার সম্ভাবনা। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নয় যে অপরের নিন্দাচর্চা করিব না তবে পত্রিকা বাহির করার প্রয়োজন কি!"

খুব লঘুস্বরে লিখলেও শিশিরকুমার সত্য কথাই অকপটে লিখেছিলেন। অমৃত-বাজার পত্রিকা ক্রমশ জাগ্রত স্বাধিকার চেতনার বাণী বহন করতে থাকে। নীল-বিদ্রোহের সমর্থনে অমৃতবাজার কলম ধরেছিল কিন্তু সেটি বড় কথা নয়—ঐতিহাসিক বিচারে যেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল অমৃতবাজার ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আরও খোলাখুলি ভাবে কথা বলেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তর দশকে এসে বাঙালির সামাজিক আন্দোলন ক্রমশ জাতীয় চেতনার মধ্যে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই জাতীয় চেতনার অর্থ ছিল জাতীয় সংহতি—বড় জোর স্বাদেশিকতা। কিন্তু ইংরাজ শাসনের অবসান যে হতে পারে একথা কেউই কল্পনা করেননি। বরং উনিশ শতকের শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি ইংরেজ সাম্রাজ্যকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিল। আশীর্বাদ করে-ছিল এই কারণে যে ইংরাজ শাসন দীর্ঘদিনের মুসলমান শাসনের ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে সারা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এছাড়া ইংরাজ শাসনে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে নগরজীবনের উন্নয়ন ও শিক্ষার ব্যাপ্তির ফলে নবযুগের বাঙালি বরং উপকৃতই হয়েছিলেন। কোথাও কোথাও ইংরাজের অত্যাচার ও অবিচারের প্রতি স্বাধিকার চেতনাসম্পন্ন বাঙালি সোচ্চার হয়ে উঠলেও ইংরাজ রাজত্বের অবসানের কথা কেউ কল্পনায় আনেননি। এই প্রসঙ্গে সত্তর দশকেরই একটি বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদক (একজন সমাজসংস্কারক ও প্রগতিশীল বাঙালি) যা লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করছি।

"ইংরাজেরা কেবল রাজা নহেন, আমাদের উদ্ধারকর্তা বলিলেও হয়। আমরা আর্যজাতি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক উন্নতি করিয়াছেন ইহা বলিয়া আস্ফালন করা কাপুরুষতা মাত্র। মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের কি দুর্দশা হইয়াছিল সেই দুর্দশা হইতে কে উদ্ধার করিল এখন যে একটু লেখাপড়া শিখিয়া আপনাদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছি। সেই লেখাপড়াই বা কে শিখালে, এ সকল কথা স্মরণ করিলে কোন মূর্খ ইংরাজকে ঘৃণা করিতে পারে, এবং ইংরাজদের দূর করিয়া আপনারা রাজা হইতে চায়? যে সকল নীচাশয় ইংরাজ বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে তাহারা ইংরাজ জাতির আদর্শ নহে, এজন্য তাহাদের কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া সমুদয় ইংরাজ জাতিকে ঘৃণা করা নিতান্ত অন্যায়। যাঁহারা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া ক্ষেপিয়াছেন, ইংরাজদিগের প্রতি ঘৃণাই তাঁহাদের ক্ষেপিবার কারণ।

যাহারা কেবল ইংরাজের নিন্দা করিয়া বড়লোক হইতে চায়, দেশহিতৈষী হইতে চায় তাহাদের অপেক্ষা মহামূর্খ জগতে নাই।"[৮৯]

এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অমৃতবাজার ইংরাজদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করে গেছেন। "এই জন্য স্বদেশ প্রেমিক সাধু রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় ব্যক্তিগণও অমৃতবাজার পত্রিকাকে রাজদ্রোহের প্রচারক বলিয়া মনে করিতেন।"[৯০]

শিশিরকুমারের সঙ্গে যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ মনরো ও তাঁর সহকারী মিঃ ওকলিনীর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু তৎসত্বেও এই ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা প্রসাদ লাভের জন্য শিশিরকুমার কখনও সাংবাদিক-সততা বিসর্জন দেননি। একজন ইংরাজ সাবডিভিশন্যাল অফিসার এক বাঙালি স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি করেছিল। সেই ঘটনা অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ করা নিয়ে সরকার একটি মানহানির মামলা রুজু করেছিলেন। এবং এই মামলা নিয়ে মনরো ও ওকলিনীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বেও চিড় ধরেছিল। শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ খালাস পেয়েছিলেন বটে কিন্তু প্রিন্টার রাজকৃষ্ণ মিত্র এই মামলায় দেড় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

ম্যালেরিয়ার তাড়নায় মাগুরার ঘোষ পরিবার ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরে কলকাতায় চলে আসেন। ১৮৬৮ থেকে ১৮৭১ এই তিন বছর গ্রাম থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা চলেছিল। কিন্তু পত্রিকা চালনায় এত ঋণ হয়ে গিয়েছিল যে যাবতীয় সরঞ্জাম সমেত ছাপাখানাটি গ্রামের একজনকে বিক্রি করে দিয়ে আসতে হয়। কলকাতায় আসার খরচ চালানোর টাকা ওই পরিবারের হাতে ছিল না। শিশিরকুমার চড়া সুদে মহাজনের কাছে একশ টাকা ধার করেছিলেন। মতিলাল খুলনায় শিক্ষকতা করে দু'শ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি ঐ দু'শ টাকা শিশিরকুমারকে দেন। মোট তিনশ টাকা সম্বল করে মাগুরার ঘোষ পরিবার ১৮৭১ সালে কলকাতায় ৫২ হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায় লেনে এক বাসা বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। সঙ্গে করে এনেছিলেন সংগ্রামী সাংবাদিকতার এক অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য।

অমৃতবাজার পত্রিকা যখন যশোহর থেকে বার হত তখন তার প্রচার সংখ্যা চার

মাসের মধ্যে পাঁচশ ছাড়িয়ে যায় এবং ক্রমশ তার চাহিদা বাড়তে থাকে।[৭১] কিন্তু যশোহরের গ্রামে বসে পুরনো কাঠের প্রেস এ টাইপ ও হাতে তৈরি কাগজে প্রচার সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব ছিল না। তবু পত্রিকাখানির বহু গ্রাহক হয়েছিল। শিশিরকুমার কলকাতায় আসার সময় ঘোষণা করেছিলেন, অমৃতবাজার পত্রিকা কিছুদিন বন্ধ থাকবে তবে পত্রিকার গ্রাহকরা যদি নিয়মিত চাঁদা দিয়ে যান ও পত্রিকার জীবনরক্ষায় সহায়তা করেন তাহলে মালিকেরা কৃতজ্ঞ থাকবেন। গ্রাহকরা এর ফলে চাঁদা পাঠানো বন্ধ করেননি। কিন্তু তাতে নতুন করে পত্রিকার মূলধন সংগ্রহে খুব বেশী সাহায্য হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ শিশিরকুমারের জীবনীকার লিখেছেন, কলকাতায় এসে শিশিরকুমার নতুন প্রেস কেনার জন্য ছ'শ টাকাও যোগাড় করতে পারেননি।[৭২] শেষে ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁকে আটশত টাকা দিয়েছিলেন। এই টাকা থেকেই প্রেস কেনা হয়েছিল এবং ১৮৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর থেকে আবার অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল।[৭৩] তবে পত্রিকাটি এখন থেকে ইংরাজী ও বাংলা দু ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২ এপ্রিল থেকে অমৃতবাজার, ২ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন থেকে প্রকাশিত হয়।

শিশিরকুমার অল্পদিনের মধ্যেই আবার অমৃতবাজার পত্রিকাকে নির্ভীক সাংবাদিকতার হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। শুধু লেখার মধ্যেই নয়, যে কোন সংস্কারমূলক বা প্রগতিশীল আন্দোলনে সে সময় সাংবাদিকরা সক্রিয়ভাবে যোগ দিতেন। বাংলার অস্থায়ী গবর্নর স্টাচি ১৮৭২ সালে ভারতবাসীর উচ্চ শিক্ষার পথরোধ করতে চেয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে বাংলাদেশে যে আন্দোলন হয় তার পুরোভাগে ছিল অমৃতবাজার ও হিন্দু প্যাট্রিয়ট। শিশিরকুমারের মেজদা হেমন্তকুমার মফস্বলে বিভিন্নস্থান ঘুরে সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ করেছিলেন। স্টাচির এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

কিন্তু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকা অবশেষে বড়লাট স্যার এসলি-ইডেনের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিল। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকা তা করেনি। অমৃতবাজারের স্বাধিকার চেতনা ও ইংরাজ শাসনের তীব্র সমালোচনা ব্রিটিশ সরকার সহ্য করতে পারেনি। স্যার এসলি-ইডেন শিশিরকুমারকে ডেকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনি বেলভেডিয়ার থেকে পাঠাবেন। শিশিরকুমার বলেছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষে অন্ততঃ একজনও ন্যায়নিষ্ঠ সম্পাদক থাকবে এটা-কি লাটবাহাদুরের অভিপ্রেত নয়। এসলি ভয় দেখিয়েছিলেন যে, ছ মাসের মধ্যে তিনি শিশিরকুমাকে কলকাতা ছাড়া করবেন। শিশিরকুমার বলেছিলেন যে, তিনি গ্রামে গিয়ে জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করবেন তবু বড়লাটের প্রস্তাবে রাজি হবেন না।[৭৪]

১৮৭৮-এর ১৪ মার্চ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি হয়েছিল; একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট অমৃতবাজারকে জব্দ করার জন্যই

তৈরি করা হয়েছিল। জাতীয় মহাফেজখানায় অমৃতবাজার পত্রিকার ওপর সরকারী ফাইল পড়ে আমার এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

১৮৭৫ সালে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি রচনা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত। বরোদার তৎকালীন রেসিডেন্ট কর্নেল ফায়েরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। সন্দেহটি গায়কোয়াড়ের ওপর গিয়ে পড়ে। অমৃতবাজারের রচনায় ওই হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করে বলা হয়, অত্যাচারী বিদেশীর উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য গায়কোয়াড়ের পক্ষে ওই হত্যা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। আজ যদি রাশিয়ার সম্রাট অমন একজন অফিসারকে খবরদারি করার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাতেন তাহলে ইংলণ্ড ক্ষমতা থাকলে ঐ রুশ অফিসারকে বহিষ্কৃত করত, না হয় কোন গোপন উপায়ে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত। গায়কোয়াড় যে কর্নেলকে বিষ দিয়েছেন তাতে সন্দেহ আছে। তবে যদি দিয়েও থাকেন তাহলে বুঝতে হবে রেসিডেন্টের অত্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত করার তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। পত্রিকা আরও মন্তব্য করে :

"Considering the unnatural relations that subsist between the English and the tributary princes of India,it is rather strange that poisoning cases havebeen so few. The oppressions of the Resident on the native chiefs would have long since made it impossible for Government to maintain peace in the country if the Native had not been so signally patient, week and helpless."

আর একটি প্রবন্ধে এই বিষ প্রয়োগের সমর্থন করে লেখা হয় :

"Thwarted by one man be set on all sides seeing no other remedy, and loving his thrown, he attempted to poison the colonel. That was a grave crime it was, but state exigencies cover graver ones."

এই রচনা দুটি লণ্ডনের পলমল গেজেটে উদ্ধৃত করে ভারতসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ভারতসচিব ১৮৭৫ সালের ৬ মে এই ব্যাপার ভারত গবর্নর জেনারেলের সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে এই ব্যাপারটি জানিয়ে দেন। ভারতসচিব এই চিঠিতে জানতে চান :

"Whether Law should be brought bear on such writings or they should be treated with disregard as one which can best be decided on the spot."

তখন হাওয়েল গবর্নর জেনারেলের সেক্রেটারি মিঃ আর্থার কলকাতায় অ্যাড-ভোকেট জেনারেলের মতামত চেয়ে পাঠান। ২৮ জুন অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ পল অভিমত দেন যে, "A conviction will depened so much upon the

constitution of the tribunal charged with the trial of the case and the view which the presiding judge may take of a law not yet judicially Interpreted that I feel myself unable to predicate the result of trial."

তখন ৯ সেপ্টেম্বর ভারত সচিবকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বর্তমানে সরকারের হাতে যে আইন আছে তাতে এ ব্যাপারে কিছু করা যায় না।

"In the present State of the law, it is not desirable for the Government to prosecute except in the case of systematic attempts to excite hostility against the Government."

এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বলেন যে, সব ভারতীয় সংবাদপত্রের স্থর এক নয়, তাঁরা হিন্দু প্যাট্রিয়টের একটি কপি চিঠির সঙ্গে পাঠান। এই সংখ্যায় অমৃতবাজারের প্রবন্ধ ত্রুটির নিন্দা করা হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৮৬১) হিন্দু প্যাট্রিয়টের সে ঐতিহ্য ছিল না, আর তাছাড়া প্রকাশ্যে ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য তখন দেশীয় জনসাধারণ তৈরি হয়নি।

দেশীয় সংবাদপত্রকে দলনের চিন্তা এ থেকেই ব্রিটিশ রাজশক্তির মাথায় এসেছিল। ভার্নাকুলার প্রেস আইন জারি করার পর শিশিরকুমার ২১ মার্চ থেকে শুধু ইংরাজী ভাষায় অমৃতবাজার প্রকাশ করেন। স্থকৌশলে তিনি আইনকে ফাঁকি দিয়েছিলেন। বাংলা সাংবাদিকতার পক্ষে এ এক অপূরণীয় ক্ষতি হল বটে, তবু বাঙালির সাংবাদিকতা বেঁচে রইল।[৯৫]

স্থলভ সমাচার

স্থলভ সমাচার উনিশ শতকের বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন এক্স্‌পেরিমেণ্ট। গ্রাহক ও পাঠকের অভাবে বাংলা সংবাদপত্রের যখন মুমূর্ষু অবস্থা তখন সংবাদপত্রের দাম কমিয়ে এই পত্রিকায় সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র সেন তা জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়। সংবাদপত্র পাঠে নতুন করে আগ্রহের স্থষ্টি হয়।

স্থলভ সমাচারের প্রকাশ ১২৭৭ সালের ১ অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ১৮৭০। পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভা। পত্রিকার মূল্য ছিল ১ পয়সা। সংবাদপত্র ন্যূনতম মূল্যে পাঠকদের হাতে তুলে দেবার এই পরিকল্পনা বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম। কেশবচন্দ্র সম্ভবত ইংলণ্ডের পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন।

১৮৩২ সালে ইংলণ্ডে সুলভ সংবাদপত্র আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করে উইলিয়ম চেম্বারস। এই বছর ৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় তাঁর চার পৃষ্ঠার পত্রিকা চেম্বারস এডিনবরা জার্নাল। চার পৃষ্ঠার ফুলস্কেপ ফোলিও সাইজের এই পত্রিকাটির দাম ছিল সাড়ে তিন পেনি। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেম্বারস লেখেন :

"Every Saturday, when the poorest labourer in the country draws his humble earnings, he shall have it in his power to purchase, with an insignificant portion of even that humble sum, a meal of healthful, useful and agreeable mental instruction : nay, every school boy shall be able to purchase with his pocket money, something permanently useful—something calculated to influence his fate through life—instead of the trash upon which the grown children of the present day are wont to spend it."[৯৬]

চেম্বার্স জার্নাল এর ফলে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিক্রি দাঁড়ায় ৩০ হাজার। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে সুলভ সাংবাদিকতা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই চেম্বারস জার্নালের প্রচার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০,০০০। ওই বছরই লর্ড ব্রোঘাম বার করেন, 'পেনি ম্যাগাজিন'। যার প্রচার সংখ্যা দু লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছিল।

কেশবচন্দ্রের সুলভ সমাচারও ছিল দেশীয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এক সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ। সুলভ সমাচার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দু হাজার থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত প্রচার ওঠে।

"আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই যে এত অল্প দিনে এত সংখ্যা কাগজ বিক্রয় হইবে এবং এত আগ্রহের সহিত লোকেরা ইহা ক্রয় করিয়া পাঠ করিবে।...কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না। প্রথমবার দুই হাজার বিক্রয় হইয়াছে, দ্বিতীয়বারে প্রায় পাঁচ হাজার, এবার কি আট হাজার ছাপাইতে হইবে ?"[৯৭]

১২৭৮ সালের ১৩ বৈশাখ সুলভ সমাচার হিসাব দিচ্ছেন, পাঁচ মাসে তাঁরা ১২৬২০১ কপি সুলভ সমাচার বিক্রয় করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের সবশুদ্ধ দুহাজার টাকা আয় হয়। ঐ সংখ্যায় পত্রিকাটির যে আয়-ব্যয়-এর হিসাব ছাপা হয় তা তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্রের অর্থনীতি জানবার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আয়

১,২৬২,০৯ খানা পত্রিকা	—	১,৯৮,১ ৯৪
বিজ্ঞাপন হিসাবে	—	৩৪·৮১
		২,০১৬·৭৫

ব্যয়

ছাপাইবার ব্যয়	—	৬৯৯ ৪৭
লিখিবার ব্যয়	—	১৭২·৩৯
কাগজ	—	৫৬৪·৬৫
বিক্রয় করিবার দস্তুরি	—	২২৩ ৩৮
গাড়ি, পাল্কিভাড়া ইত্যাদি	—	২০ ৩৪
ক্ষুদ্র ব্যয়	—	৩১·০৩
বেতন	—	৫৫·৫০
দ্রব্যাদি ক্রয়	—	৪৪·৪৮
দপ্তরী	—	৩০·৫২
ছবি ও নোটিশ প্রভৃতি	—	২৬ ৬৫
		১,৮৬৯·৬৭
	অবশিষ্ট	১৪৭·০৯
		২,০১৬·৭৫

যাহারা পরের ভাল করিব মনে করে তাহাদের কারবারে কি ক্ষতি হইতে পারে? সত্যের জয় হইবেই।

সুলভ সমাচারে প্রতি সংখ্যায় শিরোনামে সংস্কৃত শ্লোকের বদলে বাংলা কবিতা লেখা থাকত। এটিও বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম। শ্লোকটি ছিল:

ধনমান লাভ করি সকলেই চায়
সকলের ভাগ্যে কিন্তু ঘটে উঠা দায়
জ্ঞান ধর্ম চাও যদি অবারিত দ্বার
দরিদ্র ধনীর লেখা সম অধিকার।

সুলভ সমাচারে সাধারণত সংবাদ, প্রবন্ধ, ছোট ফিচারমূলক প্রবন্ধ, জিনিসপত্রের বাজার দর ইত্যাদি স্থান পেত।

সুলভ সমাচারে ইংরাজ প্রশস্তির মাঝে মাত্রাধিক্য ঘটলেও তাতে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে।

আগেই বলেছি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালির সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করে। ১৮৬২ সালের মার্চে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত

যান। ১৮৬৩ সালের জুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথ আই সি. এস. পাশ করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ন। ১৮৬৮ সালে রমেশ দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বিলাত যান। ১৮৭১ সালে তাঁরা তিনজনেই আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৬৯ সালেই পাশ করেছিলেন। কিন্তু বয়স কম অজুহাতে তাঁকে সেবার বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। তরুণ সিভিলিয়ানরা কলকাতায় ফেরার পর ১৮৭১ সালের আশ্বিন মাসে শ্যামাচরণ মল্লিকের সাতপুকুর বাগানে তাঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুলভ সমাচার ২৫ আশ্বিন ১২৭৮ তারিখে লেখে:

'আমাদের নবাগত সিবিলিয়ন বাবুদিগকে বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন ভারতের উন্নতির পক্ষে উদাসীন না থাকেন। অনেকে বিলাত হইতে আসিয়া নিজের উন্নতিতেই ব্যস্ত, দেশের লোকের সঙ্গে মিশিয়া ভারতে উন্নতির পক্ষে উদাসীন। আর একটি অনুরোধ যে বিদেশীয় পোষাক পরিয়া সাহেব না হন। সাহেব হইলে ফিরিঙ্গি দলেরই শ্রীবৃদ্ধি হইবে। বঙ্গসমাজের কোন উপকার হইবে না। ইংরাজদের অধ্যবসায়, উৎসাহ, ধর্মবল, সত্য পরায়ণতার অনুকরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। যেরূপ যাহা ভারতের উত্তম ব্যবহার তাহা রক্ষা করিয়া দেশের মান রক্ষা করাও তাহাদের সেইরূপ কর্তব্য।"

রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে সুলভ সমাচার দক্ষিণপন্থী কাগজ ছিল। ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রতি তার আস্থা ছিল অটুট। যে সমালোচনার সুর ধ্বনিত হত, সেটুকুর মধ্যে ক্রোধের বদলে ছিল প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুর। কিন্তু সামাজিক দিক থেকে সমাচার প্রগতিশীল আদর্শেরই জয়ঘোষণা করে এসেছে। রায়তদের দুরবস্থা, জমিদারের অত্যাচার, সার্বজনীন শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি ব্যাপারে সুলভ সমাচার সর্বদা বঞ্চিতের পাশে এসেই দাঁড়িয়েছে।

১৮৮৬ সালের ২৭ আগস্ট সুলভ সমাচার কুশদহ ও ভেরির সঙ্গে মিলিত হয়ে সুলভ সমাচার ও কুশদহ নাম ধারণ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবজাগরণের অভ্যুদয় ঃ বিকাশ ও বাংলা সংবাদপত্র

ইউরোপের নবজাগরণের সঙ্গে বাঙালির নবজাগরণের তুলনা। বাঙালির নবজাগরণে মুদ্রণ শিল্পের অবদান ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

বাংলা দেশে নবজাগরণের শুভারম্ভ যদি ১৮১৪-১৫ থেকে ধরি তাহলে সেই নবজাগরণ প্রায় সত্তর বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সত্তর বছর ব্যাপী বাঙালির জীবন সাধনার কাল উত্তীর্ণ হয়। তার পরের কাল সেই সাধনা সেই আরাধনার সিদ্ধিলাভের কাল।

'নবজাগরণ বা নবজাগরিত' শব্দটি বাংলা দেশে কেশবচন্দ্র সেনই বোধহয় প্রথম ব্যবহার করেন। শ্রীঅরবিন্দ এই সময়কে বলেছেন 'পুনর্জন্ম'।[১] ইংরাজী রেনেশাঁস শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবেই এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। চোদ্দ ও পনের শতকে ইতালিতে শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার যে বিরাট বিস্ময়কর উদ্বোধন ঘটেছিল পরবর্তী শতাব্দীতে তা ইতালি থেকে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশেও ইওরোপীয় রেনেশাঁসের অধিকাংশ লক্ষণই মূর্ত হয়ে ওঠে।

রেনেশাঁস' শব্দটি উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। ফরাসী ঐতিহাসিক **Michelet** 'রেনেশাঁস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ইতালিয়ান **rainasoita** শব্দটির অর্থ **revival of classical style of architecture**। শব্দটি প্রথম ফ্লোরেনসে ব্যবহৃত হয়। তার পরে এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায় **rediscovery of classical culture in all its aspects.**[২] উনিশ শতকের ঐতিহাসিক **Michelet** রেনেশাঁস শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন পুনর্জন্ম বা **rebirth** বোঝাতে। প্রাচীন গ্রীসের যে সব জ্ঞান ও শিল্প মধ্যযুগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার পুনর্জন্ম। ইওরোপে রেনেশাঁস বলতে বোঝাত **"The current age of literary and artistic revial of the splendour of classical civilisation prior to the 5th century Barbarian invasion."**[৩]

ইতালিতে নবজাগরণ প্রায় তিনশ বছর ধরে চলেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই নবজাগরণের বাণী ইতালির আকাশে বাতাসে অস্ফুটভাবে গুঞ্জরিত হতে থাকে, ক্রমে তা পরিণত হয় সোচ্চার এক মুক্তি আন্দোলনে।

দান্তে (১২৬৫-১৩২১) পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪) বোকাচ্চো (১৩১৩-৭৫) প্রমুখ কবির রচনায় লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) ও

র‍্যাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০) প্রমুখ শিল্পীর শিল্প কীর্তিতে এই নতুন যুগ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ইতালির রেনেশাঁস শুধুমাত্র ক্লাসিক্যাল মতাদর্শের পুনঃ প্রবর্তন বা ধ্রুপদী শিল্প সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। 'It was a movement. a revival of man's powers, a reawakening of the consciousness of himself and of the universe.[8]

অজানাকে জানবার আগ্রহ, পৃথিবী সম্পর্কে এক স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা রেনেশাঁস যুগের মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মধ্য যুগে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যে যোগাযোগ হারিয়ে গিয়েছিল তা ভাসকো ডা গামার অভিযানের মাধ্যমে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভাসকো ডা গামা (১৪৯৭-৯৮) উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে এসে উপস্থিত হন। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার (৯২) মানুষের চেতনাকে সুদূরপ্রসারী করে তোলে। ভেসপুচি ১৪৯৯ সালে আটলান্টিক পাড়ি দেন। ড্রেক ও হকিনসের অভিযানও এই সময়কর ঘটনা।

বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার সে সময়কার ইতিহাসে এক বিরাট ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বহন করে আনে। নব্যবিজ্ঞান মানুষকে শতাব্দীর অন্ধ জড়তা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে। নব্যদর্শন যেমন মনকে স্বচ্ছ ও যুক্তিবাদী করে তুলেছিল, নব্যবিজ্ঞানও তেমনি তার চিন্তার প্রসারতা ঘটায়। চার্চ নিয়ন্ত্রিত সমাজ-জীবনে বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার অতীত কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে এতদিন মানুষ অলৌকিক ভেবে এসেছিল। নব্যবিজ্ঞান প্রমাণ করে দেয়, কার্য কারণ সম্পর্কের অতীত কোন কিছুর অস্তিত্বকে বিজ্ঞান স্বীকার করে না। ১৫০৭ সালে কোপর্নিকস যখন বলেছিলেন পৃথিবী সূর্যের কেন্দ্রবিন্দু নয়, একটি গ্রহমাত্র এবং পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, তখন জনসাধারণ তাঁকে উপহাস করেছিল। কিন্তু গ্যালিলিও ১৭০৯ সালে দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার করে সেই কথাই আবার প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

ইতালিয় রেনেশাঁসের আর একটি বড় লক্ষণ রেনেশাঁস শুধু ইতালির মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। ইওরোপ থেকে দলে দলে জ্ঞানান্বেষী ছাত্ররা ইতালিতে এসে শিক্ষালাভ করে রেনেশাঁসের বাণী বহন করে নিজের নিজের দেশে ফিরে গেছেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশে যুক্তিবাদী ও মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত বুদ্ধিজীবীদের এক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত ইংলণ্ডে পঞ্চদশ শতকে অকসফোরড রিফরমার গ্রুপের কথা উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে William Gorocyn (1446—1519) Thomas Linacre (1460—1524) John Colet (1466—1519) Thomas More (1478—1535) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে টমাস মুর ছাড়া সবাই ইতালিতে পড়াশোনা করতে যান এবং সেখান থেকে নবলব্ধ চেতনা নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

জার্মানীর নামকরা মানবতাবাদী Rudolf Agricola (1443—1485) ইতালিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইওরোপে রেনেশাঁস আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা Desi-

derius Erasmus (1455—1536) অবশ্য প্রথম জীবনে ইতালি যাননি কিন্তু ইংলণ্ডের অকস্‌ফোরডে এসে জন কোলেট ও টমাস মুরের সংস্পর্শ তাঁকে রেনেশাঁসের মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছে। ইংলণ্ডে ১৪১৫ সালে সপ্তম হেনরির রাজত্বকাল থেকে রেনেশাঁসের শুরু এবং ১৬০৩ সালে এলিজাবেথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সমাপ্তি ঘটে।

ফ্রান্সের রেনেশাঁস আন্দোলনও ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেল বন্ধনের প্রত্যক্ষ ফল। প্রথম ফ্রান্সিস (রাজত্বকাল ১৫১৫-৪৫) ইতালি অভিযান শেষ করে ইতালির শিল্পী ও স্থপতিদের চাকরি দিয়ে ফ্রান্সে নিয়ে আসেন। এইভাবেই ফ্রান্সে এসেছিলেন লিওনারদো দা ভিঞ্চি প্রমুখ শিল্পীরা।[৫] প্যারিসে শিল্প-চর্চার অনুকূল পরিবেশ রহিত হওয়ায় বহু ইতালিয় শিল্পী প্যারিসে যান। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে ইতালিয় মানবতাবাদীরাও ছিলেন। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর (১৩৩৮-১৪৫৩) ফ্রান্সে ১৪৮৮ থেকে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রেনেশাঁসের কাজ স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় জনশূন্য গ্রামাঞ্চল আবার জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে।[৬] কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাণস্পন্দন ফিরে আসে। শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী শূন্যতার পর ফ্রান্স আবার নবজাগরণের সূর্যালোকে আলোকিত হয়।

বাংলাদেশের রেনেশাঁসের সঙ্গে ইওরোপের রেনেশাঁস আন্দোলনের বিশেষ মিল লক্ষ্য করা গেছে। ডাচ দার্শনিক এরাসমাস যেমন ইংলণ্ডের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে গেছেন বা ইতালিয় লেখক **Domenico Mancini** যেমন ফ্রান্সের চিন্তাধারাকে উদ্দীপ্ত করেছেন, ইহুদি ও আরব পণ্ডিতেরা যেমন ইতালিয়ান রেনেশাঁসের প্রেরণা যুগিয়েছেন তেমনি বাংলাদেশের রেনেশাঁসের পথপ্রদর্শক ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ প্রাচ্যবিদরা। হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কথা তাঁরাই প্রথম গভীর ভাবে চিন্তা করেন। ফোরট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের মনে তাঁরা নির্দ্বিধায় তাঁদের এই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করতেন। 'হিন্দু স্বর্ণ'যুগের পুনরুত্থানের ছবি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের ধ্যানে সর্বদা জাগ্রৎ ছিল।[৭] এবং তাঁরা অনেকেই মনে করতেন যে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুধর্ম আবার মহান হবে।[৮]

এই মনোভাব সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে ওঠে। অন্তত মারকুইজ হেষ্টিংসের রাজত্বকাল পর্যন্ত (১৮১৫-২৩) কোরট অব ডাইরেকটরসরা সরকারী প্রশাসনের দেশীয় ব্যক্তিদের চিন্তা ও ধ্যানধারণার অনুবর্তী হয়ে চলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৯]

বিদেশী শিক্ষা বা কালচারকে ইওরোপীয় মনীষীরা যেমন সহজেই আত্মসাৎ করে তাকে জ্ঞানের প্রসারের কাজে লাগিয়েছেন, বাংলাদেশের মনীষীরাও তাই করেছেন। ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র জাতীয়তার আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। **The renaissance intellectual finds himself challenged by the herculean task of combining the enduring but purified indigenous tradition with the desirable elements of a foreign civilisation. The basic problem is to**

combine everything in such a way as to maintain a fundamental unity to replace the loss of the medieval unity.[১০]

ভার্নাকুলারের প্রতি নিষ্ঠা ইতালির রেনেশাঁসের প্রধান লক্ষণ ছিল। পেত্রার্ক ও বোকাচিওর ল্যাটিন লেখাগুলি লোকে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর ইতালিয়ান সনেটগুলি জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। ১৫১৬ সালে ক্লাসিক রীতিতে লেখা ইতালিয় ভাষায় প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়।[১১]

তেমনি বাংলাদেশেও বাংলা গদ্য-চর্চার মধ্য দিয়ে রেনেশাঁসের যাত্রা শুরু হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রাচ্যবিদরা এই বাংলা চর্চার পথিকৃৎ। ফোরট উইলিয়ম কলেজে তার প্রসার এবং শ্রীরামপুর মিশনারিদের দ্বারা তার ব্যাপ্তি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিকৃৎরা এই বাংলা ভাষাকেই জ্ঞানচর্চার প্রধান বাহন করেছেন। ইংরাজী শিক্ষা স্বদেশীয় ভাষা-চর্চার প্রতিবন্ধক হয়নি বরং পরিপূরক হয়েছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ইতিহাস বাংলা ভাষা সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসেই পরিণত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথিকৃৎরা ইংরাজী শিক্ষিত হলেও মাতৃভাষা বাংলাকে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। গৌড়ীয় সমাজে (১৮২৩) বাংলায় সভার কার্যবিবরণী লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। ১৮৫১ সালে বাংলা সরকার, লর্ড স্ট্যানলির প্রস্তাব অনুসারে দেশীয় ভাষাকে স্কুল শিক্ষার মাধ্যম করবেন কিনা তা নিয়ে ইওরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষাবিদদের মতামত আহ্বান করেন। সে সময় পাবলিক ইনস্ট্রাকশানের জেনারেল কমিটির সদস্য হিসাবে রাধাকান্ত দেব মাতৃভাষাকেই শিক্ষা মাধ্যম করার পক্ষে অভিমত দেন।[১২]

অবশ্য গৌড়ীয় সমিতি বাংলাকে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৩২ সাল থেকেই আন্দোলন করে আসছিল। গৌড়ীয় সমাজের সম্পাদক রামকমল সেন হিন্দু কলেজ পাঠশালার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৩৯ সালে হিন্দু কলেজ পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেছিল বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য। রামকমল সেন ও প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শিক্ষিত বাঙ্গালীরা আদালতে ফারসীর বদলে বাংলা চালু করার দাবি জানান। ১৮৩৭ ও পরবর্তী কালের ১৮৪৩ সালের আইনে বাংলাকে আদালতের ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্য শুধু নয় বাংলা ভাষা চর্চাও সে সময় দ্রুত সমাদর লাভ করে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৮১৮ সালে একটি বাংলা অভিধান সম্পাদনা করেন। সংস্কৃতবহুল শব্দ যা তৎসম শব্দ হিসাবে বাংলায় চলে এসেছে রামকমল তারও একটি বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা যদি প্রগতিশীল শিক্ষা আন্দোলনের পথে একটি বিরাট পদক্ষেপ হয় তাহলে হিন্দু কলেজ পাঠশালা প্রতিষ্ঠা এক বৈপ্লবিক সূচনা। কারণ হিন্দু কলেজ পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে ছাত্রদের

ভারত ও ইওরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করা। হিন্দু কলেজ পাঠশালার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য বিদেশীদের সামনে প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিদেশী সরকার অন্তরায় না হলে বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঠ্যপুস্তকও সেই সময় তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু যে কোন ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক বাংলায় অনুদিত হতে দেওয়ায় শাসকগোষ্ঠীর আপত্তি ছিল। কোন পুস্তক বাংলায় অনুবাদের আগে তা রীতিমত সেনসর করার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এমন একদল নব্য শিক্ষিত যুবক তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যাঁরা ইংরাজী কলা ও বিজ্ঞানে পারঙ্গম হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অধীতবিদ্যা বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করার মত দক্ষতাও অর্জন করবে।[১৩]

বাংলা পাঠশালার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রামকমল সেন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর; দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বাংলা পাঠশালার আদর্শে পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৪৩ সালে ঢাকায় অনুরূপ ভার্নাকুলার পাঠশালা খুলবার জন্য রামলোচন ঘোষ কাউনসিল অব এডুকেশনের কাছে সুপারিশ করেন।

ইংরাজী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়েও এবং তদুপরি খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ৮৪৬-৪৯ সালের মধ্যে বিদ্যাকল্পদ্রুম নামে বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাকল্পদ্রুমের মাধ্যমে পাশ্চাত্য গণিত দর্শন ও বিজ্ঞান বাংলাভাষীর কাছে উন্মুক্ত হয়েছিল। এ ছাড়াও ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ইংরাজী গ্রন্থ ডায়ালগ্‌স অন হিন্দু ফিলসফি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। দুরূহ দর্শনের তাত্ত্বিক আলোচনা যে বাংলায় সম্ভব এই গ্রন্থই তার প্রমাণ।

১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি বাংলাভাষার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, হডসন প্র্যাট, ডব্লু এস সিটন কার, রেভাঃ জেমস লঙ প্রমুখ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। শুনলে অবাক লাগে যে ১৮৩৭ সালে দেওয়ান রামকমল সেন সমস্ত সরকারী কাজে বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবি জানিয়েছিলেন।

"কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামকমল সেন এক নতুন সমাজ স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিষ্কর ভূম্যধিকারিদিগের পক্ষে এবং রাজকীয় কর্মে বঙ্গভাষা চলন হওয়া বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইংলণ্ড দেশে প্রেরণ করেন।"[১৪]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭০ সালের ২ জুলাই তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যাঁরা ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবেন না, তাঁদের শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই দেশীর ভাষা হবে।[১৫] রাজনারায়ণ বসু মনে করতেন, কেবলমাত্র বাংলার মাধ্যমেই বাঙালি তার চিন্তা, অনুভূতি ও অভিব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারে।[১৬]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা চর্চার প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পরবর্তী

কালে অন্তর্হিত হয় এবং ইংরাজীই সমস্ত স্থানটুকু দখল করে। এই সময় বাঙালি সাংবাদিক ও বাঙালি সাহিত্যসেবী মাতৃভাষা চর্চা ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করেন নি বরং তাঁরা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা চর্চা স্বাদেশিকতা বা নবলব্ধ স্বদেশ চিন্তার অঙ্গ হয়ে গেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময় বাংলা চর্চার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন বলে কলেজের অধ্যক্ষ টোয়ানি তাঁকে ব্রিটিশ বিরোধী বলে অভিহিত করেন।[১৭] গোটা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী চর্চার সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে ভার্নাকুলার চর্চা অগ্রবর্তী হয়েছে। অনুবাদ ও সৃজনাত্মক সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এই ভাবেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলা সংবাদপত্র এই ভার্নাকুলারের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। বাঙালি যা ভেবেছে তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছে সর্বাগ্রে এই বাংলা সংবাদপত্রেই। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাময়িকপত্র বাংলা গদ্যকেও ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুষম পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

কোন জাতির রেনেশাঁসের জন্য দরকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মনন ও মনীষার দিক দিয়ে পরিণত এই শ্রেণীর মানুষেরাই কোন জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলতে পারেন। এঁরা শাসকশ্রেণীকে বুদ্ধি ও মনীষা দিয়ে পরিচালিত করেন। প্রতিভা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা দ্বারা তাঁরা সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করে থাকেন। এই শ্রেণীর শিক্ষিত নাগরিক একদা ইতালির রেনেশাঁসকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন।

The intellectual leading group supports the power position of the ruling class by the provision of an ideology and by guiding public opinion in the requisite direction. The function had been fulfilled in the Middle Ages by the clerical intellectuals now it developed upon the humanists.[১৮]

আবার এই বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভবও নবজীবনের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। মধ্যযুগে ইতালির শহরগুলির গুরুত্ব একেবারে লোপ পেতে থাকে। রাস্তা ঘাট ছিল না, জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। আইনশৃঙ্খলার বালাই ছিল না বলে ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেনি। অধিকাংশই মানুষ সে সময় কৃষিমুখী হয়ে উঠেছিল। বলা হত শহরে সে সময় ছিল '.he church, the gallows and the cemetery.[১৯]

তবে নগর জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী, কারিগর ও শিল্পীরা ক্রমশ শহর অভিমুখী হতে শুরু করে। শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। ইতালিতে এই শ্রমিক শ্রেণী এতখানি শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তারা .৩৭৮ সালে ফ্লোরেন্সে বিদ্রোহ পর্যন্ত করেছিল।[২০]

পলাশী যুদ্ধের আগে থেকেই কলকাতায় নগর জীবনের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। বর্গীর

হাঙ্গামা এবং রাজশক্তির দুর্বলতার ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটে। একারণে শক্তিশালী ইংরাজ বণিকদের ছত্রছায়ায় নিরাপদ জীবন যাপনের জন্য গ্রামাঞ্চল থেকে বহু ব্যক্তি কলকাতায় এসেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার ক্ষয়িষ্ণু নবাবতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর এই শহরমুখীনতা আরও বৃদ্ধি পায়। আর তাছাড়া একাধারে নব বিজিত একটি সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যের অবাধ বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্যও প্রচুর লোকের প্রয়োজন হয়। কলকাতার এই জনবসতি এত দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে যে ১৭৫২ সালের মধ্যে হলওয়েলের পরিসংখ্যান অনুসারে কলকাতার জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৪ লক্ষ ৯০ হাজারের মত। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে শুধু কলকাতাতেই ১৫ জুলাই থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬ হাজার লোকের মৃত্যু হয়।[২১] আর একটি হিসাবে দেখা যায় ১৮২৪ সালে কলকাতার লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ।[২২]

কলকাতার এই জনসংখ্যার প্যাটার্নটির বৈশিষ্ট্য যে এখানে ইংরাজের বাণিজ্যিক কাজে সহায়তার জন্য দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে আপনা আপনিই একটি পরগাছা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে যায়। তাঁদের কেউ ছিলেন দোভাষী, কেউ সেক্রেটারি, কেউ বেনিয়া মুৎসুদ্দি। কোম্পানির সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য সম্পন্ন হত এই মধ্যসত্বভোগী বেনিয়াদের মারফত। বিনিময়ে তাঁরা দস্তরি লাভ করতেন। এ ছাড়া অসৎ পথেও, নানান ফন্দি ফিকিরের সাহায্যে এই শ্রেণীর একটি অংশ অচিরে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। কলকাতার এইসব নব্য বিত্তশালী পরিবারের বিলাস ব্যসনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ের খবর সমাচার দর্পণের পাতায় ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। আশুতোষ দেবের মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।[২৩] রামদুলালের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসেছিলেন সাত আট হাজার। কাঙালী ভোজন করে প্রায় এক লক্ষ। রামদুলাল তাঁর জীবদ্দশাতেও কম ব্যয় করেননি। দু'পুত্রের বিবাহে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।[২৪]

কলকাতার এই নব্য ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কেউ জমিদারি কিনে অর্থ কৌলীন্যের সঙ্গে সামাজিক কৌলীন্যও অর্জন করেছিলেন। এই ভাবেই শোভাবাজার রাজপরিবার, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার, সিমলার দে সরকার পরিবার, পাইক পাড়ার সিংহ পরিবারের জমিদারির পত্তন হয়েছিল।[২৫]

অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে যে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী অত্যাচারী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, তার ফলে চাষীর জীবনে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। চাষের অবনতি ঘটে এবং জমিদার ও চাষীর মধ্যে মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।

কলকাতা পত্তনের অনতিবিলম্বের মধ্যে দরিদ্র অত্যাচারিত কৃষিজীবীর একটা অংশ শ্রমিক হিসাবে কলকাতায় এসে ভিড় করে। আসতে থাকে বৃত্তিধারী নানান মানুষ।

সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চল থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদের একটি বিরাট অংশও নগর

জীবনের নানান বৈভবের টানে শহরে এসে ভিড় জমান। এঁরাই কেউ রাইটার, কেউ সরকার, কেউ ট্র্যানস্লেটরের চাকরি নিয়ে ইংরাজের বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করেন। বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এই ভাবেই। প্রয়োজনের তাগিদেই নব্য ধনিক শ্রেণীর মত কলকাতার এই নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গ্রাম্য সমাজের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি, বিদ্যাভিমান এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য—এই ত্রিবিধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এক নবতর সমাজ ভাবনা আবর্তিত হতে থাকে। রেনেশাঁসের আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তোলার পক্ষে এই মধ্যবিত্ত নাগরিক শ্রেণী সেদিন সব থেকে বড় সহায় হন।

কলকাতার নতুন নাগরিক পরিবেশে বংশ মর্যাদা ও অমিত বিত্তই সামাজিক সম্মান লাভের একমাত্র শর্ত ছিল না। ব্যক্তিগত মর্যাদা অমর্যাদার প্রশ্ন ক্রমশ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছিল। সেক্ষেত্রে বিদ্যা অর্জনের দ্বারা বুদ্ধিজীবী হিসাবে প্রাধান্য লাভই সামাজিক গুরুত্ব অর্জনের প্রধান সোপান হিসাবে পরিগণিত হতে শুরু করে। "Classical learning was endowed with magic qualities similar to those attributed to the inexplicably rapidly acquired wealth of the capitalist, which appeared mysterious and almost sinister to a populace unable to understand how it had been won in this way the people itself helped to make conscious the division between itself and the propertied and erudite classes."[২৬]

বস্তুত হঠাৎ নবাবদের অপরিমিত বিত্ত সেই ধনতান্ত্রিক সমাজে ও জনসাধারণের মনে বিত্তবানদের সম্পর্কে এক রকমের সন্দেহ জাগিয়ে রেখেছিল। 'বিদ্যাহীন ধনের' চেয়ে যে 'ধনহীন বিদ্যা' সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের পক্ষে অধিকতর সহায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা সর্বাগ্রে মনে রেখেছিলেন এবং মনে রেখেছিলেন বলেই বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চার পুরোভাগে তাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী একাধারে বিদেশী শাসক গোষ্ঠী ও স্বদেশীয় ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে সমান পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন।

ইংলণ্ডে টিউডর যুগে (১৪৮৫-১৬০৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ। ব্যারণদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁরা সহায়ক হবেন বলে হেনরি তাঁদের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন।[২৭] এদেশেও এই নবগঠিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি ইংরেজের প্রকাশ্য দাক্ষিণ্য ছিল। কারণ মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটানোর ফলে সমস্ত দিক দিয়ে হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। এদিক থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও ধনিক শ্রেণী ইংরেজের প্রতি কৃতজ্ঞই ছিলেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলিতে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রভূত নিদর্শন আছে।

১৭৮৯ সালে নেপোলিয়নের ইংলণ্ড আক্রমণের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ইংলণ্ডের প্রতিরক্ষা তহবিলে ইংরেজরা পনের লক্ষ পাউণ্ড চাঁদা তুলে ফেলেছিলেন। এ ছাড়া

কলকাতার ব্রিটিশরা তুলে দিয়েছিলেন ১,৫৮,০৫৩ পাউণ্ড। কলকাতার নব্য-ধনী সম্প্রদায় তাঁদের ব্রিটিশ আনুগত্য প্রমাণের জন্য ১৭৯৮ সালের ২১ আগষ্ট কলকাতায় এক সভা আহ্বান করেন। ওই সভায় সঙ্গে সঙ্গে ০,৮০০ টাকা উঠে গিয়েছিল। সভার আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন গৌরচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, রামকৃষ্ণ মল্লিক, গোপীমোহন ঠাকুর, কালীচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত, গোকুলচন্দ্র দত্ত প্রমুখেরা।[২৮]

পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও ধনিক সম্প্রদায় এ বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি।

বাংলা দেশের ধনিক শ্রেণীর একটি বড় অংশও রেনেশাঁস আন্দোলনের শরিক হয়েছেন। অবশ্য রেনেশাঁসের ইতিহাসে ধনিক শ্রেণীর সামাজিক ও বুদ্ধি-আন্দোলনে যোগদান কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতালিতে Count Picodella Mirandola ও Michel Angeloকে বাদ দিলে অধিকাংশ হিউম্যানিস্ট শিল্পী বুর্জোয়া সমাজ থেকে এসেছেন। ইতালির রেনেশাঁসের পিছনে ফ্লোরেনসের মেডিসি পরিবারের দান উল্লেখযোগ্য। মেডিসি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা (১৩৯৭) এই বিরাট ধনী পরিবারের অনেকেই শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দেখিয়েছেন। কলকাতায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিবারকে এই মেডিসি পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

কলকাতার এই ধনিক ও মধ্যবিত্ত উভয় সমাজই সমান ভাবে রেনেশাঁসকে পুষ্ট করে গেছেন।

রামমোহন স্বোপার্জিত অর্থে বিত্তবান ছিলেন। গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরও বিত্তশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি যে আংটি পরতেন তার দামই ছিল পঁচিশ হাজার টাকা।[২৯]

প্যারীচাঁদ মিত্রের বাবা রামনারায়ণ মিত্র কোম্পানির কাগজ ও হুণ্ডীর ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। প্যারীচাঁদের নিজেরও ব্যবসা ছিল। রামগোপাল ঘোষের বাবা গোবিন্দচন্দ্র চীনা বাজারে ব্যবসা করতেন। তা ছাড়া কোচবিহার রাজ্যের এজেন্ট বা মোক্তারের কাজ করেও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ২৪ পরগণার কালেকটার ও নিমক এজেন্টের দেওয়ান ছিলেন। রানীগঞ্জে তাঁর কয়লার খনি, রামনগরে চিনির কল আর নীলকুঠি ছিল। বিখ্যাত 'কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানী' ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র শুঁড়ার (বেলেঘাটা) সম্ভ্রান্ত ধনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, প্যারীচরণ সরকার চোরবাগানের সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ভৈরবচন্দ্র জাহাজের রসদ সরবরাহ করতেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিকেরা তুলা ও সুতার ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। রসময় দত্ত রামবাগানের ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব তো স্বয়ং রাজা এবং সমাজপতি। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় পাটনার ধনী আফিম দেওয়ান

ফকিরচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। মাইকেল মধুসূদন দত্তও সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পাশাপাশি তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামলোচন ঘোষ, মতিলাল শীল, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ঈশ্বর গুপ্ত, দিগম্বর মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ঘর থেকে এসেছিলেন।

জাতীয় উন্নতি ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে এই শিক্ষিত ধনিক শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাই করেছেন। বিশেষ করে সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে মূলধন লগ্নীর প্রশ্নও জড়িত ছিল। এই মূলধন লগ্নীর ব্যাপারে এই বিত্তবান সম্প্রদায় সহায়ক হয়েছেন। তাঁরা কখনও নিজেরাই সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন আবার কখনও মধ্যবিত্ত সম্পাদক বা প্রকাশকের 'ফাইন্যানসিয়রের' কাজ করেছেন।

'ব্রাহ্মণ সেবধির' প্রকাশকের রামমোহনের পত্রিকা প্রকাশকের মত বিত্তের অভাব ছিল না। রংপুর থেকে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসার আগেই তিনি প্রচুর বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।[৩০] সম্বাদ কৌমুদীর মধ্যেও তাঁর মালিকানা ছিল।

সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশের পিছনেও বাবু কালীনাথ মুন্সী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর অর্থ সাহায্য করেছেন। বঙ্গদূত প্রকাশকদের মধ্যে ছিলেন আর. এম. মারটিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, নীলরতন হালদার, রাজকিষণ সিং প্রমুখেরা। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপাত্র জ্ঞানান্বেষণের প্রকাশের পিছনে বাবু সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র, বিত্তশালী রাজা দক্ষিণানন্দন (রঞ্জন) মুখোপাধ্যায়ের অর্থসাহায্য ছিল।[৩১] সংবাদপ্রভাকর প্রকাশের পিছনে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের অর্থ ছিল।[৩২] 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশে আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের অর্থসাহায্য ছিল। আন্দূলের জমিদার পরিবারের শ্রীনাথ মল্লিক সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকাকে অর্থ সাহায্য করতেন। রামগোপাল বসু মল্লিকের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক রাজনীতি সংগ্রহ প্রকাশে মহারানী স্বর্ণময়ী একশত টাকা অর্থ সাহায্য করেছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী মাসিক গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (প্রথম প্রকাশ, ১৮৬৩) প্রকাশের নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন।

১২৮২ সালের আশ্বিন সংখ্যার গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় এ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল "কেবল দীন পালিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সাহায্য দানের উপর নির্ভর করিয়া সে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অন্যথা এতদিন তাহার চিহ্ন পর্যন্ত থাকিত না।"

ভারতীয় সংবাদপত্র (১৮৬১) প্রকাশে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কালীকৃষ্ণ সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখেরা নানাভাবে অর্থ সাহায্য করে গেছেন।

ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র অমৃতবাজার পত্রিকাকে ৮০০ টাকা অর্থসাহায্য করেছিলেন।[৩৪]

অবশ্য ধনিক শ্রেণী সংবাদপত্র প্রকাশে সবদেশেই চিরকাল অর্থস্যহায্য করে এসেছে। কারণ বহু ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিপত্তি ও গুরুত্ব অর্জনের জন্য তাঁরা 'right measure of display' খুঁজছিলেন। 'And the best method of display is to keep a suitable retinue.'[৩৫] এই 'রেটেনিউ' বা অনুগামী নব্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা কোন না কোন ব্যাপারে ধনিক শ্রেণীর সাহায্য প্রার্থী তাঁদের মধ্য থেকে রিক্রুট করাই সুবিধা। ইতালিতেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। পেত্রার্কা দরবারে যেতেন বলে বোকাচ্চিও মনে করতেন এটি পেত্রার্কার 'ব্যক্তি চরিত্রের অভাব'। কিন্তু মারটিন লিখেছেন, এতে উভয় শ্রেণীর পারস্পরিক স্বার্থ ছিল।

"In their turn these welcomed the new patronage not only for economic reasons but also for the sake of their own social positions, thus the interests of both parties concerned were served."[৩৬]

তবে কোন কিছুর প্রত্যাশা না করে দানের জন্য দান করার মত বিত্তশালীও সে যুগে ছিলেন।

ব্যক্তিগত প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীগত প্রয়াসও সেদিন সংবাদপত্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে ছিল। ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র জ্ঞানান্বেষণের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী ছিল তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। সর্বশুভকরীও সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র। কৌলীন্য প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৪৯ সালে ঠনঠনিয়ায় ৺রামচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে এই সভার প্রতিষ্ঠা হয়। বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) ভার্নাকিউলার লিটারেচর কমিটি বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, পাদরি লং প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫) ছিল বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র। তেমনি স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য যে পত্রিকাটি সে যুগে সবচেয়ে বেশী কাজ করেছিল সেই বামাবোধিনী পত্রিকা (আগস্ট ১৮৬৩) ছিল বামাবোধিনী সভার মুখপত্র।

বাংলাদেশের নব জাগরণের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য হল বাংলাদেশের রেনেশাঁসের আগে অন্ধকারময় যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একথা সত্য, মুগল সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইংরাজ অধিকারের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত, বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুব দুর্বৎসর গিয়েছিল, একমাত্র অন্নদামঙ্গল ও কিছু শক্তি সঙ্গীত ছাড়া গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালির কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি ছিল না। বহু-বিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, নানাবিধ কুসংস্কারে সমাজ আচ্ছন্ন ছিল। নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক রুচির সংকীর্ণতা রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের মত প্রতিভাবান কবিদেরও বিদ্যাসুন্দর লিখতে প্রলুব্ধ করেছিল।

তবে বাংলাদেশের ভাগ্য যে জাতীয় জীবনের এই বন্ধ্যা ঋতু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

ইওরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর নতুন করে রেনেশাঁসের সূর্যোদয় হতে হাজার বছর লেগে গিয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশে তার জন্য পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় লাগেনি।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলছেন, **But with the death of the Mughal Empire the middle ages in India ended and the modern age began. In Europe the fall of the Roman Empire was followed by a thousand years of disorder and darkness, out of which Europe struggled back into light only in the 15th century. Happily for India, the death of her old order was immediately followed by the birth on her soil of modern civilisation and thought. It was as if the seedlings of the Renaissance and the Reformation had been planted in the city of Rome in 1476 as soon as the last Emperor Augustus had extinguished himself after the victory of odoacer.**[৩৭]

অবশ্য মুগল সাম্রাজ্যের পতন ও ইংরাজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিকের মত বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা পালটে যায়নি। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের মধ্যে নেপথ্যের বহু প্রস্তুতি, বহু আন্দোলন, বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই তবে রেনেশাঁসের দীপশিখা জ্বালানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু রেনেশাঁসের উপযোগী সমস্ত রকমের ঐতিহাসিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও সবার থেকে বড় প্রয়োজন রেনেশাঁসের জ্বলন্ত দীপশিখাকে হাতে নিয়ে এগিয়ে যাবার মত মানুষ। এরাসমাসের (১৪৬৬-১৫৩৬) মত যুক্তিবাদী সংস্কার বর্জিত সুশিক্ষিত মানুষ। টমাস ম্যুরের মত (১৪৭৮-১৫৩৫) মানুষ, যিনি সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিলেন, **'I die the Kings loyal servant but Gods first.'**

বাংলাদেশেও টমাস ম্যুর ও এরাসমাসের মত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্য দিয়ে। ইংরাজের সংস্পর্শে এসে বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণীর মধ্যে ধীরে ধীরে যে সংস্কারমুক্ত যুক্তিগ্রাহ্য পরিশীলিত মনের সৃষ্টি হচ্ছিল রামমোহন সেই ব্যক্তিগত সংস্কার মুক্তিকে এক সংঘবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনে রূপায়িত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর রামমোহনের মত ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন না। তিনি মুখ্যত মানবতাবাদী এবং শিক্ষাবিদ। মানবতাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি সমাজ সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বহুবিবাহ রোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন।

একথা ঠিক টমাস ম্যুরের মত তাঁদের কাউকেই বধ্যভূমিতে যেতে হয়নি, তার কারণ রাজশক্তির প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্য তাঁদের পিছনে ছিল। কিন্তু সংরক্ষণপন্থীদের যে তীব্র প্রতিরোধের তাঁরা সম্মুখীন হন তা সর্বদা নিয়মতান্ত্রিক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা শাস্ত্রীয় বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উভয়ের বিরুদ্ধেই বিরুদ্ধবাদীদের দৈহিক নির্যাতনের হুমকি এসেছে, এমন কি প্রাণনাশেরও। বিদ্যাসাগর তো এক সময় লাঠিয়াল নিয়ে চলাফেরা করতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁরা আদর্শ থেকে চ্যুত হননি এবং সাফল্য অর্জন করেছেন।

বাংলাদেশের এই রেনেশাঁস শুধুমাত্র রোমান্টিক আদর্শ ও তত্ত্ব হিসাবে কিছু স্বপ্নালু চিন্তাবিদদের মস্তিষ্কেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলাদেশের পক্ষে রেনেশাঁস ছিল এক সামাজিক বিপ্লবের মন্ত্র। শুধু শিল্পে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে ও কাব্যে নয়, নতুন সমাজ গঠনের জন্য তার সুসমঞ্জস প্রয়োগই ছিল এখানে মুখ্য। একটি জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খোলার প্রয়োজনটাই ছিল সেখানে বেশী।

সংস্কার ভাঙা উচিত, কোনদিক থেকে ভাঙা উচিত, কতখানি বর্জন করা উচিত, নতুন চিন্তার কতখানি এ সমাজের উপযোগী এ সমস্তই সমাজ নেতাদের হাতেকলমে দেখিয়ে দিতে হয়েছে এবং তার জন্য গ্রন্থাগার কিংবা কলেজের ক্লাশরুম ছেড়ে পথে পথে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে।

রেনেশাঁসের চিন্তার প্রথম প্রদীপটি অষ্টাদশ শতকের প্রাচ্যবিদরা, ফোরট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকেরা বা শ্রীরামপুরের মিশনারীরা জ্বালাতে পারেন কিন্তু তা থেকে সমাজ বিপ্লবের মশাল জ্বালানো একা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সুতরাং খুব সঙ্গত কারণেই জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থকভাবে প্রতিফলিত করে তোলার দায়িত্ব দেশের নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিদের ওপর এসেই পড়েছে। এবং যেহেতু এ সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড গণসংযোগের ওপর নির্ভরশীল সেহেতু বাংলা সংবাদপত্রই এই বিরাট সমাজ বিপ্লবের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

ইওরোপে রেনেশাঁসের বাণীকে প্রচারের পক্ষে সবচেয়ে বড় সহায়ক হয়েছিল মুদ্রাযন্ত্র। হুগো একে greatest invention of all times বলেছেন।

ইতালির রেনেশাঁস আন্দোলন প্রথম দিকে মুদ্রাযন্ত্রের সুবিধা পায়নি বটে কিন্তু পরবর্তী কালে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে রেনেশাঁসের চিন্তা দ্রুত প্রসারলাভ করে।

কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপে আধুনিক মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রচলন হয়নি। যদি রেনেশাঁস আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র থাকত তাহলে রেনেশাঁসের ধ্যানধারণা আরও দ্রুত প্রসার লাভ করত। ইওরোপে নিউজ লেটার ধরনের অপরিণত সংবাদপত্রগুলি সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডে প্রথম দৈনিক পত্রের প্রকাশ ১৭০২ সালে, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৩ সালে।

তবে সংবাদপত্র না থাকলেও মুদ্রণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ইওরোপের

রেনেশাঁস আন্দোলনে বাংলা দেশের সংবাদিকদের মতই সহায়তা করেছেন। Aldus Manutinus Romanus ১৫ শতকের শেষে ভেনিসে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। Henri Estienne প্যারিসে ১৫০২ সালে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সেটি উঠিয়ে নিয়ে যান জেনেভায়। এই সব মুদ্রকেরা নিজেরা ছিলেন সুশিক্ষিত এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত।[৩৯]

বাংলা দেশে মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তন, বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ ও রেনেশাঁস আন্দোলনের শুরু মোটামুটি একই সময়ের ঘটনা। ভারতে ছাপাখানা আসে ইওরোপে আধুনিক মুদ্রণ শিল্প আবিষ্কৃত হবার প্রায় শতবর্ষ পরে।[৪০]

মিশনারীদের প্রথম প্রেসটি স্থাপিত হয়েছিল গোয়ায়। এই প্রেস থেকে ১৪৬৭ সালে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের লেখা একটি ধর্মপুস্তিকা ছেপে বার হয়।

প্রথম ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ ফ্রান্সিস জেভিয়ারের 'ডকট্রিনা খ্রীস্টা' গ্রন্থের তামিল অথবা মালয়ম অনুবাদ 'খৃষ্টীয় ভন্নকম' প্রকাশিত হয় ১৫৭৭ সালে।[৪১]

১৭৭৮ সালে কলকাতায় হিকির প্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ওই বছরই হুগলির একটি ছাপাখানায় চার্লস উইলকিনসের তত্ত্বাবধানে পঞ্চানন কর্মকারের ছেনিকাটা বাংলা টাইপ প্রথম ব্যবহার করা হয়। এই টাইপ নাথানিয়েল ব্রাসী হ্যালহেডের (১৭৫১-১৮৩০) প্রণীত 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ' গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। পুরো বই বাংলা টাইপে ছাপা নয়, কিছু কিছু উদ্ধৃতি রোমক টাইপের সঙ্গে বাংলা হরফে ছাপা হয়। সে যাই হোক এই বাংলা হরফের আবিষ্কারই বাঙালির নবজাগরণের শুভ অরুণোদয়।

১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয় বাংলায় দ্বিতীয় মুদ্রিত বই জোনাথান ডানকানের রেগুলেশনের বাংলা অনুবাদ[৪২] ওই একই কোম্পানীর প্রেস থেকে। ১৭৯১ ও ১৭৯২-১৭৯৩ সালে আরও তিনটি আইনের অনুবাদ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ১৮০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য তার আগে দু-একটি বেসরকারী প্রেসে বাংলা হরফে ছাপা হত। যেমন ১৭৯৯ সালে 'ফেরিজ এণ্ড কোম্পানী' নামে একটি প্রেস থেকে হেনরী পীটস ফরস্টারের ইংরাজী-বাংলা ও বাংলা-ইংরাজী অভিধানের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়।[৪৩] ১৭৯৭ সালে শ্রীরামপুরে আর একটি বেসরকারী প্রেস থেকে The Tutor বা 'শিক্ষাগুরু' নামে একটি ওয়ার্ড বুক ছাপা হয়েছিল।[৪৪] তবে সুখপাঠ্য জ্ঞানগর্ভ বাংলা বই মুদ্রণ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনই শুরু করেছিলেন। অনতিকালের মধ্যেই আরও বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলা প্রকাশন শিল্প বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে পাঠের আগ্রহ যে কী তীব্র হয়ে ওঠে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ১৮২০ সালে তার বিবরণ দিয়েছেন, "Even among the inferior gentry there are few who do not possess some of the works which the press has created."[৪৫]

ওই পত্রিকার লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে এই যে নবজাগ্রত মানসিক ক্ষুধা, চিন্তার রাজ্যে এই যে ভাব বিপ্লব তা জাতীয়জীবনে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে—

"The flame which has been kindled will probably through their exertions be kept alive, and there is reason to hope, that in the course of a few years, there will arise among the leading characters of the country, a body of enlightened natives animated with an ucconquarable thirst for knowledge."[৪৬]

এই মুদ্রিত বিষয় সমূহের মধ্যে সংবাদপত্র সবচেয়ে বেশী লোকমত গঠন ও জ্ঞান প্রসারে সাহায্য করেছে। তার কারণ সংবাদপত্রের একটি ধারাবাহিকতা আছে। সংবাদের প্রতি আগ্রহের জন্য পাঠকের মধ্যেও নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠের আগ্রহ গড়ে ওঠে এবং একবার গড়ে উঠলে তা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

আর তাছাড়া মুদ্রিত পুস্তকের চেয়ে সংবাদপত্র দামেও সস্তা। তাই সংবাদপত্রের মাধ্যমে রেনেশাঁসের ধ্যান ধারণার প্রচার সবচেয়ে সাফল্যজনক ভাবে অগ্রসর হতে পেরেছে। নবজাগরণের পটভূমিতে জনমানসে সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে ১৮৫১ সালের ১৪ এপ্রিল 'সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়' একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন। এই বিবরণটির মাধ্যমে বাঙালির নবজাগরণের ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রের অবদান যে কত অসামান্য ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"সমাচার দর্পণে বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা এখানকার ভূরি ২ জ্ঞানার্থি জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়াতে ত্বরায় তদুপকার বুঝিতে পারিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাহার ব্যবহার দ্বারা স্বদেশীর জনগণের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাচার দর্পণ প্রকাশ হইলে তাহার কিয়ৎকাল পরেই এতদ্দেশীয় যোগ্য ও স্বদেশ-হিতৈষী মহাশয়েরা স্বয়ং স্বদেশ ভাষায় সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে নানা বিষয়ের আলোচনা দ্বারা বহুদর্শন ও বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমে ২ দেশের সৌভাগ্য ও সদব্যবস্থার উদয় হইতে আরম্ভ হইল ফলে এদেশে যখন সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি না হইয়াছিল তখন সাধারণ বা স্বদেশের উপকারার্থে ব্যাপারের প্রসঙ্গ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের তদর্থ উৎসাহ প্রকাশ করা দূরে থাকুক দেশের অনিষ্ট যাহা আপনাকে ভোগ করিতে হয় তাহার নিবারণ নিমিত্ত উৎসাহও প্রায় কাহার ছিল না কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচারান্ত হইলে তদ্বারা দেশ-বিদেশের বিবরণ ও সাময়িক ঘটনা ইত্যাদির পরিজ্ঞান হওয়াতে সকলের সাহস হইল এবং কি উপায়ে স্বদেশের জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় তদর্থ যত্ন হইল।

"সংবাদপত্র এতদ্দেশীয় লোকদিগের দ্বারা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি ক্রমে ২ এদেশে লোকদিগের জ্ঞানালোচনা দ্বারা মানসিক সংস্কার কি পর্যন্ত বিভিন্ন

হইয়াছে তাহা এখন বিবেচনা করিলে বিস্ময় জন্মে। এতদ্দেশের পূর্বতন সতীধর্ম অর্থাৎ পতির পরলোকান্তে স্ত্রীলোকের সহগমন বা অনুগমন ধর্মশাস্ত্রসম্মত এবং ধর্মশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভক্তিপ্রযুক্ত অত্রত্য লোকদিগের মধ্যে তাহা অতি পবিত্র ও পরম পুণ্য কর্ম বলিয়া আবহমানকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু লর্ড বেণ্টিকের শাসনকালে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক তদ্বিষয়ের দোষ উদ্ভাবিত হইয়া তাহা নিবারিত হইলে সংবাদপত্রে এ বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা ক্রমে ২ এক্ষণে অত্রত্য জনগণের মনে সংস্কারের এক প্রকার পরিবর্তন হইয়াছে যে এখন প্রায় সকলেই সতীধর্ম ভয়ানক জ্ঞান করিয়া তাহাতে ধর্মবুদ্ধির বৈপরীত্য ঘোরতর নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করিয়া থাকেন।

"সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে তদ্বারা দেশের উপকার সম্ভাবনা অনেকে বুঝিতে পারিলেন এবং সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে উৎসাহ দেওয়াতে সেই উৎসাহ অন্যান্য ভূরি ২ ব্যক্তির সংবাদপত্র প্রচারে উৎসাহ জানাইবার কারণ হইল এবং তাহাতে এই মহানগরী মধ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে অতীত ও বর্তমানে ৭৭ খানা সংবাদপত্র প্রচার হয়।"[৪৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ

প্রচার সংখ্যার স্বল্পতা ও তার কারণ ॥ কলকাতায় প্রকাশিত সমসাময়িক ইংরাজি পত্রিকার সঙ্গে তুলনা ॥ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ॥ ইংলণ্ডের সংবাদপত্রের সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের তুলনা ॥ প্রচার সংখ্যার স্বল্পতা সত্বেও রাজশক্তির কাছে বাংলা সংবাদপত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি ॥ বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে বিভিন্ন সময়কার সরকারী মতামত ॥ বাংলা সংবাদপত্রের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ॥

অধ্যাপক জন সি মেরিল ও র‍্যালফ এল. লাওয়েনস্টাইন তাঁদের 'মিডিয়া মেসেজেস অ্যানড মেন' গ্রন্থে গণমাধ্যমের ক্রমবিকাশের ধারাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়টি হল: অভিজাত পর্যায় (**elitist stage**), দ্বিতীয়টি গণপ্রচার পর্যায় (**popular stage**) ও শেষের পর্যায়টি হল বিশেষ পর্যায় (**specialised stage**).

সংবাদপত্র বা অন্য মাস মিডিয়া প্রচারের প্রথম স্তরে সমস্ত দেশেই তার আবেদন একমাত্র অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত থাকে। এর কারণ অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। যে কোন দেশে শিক্ষা যতক্ষণ না সার্বজনীন হচ্ছে ততক্ষণ সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা শুধুমাত্র শিক্ষিত শ্রেণীর মাধ্যই আবদ্ধ থাকে। আবার ঐ দেশ চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত থাকলে শিক্ষিত দরিদ্র ব্যক্তিও সংবাদপত্র কেনার মত অর্থ সঙ্কুলান করতে পারেন না। ফলে এই পর্যায়ে সংবাদপত্রের প্রচার শুধু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত অভিজাত ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমিত থাকে।

শিক্ষার প্রসার এবং আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের গণপ্রচার সম্ভব হয় কিন্তু এই পর্যায়ে গণপ্রচারিত সংবাদপত্র শুধুমাত্র গণরুচির তুষ্টি বিধান করেই ক্ষান্ত থাকে।

ব্যাপক উচ্চ শিক্ষা, সামগ্রিক ভাবে আর্থিক সচ্ছলতা, নাতিদীর্ঘ জনসমষ্টি ও নাগরিক জীবনে পরিমিত অবসরের সঙ্গে সঙ্গে গণপ্রচারিত সংবাদপত্রের আর আবেদন থাকে না। তখন পাঠক শ্রেণী নিজেদের বিশেষ রুচি শিক্ষা ও পছন্দ অনুসারে **Specialised** সংবাদপত্র পাঠেই অধিকতর আগ্রহী হয় ওঠেন।

১৮১৮ থেকে বাংলা সংবাদপত্রের উদ্ভব কাল থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্র **elitist** পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল; বিশেষ করে গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাংলা সংবাদপত্রের পাঠকরা অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং সংবাদপত্রের প্রচার বেশীর ভাগই নগর এলাকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

তবু স্বল্প এবং সীমিত হলেও বাংলা সংবাদপত্রের পাঠক শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল আর এই পাঠক শ্রেণী গড়ে ওঠার পিছনে বাংলা বিদ্যালয়গুলির দান ছিল অসামান্য।

১৮০২ সালে দেশীয় খৃষ্টান শিশুদের জন্য মিশনারিরা যে বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করেন, সেখানে বাংলাকে অন্যতম বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে বাংলাকে যুক্ত করার সেই সর্বপ্রথম প্রয়াস। ১৮১৫ সালের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে প্রায় ২০০টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেগুলির শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা।[১]

সুতরাং বাংলায় নব্যশিক্ষিত এই শ্রেণীর বাস কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বল থেকেও বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু পত্রিকার কণ্ঠস্বর জাতীয় জাগরণের ঐকতানের মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

তবে বাংলা সংবাদপত্র গুণগত উৎকর্ষ ও চারিত্রিক দার্ঢ্যের দিক দিয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেও তার একটা বরাবরের দুর্বলতা ছিল, সেটি প্রচার সংখ্যার স্বল্পতা। এর অন্যতম কারণ নবজাগরণের ফলে শিক্ষা আন্দোলন ও লেখাপড়ার চর্চা জোয়ারের কলোচ্ছ্বাসের মত নগরজীবনকে প্লাবিত করেছিল বটে কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তা কখনও গণ আন্দোলনে পরিণত হয়নি। শিক্ষার আলোক মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনকেই শুধু আলোকিত করেছে। নগর জীবনের বাইরে গ্রামাঞ্চলে দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ শিক্ষার কোন সুযোগ পাননি এবং সামাজিক অর্থে যাকে বলা হয়, 'প্রণোদন' বা 'মোটিভেশন' তা কখনই 'মাস' বা জনতাকে স্পর্শ করেনি। ১৮৫০ সালে বাংলা দেশে সাক্ষরজ্ঞানের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র তিনভাগ অর্থাৎ দেশের ২ কোটি ৯০ লক্ষ লোক ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর।[২] ঐ বছরই প্রতি বাংলা সংবাদপত্রের পাঠক দশজন করে ধরলে মোট পাঠক সংখ্যা ৩০ হাজারের বেশী নয়। বিক্রয়ের সংখ্যা ছিল আরও কম ২৯৫০।[৩]

এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গিয়েও বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা যে আশানুরূপ বাড়েনি দিল্লির মহাফেজখানায় রক্ষিত দেশী সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারী অনুবাদকের বার্ষিক রিপোর্টগুলির প্রচার সংখ্যা দেখলে জানা যাবে।[৪]

পত্রিকার নাম	১৮৬৭	১৮৭০	১৮৭৭
সোমপ্রকাশ	৪৫০-৪৭৫	৭০০	৭০০
এডুকেশন গেজেট	৩৯৪	×	১১৬৮
সুলভ সমাচার	×	৩০০০	×
ঢাকা প্রকাশ	২৬৯	×	৪০০
তত্ত্ববোধিনী	৫০০	×	×
ভাস্কর	৪০০		
অমৃতবাজার পত্রিকা	×	২২১৭	২২১৭

নীচে ১৮৬৭ সালের আরও কয়েকটি বাংলা পত্রিকার প্রচার সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হল।

সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম	প্রচারের স্থান	প্রচার সংখ্যা
হিন্দুহিতৈষী	ঢাকা	৪০০
বিজ্ঞাপনী	ময়মনসিংহ	১৫০
রংপুর দিগপ্রকাশক	রংপুর	১৮০
ভারতরঞ্জন	বহরমপুর	২৫০
দূরবীণ	কলকাতা	২০০
সমাচার চন্দ্রিকা	কলকাতা	৭০০
সম্বাদ রসরাজ	কলকাতা	×
দৈনিক পত্রিকা		
বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা	কলকাতা	৬০০
পূর্ণচন্দ্রোদয়	ঐ	৩০০
সংবাদপ্রভাকর	ঐ	৫০০

অবশ্য তুলনামূলকভাবে প্রথমদিকে ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রচারও যে সর্বদা খুব বেশী ছিল তা বলা যায় না। ১৮৩০ সালে কলকাতায় আটটি ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা ছিল ৩৫১০। প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের আলাদা আলাদা প্রচার সংখ্যা দেওয়া হল।[৫]

পত্রিকার নাম	প্রচার সংখ্যা
বেঙ্গল হরকরা	৮০০
জনবুল	৪২০
ক্যালকাটা গেজেট	১৫০
গভর্নমেন্ট গেজেট	৫০০
ইণ্ডিয়া গেজেট	৪৬০
বেঙ্গল ক্রনিকল	৩০০
বেঙ্গল হেরাল্ড	২৫০
ওরিয়েন্টাল অবজারভার	৪১০

ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যার স্বল্পতার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে উনিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত ইংরেজরা এদেশে জমিজায়গা কিনে বসবাসের অধিকারী ছিলেন না; যেভাবে আমেরিকায় ও অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশে ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল ভারতে সে অর্থে ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে উঠতে পারেনি। কলোনাইজেশন যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী তা আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকেই ব্রিটিশ শাসকরা শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই জন্যই ইউরোপীয়দের যথেচ্ছ ভারত আগমনকে তাঁরা সন্দেহের চোখে

দেখতেন। এই প্রবল নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারতে ইংরাজী ভাষাভাষী ব্যক্তির সংখ্যা কখনই বিরাট বড় হয়ে ওঠেনি। ১৮১৪ থেকে ১৮৩২ সালের মধ্যে রাজকর্মচারী ছাড়া বেসরকারী ইওরোপীয়দের জনসংখ্যা গোটা ভারতে ১৩২৪ জনের বেশী ছিল না।[৬]

তবে উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে ইংরাজী পত্রিকার প্রচার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর একটা বড় কারণ ইংরাজী পত্রপত্রিকা ততদিনে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালির মধ্য থেকে পাঠক সৃষ্টি করে নিতে পেরেছিলল।

১৮২৯ সালে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মিলে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' প্রকাশ করেছিলেন। দ্বারকানাথ বেঙ্গল হরকরার মালিকানা স্বত্বও কিনে নেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর ও শ্যামাচরণ ঠাকুর ১৮৩১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক 'রিফর্মার' প্রকাশ করেছিলেন।

এইসব ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের মতামতকে ইংরেজ রাজকর্মচারী ও বিদেশী শাসকদের সামনে তুলে ধরা। তাঁরা জানতেন এইসব পত্রিকার প্রচার দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে বেশী হবে না। এই কারণে প্রসন্নকুমার 'রিফর্মারের' অনুবাদ 'অনুবাদিকা' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করে বিনা মূল্যে বিলির ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রসন্নকুমারের রিফর্মারের প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু'টাকা এবং এই চড়া মূল্যের জন্য রিফর্মার থেকে মুনাফাও হয়ত হত। ১৮৩২ সালে সংবাদ তিমির নাশক কটাক্ষ করে লিখছেন, "শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর অন্যূন নহেন, রিফর্মার কাগজ দুই টাকা করিয়া বিক্রয় করেন, তাহাতে অনেক মুনাফা আছে আছে অনুবাদিকা অমনি দিতে পারেন…" (সমাচার দর্পণ ২১ জানুয়ারী ১৮৩২ উদ্ধৃত)।

কিন্তু ১৮৩১ সালে সম্বাদ কৌমুদী লিখলেন, 'অস্মদ দেশের মধ্যে অনেকে ইংলণ্ডীয় ভাষা অবগত নহে সুতরাং রিফর্মারে কি প্রকাশ হয় অনেক লোক তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন না।' (১৮৩১ সালের ২৭ আগস্ট সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত)

দেখা যাচ্ছে ১৮৩১ সালেও ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি।

১৮২৮ সালে দৈনিক 'হরকরা' ডাকঘরের মারফত পাঠানো হত দিনে মাত্র ১৫৫টি করে। সুতরাং কলকাতার বাইরে ইংরাজী পত্রিকা প্রচার তখনও পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়নি।[৭]

ইংরাজী শিক্ষার গোড়াপত্তন ১৮১৭ সালে হলেও ত্রিশ দশকের আগে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটেনি। ইংরাজীর সপক্ষে মেকলের বিখ্যাত মাইনিউটের প্রকাশ কাল ১৮৩৫। ত্রিশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে নিজেদের সন্তানকে ছোটবেলা থেকে ইংরাজী স্কুলে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়। হিন্দুকলেজ, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, হেয়ার সাহেবের স্কুল, বেনিভোলেন্ট ইনষ্টিটিউশন, ভবানীপুর সেমিনারি, হিন্দু ফ্রি স্কুল, গরাণহাটা একাডেমি, কবরডাঙ্গা ও মীর্জাপুর ইংলিশ স্কুল

১৮৩৪ সালের মধ্যেই জমজমাট হয়ে ওঠে। "পাশাপাশি এমন কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে পাঠার্থিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয়।"[৮]

সমাচার চন্দ্রিকার জনৈক পত্রলেখক ১৮৩৪ সালে লিখছেন, 'বাঙ্গালা শিক্ষাতে সর্বসাধারণের অনুরাগ নাই।'[৯]

ইংরাজী সরকারী ভাষায় পরিণত হওয়ায় এই অনুরাগ আরও যে প্রগাঢ় হয় শুধু তাই নয়, ইংরাজীতে কথা বলা, ইংরাজী সংবাদপত্র পড়া ও অত্যুগ্র সাহেবীয়ানা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিশেষভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। স্বভাবতই স্বদেশীয়দের মধ্যে ইংরাজী সংবাদপত্রের পাঠক বাড়তে থাকে এবং উত্তরোত্তর আরও বাঙালি ইংরাজী সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এই বাঙালি পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রগুলি এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অর্জন করে। এইসব পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন বিদ্বৎসমাজে তাঁদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

১৮৬১ সালের ১ আগস্ট মনমোহন ঘোষ ইণ্ডিয়ান মিরর প্রতিষ্ঠিত করেন। তার আগে ১৮৩৬ সালের ১৬ নবেম্বর কাশীপ্রসাদ হিন্দু ইনটেলিজেনসার প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৫৫ সালের জুন মাসে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়টের (প্রথম প্রকাশ ৮৫৩) সম্পাদক হয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র ইণ্ডিয়ান ফিল্ড সম্পাদনা করেছিলেন। এছাড়া ইংরাজ সম্পাদিত ইংরাজী পত্রিকা পাঠে আত্মতৃপ্তি অনুভব করার মত বাঙালির সেদিন অভাব ছিল না।

এইসব কারণেও পরবর্তীকালে ইংরাজী সংবাদপত্রের প্রচার বাড়ে এবং বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার কমতে থাকে। ১৮৭৫ সালে যেখানে বেঙ্গল লাইব্রেরী ৫৩টি বাংলা পত্রিকা তালিকাভুক্তির জন্য পান, সেখানে ১৮৭৬ সালে পেয়েছিলেন মাত্র ৩৫টি পত্রিকা। এই হ্রাসের কারণ হিসাবে তাঁরা দায়ী করেছিলেন, ইংরাজী শিক্ষার উত্তরোত্তর প্রচলনকে।[১০] পাদ্রী রেভারেণ্ড লং তার আগে দেখিয়েছিলেন, ১৮৪০-১৮৫১ সালের মধ্যে ৩০টির মত বালা সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে।

অথচ আশা করা গিয়েছিল, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার আশানুরূপ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তা হয়নি।

ষাট দশকের বাংলা সংবাদপত্রের মন্দা বাজার সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকর লিখেছিলেন, "মনুষ্যের মন কোন সময়ে কোন কার্যে ধাবিত হয়, তাহা কিছুই বলা যায় না। সকলেই স্বার্থলাভে ব্যাকুল চিত্ত, একবার এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সংবাদপত্র ও নীতি প্রবন্ধ এবং কবিতাদি পূরিত মাসিক এবং সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্র প্রকাশে সাতিশয় অনুরাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অনুরাগের স্রোত অধিক দিবস প্রবাহিত হয় নাই। তাঁহারা যে কঠিনতর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তন্নির্বাহ করণের সম্যক ক্ষমতা না থাকাতে বিশেষতঃ জাতীয় পত্রাদির প্রতি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ না করাতে তাহারা

অধিকাংই বিলাসের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকার মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমাদৃতা হইয়া জীবিতা আছে। বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক পত্রের সম্ভব বড়, তাহার গ্রাহক সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহারা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয় না…।"

"পরন্তু অরুণোদয় নামে মিশনারীদিগের যে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে তাহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন তাহাই তল্লেখক মহাশয়দিগের উদ্দেশ্য। এডুকেশন গেজেট পত্র উত্তমরূপে নির্বাহ হইতেছে, বিশেষ গবর্নমেণ্ট তাহার বিশেষ সাহায্যকারী, কিন্তু তাহার গ্রাহক সংখ্যা কত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না।" (সংবাদ প্রভাকর, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০)

এছাড়া বাংলা সংবাদপত্র যাঁরা পড়তেন তাঁদের অনেকেরই প্রবণতা ছিল দাম না দেওয়ার। সংবাদপত্র পাঠ করে তাঁরা তৃপ্ত হতেন, উদ্দীপ্ত হতেন, উত্তেজিত হতেন, কিন্তু কিভাবে পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তা নিয়ে সাধারণ পাঠকের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদককে এ নিয়ে একাধিকবার আক্ষেপ করতে হয়েছে।

"দৈনিক পত্রের মূল্য ১ টাকা এবং সাপ্তাহিক পত্রের মূল্য চার আনা মাত্র, ইহাতেও কোন কোন মহাত্মা চারি, পাঁচ, ছয় বৎসর পর্যন্ত এক কপর্দক মাত্র প্রদান করেন নাই। কি এতন্নগর, কি এতৎপ্রদেশ, কি দূরদেশ কতগুলীন এমত সজ্জন মনুষ্য আছেন যাঁহারা দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর, দেড় বৎসর এবং দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত পত্রদ্বয় গ্রহণ করণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহারা আর টাকা দিবার নামও করেন না, সাক্ষাৎও করেন না, পত্র লিখিলেও উত্তর দেন না।" (সংবাদ প্রভাকর ১৮৫৩, ১২ এপ্রিল)

ওই বছরই ১৩ই মে সংবাদ প্রভাকর আবার লিখছেন : "একে এই দেশের দোষে বাঙ্গালা সমাচার পত্রের গ্রাহকের সংখ্যা অত্যল্পমাত্র তাহাতে যদি গ্রাহকেরা লিখিত-রূপে গৃহীত পত্রের মূল্য প্রদান না করেন তবে কি প্রকারে তাহার ব্যয় নির্বাহ হইয়া সকল বিষয়ের প্রতুল হইতে পারে ?

"কতিপয় সুযোগ্য সম্পাদক কয়েকখানি বাঙ্গালা সমাচার পত্র প্রচার করত সাধারণ সমাজে অত্যন্ত যশস্বী হইয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না, কারণ সাধারণ কর্তৃক সম্ভবত সাহায্যপ্রাপ্ত না হওয়াতে স্ব স্ব প্রণীত পত্রকে সজীব রাখিতে পারেন নাই। তাহা কি পরিতাপ।"

১৭ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখের প্রভাকর আক্ষেপ করে আবার লিখছেন, "এই সম্পাদকীয় কার্য কী ব্যয়ে ও কী উপায়ে নির্বাহ হয় তাহাতো বিবেচনা করা উচিত হয়। এই মহাশয়েরা মনে মনে কি ভাবিয়াছেন তাহা ইহারাই জানেন ও জগদীশ্বর জানেন। আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখি, তাঁহাদিগের মহত্ত্বের সীমা কতদূর

পর্যায়, পরে যখন নিতান্তই নিরুপায় দেখিব তখন যাহা কর্তব্য তাহাই করিব।" এই যাহা কর্তব্য কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ সহজেই অনুমেয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। সংবাদপত্রের ওপরেও তার প্রতিক্রিয়া পড়ে।

১৮৪০ সাল থেকে ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের কথাবার্তা চলতে থাকে। ১৮৪৯ সালে কোম্পানির সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির এক চুক্তি হয়। চুক্তি অনুসারে ঠিক হয় তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি অঞ্চলে রেল লাইন পাতবেন। প্রথমে বেছে নেওয়া হয় হাওড়া থেকে রাজমহল লাইনটি। সেই সঙ্গে আর একটি শাখা লাইনও মঞ্জুর হয়। হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ। এই রেল লাইন পাতবার ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৫১ সালের শীতকালে বর্ধমান থেকে রাজমহল লাইনটি সার্ভে করা হয়। পরের বছর সার্ভে হয় এলাহাবাদ পর্যন্ত।

আরও যেসব ট্রাঙ্ক লাইনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, সেগুলি হল কলকাতা থেকে লাহোর। আগ্রা থেকে বোম্বে। বোম্বে থেকে মাদরাজ। মাদরাজ থেকে মালাবার উপকূল।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে কলকাতা রানীগঞ্জ রেলপথের শুভ উদ্বোধন হয় ১৮৫৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি।[১২]

কলকাতায় প্রথম ইলেকট্রিক বসেছিল ১৮৪৯ সালের শেষে।[১৩] ওই বছর নবেম্বর মাসে কলকাতা ডায়মণ্ড হারবার লাইন টানা হয়। জনসাধারণের জন্য টেলিগ্রাফ লাইন উন্মুক্ত করা হয় ১৮৫১ সালে। কলকাতা আগ্রার মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন বসানোর কাজ ১৮৫৩ সালে শুরু হয় এবং ১৮৫৪ সালের ২৪ মার্চ ৮০০ মাইল পথে প্রথম তারবার্তা প্রেরিত হয়েছিল। ১৮৫৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে আগ্রা কলকাতা টেলিগ্রাফ লাইন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। ওই বছর বোম্বাই মাদরাজ লাইনও চালু হয়ে যায়। ১৮৫৫ সালের মধ্যে গোটা ভারতে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে টেলিগ্রাফের বিস্তার ঘটেছে। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে চার হাজর মাইল টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয়েছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে।[১৪] টেলিগ্রাফের বার্তা প্রেরণের ব্যয়ও অনেক কমে গিয়েছিল। এমনকি ডালহৌসির নতুন ব্যবস্থার ফলে ভারতবর্ষে ট্রেন টেলিগ্রাফে বার্তা পাঠানোর ব্যয় ইংলণ্ড আমেরিকার টেলিগ্রাফের ব্যয়ের চেয়েও কম পড়ে।

ইংলণ্ডে ৪০০ মাইল দূরে ২০ শব্দের একটি বার্তা পাঠাতে যেখানে ব্যয় পড়ত ৫ শিলিং সেখানে কলকাতা থেকে বেনারস ৪২০ মাইল দূরে বার্তা পাঠানোর ব্যয় ছিল ৩ শিলিং। নিউ ইয়র্ক থেকে নিউ ওরলিয়ান্স এই দু'হাজার মাইল পথে ১৬ শব্দ বিশিষ্ট একটি তারবার্তা পাঠাতে খরচ লাগত ১৩ শিলিং ৬ পেনি অথচ কলকাতা থেকে বাঙ্গালোর যার দূরত্ব দুহাজার মাইলের বেশি সমপরিমাণ শব্দের টেলিগ্রাম মাশুল ছিল মাত্র ১০ শিলিং।[১৫]

ডালহৌসির রাজত্বে ১৮৫৬ সালের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আর একটি যে বিরাট বিপ্লব সূচীত হয় সেটি হল সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য সমহারের ডাকমাশুল। এ পর্যন্ত ডাকমাশুল যে দূরত্ব অনুসারে নির্ধারিত হত তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

সাধারণ চিঠির জন্য ডাকমাশুল নির্ধারিত হল আধ আনা আর সংবাদপত্রের জন্য মাত্র এক আনা (দেড় পেনি)। নগদ দামে স্ট্যাম্প বিক্রয়ের নিয়ম চালু হল। বিদেশী ডাকের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হল। ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে চিঠির ডাকমাশুল ধার্য হয়েছিল মাত্র ৬ পেনি (চার আনা)।

তিন বছর আগে ডাকমাশুল যা ধার্য ছিল তা থেকে ১৬ গুণ কম পড়তে লাগল বর্তমানের ডাকমাশুল। তিন বছর আগে পেশোয়ার থেকে লাহোরে একটি চিঠি পাঠাতে যে ব্যয় লাগত এখন সে চিঠি ইংলণ্ড পর্যন্ত পাঠানো যেতে লাগল।[১৬]

শুধু সংযোগই নয় দ্রুততার সঙ্গে বার্তা প্রেরণই ছিল নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ডালহৌসি তাঁর মাইনিউটে লিখেছেন :

"We have reportedly sent the first bulletin of overland news 40 minutes from Bombay to Calcutta 1600 miles. We have delivered despatches from Calcutta to the Governor General at Ootcamund during the rainy season, in three hours the distance being 200 miles greater than London to Sabastopel. We have never failed for a whole year in delivering the mail news from England via Bombay within 12 hours."[১৭]

যোগাযোগ ব্যবস্থার এই নিদারুণ বিপ্লব দেশীয় সংবাদপত্রের পক্ষে সবচেয়ে সহায়ক হয়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। সমগ্র ভারত জুড়ে একই হারে ডাকমাশুল প্রবর্তন তো সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এক পরম আশীর্বাদ। অতীতে এই ডাকমাশুলই সংবাদপত্রের প্রচারের পক্ষে অন্তরায় হয়েছে। ১৮৩৪ সালে সরকার ডাকমাশুল আরও বৃদ্ধি করলে সমাচার দর্পণ পত্রিকার মফস্বল গ্রাহক সংখ্যা নিদারুণ ভাবে হ্রাস পায়। দর্পণ সেসময় সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হত। বাড়তি মাশুল দিলে যাতে গ্রাহকদের ওপর আর্থিক চাপ না পড়ে তার জন্য বুধবারের সংখ্যাগুলি তুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩৪ সালের ৫ নবেম্বর দর্পণ বিজ্ঞপ্তি দেন : "পাঠক মহাশয়েরদিগকে অতি খেদপূর্বক আমরা জ্ঞাপন করিতেছি যে ইহার পূর্বে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের যে মাস্থল নির্দিষ্ট ছিল তাহা সম্প্রতি গবর্নমেন্টের হুকুম ক্রমে দ্বিগুণ হওয়াতে ইহার পর অবধিই আমাদের বুধবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ রহিত করিতে হইল।"

"এই মাস্থল বৃদ্ধি হওয়াতে মফস্বল নিবাসী এক গ্রাহক মহাশয়েরা দর্পণ ত্যাগ করিয়াছেন এবং এই বৎসরের শেষেই তাহা তাঁহাদের নিকটে প্রেরণ করিতে বারণ করিয়াছেন। যে দর্পণের মূল্য যদি কিছু কমান যায় তবে বোধ হয় যে আমাদের মফস্বলের গ্রাহক আর থাকেন না অতএব এইক্ষণে আমরা পূর্ববৎ সপ্তাহের মধ্যে

কেবল একবার অর্থাৎ শনিবাসরীয় দর্পণ প্রকাশ করিব এবং তাহার মূল্যও পূর্ববৎ ১ টাকা স্থির করিব।"

সংবাদপত্রের প্রচার বৃদ্ধির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এই ডাকমাশুল যখন অনেক সুলভ হয়ে গেল তখন বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার হু হু করে বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়নি। অবশ্য ডাকমাশুল সুলভ হওয়ার ফলে কোন প্রতিক্রিয়াই যে হয়নি তা বললে ভুল বলা হবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রের কপি কিছু কিছু যেতে শুরু করে।

১৮৭৭ সালের হোম পাবলিক ডিপার্টমেণ্টের রেকর্ডস থেকে দেখা যাচ্ছে 'ভারত মিহির' পত্রিকার কিছু গ্রাহক রয়েছে আসাম ভাগলপুরে পাটনায় এমনকি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। 'ঢাকা প্রকাশ' যাচ্ছে মণিপুর, বার্মা, পাঞ্জাব এমনকি সুদূর বেলজিয়মে। 'এডুকেশন গেজেট' অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে। 'প্রতিকার' বোম্বায়ে। 'সাধারণীর' কিছু গ্রাহক আছেন নেপালে এমনকি কাশ্মীরে। 'সোমপ্রকাশ' যাচ্ছে অযোধ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ওড়িষা, আসাম, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।[১৮]

কিন্তু প্রচার সংখ্যা তাতে এমন আশানুরূপ বাড়েনি যাতে ব্যবসায়িক সাফল্য আসতে পারে। অন্যদিকে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও সংবাদপত্রগুলি সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে তার যথাযথ সুযোগ গ্রহণ করে আধুনিক সাংবাদিকতার নবযুগ সৃষ্টি করতে পারেনি। বিভিন্ন সংবাদপত্রের মধ্যে সংবাদ সংগ্রহের ও প্রকাশের তীব্র প্রতিযোগিতাও পরিলক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ সংবাদপত্র শিল্প হয়ে ওঠার পক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে উপযোগী পরিবেশ বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, তার সুযোগ গ্রহণ করার মত আর্থিক সচ্ছলতা ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কোনটাই বাংলা সংবাদপত্র পরিচালকদের ছিল না। টেকনিক্যাল বা কারিগরি দিকের এই ত্রুটিই ছিল বাংলা সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটি।

১৮৮৬ সালের ২২ জানুয়ারি তদানীন্তন হোম সেক্রেটারির একটি চিঠিতে জানা যাচ্ছে যে টেলিগ্রাফের কনসেসন কোন দেশী সংবাদপত্রের প্রতি প্রযোজ্য নয় এবং কোন দেশী সংবাদপত্র এই কনসেসনের জন্য আবেদনও করেননি।[১৯]

বাংলা সংবাদপত্রের এই পশ্চাদমুখীনতার জন্য দায়ী আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। ধনীর অর্থ সাহায্য বাংলা সংবাদপত্রের পিছনে ছিল কিন্তু পুঁজিপতির অর্থ লগ্নী ছিল না। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংবাদপত্রগুলি প্রকাশিত হত না। উদ্যম ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৌখিন। প্রকৃত অর্থে প্রফেশানালিজম বা বৃত্তিগত চিন্তাধারা তখনও পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেনি। প্রচার বৃদ্ধির জন্য অভিযান, পত্রিকার মুদ্রণ পারিপাট্য, টাটকা খবর সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয় ছিল উপেক্ষিত। সংবাদপত্র আকর্ষণীয়

না হলে পাঠক সংখ্যা বাড়বে না আবার পাঠক না বাড়লে, আয় বৃদ্ধি না হলে আধুনিকীকরণের মত ব্যয়সাপেক্ষ কাজেও হাত দেওয়া যায় না। সংবাদপত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে এই পরস্পর নির্ভরশীল সর্ত অনেকটা দুষ্ট চক্রের মত কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে কিছুটা ঝুঁকি নিতে হয়। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি নেবার মত কোন শিল্পপতির আবির্ভাব ঘটেনি। শিল্প হিসাবে বাংলার সংবাদপত্র সেদিন অকল্পনীয়। সংবাদপত্র সেদিন শুধু মতামত প্রকাশের মাধ্যম, সংগ্রাম ও সংস্কারের হাতিয়ার, এজন্য বেশী মাত্রায় মতামত প্রধান। অন্যদিকে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র শিল্পে অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই জন বেল (দি মর্ণিং গেজেট) জন ওয়ালটার (দি টাইমস), জেমস পেরী (মর্ণিং ক্রনিকল) প্রমুখের মত অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধি-সম্পন্ন সংবাদপত্র মালিকদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা অতি সহজেই শিল্প হিসাবে সংবাদপত্রের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সমাজ পরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে তাঁরা কেউ সংবাদপত্রকে দেখেননি।

একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া বাঙলা সংবাদপত্র প্রকাশ যে কখনও লাভজনক হয়ে ওঠেনি তা সেযুগের একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশকের স্বীকৃতিতে পাওয়া যাবে। বরং সংবাদপত্র প্রকাশের চেয়ে পুস্তক প্রকাশ ও ছাপাখানা চালানো অধিকতর লাভজনক ছিল।

১৮৬৮ সালে বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারি লিখছেন, ১৮৬৭ সালের মধ্যে কলকাতার বড়তলা (বটতলা) অঞ্চল প্রতি মাসে নানা ছাপার বইতে ভরে উঠছে।[২০] ১৮৬৫-৬৬ সালে কলকাতা ও ২৪ পরগনায় ১৩টি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া যশোরে পি, এল, ঘোষ মহাশয় অমৃত প্রবাহিনী প্রেস তৈরি করেছেন। সেখানে শুধু চিঠি ও দাখিলা ছাপা হচ্ছে।[২১]

১৮৬৬-৬৭ সালে বাংলাদেশে প্রেসের একটি হিসাব পাওয়া গেছে।

ঢাকা	৩	রংপুর	২
ময়মনসিং	১	বর্ধমান	১
মুর্শিদাবাদ	২	হুগলী	১
হাওড়া	২	শ্রীরামপুর	৪
মেদিনীপুর	১	ভবানীপুর	১
		কলকাতা	১৩

১৮৬০ সালে সংবাদ প্রভাকর লিখেছেন :

"সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশপূর্বক অর্থোপার্জন অথবা সুখ্যাতি লাভ করা অতি কঠিন, এ কারণে এইক্ষণে অনেকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুস্তক রচনায় চিত্তনিবেশ করিয়াছেন।' (সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রভাকর ৭-২-১৮৬০)

১৮৬০ সালে সংবাদ প্রভাকরের এই উক্তির মধ্যে যেন পূরবীর শেষ রাগিণীর সুরই ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এত বছরের গৌরবোজ্জল ইতিহাসের যে এই করুণ পরিণতি হবে

তা কেউই বোধ হয় ভাবেননি। ১৮৩১ সালে যখন সম্বাদসার সংগ্রহ নামে একটি নূতন বাংলা সংবাদপত্র স্থাপন করা হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তখন সমাচার দর্পণ আশঙ্কা করেছিলেন নতুন পত্রিকা গ্রাহক পাবেন না। কারণ প্রস্তাবিত পত্রিকার গ্রাহক মূল্য ধার্য হয়েছে দুটাকা। 'ইহার পূর্বে যে সকল সংবাদপত্র মাসিক দুই টাকা মূল্যে প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাহা সকলই বিফল হইয়াছে।' (৩ সেপ্‌টেম্বর. ১৮৩১) তবে সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও করেছিলেন, "ইহার দশ বৎসর পরে পাঠকের সংখ্যা যখন দশগুণ বৃদ্ধি হইবে তখন ঈদৃশ প্রস্তাব সম্ভবিতে পারে!" কিন্তু দশ বছর দূরে যাক ত্রিশ বছর পরেও বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে কোন আর্থিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।

অবশ্য ষাট দশকে বাংলা সংবাদপত্র জগতে উপযুক্ত নেতৃত্বেরও অভাব ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দিকপাল সাংবাদিকরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভবানীচরণের মৃত্যু হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। ঈশ্বর গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ১৮৫৯ সালে পরলোক গমন করেছিলেন। অক্ষয়কুমার জীবিত, কিন্তু ১৮৫৫ সালেই তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা ছেড়েছেন। স্বভাবতই বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ ভাস্কর, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় তখনও টিকে ছিল, কিন্তু আগের মত সগৌরবে আর সমাসীন ছিল না। এঁদের সম্পর্কে ১৮৬৬ সালে সরকারী বাংলা অনুবাদক জে রবিনসনের মন্তব্য হল:

'But the last ten years have furnished a class of journalist who have thrown those of long standing into the shade; and they seen to have quietly submitted to their fate, and are now satisfied with little more than echoing the sentiments of their more talented contemporaries.'[২২]

অবশ্য এই শূন্যতার মধ্যেও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন। ষাট দশকের শেষে অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে শিশিরকুমার নতুন সাংবাদিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বারকানাথের ক্ষুরধার লেখনী ছিল, নিষ্ঠা ছিল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। কিন্তু আধুনিক সংবাদপত্রের শিল্পগত রূপটি তাঁর চোখে কখনও প্রতিভাত হয়ে ওঠেনি। একমাত্র শিশিরকুমারই আধুনিক সংবাদপত্রের অস্ফুট কল্লোলধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। বৈষয়িক বুদ্ধির প্রখরতাও তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর স্থাপিত অমৃতবাজার পত্রিকাই একারণে টিঁকে থাকতে পেরেছিল। অবশ্য অমৃতবাজার বাংলা পত্রিকা থাকলে কত বছর অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারত বলা কঠিন। কারণ ইংরাজী শিক্ষার প্রাবল্যে শিক্ষিত বাঙ্গালী যে অতিদ্রুত বাংলা সংবাদপত্র পাঠ ভুলতে বসেছিলেন তা আগেই উল্লেখ করেছি।

বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক একটি সাময়িক ইস্যুতে বা বিশিষ্ট সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব ও লেখনীর জোরে কোন সংবাদপত্র সাময়িকভাবে মুনাফা করলেও পরবর্তীকালে সেই আর্থিক সমৃদ্ধির পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি।

আর তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অর্থ এই নয় যে দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রগতিশীল চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। দেশের আপামর জনসাধারণ যাঁরা গ্রামে বাস করতেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কোন সুচিন্তিত মতামত গড়ে ওঠেনি। শুধু অর্থনৈতিক শোষণ প্রবলতর হয়ে উঠলে স্থানে স্থানে প্রচণ্ড জনবিক্ষোভ খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের রূপে হাউই-এর মত জ্বলে উঠে আবার ফুরিয়ে গিয়েছে এই মাত্র। রেনেশাঁসের কেন্দ্রভূমি ছিল নাগরিক মানস। কিন্তু এই নাগরিক মানসও জাতীয় জাগরণের মশালের আলোকে সর্বদা পূর্ণ আলোকিত হয়ে উঠেছিল তা নয়। শহরের নব্য শিক্ষিত জনসাধারণও মডারেট, রাডিক্যাল ও কনজারভেটিভ এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এই কনজারভেটিভ বা সংস্কার-বিরোধী শিবিরের শক্তি যে যথেষ্ট প্রবল ছিল, তার প্রমাণ বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সংবাদপত্রের পাঠক চরিত্রের মধ্যেও তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সতীদাহ ইস্যুতে ভবানীচরণ ১৮২২ সালেই সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন এবং সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল এই যে সমাচার চন্দ্রিকার প্রচার বাড়তে সুরু করেছিল, সম্বাদ কৌমুদীর কমতে সুরু করেছিল। শেষের দিকে নিদারুণ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে কালীনাথ মুন্সী ও দ্বারিকানাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যের ওপর নির্ভর করে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত কৌমুদী কোন রকমে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখে। অন্যদিকে ভবানীচরণের চন্দ্রিকার কলাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সতীদাহ ইস্যু এবং ভবানীচরণের লেখনী চন্দ্রিকার আর্থিক সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। চন্দ্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশ গ্রাহক হয়। পত্রিকাটি কিছু দিন দৈনিকেও পরিণত হয়েছিল।[২৩] পরে আবার দ্বি-সাপ্তাহিক হয়ে যায়। প্রচণ্ড আর্থিক সমৃদ্ধি থাকলে এ কাগজ দৈনিকই থাকত।

১৮৪৮ সালে ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে রাজকৃষ্ণ চন্দ্রিকা সম্পাদক হন। রাজকৃষ্ণ যে পিতৃ অর্জিত বিত্তের অধিকারী হয়েছিলেন তার প্রমাণ ১৮৫৯ সালে তাঁর বড় ছেলের বিয়েতে যথেষ্ট ঘটা করেছিলেন।[২৪] কিন্তু রাজকৃষ্ণের এই পরিমাণ অর্থ শুধু চন্দ্রিকা থেকে হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ ভবানীচরণের নিজস্ব ছাপাখানা ও প্রকাশনা ছিল। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রিকাও চলেনি। দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে রাজকৃষ্ণ দেউলিয়া হয়ে মাত্র ২৫০ টাকায় চন্দ্রিকা বিক্রয় করে দিয়েছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশ যে সম্ভব হয়েছিল সে কথা আগেই বলেছি। ১৮৩২ সালে যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩১ সালে ১৮ জুন পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। পরে পাথুরিয়া ঘাটার বিত্তশালী কানাইলাল ঠাকুর ও গোপালচন্দ্র ঠাকুর অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হলে ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট পত্রিকাটি আবার প্রকাশিত হতে সুরু করে।

১৮৫৩ সালের ৪ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকরের এক প্রতিবেদনে জানা যায় : ১৮১৮ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে ৭৬টি বাংলা পত্রিকা মৃত। ১৯টি মাত্র জীবিত। জীবিত পত্রিকার মধ্যে ১৩টি মাত্র সংবাদপত্র। তার মধ্যে দুটি দৈনিক। এই হিসাবে দেখা যায়

৩৫ বছরের মধ্যে প্রতি পাঁচখানা সাময়িক পত্র পিছু চারখানি করে পত্র বিদায় নিয়েছে।

অবশ্য সংবাদপত্রের দীর্ঘায়ু সর্বদা সহজলভ্য নয়। সংবাদপত্র গঠনের যুগে নানা রকমের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়েই তার যাত্রাপথ স্থরু হয়। আমেরিকাতেও ১৬৯০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে প্রকাশিত ২১২০টি সংবাদপত্রের অর্ধেকেরই আয়ু দুবছরের বেশী ছিল না। মাত্র ৩৪টি সংবাদপত্র এক জেনারেশন টিকে থাকে।[২৫]

সে তুলনায় ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদপত্রের মধ্যে সমাচার দর্পণ ২৭ বছর ধরে চলেছিল। সমাচার চন্দ্রিকা ৫৫ বছর চলে, সংবাদ প্রভাকর ১৮৯২ সাল পর্যন্ত চলার প্রমাণ আছে। তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) ১৯২৩ সাল পর্যন্ত চলেছিল। বাংলা দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে এই কটি বিখ্যাত পত্রিকার দীর্ঘজীবনও আবার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলতে হবে।

পরিচালকদের কমারসিয়াল বা বাণিজ্যিক দৃষ্টির অভাব এবং সেই সঙ্গে বৃত্তির প্রতি নিরপেক্ষ মনঃসংযোগের ত্রুটি বাংলা সংবাদপত্রের অসাফল্যের কারণ একথা আগেই বলেছি। এই উভয় ত্রুটি থেকে মুক্ত হবার দরুণ ইংলণ্ডের সম-সাময়িক সংবাদপত্রগুলি কালোত্তীর্ণ হয়ে টিঁকে থাকতে পেরেছিল। 'দি টাইমস' (প্রথম প্রকাশ, ১ জানুয়ারি, ১৭৮৫), ডেলি টেলিগ্রাফ (২৯ জুন, ১৮৫৫), ডেলি মেল (৪ মে, ১৮৯৬) টিকে থাকতে পেরেছে তার কারণ পরিচালকদের ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি। টাইমসের প্রতিষ্ঠাতা জন ওয়ালটার (১৭৩৯-১৮১২) তো প্রখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ী ছিলেন। তৎকালীন মুদ্রণ শিল্পে নব আবিষ্কৃত লোগোটাইপে ছাপা হয়ে টাইমস মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রেও নতুনত্বের স্বাদ বহন করে এনেছিল।

টাইমস-এর প্রকাশক পাঠকরুচির দিকে দৃষ্টি রেখেই এ কাগজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন:

The Register of the times and faithful recorder of ever & species of the intelligence, it ought not be engrossed by any particular object; but, like a well covered table, it should contain something suited to every palate, observations on the dispositions of our own foreign courts should be provided for the political leaders, debates should be reported for the amusement or information of those who may be particularly fond of them; and a due attention should be paid to the interests of trade which are so greatly promoted by advertisement.[২৬]

টাইমস ফরাসী বিপ্লব কভার করার জন্য প্যারিসে সংবাদদাতা পাঠিয়েছিলেন এবং ১৮৯২ সালে ষোড়শ লুই ও মেরি আন্তোনিয়েতার শিরোচ্ছেদের বিশেষ প্রতিবেদন টাইমসে প্রকাশিত হয়েছিল। সাত বছরের মধ্যে টাইমস-এর প্রচার সংখ্যা বেড়ে চার হাজারে ওঠে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের প্রতিবেদন টাইমস-এর সম্মান আরও বৃদ্ধি করে।

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 'মার্নিং স্টার ইভনিং স্টার' পত্রিকার পিছনে ৮০ হাজার পাউণ্ডের মূলধন লগ্নী ছিল।[২৭]

পূর্ণ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে পাঠকদের মধ্যে টিঁকে থাকার জন্য টেলিগ্রাফ দু' পেনি দাম করে সংবাদপত্র জগতে বিরাট চাঞ্চল্য এনেছিল। সে সময় সংবাদপত্রের প্রচলিত দাম ছিল ৪ পেনি।

মূল্য হ্রাসের পিছনে যুক্তি দিয়ে ডেলি টেলিগ্রাফ ১৮৫৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে :

There is no reason why a daily newes paper conducted with a high tone, should not be produced at a price which would place it within the means of every class of community. The future stability of the revered institutions of this country must depend more upon the enlightment of the million, than all the bayonets and legions the enormous wealthy of the nation would enable it to collect upon its shores.[২৮]

দ্বিতীয় ডেলি টেলিগ্রাফের জনপ্রিয়তার পিছনেও নানান চাঞ্চল্যকর সংবাদের আকর্ষণ ছিল। যেমন ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা অসাধারণ পণ্ডিত প্রতিবেদক ডাঃ এমিল জোসেফের (১৮৫৪-১৯৩৩) প্রেরিত রিপোর্টগুলি, ১৮৯৪ সালে জোসেফ রুশ অফিসারের ছদ্মবেশে আর্মেনিয়া ভ্রমণ করে সেখান থেকে চাঞ্চল্যকর সংবাদ সংগ্রহ করে এনেছিলেন।[২৯]

বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে সুলভ সমাচারের মধ্য দিয়ে গণ-প্রচারিত সংবাদপত্র বা মাস নিউজপেপার গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছিল। এক পয়সা দাম করার জন্য পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যাও বেড়েছিল। সুলভ সমাচার প্রথম সংখ্যা দু' হাজার ছাপা হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা পাঁচ হাজার। তারপর প্রচার আরও বৃদ্ধি পায়।[৩০] এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ চেয়েছিলেন পত্রিকাটি সাধারণ মানুষের কাছে যাক। 'সেদিন গাড়োয়ানেরা পর্যন্ত সুলভ সমাচার হাতে লইয়া প্রসন্ন মনে গাড়ীর উপর পড়িতে পড়িতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবে সেদিন আমাদের পক্ষে কত আহ্লাদের দিন হইবে।'[৩১]

কিন্তু সুলভ সমাচার সমসাময়িক অন্যান্য বাংলা সংবাদপত্র থেকে সংবাদ প্রকাশের দিক থেকে কোন বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। অন্যান্য পত্রিকার মত এ পত্রিকাও ছিল মতামত প্রধান।

অন্যদিতে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি ছিল সংবাদ নির্ভর। সংবাদ সংগ্রহের প্রতি-যোগিতা সুলভ মূল্য, সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত পরিচালনাই ইংলণ্ডে কয়েকটি সংবাদপত্রকে আজও পর্যন্ত টিঁকিয়ে রেখেছে। তাছাড়া ইংরেজদের পাঠ্যাভ্যাস বা 'রিডিং হ্যাবিটও' জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সমাচার দর্পণ প্রকাশের সময় (১৮১৮-১৮১৯) ইংলণ্ডে ৪৩৩টি সাময়িক পত্রের প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। মনে রাখতে হবে ষ্ট্যাম্প

ডিউটির জন্য সংবাদপত্রের দাম তখনও সুলভ ছিল না।[৩২] ১৮৪৫ সালে দ্বিসাপ্তাহিক ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের প্রচার ছিল নয় হাজার।[৩৩] আর ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময় (১৮৭০-৭১) ডেলি টেলিগ্রাফের প্রচার সংখ্যা দু'লক্ষে উঠে যায়।[৩৪]

১৮৫৭ সালের দিকে দেখা যায় টাইমস, ডেলি টেলিগ্রাফ ও স্ট্যানডারড প্রভৃতি সংবাদপত্রের মধ্যে মূল্যহ্রাসের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। এই হ্রাসের ফলে কিছু কিছু সংবাদপত্র সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু মোটের ওপর পাঠকদের তা সংবাদপত্র পাঠে অধিকতর প্রণোদিত করেছে।

বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এইসব ব্যবসায়িক খুঁটিনাটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি। কেশবচন্দ্র সেন এক পয়সা দামে সুলভ সমাচার প্রকাশ করে ভাল ফলই পেয়েছিলেন কিন্তু মনে রাখতে হবে কেশব সেন মুখ্যত সমাজ সংস্কারক, ব্যবসায়ী নন।

বাংলা সংবাদপত্র তাই বিচিত্র পথে গেলেও সর্বত্রগামী হয়নি। সাধারণ মানুষের কাছে তার বাণী গিয়ে পৌঁছয়নি। ১৮৭১ সালে বাংলা সরকারের সরকারী অনুবাদক বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখছেন,

"Except occasionally they do not reach the lower classes of the native community. They are patronised to some extent by Government officers and others who have received a fair English Education but mainly by Zeminders, vernacular school masters, mukhtars and Court and Zemindari Omlahs. Many educated persons take vernacular newspapers but seldem read them, execept now and then."[৩৫]

৮৭৭ সালের ১৭ এপ্রিল সমাচার চন্দ্রিকার কথায় বাংলা অনুবাদকের বক্তব্যেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

"কেবল লণ্ডন নগরী হইতে ৩২০ খানি সমাচার পত্র প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রদেশে ৯১১ খানি সমাচারপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের সামান্য কৃষকেরাও এক একখানি সংবাদপত্র পাঠ করে। তথাকার জাহাজের নাবিক ও সামান্য মজুর প্রভৃতি নীচ লোকেও একখানি সংবাদপত্র পাঠ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের এদেশের লোকদিগের মধ্যে যাহার এক লক্ষ টাকার বিষয় আছে তিনি হয়ত একখানি সংবাদপত্রের নাম পর্যন্ত জানেন না। ইহাতে আর ভারতমাতার উন্নতি হইবে কিসে?"

তবে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যেখানে দুর্বলতা, সেখানেই আবার তার সর্বাধিক শক্তির পরিচয়। ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন সাংবাদিকতার চরম লক্ষ্য ছিল না বলেই অধিকাংশ সংবাদপত্র নির্দ্বিধায় জাতীয় জাগরণের বাণীকে ধ্বনিত করে তুলতে পেরেছে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্রিটিশ রাজশক্তির তীব্র কঠোর সমালোচনাতেও সে পরাঙ্মুখ হয়নি। আবার প্রচার সংখ্যার স্বল্পতার জন্যও তার

ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছতে কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। এক জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার বাণীকে জনসাধারণের মধ্যে ধ্বনিত করা। অন্যদিকে জনমতকে রাজশক্তির কাছে উপস্থিত করা এবং সুষ্ঠু প্রতিবিধানের দাবিকে সোচ্চার করে তোলা।

একথা ঠিক যে বাংলা সংবাদপত্রের পাঠক ছিল মধ্যবিত্ত ও সামন্ত বাঙালি। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলার জাতীয় নেতৃত্ব এই মধ্যবিত্ত ও সামন্ত শ্রেণীর হাতেই ছিল। এঁদের অনেকে পয়সা দিয়ে কাগজ কিনে পড়তেন না বলে বাংলা অনুবাদক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ঢিমে তেতালা সামাজিক জীবনে নিরবিচ্ছিন্ন অবসরের মাঝে সংবাদপত্র পয়সা দিয়ে কেনা সত্ত্বেও কেউ পড়ছেন না তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। আর না পড়লেও গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র সমাজে কোন কোন সংবাদপত্রে কোন সতেজ লেখা প্রকাশিত হলে তা নিয়ে সমাজে নিশ্চয়ই আলোড়ন উঠত। দ্বিতীয়ত যেহেতু সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাংলা সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেজন্য বাংলা সাংবাদপত্রের মতামতকে রাজশক্তি উপেক্ষা তো করেননি বরং অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি বাংলা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের যে প্রচেষ্টা বার বার হয়েছে তাও এই গুরুত্ব দান নীতির অঙ্গ হিসাবেই।

দেশী সংবাদপত্রের অপরিসীম গুরুত্ব সম্পর্কে বিদেশী শাসকরাই মন্তব্য করেছেন,

"The native newspapers are humble in appearance yet like the balladers of a nation. They often act where laws fail and as straws on a current they show its direction. In it questions of Sati, widow re-marriage, Kulin Poligamy have been argued with great skill and acuteness on both sides : they have always opposed having a foreign language as the language of the court : the atroocities of indigo planters and the blunders of young Magistrates have been laid bare, while the correspondence columns open out a view of native society no where else to be found."[৩৬]

এই ক্ষুদ্র শীর্ণ এবং দরিদ্র বাংলা সংবাপত্রগুলিই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি এবং পরিণামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণলঙ্কায় তারা যে একদিন অগ্নিকাণ্ড বাধাতে পারে সেম্পর্কে ১৮২২ সাল থেকেই ইংরেজ শাসকরা অবহিত হচ্ছিলেন।

১৮২২ সালে টমাস মুনরো তাঁর মাইনিউটে দেশী সংবাদপত্র সম্পর্কে লিখেছিলেন :

"Were the people all our countrymen, I would prefer the utmost freedom of the press but as they are, nothing could be more dangerous than such freedom. In place of spreading useful knowledge among the people and tending to their better

Government it would generate in subordination insurrection and anarchy."[৩৭]

অর্থাৎ এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, দিশী সংবাদপত্রকে প্রশ্রয় দিলে তারা একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। কারণ পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতার অর্থই তো বিদেশী শক্তির শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার কাজে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা। কাজেই যে দেশ তাঁরা শাসন করতে এসেছেন সে দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক।

"A free press and dominion of strangers are things which are quite incompatible and which can not long exist together for what is the first duty of a free press ? It is to deliver the country from a foreign yoke, and to sacrifice to this one great object every measure and consideration, and if we make the press really free to the natives as well as the Europeans, it must inevitably lead to this result. We might wish that the press might be used to convey morale and religous instructions to the natives and that its effects should go no further ; they might be satisfied with this for a time, but soon learn to apply it to political purpose to compare their own situations and our to overthrow our power."[৩৮]

দেশী সংবাদপত্র সম্পর্কে টমাস মুনরোর এই উগ্র মতবাদ যা ১৮২৩ সালে জন অ্যাডামকে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে প্রণোদিত করেছিল পরবর্তী কালে ইংরাজ শাসকরা তার সঙ্গ একমত হয়নি। চার্লস মেটকাফ (১৮৩৫-১৮৩৬) মনে করতেন, সংবাদপত্রের মধ্যে বিপজ্জনক কিছু নেই। পূর্বের নিয়ন্ত্রণ আইনকে তিনি odious and useless restrictions বলে মনে করতেন।[৩৯] তিনি ১৮২৩ সালের প্রেস আইন তুলে দিয়েছিলেন। তবে বাংলা সরকারের সেক্রেটারি এইচ, টি, প্রিনসেপ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে উদারপন্থী হলেও দিশী সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৩৫ সালের ১৮ মে তিনি তাঁর মতামত লিখছেন,

"But I think the eye, the Government will require to be kept continually upon the native press and especially upon the native press for it is capable of being made an engine for destroying the respect in wha the Government is held and is undermining its power."[৪০]

অবশ্য প্রিনসেপের এই মনোভাব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। এমন কি মেটকাফ যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিশেষ করে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন

তার পিছনেও সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি ছিল। সাম্রাজ্যরক্ষায় ইংরেজ যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সহায়তা পেয়েছিলেন, তাঁরা দেশীয় সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ যে ১৮২৩ সাল থেকে বাঙালি জনমতকে ক্ষুব্ধ করে তুলছিল মেটকাফ তা বুঝতে পেরেছিলেন। ১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্র সঙ্কোচন আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ছজন বিশিষ্ট বাঙালি কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। বিলাতেও রাজার কাছে আবেদনপত্র পাঠান। সে আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেননি। মেটকাফ তাই সংবাদপত্রের ওপর সেনসর উঠিয়ে দেবার কারণ হিসাবে বলেছিলেন, তিনি 'ডিসট্রাস্ট টু নেটিভ সাবজেক্টস' সৃষ্টি করতে চান না। এমনকি কর্ণেল মরিসনও সরকারের হাতে একটি সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ রাখতে চেয়েছিলেন যার ফলে "Government will retain the power of instantly suppressing any publication of it should at any time appear to risk the safty of the state."

কিন্তু মেটকাফ তাঁর ফাইলে ১৮৩৫ সালের ২৭ এপ্রিল লেখেন :

"It does not seem to me that such a clause is either necessary or expedient.[৪১]

মেটকাফ যা চেয়েছিলেন, তা হয়েছিল। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ১৮৩৫ সালের ৮ জুন ভারতবাসী ও বেসরকারী ইওরোপীয়রা মিলে মেটকাফকে কলিকাতয় সম্বর্দ্ধনা দেন। ১৮৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মেটকাফকে একটি ভোজসভাতেও সম্মানিত করা হয়।

বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে বাংলা সরকারের এই মনোভাব যে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৬২ সালের ২ আগষ্ট বাংলা সরকারের জুনিয়র সেক্রেটারি আই, ডব্লু, গরডন ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারিকে লিখছেন যে—

"The Lieutenant Governor is not prepared to recommend anything in the shape of a censorship of the native press-"[৪২]

কিন্তু অন্যদিকে সরকার কর্মচারীরা মনে করেছিলেন, বাংলা সংবাদপত্রগুলি জনমানসে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। এর প্রভাব থেকে নাগরিকদের মুক্ত করতে গেলে সেনসার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন যদি সম্ভব নাও হয় তাহলে অবাধ্য সংবাদপত্রগুলির পাল্টা একটি সরকারী সংবাদপত্র প্রকাশ করা হোক। ১৮৬০ সালের ১০ জুলাই বাংলার ডি পি আই, ডব্লু, এস, ক্যাস্টকিনসন, জুনিয়র সেক্রেটারি রিভারস টমসনকে যে চিঠি খেখেন, তাতে এই কথাই লিখেছিলেন,

"At a time when the other vernacular Journals are freely discussing the measures of Government, most of them in a vehemently hostile spirit, falsifying or distorting facts and covertly suggesting resistance, it appears to me eminently

desireable that steps should be taken to supply an antidote to the poison thus disseminated by putting forth in a form at once popular and authoritative, plain statements of facts with simple expositions of the policy of Government and refutation of seductive and dangerous falsehood."[৪৩]

১৮৬২ সালের ২ আগষ্ট ভারত সরকারের হোম সেক্রেটারিকে লেখা চিঠিতে দেশীয় সংবাদপত্রের মনোভাব জানার জন্য একটি বাংলা অনুবাদকের পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়। এই পদ মঞ্জুর হয় এবং প্রতি বছর বাংলা অনুবাদক বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে একটি করে রিপোর্ট সরকারকে পাঠাতে থাকেন। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের অধীনে ওই অনুবাদকের কাজ শুধু দেশীয় সংবাদপত্রের ওপর নজর রাখা, তার বেশী কিছুই নয়। অবশ্য সরকারী আমলারা ইচ্ছা করলে সংবাদপত্রের সঙ্গে মিত্রসুলভ আচরণ করে প্রয়োজনে তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিরসন করতে পারবেন। কিন্তু সরকারের কঠোর নির্দেশ ছিল কোনমতেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

"It is not the desire of the Government to maintain any official censorship, direct or indirect over the native Press. The entire press has after full consideration been made legally free, subject only to the provisions of the penal code; and so long as these are not infringed neither the Government nor its officers have any power to interfere. It is obviously desirable, therfore that the Dircctor of public instruction, of all that is said by the native press, should abstain from any communication to its conductors in excess of his legal power and that he should not assume any functions beyond those which it was the object of Government that he should exercise"[৪৪]

১৮৬৬ সালে বাংলা সরকারের সরকারী ট্র্যানস্লেটর বাংলা সংবাদপত্র সমূহের যে রিটার্ণ তৈরি করেছেন, তাতে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি চরিত্রগত বৈশিষ্টের পরিচয় পাওয়া যাবে। অবশ্য সংবাদপত্র তার নিজস্ব প্রতিবেদন সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধের দ্বারাই প্রকাশমান। কিন্তু এই সমস্ত সরকারী গোপন রিপোর্টে এইসব সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কী ছিল তা অবগত হওয়া যাবে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসের পক্ষে এই রিপোর্টগুলি এক বিশিষ্ট উপাদান। ১৮৬৬ সালে বাংলা সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ১৭। আড়াই বছরের মধ্যে ১৬টি দেশী কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। তার অধিকাংশই বাংলা, ১৭টি কাগজের মধ্যে তিনটি দৈনিক। তার মধ্যে একটি দৈনিক শুধু বিজ্ঞাপনের। ২টি দ্বি-সাপ্তাহিক। ১টি বারত্রয়িক। চারটি মাসিক।

শ্রেণীচরিত্রের দিক দিয়ে সমস্ত দেশী সংবাদপত্রই ব্রিটিশ সরকারের অনুগত।

"They appear to be thoroughly loyal and express themselves ever grateful for the connection into which they have been brought with their British Fellow subjects. Queen Victoria is their Queen. For the Secretary of the State they always express the highest regard and manifest in almost everything the greatest satisfaction with Sir Charles Wood's measures.

Their sentiments are written with the utmost official capacity. They appreciate British Rule, and any to their feelings without compromising his own self respect is sure to win their confidence, and secure from the highest encomiums.[8৫]

বাংলা সংবাদপত্রগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে অনুবাদক বলছেন,

(ক) গবর্নর জেনারেল ও লেঃ গবর্নরের গ্রীষ্মাবকাশে শৈলাবাসে কাটানোর ফলে সরকারী কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটে। এজন্য বাংলা সংবাদপত্রগুলি সমালোচনা মুখর।

(খ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে অযোগ্য আমলাদের পিছনে অর্থব্যয় এবং পক্ষান্তরে সত্যিকারের দক্ষ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অর্থদানে কৃপণতা।

(গ) জনসাধারণের অর্থের অপব্যয়ের তীব্র সমালোচনা।

(ঘ) সামাজিক ব্যাপারে সংস্কার প্রবণতা। পৌত্তলিকতা বিরোধী ধর্মমতের প্রতি সমর্থন এবং বেদান্তের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। (বলা বাহুল্য এখানে ব্রাহ্মপত্রিকাগুলির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লেখক।)

(ঙ ধর্মীয় উৎসবে অর্থ অপব্যয়ের নিন্দা।

(চ বহু বিবাহ প্রথার নিন্দা। বিধবা বিবাহের প্রতি সমর্থন। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমর্থন। তিন বছর আগে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি পত্রিকাই এজন্য স্থাপিত হয়েছে। (সর্বশুভকরী পত্রিকার কথা এখানে বলা হয়েছে। লেখক। ৪৬

দেশীয় সম্পাদকের স্বাধিকারপ্রমত্ততারও প্রশংসা না করে পারেননি, সরকারী অনুবাদক লিখেছেন:

"In all matters political and social, the native Editors asert and claim a right to equality of privilages with Europeans ; and it has not been a little gratifying to them to find that of late some of their fellow countrymen have had the courage return a European blow for blow. Though timidity is still a prevailing characteristic, it is to be hoped that it will give place to boldness in action as well as in speech. There are certain points on which they appear to be peculiarly sensitive. as where a European criminal has not meted out to him, a punishment

similar to that which would have been expected to attend a Native guilty of a like crime. Any such apparent leniency is attributed to national feeling."[৪৭]

অবশ্য উনিশ শতকে সংবাদপত্রের মধ্যে শিল্প লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়ার ফলে পত্রিকাগুলির পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। মাঝে মাঝে সরকারী সেনসরের কথা বাদ দিলেও সরকার থেকে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধের কোন চেষ্টাই হয়নি। সংবাদপত্রের ইউনিট ক্ষুদ্র থাকায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নিয়ে পরিচালকদের বিব্রত হতে হয়নি। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন প্রভাবই সাংবাদিকদের ওপর কাজ করেনি। একজন বাঙালি লেখক এই পরিবেশে বাংলা সংবাদপত্রের চারিত্র লক্ষণ বিবৃত করেছেন এইভাবে:

"Those perhaps were the great days of comparative freedom. Even if the owner was not also the editor and printer, the staff were small and easy to control. It is true duels and riotous mobs perhaps curbed the editors absolute freedom; yet the potential power of the new mass media was only being vaguely appreciated and the pressure of "Public Relations" were not known. Nor were the Industries organissed for massive advertisement and politicians inclined to Court Staff reporters. The owner editor's life was eventful, sometimes troublesome, often materially unrewarding—but he was almost always free to write according to rights and perhaps public opinion. The fact that there was no other mass media must have helped."[৪৮]

সরকারী বাংলা অনুবাদক বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে আরও লেখেন, হিন্দু পত্রিকাগুলি নির্ভয়ে তাদের মতামত ব্যক্ত করে। যদিও এক এক সময় তাদের অভিপ্রকাশ নগ্ন (crude) কিন্তু সার্বজনীন সাম্যবোধের ভিত্তিতেই তারা এই ধরনের মতামত প্রকাশ করে থাকে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তাদের মন্তব্য তারা নির্দয় কখনও তীব্র। তবে মুসলমান পত্রপত্রিকাগুলি মুখ খুলতে সাহস করে না।[৪৯]

দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলির মতামতকে সরকার যে গুরুত্ব দিতেন এই কথাও ওই রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে। অনুবাদক বলছেন, এর ফলে দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা অনুভব করতে সুরু করেছেন যে সরকার তাঁদের উপযুক্ত মর্যাদা দিচ্ছেন। দেশে ও বিদেশে তাঁদের মতামতকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে এবং দেশীয় সংবাদপত্র 'ইনডেক্স অব নেটিভ পাবলিক ফিলিং' বলে পরিগণিত হতে সুরু করেছে। তাঁদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে। অবশ্য এর ফলে কেউ একটু বাড়াবাড়িও করে ফেলেছেন। শুধুমাত্র অন্যের শোনা কথা যা বিকৃতভাবে এসে পৌঁছেছে, তার ওপর ভিত্তি করে তাঁরা কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেচ্ছা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য

সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে, "সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে"। 'This will most itself cure in time'[৫০]

দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে বিদেশী শাসকের এই মনোভাব অত্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ। অন্তত ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট-এর খড়্গাঘাত নেমে আসার আগে পর্যন্ত দেশীয় সংবাদপত্রে স্বাধিকার প্রমত্ততা, বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় কণ্ঠ, বিশ্লেষণী প্রবণতাকে খোলা মনেই গ্রহণ করেছেন। কখনও তাদের চাঞ্চল্য সৃষ্টির প্রবণতা ও সত্যাসত্য যাচাই না করে সংবাদ পরিবেষণ বা অতিরঞ্জন দোষকে নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি। ১৮৭৯ সালে বাঙ্গালী অনুবাদক রাজকৃষ্ণ মুখার্জী তাঁর রিপোর্টে অবশ্য দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে সহানুভূতিহীন অকারণ মন্তব্য করে বলেছিলেন, দেশী সংবাদপত্র অনেকে নেন কিন্তু কেউ পড়েন না। কিন্তু ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রবর্তিত হবার পর রাজকৃষ্ণ তাঁর ব্রিটিশ প্রভুদের দেশী সংবাদপত্র সম্পর্কে পরিবর্তিত মনোভাব অবগত হয়েছিলেন বলেই হয়ত দেশী সংবাদপত্রের প্রভাবকে ছোট করে দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশী সংবাদপত্র তথা বাংলা সংবাদপত্র কীভাবে দেশের জনমতকে প্রভাবিত করেছে পরবর্তী অধ্যায়গুলিই তার প্রমাণ।

এই অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখাব সীমাবদ্ধতা ও নানান ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট মাত্রায় সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।

নবজাগরণের পটভূমিতে এই আন্দোলনগুলিকে মোটামুটি এই কয়ভাগে ভাগ করা যায়:

(১) সমাজ সংস্কার আন্দোলন। (২) শিক্ষা আন্দোলন। (৩) ধর্মসংস্কার আন্দোলন। (৪) রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের আন্দোলন। (৫ গদ্য ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ।

এই বহুমুখী ভাব বিপ্লবকে বাংলা সংবাদপত্র কীভাবে পরিপুষ্ট করেছে তা দেখা যাক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র

বাংলার সামাজিক অবস্থা ॥ নানাবিধ কুসংস্কার ॥ সতীদাহ ও বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকা ॥ বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র ॥ বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা ও বাংলা সংবাদপত্র ॥

১৮২৮ সালে ১৮ জানুয়ারি রামমোহন জন ডিগবিকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন, তাতে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পিছনে বাঙালি মনীষীদের প্রেরণার বাণীটি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে।

রামমোহন ওই চিঠিতে লিখছেন, হিন্দু সমাজের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করা সম্ভব নয়। অসংখ্য রকমের ধর্মীয় কুসংস্কার, আচার অনুষ্ঠান, প্রায়শ্চিত্তের নানান বিধান, জাতিভেদ এসব কিছুই তাদের স্বাদেশিক চিন্তা ও ধ্যান ধারণার প্রতিবন্ধক।

"—I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindoos is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise···. It is, I think necessary that some change should take place in their religion, at least for the shake of their political advantage and Social Comfort."[১]

অর্থাৎ একটি পরাধীন জাতির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার রূপরেখাটি রামমোহনের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং এই 'পলিটিক্যাল অ্যাডভানটেজ' ও 'স্যোসাল কমফর্ট'-এর জন্যই তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে জাতির মুক্তির জন্য সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করে গিয়েছিলেন। রামমোহন যুগ থেকে বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত যে সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন প্রায় সত্তর বছর ধরে জাতীয় জীবনকে প্লাবিত করে তুলেছিল, তার পিছনে রামমোহনের ওই সুদূর প্রসারী চিন্তা বীজমন্ত্রের মত কাজ করেছে।

রামমোহন যে সময় কলকাতা এলেন, তখন অষ্টাদশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি সমাজ নতুন শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থ কৌলীন্যে আরও সম্পদশালী হয়েছে! কিন্তু তার চিত্তের দৈন্য তখনও দূর হয়নি। অর্ধশতাব্দীর ওপর ইংরাজ সান্নিধ্য সমাজ জীবনের ভঙ্গুর রূপরেখাকে বিন্দুমাত্র বদলাতে সাহায্য করেনি বরং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সুচতুর ইংরাজ প্রথম দিকে হিন্দু সংরক্ষণশীলতা ও ভ্রষ্টাচারকে সমর্থন করে শান্তিপূর্ণসহ অবস্থান গড়ে তুলতে চেয়েছে।

সেসময় কলকাতার সামাজিক জীবন ছিল কলুষপূর্ণ। বিদেশী বণিক ও ঔপনিবেশিকদের দল ও তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় হঠাৎ নবাবেরা বিলাস ও ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন। বারবণিতাদের নূপুর ঝঙ্কারে, কবি আখড়াই, খেউড় গানের মধ্য দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির জোয়ারে তখন ভাসমান কলকাতা। বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে ক্রীতদাস।

"The picture of Slavery in Calcutta at the close of the eighteenth Century, horrible as it is, was by no means overdrawn, and the hide outs did not die out till nearly fifty years after that period."[২]

আর একজন বাঙালি লেখক তৎকালীন কলকাতার অবক্ষয়িত সমাজ জীবনের আর এক বীভৎসরূপ তুলে ধরেছেন,

"সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নতি ছিল না। তখন মিথ্যা প্রবঞ্চনা। উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতি দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তায় প্রশংসা হইত? ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে পুত্রকন্যার বিবাহে পূজাপার্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সিন্দুরীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্তকী ভারতবর্ষে আসিত তাহারা বাইজী এই সম্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজভবনের বাইজীদের অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন ধনী কোন প্রসিদ্ধ বাইজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদের মুখে মুখে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ মনে করিত না। এমনকি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।"[৩]

৮০২ সালে গঙ্গায় শিশু বিসর্জন রদ করার জন্য আইন হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নিষ্ঠুর কুপ্রথা অন্তত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮ ১ সালে ২ মার্চ বারুণীর দিন বৈদ্যবাটিতে একজন ওড়িয়া স্ত্রীলোক তাঁর ছ'বছরের ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দেয়। এটি কোন গোপন হত্যাকাণ্ড ছিল না। আনুষ্ঠানিকভাবে বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটেছিল এবং অনন্ত জলরাশির মধ্যে আর্তনাদ করতে করতে যখন বালক ডুবে যাচ্ছিল তখন দর্শকেরা হরিধ্বনি করে উঠেছিল।[৪]

এ ছাড়া ছিল বৃদ্ধদের অন্তর্জলি। অসুস্থ বৃদ্ধকে গঙ্গাতীরে উন্মুক্তস্থানে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় রাখা। যদি সে কোনক্রমে রোগমুক্ত হয়ে আসত তাহলে সে হত সমাজে পতিত। সে জীবন তার কাছে তখন মৃত্যুরও অধিক।[৫]

চড়কে নিষ্ঠুরভাবে দেহে লোহার বঁড়শি বিঁধিয়ে ঘোরান ছিল ধর্মের অন্যতম অঙ্গ। এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের উপর জোর জবরদস্তি করা হত। ১৮১৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাঁদের সার্কুলার লেটারে লিখছেন শ্রীরামপুরের ছাপাখানা কর্মীদের চড়কে অংশ নেবার জন্য জুলুম করা হচ্ছে। তাঁরা মিঃ ওয়ার্ডের কাছে প্রটেকশান চাইছেন।[৬]

১৮২০ সালের ৬ জানুয়ারি উইলিয়ম ওয়ার্ড লণ্ডন থেকে জে, সি, ভিলিয়ার্স-এর কাছে দেশীয় লোকদের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে একটি চিঠি দিচ্ছেন। ঐ চিঠিতে তিনি বলেন, "রক্ষিতা রাখা, অস্বাভাবিক অপরাধে লিপ্ত হওয়া, বাল্যবিবাহ, মিথ্যাচার অতি সাধারণ ঘটনা। জুরি ও সাক্ষীদের কিছু পয়সা দিলেই কেনা যায়। মামলা মোকদ্দমাও আকছার হয়। অন্ততঃ ২০ লক্ষ ভারতীয় ভিক্ষুক আছে। যারা ধর্মের নামে ভিক্ষা করে বেড়ায়। চড়কের সময় পিঠে বঁড়শি গেঁথে ঘোরা বা গরম কয়লার ওপ নৃত্য আমি একাধিকবার দেখেছি। দেখে মনে হয় না, যে তাদের মন বিজ্ঞানের দ্বারা পবিত্র বা নীতি শিক্ষার আলোকে আলোকিত।"

রামমোহনের কলকাতা বসবাসের (১৮১৪-১৮৩০) কালের এটাই ছিল সামাজিক পটভূমি। এই সামাজিক পটভূমিতে সবচেয়ে যেটি শোচনীয় ছিল তা হল সমাজে নারীর স্থান।

উইলিয়ম ওয়ার্ড লিখছেন, 'মেয়েদের অবস্থা অভাবনীয়। কোন শিক্ষা নেই, কোথাও মেয়েদের স্কুল নেই। সেলাই ফোঁড়াই পর্যন্ত তারা জানে না। তারা এক টুকরো কাপড় পরে কাটায়। সাজবার-গোজবার সময় পর্যন্ত তাদের নেই। রান্না ছাড়া তাদের আর কাজ নেই। নারী অর্থেই বাড়ির বন্দিনী। মেয়েদের সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার কথা বলার অধিকার নেই। নেহাৎ নিকট আত্মীয় না হলে পুরুষের দিকে সে তাকাবে না। নিজের পরিবারে সে ব্যবহার পাবে ক্রীতদাসীর মত। স্বামীর সঙ্গে এক সঙ্গে খাবার অধিকার পর্যন্ত তার নেই।'

Thus we see that Hindoo female is in her birth undesired, her education is neglected in her family, she is a slave, a prisioner.

রেনেশাঁসের ঝরণাধারায় স্নাত মানুষ শেখে নারীর প্রতি সম্মান। অথচ সেই নারী সমাজে সব থেকে অবহেলিত। সুতরাং রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যে সংস্কার মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল তার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল এই নারী মুক্তি আন্দোলন। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল সতীদাহ বা সহমরণ রদ আন্দোলনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সেই সর্বপ্রথম সামাজিক আন্দোলন।

সেসময় কলকাতার সামাজিক জীবন ছিল কলুষপূর্ণ। বিদেশী বণিক ও ঔপনিবেশিকদের দল ও তাঁদের অনুগ্রহপুষ্ট দেশীয় হঠাৎ নবাবেরা বিলাস ও ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন। বারবণিতাদের নূপুর ঝঙ্কারে, কবি আখড়াই, খেউড় গানের মধ্য দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির জোয়ারে তখন ভাসমান কলকাতা। বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে ক্রীতদাস।

"The picture of Slavery in Calcutta at the close of the eighteenth Century, horrible as it is, was by no means overdrawn, and the hide outs did not die out till nearly fifty years after that period."[২]

আর একজন বাঙালি লেখক তৎকালীন কলকাতার অবক্ষয়িত সমাজ জীবনের আর এক বীভৎসরূপ তুলে ধরেছেন,

"সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নতি ছিল না। তখন মিথ্যা প্রবঞ্চনা। উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতি দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদগোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তায় প্রশংসা হইত? ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে পুত্রকন্যার বিবাহে পূজাপার্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সিন্দুরীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অথিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। তখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্তকী ভারতবর্ষে আসিত তাহারা বাইজী এই সম্ভ্রান্ত নামে উক্ত হইত। নিজভবনের বাইজীদের অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন ধনী কোন প্রসিদ্ধ বাইজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদের মুখে মুখে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ মনে করিত না। এমনকি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।"[৩]

৮০২ সালে গঙ্গায় শিশু বিসর্জন রদ করার জন্য আইন হয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও এই নিষ্ঠুর কুপ্রথা অন্তত উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮ ১ সালে ২ মার্চ বারুণীর দিন বৈষ্ণবাটিতে একজন ওড়িয়া স্ত্রীলোক তাঁর ছ'বছরের ছেলেকে গঙ্গায় ফেলে দেয়। এটি কোন গোপন হত্যাকাণ্ড ছিল না। আনুষ্ঠানিকভাবে বহু ব্যক্তির উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটেছিল এবং অনন্ত জলরাশির মধ্যে আর্তনাদ করতে করতে যখন বালক ডুবে যাচ্ছিল তখন দর্শকেরা হরিধ্বনি করে উঠেছিল।[৪]

এ ছাড়া ছিল বৃদ্ধদের অন্তর্জলি। অসুস্থ বৃদ্ধকে গঙ্গাতীরে উন্মুক্তস্থানে নিয়ে গিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় রাখা। যদি সে কোনক্রমে রোগমুক্ত হয়ে আসত তাহলে সে হত সমাজে পতিত। সে জীবন তার কাছে তখন মৃত্যুরও অধিক।[৫]

চড়কে নিষ্ঠুরভাবে দেহে লোহার বঁড়শি বিঁধিয়ে ঘোরান ছিল ধর্মের অন্যতম অঙ্গ। এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষের উপর জোর জবরদস্তি করা হত। ১৮১৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা তাঁদের সার্কুলার লেটারে লিখছেন শ্রীরামপুরের ছাপাখানা কর্মীদের চড়কে অংশ নেবার জন্য জুলুম করা হচ্ছে। তাঁরা মিঃ ওয়ার্ডের কাছে প্রটেকশান চাইছেন।[৬]

১৮২০ সালের ৬ জানুয়ারি উইলিয়ম ওয়ার্ড লণ্ডন থেকে জে, সি, ভিলিয়ার্স-এর কাছে দেশীয় লোকদের নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে একটি চিঠি দিচ্ছেন। ঐ চিঠিতে তিনি বলেন, "রক্ষিতা রাখা, অস্বাভাবিক অপরাধে লিপ্ত হওয়া, বাল্যবিবাহ, মিথ্যাচার অতি সাধারণ ঘটনা। জুরি ও সাক্ষীদের কিছু পয়সা দিলেই কেনা যায়। মামলা মোকদ্দমাও আকছার হয়। অন্ততঃ ২০ লক্ষ ভারতীয় ভিক্ষুক আছে। যারা ধর্মের নামে ভিক্ষা করে বেড়ায়। চড়কের সময় পিঠে বঁড়শি গেঁথে ঘোরা বা গরম কয়লার ওপ নৃত্য আমি একাধিকবার দেখেছি। দেখে মনে হয় না, যে তাদের মন বিজ্ঞানের দ্বারা পবিত্র বা নীতি শিক্ষার আলোকে আলোকিত।"

রামমোহনের কলকাতা বসবাসের (১৮১৪-১৮৩০) কালের এটাই ছিল সামাজিক পটভূমি। এই সামাজিক পটভূমিতে সবচেয়ে যেটি শোচনীয় ছিল তা হল সমাজে নারীর স্থান।

উইলিয়ম ওয়ার্ড লিখছেন, 'মেয়েদের অবস্থা অভাবনীয়। কোন শিক্ষা নেই, কোথাও মেয়েদের স্কুল নেই। সেলাই ফোঁড়াই পর্যন্ত তারা জানে না। তারা এক টুকরো কাপড় পরে কাটায়। সাজবার-গোজবার সময় পর্যন্ত তাদের নেই। রান্না ছাড়া তাদের আর কাজ নেই। নারী অর্থেই বাড়ির বন্দিনী। মেয়েদের সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার কথা বলার অধিকার নেই। নেহাৎ নিকট আত্মীয় না হলে পুরুষের দিকে সে তাকাবে না। নিজের পরিবারে সে ব্যবহার পাবে ক্রীতদাসীর মত। স্বামীর সঙ্গে এক সঙ্গে খাবার অধিকার পর্যন্ত তার নেই।'

Thus we see that Hindoo female is in her birth undesired, her education is neglected in her family, she is a slave, a prisioner.

রেনেশাঁসের ঝরণাধারায় স্নাত মানুষ শেখে নারীর প্রতি সম্মান। অথচ সেই নারী সমাজে সব থেকে অবহেলিত। সুতরাং রাজনৈতিক মুক্তির জন্য যে সংস্কার মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল তার একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল এই নারী মুক্তি আন্দোলন। নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল সতীদাহ বা সহমরণ রদ আন্দোলনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সেই সর্বপ্রথম সামাজিক আন্দোলন।

রামমোহন এই আন্দোলনকে দুভাবে দেখেছিলেন. এক সংস্কার মুক্তির সোপান হিসাবে। তাঁর যুক্তি নির্ভর ভ্রষ্টাচার বর্জিত ধর্মসংস্কারের মাঝে সহমরণের মত জঘন্য নিষ্ঠুর কোন প্রথা ধর্মীয় সমর্থন নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে তা কল্পনাতীত ছিল। সুতরাং যে যুক্তিবাদের ওপর তাঁর বেদান্তবাদী নব্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা সেই ধর্মের আলোকে, ধর্মীয় যুক্তি দিয়ে তিনি সহমরণ রদ আন্দোলনের সমর্থন করেছেন। দ্বিতীয়ত নারী মুক্তি আন্দোলনকে তিনি মানবতাবাদীর চোখ দিয়েই দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদ' পুস্তিকায় নিবর্তক বলছে, অন্য ২ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালক কাল অবধি আপন ২ প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্য ২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্বক স্ত্রীদাহ পুনঃ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকতে তোমাদের বিরুদ্ধে সংস্কার জন্মে এইনিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের মরণকালে কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ ২ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়া হয়।"[৯]

নারীর বিশেষ মর্যাদা দূরে থাকুক, সাধারণ মানসিক মর্যাদা দিতেও সমাজ সেদিন ভুলে গিয়েছিল। তাই 'মরণকালীন কাতরতা'তে সমাজের কোন দয়া জন্মায়নি। আর তাছাড়া ধর্মের মোহাঞ্জনে মানুষের চোখ তখন মোহগ্রস্ত। স্ত্রী কেন, পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে (রামমোহন এখানে সম্ভবত অন্তর্জলি যাত্রা সম্পর্কে ইংগিত করেছেন) সমাজের চৈতন্যোদয় হচ্ছে না। প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদে নিবর্তক আবার বলছে, "আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে তাহারা দিবারাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে কখন এমত উপস্থিত হয় যে, এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্বদা তাড়না করে এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীতে কিঞ্চিত ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণার অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপ থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্ব জাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ-দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে, এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী' তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্টন পূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[১০]

সতীদাহ কৌলীন্য প্রথা বা বহুবিবাহ রদ ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনই একই সামাজিক চেতনার ফলশ্রুতি। সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছিল ১৮২৯ সালে—বিধবা

বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয়েছিল ১৮৫৬ সালে। বহুবিবাহ রদ আইন দুর্ভাগ্যের বিষয় উনিশ শতকে পাশ হতে পারেনি। তবে সামাজিক আন্দোলনের তীব্রতার ফলে বহু বিবাহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই হ্রাস পেয়েছিল এবং শিক্ষিতদের মধ্যে লোপ পেয়েছিলই বলা যায়।

অবশ্য চিন্তা করে দেখতে গেলে বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও বহুবিবাহ রদ আন্দোলন সতীদাহের আগে হওয়াই উচিত ছিল। কারণ বৈধব্য যন্ত্রণা যে মৃত্যুর অধিক পুরুষ শাসিত স্বার্থলুব্ধ সমাজে বিধবার যে অসহনীয় অবস্থা ছিল সে কথা আগেই বলেছি। একজন ইংরাজ মহিলা বৈধব্য যন্ত্রণার এক ভয়াবহ চিত্র এঁকে গেছেন।

"As a widow she is doomed to all sorts of indignity, the name of widow being a reproach. All her fine clothing is taken from her, she is stripped off every ornament which she never can wear : her beautiful hair is frequently shaved off and she then becomes a slave in the house where she formerly was mistress. Thus it is that the Suttee becomes a willing sacrifice."[১১]

তবে সমস্ত বিধবাদেরই যে সতী হতে হত তা ঠিক নয়। বৈধব্যের যন্ত্রণা সহ্য করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে যারা বেঁচে থাকতে চাইতেন তাঁরা বাঁচতে পারতেন। ১৮১৪ সালে একজন ইংরেজ লেখিকা লিখেছেন :

'Although it be the duty of a widow to burn herself with her husband, she has the alternative either to live after his death as a Brahmachari or to commit herself to the flames. Should she resolve to live, she must pass her life in chastity, piety, and mortifications. She must eat but one meal a day, and never sleep upon a bed, under pain of causing her husband to fall from a state of bliss. She must abstain from ornamenting her person, or eating out of magnificient vessels, or of delicious food and she must daily offer oblations for the Manes of ancestors. In some cases, as where a woman has a young infant, or is pregnant, she is positively forbidden to burn herself, and the widow of a Bramhin who died in a foreign country is also prohibited from giving this proof of affection for her absent lord ; but the widows of other castes may if they please burn themselves, on the news of the death of their husbands.'[১২]

এই বৈধব্যযন্ত্রণা নিয়ে আর্থিক দুর্গতি ভোগ করেও অনেক বিধবা বেঁচে থাকতেন। বিশেষ করে যেসব দরিদ্র ঘরের বিধবাদের স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী

হওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না—তাদের ক্ষেত্রে সহমরণে পাঠাবার ব্যাপারে জোর জবরদস্তিটা কম হত। ১৮২৮ সালের ২২ নভেম্বর 'সমাচার চন্দ্রিকায়' প্রকাশিত এক চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে দরিদ্র পরিবারের বিধবারা সুতা কেটে, মাছ বিক্রি করে জীবন নির্বাহ করতেন।

সমসাময়িক লেখকদের মতে যদি বিধবা বিবাহ সম্মানীয় হত এবং বিধবার গর্ভে জাত পুত্রেরা সম্পত্তির অধিকার পেত তাহলে সতীদাহ ধীরে ধীরে কমে যেত। কিন্তু যে দেশে 'বাউন্টিজ অব প্রভিডেন্স', 'কোয়েশ্চন অব ইন্টারেস্ট', 'লস অব ফিউ রুপিজ অ্যানুয়ালি' প্রভৃতি প্রশ্ন জড়িত সেখানে বিধবাদের এই নিষ্ঠুর মৃত্যু অবধারিত।[১৩]

কিন্তু তা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ অপেক্ষা সতীদাহকেই যে রামমোহন তাঁর সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তার প্রধান কারণ যতদূর মনে হয় গৃহকোণে নারীর নিরন্তর লাঞ্ছনা অপেক্ষা জ্বলন্ত চিতায় প্রকাশ্য স্থানে জীবন্ত মানুষের পুড়ে মরার ঘটনার বাহ্য প্রতিক্রিয়া অনেক বেশী। রামমোহন স্বয়ং এই সব মর্মন্তুদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর পরিশীলিত বিদগ্ধ সংবেদনশীল মনে এর ফলে তীব্র আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। আর তাছাড়া সব বিধবাই যে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন তা নয়। বহু নারীকে সম্পত্তির লোভে তার আত্মীয়রা জোর করে পুড়িয়ে মারত এবং সহমৃতা সতী যাতে মৃত্যু ভয়ে চিতা থেকে উঠে পালাতে না পারে তার জন্য তাকে চিতার সঙ্গে বেঁধে রেখে তারপর চিতায় আগুন দেওয়া হত। বিশেষ করে সদ্য বিধবা বালিকাদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ আসন্ন বৈধব্য যন্ত্রণা সম্পর্কে তাদের মধ্যে কতটুকু ধারণাই বা হওয়া সম্ভব? বরং জ্বলন্ত চিতার নিষ্ঠুর মৃত্যুই তাদের কাছে অধিকতর ভীতিপ্রদ।

...'that the approach of death on the funeral Pyre is horrible to them, they understand not the degradations to which they will have to submit and life seems sweeter now that they are released from an old and perhaps deprived husband.'[১৪]

শ্রীমতী ক্লিমনস নিজে একটি বালিকাবধূকে সহমরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মাত্র সাতদিন হল তার বিবাহ হয় এবং স্বামীর মৃত্যুর পর আর দুজন সতীনের সঙ্গে তাকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

এই ধরনের বহু মর্মন্তুদ ঘটনাই গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বছর ধরে ঘটে আসছিল।

দ্বিতীয়ত এ ব্যাপারে রামমোহনকে যা আরও ব্যথিত করে তোলে তা হল এইসব সতীদাহ ঘটানো হচ্ছিল ধর্মের নাম নিয়ে। ঋগ্বেদের শ্রুতি, ঋষি অঙ্গিরার বচন প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র থেকে এই কুপ্রথার সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন সংরক্ষণপন্থীরা। যিনি সারাজীবন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় তিনি আরও বিচলিত হন এবং শাস্ত্র দিয়েই তিনি বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করেন।

রামমোহনের আগে থেকেই কোম্পানীর কর্তারা, ইংরাজ সাংবাদিকরা, মিশনারি এবং হিন্দু সমাজ সম্পর্কে উৎসাহী বিদেশীদের কেউ কেউ সহমরণ সম্পর্কে ভাবতে সুরু করেছিলেন।

এই ব্যাপারে ইংরাজী সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বিশেষ করে স্মরণ করা যেতে পারে। ইংরাজী সংবাদপত্রের সুরু থেকেই সংবাদপত্রগুলিতে মাঝে মাঝেই সতীদাহ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর ভয়াবহ বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে।

১৭৮৫ সালের ৬ জানুয়ারি ক্যালকাটা গেজেটে এক ইংরাজ কর্মচারী চুঁচড়ায় যাবার পথে চন্দননগরে এক সতীদাহের দৃশ্য দেখে তার বিবরণ দেন। মেয়েটির লাল চোখ ও আচ্ছন্ন ভাব দেখে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, তাকে মাদকদ্রব্য খাওয়ান হয়েছে।

"I however perceived from the redness of her eyes that norcotics had been administered"

(Calcutta Gazett, 6th January, 1785)

১৭৮৯ সালের মধ্যেই এদেশীয় জনসাধারণের একাংশের মধ্যে সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হয়ে গিয়েছিল। ওই বছর ১ সেপটেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে জনৈক পত্রলেখক বলছেন, এই প্রথা বন্ধ করার জন্য কিছু একটা করা দরকার। পত্রলেখক বলেন যে ভারতীয়দের অনেকেই এই প্রথার অবসান চান। তাঁরা আমাকে বলেছেন, যদি কড়া জরিমানার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অনেকে সতীদাহ করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং ফলে এই প্রথা উঠে যাবে।[১৫]

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা সতীদাহ রদের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকেন। অন্যদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণও চলতে থাকে। ডঃ কেরী সতীদাহের সংখ্যা গণনার জন্য বিভিন্ন এলাকায় লোক পাঠান। এতে জানা যায়, ১৮০৩ সালে ছ'মাসের মধ্যে কলকাতার আশে পাশে ২৭৫টি সতীদাহের ঘটনা ঘটেছে। পরের বছর দুজন দেশীয় খৃষ্টান—সীতারাম ও কবীর তদন্ত করে এসে জানান, কলকাতার ৩০ মাইলের মধ্যে ১৮০৩ সালে কমপক্ষে ৪৩৮ জন সতী হয়েছে।[১৬] ১৮০৪ সালে ছ'মাসে ১১৬টি সতীদাহের ঘটনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-সতীদাহের এই খতিয়ান পরবর্তী বছরগুলিতে কিছু কম হলেও তা অব্যাহত ছিল।

একজন ইংরাজ লেখক ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৪ সালের মধ্যে কলকাতা, কটক, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেরিলি ও বেনারসে মোট ৫৯৯৭ জন সতী হয়েছেন বলে হিসাব দিয়েছেন। তার মধ্যে ওই কয় বছর কলকাতায় সতী হয়েছেন ৩৪৫১ জন। ১৮১৫-১৮২০ সালের মধ্যে ৬২টি শিশু কিংবা বালবিধবাকে সতী করা হয়েছি—। এদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স ৬ বছর। আর সর্ব্বোচ্চ বয়স ১৭ বছর।[১৭]

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যে সহমরণের বীভৎসতায় কতখানি মুহ্যমান ...লেন। এই ... সম্বাদ প্রকাশ ...লোচনার জন্য তার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁদের মিশনের বার্ষিক বিবরণীতে। মার্শম্যা...

এসেছিল। পত্রিকাটি এই পুস্তিকার বক্তব্যের প্রতি কঠোর সমালোচনা করে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন :

They lie bound as sheep for the slaughter ; and thus they must remain suffering in silence, till British feeling and sympathy shall duly realize their hitherto unknown unpitied misery.[২৫]

রামমোহনের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ ১৮১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে ও ২৫ ডিসেম্বর ক্যালক্যাটা জার্নালেও প্রশংসিত হয়েছিল। সংবাদপত্র যে বরাবরই সতীদাহের বিপক্ষে ছিল তা দেখা যাচ্ছে।

ক্যালকাটা জার্নাল রামমোহনকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছিলেন :

"We hail with lively satisfaction, a pamphlet recently publised by a Hindoo on this subject. A learned native already well-known among our countrymen by his luminous examination of the Hindoo theology and Philosophy has printed and widely circulated a tract in the Bengalee language.. "

ক্যালকাটা জার্নাল এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে

".. ...ultimately Government will abolish entirely a custom which involves the murder of the helpless and the innocent, almost without the shadow of support from the Hindoo Super stition itself."

অবশ্য ইংরাজী সংবাদপত্রের এই সব মতামত দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে কতখানি গিয়ে পৌছতে পেরেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং সাধারণ বাঙালি জনমত সৃষ্টির জন্য বাংলা সংবাদপত্রের মতামতেরই সামাজিক মূল্য বেশী ছিল। তাই আমরা আবার সমাচার দর্পণে ফিরে আসি।

রামমোহনের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ-এর এই সংক্ষিপ্ত খবরটি ১৮১৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল : "কলকাতার শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

সহমরণ সম্পর্কে সমাচার দর্পণ ক্রমাগত রিপোর্ট ছাপতে থাকেন। কোন সামাজিক কদাচার বা অপরাধের খবর সংবাদপত্র যদি বার বার ফলাও করে ছাপতে থাকে তাহলে পাঠক মানসে তার এক মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। সমাচার দর্পণের রিপোর্টগুলি সেদিক থেকে জনমানসে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল বলেই মনে হয়। দর্পণ শুধু রিপোর্ট প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকত না। প্রতিবেদনের মধ্যে নিজস্ব কিছু মন্তব্যও জুড়ে দিত। যেমন একটি রিপোর্ট :

"এক দিবস হইল দুইজন ইংলণ্ডীয় কলিকাতা হইতে পশ্চিম যাইতেছিল কোননগর পর্যন্ত আসিয়া সেইখানে অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকা হইতে নামিয়া দেখিল যে একজন যোগীর স্ত্রী সহমরণ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে পরে দেখিল একটা গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল পরে ঐ স্ত্রী সেই গর্ত মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার উনিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র সেই গর্তে তিনবার মৃত্তিকা দিল পরে অন্য লোকে মৃত্তিকা দিয়া ডুবাইল পরে সেই বালক পিতৃমাতৃ বিয়োগে কাতর না হইয়া কুটুম্বেরদিগের সহিত ঐ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও কুটুম্বেরদিগের পরিচয় দিল। পূর্বে চন্দননগরের নিকটে এমত একটা হইয়াছিল, তখন জানিয়াছিলাম দৈবাৎ একটা হইল আর এমত হইবে না কিন্তু এখন অন্য দেখা যায়।" (১১ জুলাই ১৮১৮)

এখানে দর্পণের মনোবেদনার কারণটি লক্ষ্যণীয় 'তখন জানিয়াছিলাম দৈবাৎ একটা হইল আর এমত হইবে না কিন্তু এখন অন্য দেখা যায়।'

সহমরণ সংক্রান্ত সরকারী বিধিনিষেধকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকদেরও সহমরণে পাঠানো হচ্ছে বলে আর একটি প্রতিবেদনে দর্পণ দুঃখ করছেন। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা এ সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে 'অধিক সহমরণ বাঙ্গালাদেশে হয়। পশ্চিমদেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যেও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয়, তাহার সাত অংশের এক অংশ কেবল জিলা হুগলীতে হয়। (২৭ মার্চ ১৮১৯)

ঐ প্রতিবেদনেরই আর একটি অংশ :

কয়েক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুক্ত নানা দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সহমরণ বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়শবর্ষ বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতিশিশু বালক থাকে সে স্ত্রী সহমরণ করিতে পাইবেক না। এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও কহে যে সহমরণাদি রূপ কর্মে নির্বাণমুক্তি হইতে পারে না কিন্তু সুখভোগ মাত্র হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের মতে নির্বাণসাধন কর্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন।'

১৮১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আর একটি প্রতিবেদনে দর্পণ সতীদাহের এক নিষ্ঠুর চিত্র তুলে ধরেছেন এবং ইঙ্গিত করেছেন যে সতীদাহ জোর করে বন্ধ করা গেলে তার পেছনে জনসমর্থন পাওয়া যায়।

'১৭ জানুয়ারি তারিখে মোং লক্ষণৌ আশ্চর্যরূপ সহমরণ হইয়াছে।' সহমৃতা স্ত্রী যতবার চিতা থেকে উঠে পালাতে যায় ততবার সিপাহী তাকে ধরে চিতায় ফেলে দেয়। তখন "তিন চারিজন সাহেব লোক বিবেচনা করিল যে এই স্ত্রীর নিতান্ত সহমরণ যাইতে বাসনা নাই কেবল ঐ সিপাহী তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া তাহার এক সাহেব ঐ সিপাহীকে ধাক্কা মারিয়া দূরে ফেলিল ও আপনারা ও অন্য সিপাহীরা সকল সে স্ত্রীকে ঘেরিয়া অন্যত্র লইয়া তাহাকে

বাঁচাইল। ইহাতে অন্য ২ হিন্দু সিপাহীরা কেহই অসম্মত হইল না বরং তাহার রক্ষার্থে সকল যত্নযুক্ত হইল।"

সহমরণের খবর সমাচার দর্পণের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থাকত। তবে অধিকাংশ খবর ছাপা হত সাংবাদিক নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে। তবে কিছু কিছু খবরে এই প্রথার নিষ্ঠুরতা ও তার উদ্যোক্তাদের পৈশাচিক মনের যে পরিচয় থাকত সেটুকুর সামাজিক তাৎপর্য কম ছিল না। যেমন ১৮২৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি দর্পণের একটি খবরে জানা যাচ্ছে যে একটি ক্ষেত্রে সহগামিনী সতীর সঙ্গে কথা বলতে তার আত্মীয়েরা ম্যাজিস্ট্রেটদেরও অনুমতি নেয়নি। ধর্মীয় ব্যাপার বলে সরকারী অধিকর্তারা এ ব্যাপারে খুব একটা জোর জবরদস্তি করতেন বলেও মনে হয় না।

'শহর শ্রীরামপুর নিবাসী জগন্নাথ সেন নামে এক ব্যক্তি কায়স্থ ২ ফেব্রুয়ারি ২১ মাঘ সোমবার অনুমান রাত্রি এক প্রহরের সময় লোকান্তরগত হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান সত্তরি বৎসর হইবেক। পরে তাহার দুই স্ত্রী সহমরণোদ্যতা হইলে শ্রীরামপুরের দারোগার নিকটে সমাচার ছিল এবং থানাদার ঐ রাত্রিতেই তাহাদের নিকটে গিয়া ব্যবস্থানুসারে সকল জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট সমাচার দিল তাহাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কহিলেন যে কল্য প্রাতে আমি আপনি গিয়া দেখিব, পরদিন ২২ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও আর ২ সাহেব লোক সেখানে গিয়া ঐ স্ত্রীদের সহিত কথোপকথন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারদের আত্মীয় লোকেরা ও ব্রাহ্মণেরা প্রায় তাহাতে সম্মত হইল না। তাহাতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অগত্যা অনুমান এগার ঘণ্টার সময় অনুমতি দিলেন তাহাতে তাহারা দুইজনেই সহগামিনী হইয়াছে এবং দুই স্ত্রীই বন্ধ্যা ছিল। প্রধানার বয়ঃক্রম অনুমান ষাট হইবেক ও কনিষ্ঠার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশ বৎসর হইবে।'

পুলিশের বা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজ যে দায়সারা গোছের হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ ১৮১৮ সালে কলকাতার পুলিশ প্রধানের মন্তব্য। তিনি বলেছিলেন,

"It appears to me that, if the practice is allowed to exist at all, the less notice we take of it the better. The interference of the Police may in some cases have induced Complainants with the rules of the Sastras."[২৬]

পুলিশের ওপর শুধু ভার ছিল সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত ভাবে হচ্ছে কী না, তা দেখা। হুগলির ম্যাজিস্ট্রেটের মতে সতীদাহের ঘটনা এর ফলে কমেনি বরং বেড়ে গেছে। কারণ ১৮১৩ সালের বিধিনিষেধ সতীদাহ প্রথাকে স্বীকারই করে নিচ্ছে।

সত্যি সত্যি ১৮১৫ থেকে সতীদাহের সংখ্যা আবার ঊর্ধ্বমুখী হতে দেখা গেল। ১৮১৫ সালে কলকাতায় যেখানে ৩৭৮টি সতীদাহ হয়েছে ১৮১৮ সালে তা বেড়ে হল ৮৩৯।[২৭]

কলকাতার চীফ জাজ জে এইচ হ্যারিংটন তাঁর ১৮২৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারির

রিপোর্টে স্বীকার করেন যে, বর্তমান সতীদাহ রেগুলেশন সতীদাহকে বৈধই করেছে।[২৮]

স্থানীয় সিভিলিয়ানদের অনেকেই সতীদাহের অবসান চান। এ ব্যাপারে তাঁরা তাঁদের প্রশাসনিক রিপোর্টে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে এই কুপ্রথা রদ করার দাবি জানিয়েছিলেন। যেমন, আলিপুরের জজ ই. ওয়াটসন (এপ্রিল, ১৮:৮) গবর্নরের সেক্রেটারি জেনারেল জন অ্যাডাম (অক্টোবর ১৮১৭), কলকাতার পুলিশ সুপার ই. ইউয়ার (জানুয়ারি ১৯১৯) বর্ধমানের ম্যাজিস্টেট মোলনি (ডিসেম্বর, ১৮১৮), নিজামত, আদালতের চীফ জাজ ডবলু লেসটার সি, স্মিথ, (মে, ১৮২১) সেকেণ্ড জাজ ক্যালকাটা (মে ২৫, ১৮২১) ত্রিচিনপল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট সি, এম, লুসিংটন (অক্টোবর, ১৮১৯) প্রমুখেরা তাঁদের রির্পোটে এক বাক্যে সতীদাহের অবসান চেয়েছিলেন।[২৯]

সতীদাহের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জনমতও জাগ্রত হতে থাকে। ১০২৭ সালের ১৯ জানুয়ারি ইয়র্কে সতীদাহের অবসান দাবি করে এক সভা হয়। ১৮.৩ সালে বেডফোর্ডে ও ১৮২৫ সালে এডিনবরার কাছে ক্রেন শহরেও সতীদাহ বিরোধী সভা হয়। ১৮২৭ সালের ৯ মে, ম্যাঞ্চেস্টারে নাগরিকরা সভা করে লর্ডসভায় সতীদাহের অবসান জানিয়ে দরখাস্ত দেন। ১৮২৯ সালে কভেনট্রি শহরেও অনুরূপ সভা হয়।[৩০]

সতীদাহের বিরুদ্ধে সমাচার দর্পণ ইচ্ছা করলে আরও সোচ্চার হতে পারতেন কিন্তু কেন হননি সেটাই আশ্চর্য। তবে সোচ্চার হয়েছিলেন সম্বাদ কৌমুদী। কৌমুদীর সম্পাদনার সঙ্গে ভবানীচরণ যুক্ত ছিলেন এবং সতীদাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে কৌমুদীর পলিসি নিয়ে ভবানীচরণের সঙ্গে কৌমুদীর পরিচালক গোষ্ঠীর বিরোধ বাধে। ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ সম্বাদ কৌমুদী প্রথম প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণ কৌমুদী ছেড়ে চন্দ্রিকা প্রকাশ করেন ১৮২২ সালের ৫ মার্চ। একটি কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে, সতীদাহ সম্পর্কে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের মতামত ১৮১৮ সালেই প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ সালে সতীদাহপন্থীরা রামমোহনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ১৮১৮ থেকে ১৮২৩ এই পাঁচ বছরে সতীদাহ সম্পর্কে রামমোহনের মতামত কি তা জানতে বুদ্ধিজীবী মহলে কারও বাকী থাকার কথা নয়, কিন্তু ভবানীচরণ সব জেনেশুনে সম্বাদ কৌমুদীতে কেন যোগ দিয়েছিলেন? এক হতে পারে, কৌমুদীতে যোগ দেবার পর, তাঁর মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটেছিল। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে এই মতাদর্শের পরিবর্তনও এক বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয়।

১৮২৩ থেকে সতীদাহের প্রশ্নে বাংলা সংবাদপত্র দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে সম্বাদ কৌমুদী, বঙ্গদূত ও জ্ঞানান্বেষণ। অন্যদিকে সমাচার চন্দ্রিকা, সম্বাদ তিমির নাশক, সম্বাদ রত্নাবলী ইত্যাদি।

সতীদাহের সপক্ষে রক্ষণশীল হিন্দু জনমত সেদিন কম প্রবল ছিল না। রাধাকান্ত দেবকে কেন্দ্র করে সে সময়কার হিন্দু রক্ষণশীল জনমত আবর্তিত হচ্ছিল। অর্থ

কৌলীন্যেও এই গোষ্ঠী কম প্রবল ছিলেন না। সতীদাহ রদ আইন প্রবর্তিত হবার ঠিক মুখে বা পরে ব্যাঙের ছাতার মত পাঁচ-ছটি সংরক্ষণপন্থী বাংলা কাগজ গজিয়ে উঠেছিল। এই সমস্ত কাগজের পিছনে যে সম্পদশালী গোষ্ঠী ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

প্রতিক্রিয়াশীলতার একটা অসম্ভব শক্তি আছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে সে শক্তি যত বড়ই হোক তা ইতিহাসের দুর্বার গতিকে আটকে রাখতে পারে না। সহমরণের বিরুদ্ধে যে প্রগতিশীল শক্তি রামমোহনের নেতৃত্বে গঠিত হচ্ছিল তুলনামূলকভাবে তা প্রতিক্রিয়াশীলদের থেকে অনেক কম। কিন্তু ইতিহাসের তুলাদণ্ড তাঁদের দিকেই ঝুঁকে পড়ছিল। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্ট সতীদাহের ওপর আর এক দফা নিয়ন্ত্রণ আদেশ চাপিয়ে দেন। নিঃসন্তান সতীদের সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করবেন এই ছিল সে বিধান। সম্পত্তির লোভে ধর্মীয় প্রথার নামে যে স্ত্রীহত্যা হয়ে আসছিল, এই নিয়ন্ত্রণের ফলে তা বন্ধ হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। তৎসত্ত্বেও ধর্মীয় উন্মত্ততা হ্রাস হয়নি। ১৮২৫ সালের ৮ অক্টোবর সম্বাদ কৌমুদী লিখছেন, বৈষ্ণবাটীর জনৈক রামচন্দ্র মিত্র (২৫) কলেরায় হঠাৎ মারা যান। তাঁর সুন্দরী পত্নীর বয়স চৌদ্দ কি পনের। তিনি ভেবে দেখলেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর বেঁচে থাকার অর্থ অনন্ত দুর্দশা তাই তিনি স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ওই দিনই কৌমুদী আর একটি খবর দিচ্ছেন: ২৪ পরগণা (কলকাতার) মদনমোহন চক্রবর্তী পনের বছর বয়সে মারা গেছেন। তাঁর বারো বছরের স্ত্রী আর এই পার্থিব জগতে বাঁচতে না চেয়ে স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।[৩১]

সহমরণ সম্পর্কিত বিতর্কিত বিতর্কে কিছু ইংরাজ সহমরণের পক্ষে ছিলেন। সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ উইলসনও আইন করে সতীদাহ বন্ধ করার বিপক্ষে ছিলেন।

১৮২৭ সালে ২৮ মার্চ লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে এক সভায় মিঃ পাইণ্ডার নামে এক ব্যক্তি সতীদাহ বন্ধের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ওই সভায় কর্নেল স্ট্যানহোপ ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সভার পাঁচজন তাঁর সঙ্গে একমত হন। প্রস্তাবটি আর গৃহীত হতে পারে না।

এই খবর পেয়ে ১৮২৭ সালের ২০ আগস্ট চন্দ্রিকা লেখেন: আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে কর্নেল স্ট্যানহোপ ও আরও কিছু ভদ্রলোকের চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব লণ্ডনের সভায় বাতিল হয়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা এখনও এমন লোক আছেন যাঁরা, আমাদের শাস্ত্রসিদ্ধ প্রথায় হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক। কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই আমরা এটি দীর্ঘকাল ধরে পালন করে আসছি। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের ধর্মীয় আচারের বিরোধিতা করা হবে না। কারণ আমরা গৌরবময় ইংলণ্ডের প্রজা। আশা করব সতীদাহ প্রথা রদের প্রস্তাব নিয়ে ভবিষ্যতে আর কেউ বিক্ষোভ প্রকাশ করবেন না[৩২]

তবু আমহার্স্ট যতদিন গবর্নর ছিলেন ততদিন তিনি সতীদাহ প্রথা পুরোপুরি

রদের জন্য আইন করতে সাহস করেননি। তাঁর ভয় ছিল হয়ত এ নিয়ে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে। ১৮২৭ সালের ১৮ মার্চ তিনি তাঁর মিনিটে লিখেছেন, একটা হিংসাত্মক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ার চেয়ে আমি ক'বছর অপেক্ষা করব। আমহার্স্ট অপেক্ষা করতেন কিনা জানি না। কিন্তু তাঁর সে সুযোগ হয়নি। কারণ লর্ড আমহার্স্টের শাসননীতির প্রতি কোম্পানির ডিরেক্টররা প্রসন্ন হতে পারেননি। তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ১৮২৮ সালে গবর্নর জেনারেল হয়ে আসেন বেন্টিঙ্ক। তার দূরদৃষ্টি ছিল, সংস্কারবাদী মন ছিল, প্রশাসনেও ছিল দক্ষতা। তিনি সহমরণ সম্পর্কে অফিসারদের মতামত চেয়ে পাঠালেন। অধিকাংশ মতামতই এল সতীদাহের পক্ষে।

১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর বেন্টিঙ্ক কাউনসিলে সতীদাহ রদ আইনটি পাশ করিয়ে নেন। এটি ১৮২৯ সালের Regulations XVIII—নামে পরিচিত। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এই আইনের মাধ্যমে নবজাগ্রত সমাজে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার সর্বাগ্রে স্বীকৃত হল। দ্বিতীয়ত নবজাগরণের ধারক ও বাহক প্রগতিশীল সাংবাদিকতারও বিরাট জয় সূচিত হল। বাংলা সংবাদপত্রের প্রগতিশীল অংশ তার লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করল।

সতীদাহ আইনে স্পষ্টই বলে দেওয়া হল: সতীদাহ দেখলেই জমিদার, তালুকদার, নায়েব বা তাদের স্থানীয় কর্মচারী দেশী রাজস্ব অফিসাররা নিকটবর্তী থানায় খবর দিতে বাধ্য থাকবেন। না দিলে শাস্তি হবে।

পুলিশ দারোগারা দাহস্থানে উপস্থিত হয়ে সমবেত জনতাকে প্রথমে বলবেন যে সতীদাহ বে-আইনী। তারা না শুনলে তাদের গ্রেপ্তার করবেন। সতীদাহ সতীর ইচ্ছায় হোক বা বলপ্রয়োগ করে হোক যিনি সতীদাহে সাহায্য করবেন তাঁরও শাস্তি হবে।

চতুর্থত যদি নিজামত আদালত সতীদাহে সাহায্যের অপরাধে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেন তাহলে কেউ তা থেকে আদালতকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।[৩৩]

এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর সামাজিক আলোড়ন আরও জোরদার হয়। আইন যে হয়ে যাচ্ছে সে খবর সংবাদপত্র আগেই পেয়েছিল। ১৮২৯-এর ২৭ জুলাই ইণ্ডিয়া গেজেটে আইনের আভাস দেওয়া হয়। ৮ আগস্ট সমাচার চন্দ্রিকা উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখে:

"২৭ জুলাই ইণ্ডিয়া গেজেট নামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রস্তাব হইয়াছে যে গবর্নমেন্ট এইক্ষণে চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গভর্নর জেনারেল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন।"

চন্দ্রিকা জানায়, ইংরাজরা ভুল বুঝছেন। পতিপ্রাণা স্ত্রীলোক 'স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে ও হাস্যবদনে স্বামীর চিতায় আরোহণ করে। জোর জবরদস্তির দরকারই হয় না। অতএব আমারদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম শ্রীযুত লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক সাহেব যিনি দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্মসংস্থাপন করণ জন্য এতদ্দেশ্যে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম কিংবা রীতি আছে তাহার অন্যথা করণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না।'

কিন্তু বেন্টিঙ্ক এতে কর্ণপাত করেননি। তিনি আইন পাশ করেন। রামমোহন বেন্টিককে স্বাগত জানালেন। সহমরণপন্থীরা ১৮৩০ সালের ১৪ জানুয়ারি গবর্নর হাউসে উপস্থিত হয়ে সতীদাহের পক্ষে এক আবেদন গবর্নরকে দিয়ে বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করতে বললেন। আবেদনের সঙ্গে সহমরণ সমর্থনে শাস্ত্র বাক্যসমূহের প্রবচন যোগ করে দেওয়া হল। কুড়িজন পণ্ডিত স্বাক্ষর করলেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাইচরণ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, রাধাকান্ত দেব, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দে, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র, রামগোপাল মিত্র প্রমুখ।

এই সহমরণের প্রশ্নে হিন্দুসংরক্ষণপন্থীরা সুসংহত হয়ে উঠলেন। ১৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা হল। সভার সঙ্গে সঙ্গে ১১,২৬০ টাকা চাঁদাও উঠে গেল।[৩৪]

বেন্টিঙ্ক আবেদন নামঞ্জুর করলেন তবে বললেন, এ ব্যাপারে তাঁরা প্রিভিকাউন্সিলে আবেদন করতে পারেন। তিনি আবেদন পাঠিয়ে দেবেন। ধর্মসভা প্রতিষ্ঠার আগের দিন ১৬ জানুয়ারি রামমোহন রায় তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গবর্নর হাউসে গিয়ে লর্ড বেন্টিককে সম্বর্ধনা জানিয়ে এসেছিলেন! তাঁরা দেশীয় ব্যক্তিদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি অভিনন্দনপত্রও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সেটি শ্রীকালীনাথ রায় বাংলা ভাষায় পাঠ করে শোনান। তার একটি ইংরাজী তর্জমাও দেওয়া হয়।[৩৫]

সতীদাহের পক্ষে প্রিভি কাউন্সিলে যে আবেদন জমা পড়ে তাতে ১১৪৬ জন স্বাক্ষর করেন।[৩৬]

১৮৩০ সালের ১৫ নবেম্বর রামমোহন বিলাত যান। বিলাত যাত্রার প্রধান কারণ ছিল দিল্লীর বাদশাহের দৌত্যকর্ম তবে সেই সঙ্গে আরও একটি উদ্দেশ্য সাধিত হল। সতীদাহ নিবারণ আইনের প্রতিবাদে রক্ষণশীলরা প্রিভি কাউন্সিলে যে আবেদন করেছিলেন তার প্রতিরোধ করারও সুযোগ হাতে এল। রামমোহন বিলাতে গিয়ে সেখানে জনমত গড়ে তুললেন। ধর্মসভা তাঁদের মামলা লড়ার জন্য কলকাতার প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল সার্জেন্ট সন্যাঙ্কিকে নিয়োগ করলেন। তিনি তখন পার্লামেন্টের কনজারভেটিভ দলের সদস্য। এছাড়াও ছিলেন, প্রিভি কাউন্সিলে ফ্রান্সিস বেথি সাহেব।[৩৭] ধর্মসভার সমর্থক জুটে যেতেও দেরি হয়নি। ডাঃ লনসিটন, ড্রিঙ্কওয়াটার ম্যাকডোগন প্রমুখ সদস্য সতীদাহকে সমর্থন করেছেন।[৩৮]

১৮৩২ সালের জুলাই মাসে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের শুনানী হয়। জুলাই-এ কাউন্সিল আপীল ডিসমিস করে দেন।

রামমোহনের বিলাতযাত্রা সংবাদে সমাচার দর্পণ আনন্দ প্রকাশ করে লেখেন :

'অকিঞ্চনের বোধে এই হয় যে তাঁহার বিলায়ত গমনে ভারতবর্ষের অত্যন্ত হিতের সম্ভাবনা' (২০ আগস্ট ১৮৩১)। ২৪ মার্চ আবার লেখেন :

"অতএব উক্ত রাজা জীউর বিলায়ত গমনেতে ভারতবর্ষের মঙ্গল সম্ভাবনা যে পূর্বে আমরা লিখিয়াছিলাম এইক্ষণে তাহার সুফলের লক্ষণ হইতেছে পাঠক মহাশয়েদের ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে। এবং রামমোহন রায়ের ধর্মাবলম্বন বিষয়ে যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরদের সম্মতির অনৈক্য থাকে তথাপি রায়জী যে এতদ্দেশীয় অতিরিক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের হিতার্থে যে উত্তম পরামর্শ দিতে ক্ষমতাপন্ন ইহাতে কাহারো বিপ্রতিপত্তি নাই ..."

কিন্তু সমাচার চন্দ্রিকা রামমোহনের বিলাত যাত্রার খবরটি ছাপেনি। এতে কয়েকজন পাঠক চন্দ্রিকাতে চিঠি লিখেছিলেন। ১৮৩০ সালের ২৮ অক্টোবর চন্দ্রিকা এ ব্যাপারে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে লেখেন :

"শ্রীযুত রামমোহন রায় মহাশয়ের বিলাত গমন উদযোগ সংবাদ আমরা চন্দ্রিকায় এপর্যন্ত প্রকাশ করি নাই এজন্য তিন চারিজন চন্দ্রিকা পাঠক পত্র লিখিয়াছেন যে কি কারণ প্রকাশ করনা উত্তর এসংবাদ প্রায় তাবৎ লোকের শ্রুতিগোচর হইয়াছে অতএব লিখনের আবশ্যক বুঝা যায় নাই, রায়বাবুর বিলাত গমনে কাহার শঙ্কালেশও হয় নাই যেহেতুক সুবিচারক রাজার নিকট পক্ষপাত হইতে পারিবেক না অতএব সতী ও কলনিজেসিয়ান বিষয়ে শঙ্কা নাই শাস্ত্র ও সুবিচার বলে ডঙ্কা বাজাইয়া উকীল জয়ী হইয়া আসিবেক।"

'উকীল' অর্থে ধর্ম সভার উকীল। কিন্তু চন্দ্রিকার দুর্ভাগ্য উকীল জয়ী হয়ে আসেনি।

রামমোহন বিলাত যাত্রার পর চন্দ্রিকায় রামমোহন সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক ছড়াও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৩০ সালের ৪ ও ৮ নবেম্বর দ্বিজরাজের খেদোক্তি নামে সেগুলি প্রকাশিত হয়। তার একটু নমুনা :

বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখে কত।
পাতশাই পাঞ্জা পাই এই অভিমত॥
এদেশের রাজা হয়ে প্রজারে পালিব।
আপন মতের মধ্যে তাবেতে আনিব॥
কাহার সাক্ষাতে এই মনের বাসনা।
কহিবাতে সে আমারে কহিল মন্ত্রণা॥
যদ্যপি বিলাতে তুমি যেতে পার ভাই।
পুরিবে বাসনা তার সন্দেহ নাই॥

প্রিভি কাউন্সিলে ধর্মসভাপন্থীদের পরাজয় নবজাগরণের পথকে আলোকিত করে তোলে। ১০ নবেম্বর দ্বারকনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রগতিপন্থীদের এক সভা হয়। তাতে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য ও কোর্ট অব ডিরেক্টরসদের ধন্যবাদ দেওয়া হবে ও সেই ধন্যবাদ পত্র রামমোহনের হাত দিয়ে পৌঁছে দেওয়া হবে।

জ্ঞানান্বেষণ এই সভার প্রতিবেদনের হেডিং দিয়েছিলেন স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা। ১৮৩২ সালে ১৭ নভেম্বর জ্ঞানান্বেষণে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।

স্ত্রীদাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা। গত শনিবার ১০ নবেম্বর, সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ গৃহে স্ত্রীদাহ নিবারণে আনন্দিত মহোদয়েরা এক মনোরম কমিটি করিয়াছিলেন, তাহার প্রধানাধ্যক্ষ শ্রীযুক্তবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ঐ সভোপবিষ্ট ইউ-রোপীয় ও এতদ্দেশীয় মহাত্মাবর্গের সমক্ষে প্রথম প্রশ্ন এই হইয়াছিল যে অত্যধিক ঘৃণ্য স্ত্রীহত্যারূপ দুষ্কর্ম নিবারণ প্রযুক্ত আমাদের যে পরমানন্দের মঙ্গল সমাচার সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আহ্লাদিত করিরাছে ইহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিশিষ্ট শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ডাধিপতি ও প্রবিকৌসেলকে ধন্যবাদ দেওয়ায় বিষয়ে আপনারদের কি অভিপ্রায় তাহাতে পরস্পর সভ্যগণেরা পরমোল্লাষিত হইয়া অত্যা-বশ্যক রূপে সম্মতি প্রদান করিলেন অপর কোর্ট অব ডিরেকটরকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাবেও সভ্যগণের অভিমত সম্পূর্ণ হইল তৃতীয় প্রশ্ন এই যে আমারদের এ মহোল্লাষের আদি কারণ পরম দয়ালু শ্রীশ্রীযুত লর্ড উলিএম বেণ্টিক গবর্ণর বাহাদুর অতএব তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের উচিৎ কিনা ইহাতে সভ্যগণেরা সম্পূর্ণ সম্মতি দিলেন যে তাহার ধন্যবাদ দেওয়া অতি কর্তব্য চতুর্থ প্রশ্ন এই যে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের দ্বারা ঐ ধন্যবাদ পত্র বিলাতে পূর্বোক্ত উভয় বিচার স্থানে অর্পিত হওনের বিষয়ে আপনারা কি অনুমতি করেন তাহাতেও সভ্যগণেরা আনন্দিত রূপে সম্মত হইলেন। বিশেষতঃ সভ্যগণেরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে স্ত্রীহত্যা নিবারণার্থে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়ের যে পর্যন্ত পরিশ্রম ও নির্দয় স্ত্রী বারিদের কটূক্তির ভাগী তিনি হইয়াছেন বাঙ্গালিদের মধ্যে অন্য কাহারও এরূপ হয় নাই এতএব এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে এক ধন্যবাদ দেওয়া অত্যাবশ্যক।

সতীদাহ প্রথা উঠে যাবার পর ধর্মসভার ভগ্নদশা ঘনিয়ে আসে। তবে চন্দ্রিকা সতীদাহকে যেন পবিত্র কর্তব্য হিসাবেই গ্রহণ করে ছিলেন। চন্দ্রিকা এরপর 'সতী ও প্রতিপ্রাণাসতী' এই শিরোনামে মফস্বলের বিভিন্ন নারী মৃত্যুর খবর নিয়মিত রূপে ছেপে দেখান যে সহমরণ অবৈধ ঘোষিত হবার পরও সতীরা স্বেচ্ছায় সহমৃত হচ্ছেন।

সতীদাহ প্রথা রদের অপমান চন্দ্রিকা কখনও ভুলতে পারে নি। কঠোর ভাষায় ইংরাজের সমালোচনা করার মত ক্ষমতা চন্দ্রিকার ছিল না। অক্ষমের প্রচণ্ড অভিমান ও দ্বেষের বিষে চন্দ্রিকা জর্জরিত হয়েছেন। কথায় কথায় সরকারকে খোঁটা দিয়েছেন। ১৮৩১ সালে কলকাতার ঘাটে খেয়া পারাপারের সময় বেশ কিছু লোক ডুবে মারা

যায়। ৫ মে তারিখের চন্দ্রিকা লিখছেন: আমরা অনুমান করি এ বিষয় শ্রীশ্রীযুতের কর্ণগোচর হইবামাত্র ইহাতে মনোযোগ করিবেন যেহেতু স্বধর্মরক্ষার্থে যথাশাস্ত্র মতে যে সকল স্ত্রী প্রফুল্ল চিত্তে মৃত স্বামীর সহিত সহগমন করেন তাঁহার মতে সে কুকর্ম এ বিবেচনায় তাঁহারদিগের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত আইন করিয়াছেন অতএব বুঝা যায় অধর্ম হইলেও তাহা অবশ্যই করেন সুতরাং বুঝিতে পারি ইহাতে মনোযোগ করিবেন।

তবে চন্দ্রিকার নীতি ছিল মোটামুটি তোষামোদ করে সরকার বাহাদুরের মন জয় করা। তাঁদের বিশ্বাস বেণ্টিঙ্ক 'পরমদয়ালু' শেষ পর্যন্ত এ আইন রদ হবেই। অন্তত প্রিভি কাউনসিলেতো বটেই। তাঁরা ইংরাজকে বলতে চেয়েছিলেন: কিছু মিশনারি ও কয়েকজন হিন্দুর ভুল বোঝানোর ফলেই সরকারের মনে হতে পারে যে এ অতি কুকর্ম নিবারণ করা উচিত।[৪০] (তাই আমরা এক্ষণেও তাঁহার নিকট সতীর পক্ষে প্রার্থনা করিতে বিরত হই নাই তৎপ্রমাণ তাঁহার অনুজ্ঞামত বিলাতে আপীল রা গিয়াছে।)[৪১]

সেই সঙ্গে চন্দ্রিকার ধারণা ছিল যে সহমরণ রদ আইন যে প্রতিপ্রাণাসতীদের প্রাণ বিসর্জনে বিরত করতে পারেনি এই তথ্য জানতে পারলে *রকার তাঁর মত পালটাবেন। তাঁরা লেখেন:

এই সংবাদ প্রাপ্তিতে বোধ হইতেছে সতীদিগের ব্রতভঙ্গ হয় নাই এবং বিধিলিপির অন্যথা হইতে পারিবেক না অর্থাৎ বিধাতা যাঁহার ভাগ্যে লিখিয়াছেন পতির সহিত সহগমন হইবেক তাহা কোন প্রকারেই কেহ খণ্ডিতে পারিবেন না।

এ সকল সংবাদ শ্রীশ্রীযুতের কর্ণগোচর হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ কি কিন্তু ঐ পরম দয়ালু মহামহিম অবশ্যই ইহা বিবেচনা করিয়াছেন যে হিন্দুদিগের ইহা যথার্থ 'ধর্ম'।[৪২]

সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ হলেও চোরা গোপ্তা ভাবে বহু সতীদাহের ঘটনা ঘটে। এবং এইসব ঘটনায় বহু ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতারও করে। চন্দ্রিকা ফলাও করে সে সব খবর ছাপে।

সতীদাহকে কেন্দ্র করে ধর্মসভাপন্থীরা প্রচুর টাকা তুলেছিলেন। যে অর্থ ও যে উদ্যম সেদিনের সংরক্ষণপন্থী বাঙালি সতীদাহের পিছনে ব্যয় করেছিলেন তা সে অর্থ সমাজ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত হলে দেশের কল্যাণ আরও ত্বরান্বিত হত। শুধু তাই নয়, ওই সাধারণের অর্থ নিয়ে ধর্মসভার কোন কোন নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছিল। বিশ শতকের প্রগতিশীল সমাজ কাঠামোর মধ্যেও যেখানে দুর্নীতি অবাধে বাসা বাঁধছে সেখানে উনিশ শতকের কলুষতাময় অন্ধকার সমাজে অসাধুতা ও দুর্নীতি যে সমাজকে গ্রাস করে বসবে তাতে আর আশ্চর্য কী! ১৮৪০ সালের ৪ এপরিল সম্বাদ ভাস্কর এই দুর্নীতির স্বরূপ উদের জাতিচ্যুত

"ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বহুকাল মানস ছিল হিন্দু জাতির প্রল যে তাঁরা তো করিবেন সেই তাৎপর্যানুসারে লর্ড উইলিএম বেণ্টিক সাহেব এতদ্দেসামাজিক সম্পর্ক লোকের সম্মতি লইয়া ১২৩৬ সালে সহমরণ রহিত করেন, য়েছিলেন। দর্পন

হইলে পর এতদ্দেশীয় বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বিপক্ষ হইলেন এবং সংস্কৃত কলেজে সভা করিয়া স্থির করিলেন ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে আবেদন করিবেন তাহাতে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত করিয়াছিলেন এই বৃহদ্ব্যাপারে অনেক টাকা চাই এবং দেশের হিতাহিত বিবেচনার জন্য সহমরণ পন্থীয়েরদের অবস্থার যোগ্য অট্টালিকা (নাই) এই সুযোগে প্রস্তুত বাটী কিম্বা স্থান ক্রয় করিয়া তথায় বাটী প্রস্তুত করিলে ভালো হয় কিন্তু এসকল অধিক টাকার কর্ম অতএব চাঁদা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিতে হইবেক, এই প্রস্তাবের পর চাঁদাপত্রে সকলে স্বাক্ষর করিলেন এবং উপস্থিত বিষয় সহমরণ রক্ষার্থে বেথি সাহেবকেও বিলাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতবাসি বিচারকর্তারা ধর্মসভার ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন তাহাতে সুতরাং ধর্ম সভার মতস্তাপ হইয়াছিল কিন্তু তথাপি চাঁদার টাকা সংগ্রহ ক্রটি করেন নাই এবং শেষ স্থির করিলেন ঐ টাকার দ্বারা স্থান ক্রয় করিয়া আপনাদিগের সভার নিমিত্ত বাটী প্রস্তুত করিবেন্ পরে সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলেন ভূমি স্থির হইয়াছেন এক দিবস তাবৎ সভ্যেরা একত্র হইয়া দেখিলেই ক্রয় করা যায়। আমারদিগের স্মরণ হয় সভ্য মহাশয়রা ভূমি দেখিয়াছিলেন এবং ক্রিয়ার্থে চাঁদার টাকাও সংগ্রহ করা গিয়াছিল কিন্তু কিজন্য ভূমি ক্রয় হইল না বলিতে পারি না।

সহমরণ স্থাপনার্থ আবেদন অগ্রাহ্য হইলে ধর্ম সভা যখন পরামর্শ করিলেন দেশের মঙ্গল ও সংস্থাপনা সভা জগতের উপকার করিবেন এবং যাহারা ধর্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাও ঐ সভা শাসনে ভীত হইবে কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কার্য্য কেবল দলাদলিতে প্রর্যাপ্ত হইল আর স্বদেশের ধনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল শ্রীযুতবাবু প্রমথনাথ দেব সভার ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু তিনি টাকা রাখেন নাই এবং স্বহস্তেও ব্যয় করেন নাই সুতরাং দাতারা হিসাব চাহিলে ঐ বাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার হিসাব কে দিবেন সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধনরক্ষক নহেন এই কথা বলিয়া নির্লিপ্ত হইয়া বসিবেন তবে কি ঐ সমূহ টাকা শূন্যে ২ উড়িয়া গেল আমরা দেখিতেছি ঐ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরস্পর মনোভঙ্গ হিংসা দ্বেষ মাত্র সুদ বৃদ্ধি হইতেছে।

"ধর্মসভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া চুক্তি পত্রে লিখিয়াছিলেন দেশের মঙ্গল ও ধর্মরক্ষা করিবেন এবং সতীদ্বেষীদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে ও সংগ্রহ রাখিবেন না কিন্তু এই গুণে সতীদ্বেষীদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধর্ম সভার পত্র চাটাচাটি হইতেছে আমরা তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব এ পর্যন্ত মঙ্গল কর্ম কি হইয়াছে তাহা ...চর হয় না এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক এবং বিপরীত হইয়া

হচ্ছেন। ... ব্যাপারে সাধারণের কি লক্ষ্য আছে তাহা বলিতে পারি না

সতীদাহ প্রথা রদে... ...য়র কিঞ্চিৎ সুসার হইয়া থাকিবে দুর্বল ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা মধ্যে

ইংরাজের সমালোচনা ক... থাকেন কিন্তু একের কিঞ্চিৎ লভ্য অনেকের অলভ্য হইতেছে

ও দ্বেষের বিষে চন্দ্রিকা ... দের পরস্পর প্রণয় যে মহাসুখের কারণ তাহা ভঙ্গ হইয়াছে এবং

১৮৩১ সালে কলকাতা

ঐ মনোভঙ্গ প্রযুক্তই রাজনারায়ণ রায় কুকর্ম করিয়া কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন বোধ হয় পরস্পর বিচ্ছেদে শেষ রক্তারক্তিতেই উচ্ছেদ হইবে অতএব কুরিয়র সম্পাদক মহাশয় যাহা বলেন ধর্ম সভার নামে গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন হইবে আমার দিগের বোধ হয় তাহা হইলেও হইতে পারে কেননা এ সভা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন অতএব মিথ্যা শপথ বিষয়ক অভিযোগ হইবার আটক নাই এবং বাটী করিবার নিমিত্ত টাকা লইয়া তাহা উদরে নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেও বিচারযোগ্য বটেন যখন পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া উঠিল তখন বোধ হয় কেহ ছাড়িয়া কথা কহিবেন না।

"যে সময়ে কলিকাতার মধ্যে নানা প্রকারবিদ্যা স্বর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং দেশীয় লোকেরা সভ্য হইতেছেন এতৎ সময়ে প্রধান বংশোদ্ভব মহাশয়ের বিদেশীয় সভ্য লোকের নিকট ঘৃণিত হইতেছেন অতি লজ্জার বিষয় শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত প্রমথনাথ দেব প্রভৃতি মান্য মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করি এ পর্যন্ত দলাদলি ব্যাপারে কি পরমার্থ রক্ষা হইয়াছে আর আপনারা ধার্মিক অন্যেরা পাপিরা এই অভিমান করেন ইহা কি তাঁহারদিগের ঘৃণাজনক নিন্দাকর হয় না।

"অতএব আমরা প্রার্থনা করি উক্ত মহানুভব লোকেরা এ বিষয় বিবেচনা করেন দলাদলি তুচ্ছ বিষয় অধম শুদ্র কৈবর্তাদির কর্ম বিশিষ্ট লোকেরা কেন তাহাতে লিপ্ত থাকেন পরমেশ্বর তাঁহারদিগকে ধনী করিয়াছেন ধর্ম কর্মোপলক্ষে অনায়াসে অধিক লোকের সন্তোষ করিতে পারেন ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত কেন দলাদলি করেন।"

প্রতিক্রিয়াপন্থীদের লড়াই যে শুধু আদর্শগত ছিল না, তা ব্যক্তি পর্যায়ে গিয়েও পৌছেছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। রামমোহনের মৃত্যুর পর ধর্মসভাপন্থীরা তাঁদের সভ্যদের সতীদাহের সমর্থক কারও গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

অবশ্য ধর্মসভার এই নিষেধাজ্ঞা যে সকলেই মেনেছিলেন তা নয়। ১৮৩২ সালেই সতীদাহ সমর্থক ভগবতীচরণ মিত্রের কন্যার সঙ্গে আন্দুলের রাজা সহমরণ বিরোধী মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয় গোবিন্দচন্দ্র রায়ের বিবাহ হয়েছিল। এই বিবাহে রামমোহনের ভাই রামরতন বরযাত্রী গিয়েছিলেন। ১৮৩২ সালের ডিসেম্বরে জ্ঞানান্বেষণ এই খবরটির 'ধর্মসভার দলে ভগ্নদশা' নামে হেডিং দিয়ে ছেপেছিলেন।

১৮৩৪ সালে সতীদাহ নিবারণের সমর্থক রাজকৃষ্ণ সিংহ ও মথুরানাথ মল্লিকের বাড়ির বিবাহে বহু কায়স্থ ঘটক কুলীন ঘটকদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল কিন্তু চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ যিনি একাধারে ধর্মসভায়ও কর্ণধার তিনি কলকাতার ঘটক কুলীনদের এই ভয় দেখালেন যে যাঁরা ওই বিবাহ অনুষ্ঠানে যাবেন তাঁদের জাতিচ্যুত করা হবে। তাঁদের দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই পর্যন্ত করে নেওয়া হল যে তাঁরা তো নিমন্ত্রণে যাবেনই না উপরন্তু যাঁরা যাবেন তাঁদের সঙ্গে কোন সামাজিক সম্পর্ক রাখবেন না। ১৫ মার্চ সমাচার দর্পণ এই নির্দেশটি ফাঁস করে দিয়েছিলেন। দর্পণ

লিখেছিলেন, 'ধর্মসভা ও ধর্মসভার অগ্রগণ্য চন্দ্রিকা সম্পাদকের অত্যাশ্চর্য ব্যবহারের দ্বারা গত সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে কলিকাতা নগরে একটা মহাগণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে।' ঘটনার বিবরণ দিয়ে দর্পণ ধর্মসভার প্রতিজ্ঞাপত্রের অনুলিপিটিও ছেপে দেন।

ধর্মসভা বার বার ধর্মভীরু হিন্দুকে সমাজচ্যুত করার ভয় দেখিয়েছে। উনিশ শতকের কলকাতার সামাজিক গঠন ছিল গ্রামীণ। একে বাঙালি মানসিকতার গঠন নাগরিক নির্লিপ্ততার বিরোধী। তদুপরি কলকাতার সমাজে সেসময় বর্ণাশ্রমের বেড়া ভেঙেছে বটে কিন্তু জাত্যভিমান অবলুপ্ত হয়নি। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণেই সমাজ পরস্পরের সঙ্গে ঘন সন্নিবিষ্ট, ইংরাজীতে যাকে বলা যায় কম্প্যাক্ট। এসব কারণে সমাজ কাঠামোকে অনেকেই অস্বীকার করতে পারেন নি। ব্রাহ্মসভা পন্থীরা সে সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন সমাজ গড়ে তুলছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলদের তো কোন সামাজিক বন্ধনের অনুভবই ছিল না। তাঁরা ছিলেন বেপরোয়া। মুশকিলে পড়েছিলেন তাঁরা যাঁরা নানা কারণে ঝুঁকি নিতে পারেননি। তাঁদের এজন্য ধর্মসভার নেতাদের কাছ থেকে নানান নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। যেমন শ্রীমধুসূদন মিত্র। ভদ্রলোক অকুলীন ঘরে তাঁর পুত্রের বিবাহ দিয়ে সামাজিক অপরাধ করে ফেলেছিলেন। এই অপরাধের জন্য তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। মধুসূদন এই মুচলেকা দেন যে তিনি তাঁর নববিবাহিত পুত্রবধূকে পরিত্যাগ করে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করবেন অতএব তাঁকে যেন সমাজে গ্রহণ করা হয়। এই মুচলেকা দেবার পর মধুসূদন আবার সমাজে গৃহীত হন। ধর্মসভার এই অধর্মের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন 'বেঙ্গল স্পেকটেটর।' ধর্মোন্মাদনা যে কত ভয়াবহ হতে পারে যে মানুষ তার জন্য নববধূকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, কুটুম্বদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে। ইংরাজী শিক্ষা যেমন সতীদাহের মত নির্মম কুপ্রথাকে রদ করতে পারেনি তেমনি ধর্মীয় গোঁড়ামিকেও অনেকের মন থেকে দূর করতে পারেনি। বরং সতীদাহ প্রথার সমর্থন দিয়ে যার শুরু তার শেষ হয়েছে একের পর এক সামাজিক অনাচার সমর্থনে। বাংলা সংবাদপত্র সঙ্গে সঙ্গে এই সামাজিক অন্যায়কে চিহ্নিত করতে দেরী করেনি।

বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর 'ধর্মসভার গত বৈঠক' নামে যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার এক জায়গায় বলেছেন :

"এতৎ পত্রাবলোবলে আমারদিগের মনোমধ্যে পত্র লেখক ও আশুতোষ বাবু এবং উক্ত নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কার্য্যের সহকারি ব্যক্তিদিগের প্রতি এতাদৃশ অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহা এস্থলে ব্যক্ত না করিয়া সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হিন্দু ধর্মের অথবা পৃথিবী মণ্ডলস্থ অন্য কোন ধর্মে উক্ত রূপ কার্য্যের আদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, হায়! দলবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পিতাপুত্র স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ হয় তাহার কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর যে দুরাত্মা আপন পুত্রকে ধর্মদার পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করে ও আশুতোষবাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত আহার ব্যবহার করণার্থ আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ

করিতে উদ্যত তাহার কথাই বা কি কহিব, আমরা জানি আশুতোষবাবু যদিও কেবল ঐহিক সুখাভিলাষে মত্ত তথাপি তাঁহার অনেক সদগুণ আছে অতএব দলস্থ এতাদৃশ নিষ্ঠুর ও অধর্মজনক কর্ম করিতে আদেশ করা তাঁহার উচিত হয় না আর ঐ দুঃখিনী অথচ নিরপরাধিনী অবলাকে পতিসত্বে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাইতে তাঁহারদিগের কি কিঞ্চিন্মাত্র দয়া হইল না? এক্ষণে আমরা ঐ সকল মহাশয়দিগকে বিনয় পুরঃসর অনুরোধ করি তাঁহারা এই গুরুতর অধর্ম্মজনক ব্যাপার বিবেচনা করুন কারণ এ বিষয়ের বিচার যদিও অন্য কোন মনুষ্য বিচারক সমীপে হইবার সম্ভাবনা নাই তথাপি জগদীশ্বরের নিকট অবশ্যই হইবেক এবং ধর্মসভার সামান্য দোষে গুরুতর দণ্ড দেখিয়া তাহার প্রতি আমারদিগের ঘৃণা জানিবেক ও তাহার নির্দ্ধারিত অন্যায় কর্মসকলও আর সহ্য হইবেক না, ধর্মসভা স্থাপিত হইয়া এতাবৎ কাল পর্যন্ত কি ফল জন্মিল? সভ্যগণেরা যাবৎ অন্যায়াচরণ করিয়া বরং কেবল অধর্মেরই বৃদ্ধি করিলেন এবং এক্ষণেও হিন্দু ধর্মাভিমানী হইয়া কেবল দলপতিত্ব স্বরূপ স্ব ২ সম্ভ্রমমাত্র রক্ষা করিতেছেন ইহাতে আমরা তাহাদিগকে এক প্রকার অন্ধ কহিতে পারি যেহেতু তাঁহারা আপন ২ সন্তানদিগকে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করাইয়া আপনারাই ধর্ম ও ঐ সম্ভ্রমের মূলোৎপাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রায় ১২ বৎসর গত হইল পণ্ডিতাগ্রগণ্য উইলসন সাহেব হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষদিগকে কহিয়াছিলেন যে ইংরাজী ভাষার উত্তমরূপে শিক্ষাদানারম্ভ হইলে এতদ্দেশের মিথ্যাধর্মের অবশ্যই লোপ হইবেক আর এদেশের প্রধান লোকেরদের ধন সম্ভ্রম ও উচ্চপদ প্রাপ্তির অভিলাষ থাকাতে তাঁহারা স্ব ২ সন্তানগণকে তদভাষা শিক্ষা করাইতে কখনই বিমুখ হইবেন না সুতরাং কারণ সত্বে কার্যোৎপত্তির প্রসিদ্ধ হেতুক উক্ত শিক্ষার দ্বারা মিথ্যা ধর্মলোপ রূপ ফল অবশ্যই জন্মিবেক। এক্ষণে তদ্বিষয়ে অধিক লিখন অনাবশ্যক, সম্প্রতি উক্ত সভার কার্য্যের অন্যান্য বিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি।

"সভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে আমাদিগের মনোযোগ আবশ্যক নাই, চতুর্থ পত্রে শ্রীযুত কেশব বসু ধর্মসভার বহির্ভূত দলস্থ কোন ব্যক্তির সহিত কুটুম্বতা করিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানপূর্ব্বক ঐ কুটুম্বের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার আশুতোষবাবু শুদ্ধ দলে প্রবিষ্ট হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, কি আশ্চর্য যে কোন দলস্থ হইবার ক্ষণিক সম্ভ্রমের জন্যে এতদ্দেশের লোকেরা আত্মকুটুম্ব পরিত্যাগ করিতে অনায়াসে উদ্যত হন।"

সতীদাহ প্রথা অবলুপ্ত হলেও তাকে কেন্দ্র করে যে রক্ষণশীলতার মহীরূহ সমাজে সেদিন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল, তার মূল চল্লিশ দশক পর্যন্ত যে শক্ত ছিল এটা তারই প্রমাণ।

তবে বাংলা সংবাদপত্র এই বিষবৃক্ষের মূল উৎপাটনের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিল এবং সতীদাহ রদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সংবাদপত্র যে সামাজিক আন্দোলনের সামিল হয় পরবর্তীকালে বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে আন্দোলন আরও দুর্বার হয়ে ওঠে।

বিধবা বিবাহ ঃ

বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইনটি ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই গৃহীত হয়। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর প্রথম বিধবা বিবাহ দেন।

এই বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজ আবার দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনকে অবলম্বন করে বিশের দশকে যা ঘটেছিল তারই আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তবে এবারের এই সামাজিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল, অধিকাংশ বাংলা সংবাদপত্রই বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসেন। তত্ত্ববোধিনী, ভাস্কর, সর্বশুভকরী, বামাবোধিনী, সোমপ্রকাশ এই ক'টি বিখ্যাত পত্রিকা বিধবা বিবাহের পক্ষে কলম ধরেছিলেন। ষাট দশকের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'সুলভ সমাচার'ও বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে চল্লিশ দশকের পত্রিকা বেঙ্গল স্পেকটেটর, বিদ্যাদর্শন, জ্ঞানান্বেষণ আগে থেকেই বিধবা বিবাহের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছিলেন। এ ছাড়া মফস্বল থেকে প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকাতে বিধবা বিবাহের সমর্থনে লেখা হতে থাকে। বিধবা বিবাহ সমাজে কোনদিন জনপ্রিয় না হয়ে উঠলেও সমাজ সংস্কারকরা তাকে বরাবরই সামাজিক কল্যাণের প্রতীক হিসাবেই দেখেছেন। বিশ শতকের ত্রিশ দশক পর্যন্ত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় বিধবা বিবাহের খবর এবং জেলাওয়ারি বিধবা বিবাহের হিসাব প্রকাশিত হত।

বিধবা বিবাহের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন 'সমাচার চন্দ্রিকা'। কিছু পরিমাণে 'সংবাদ প্রভাকর'ও। তবে সংবাদ প্রভাকরকে বিধবা বিবাহ বিরোধী বললে ঠিক বলা হবে না। বলা যেতে পারে বিধবা বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে প্রভাকরের আলাদা মতামত ছিল।

কৌলীন্য প্রথা, বাল্য বিবাহ এবং বিধবা বিবাহের উপর বিধিনিষেধই ছিল সতীদাহের প্রধান কারণ। আবার কৌলীন্য প্রথা ও বাল্য বিবাহই ছিল অকাল বৈধব্যের কারণ। কৌলীন্য প্রথার কবলে পড়ে কুলরক্ষার জন্য বালিকাকে অনেক সময় বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত। একজন স্বামীর মৃত্যু হলেই দেশের বেশ কিছু বালিকা বিধবার সংখ্যা বেড়ে যেত। দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন কাটাতে হত। এর ফলে স্বাভাবিক কারণেই পাপাচার প্রশ্রয় পেত। সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ হওয়ার পরে বিক্ষিপ্তভাবে সতীদাহের ঘটনা ঘটলেও চল্লিশের দশকে সতীদাহ প্রায় অবলুপ্ত হয়েই গিয়েছিল। সতীদাহের বিরুদ্ধে ততদিনে সামাজিক জনমতও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ যথারীতি প্রচলিত ছিল এবং তার ফলে বিধবারা সামাজিক সমস্যাই থেকে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর এই সমস্যার গোড়ায় ঘা দিতে চেয়েছিলেন বাল্যবিবাহ বন্ধ করে। ১৮৫০ সালে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি বাল্যবিবাহের দোষ দেখিয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

১৮১৫ সালে লেখেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব। এটি প্রথমে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তারপরই পুনর্মুদ্রিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে—১৭৭৬ শকের ফাল্গুনে। তার পরের সংখ্যাতেই সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত একটি প্রবন্ধ লিখে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় প্রস্তাব পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের অকটোবরে। ১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পুস্তিকাটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং পুস্তিকার বক্তব্য সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগরের এই দুটি পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহ সামাজিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে এবং এই আন্দোলনের পক্ষে ও বিপক্ষে দ্রুত বেগে জনমত সংগঠিত হতে থাকে।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের বহুকাল পূর্ব হইতে, অনেক ধনশালী লোক বালিকা বিধবার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য, এতদ্বিষয়ে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অনেক ধনশালী ব্যক্তির (রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির) আন্তরিক যত্ন থাকিলেও এ বিষয়ে সাহস করিতে পারেন নাই।[৪৩] এক্ষেত্রে 'আন্দোলন' কথাটির মধ্যে অত্যুক্তি আছে। বিধবা বিবাহ দেওয়া যায় কি না এ নিয়ে তাঁর আগে অনেকেই ভেবেছেন। ভেবেছেন প্রধানতঃ ব্যক্তিগত কারণে. তাঁদের অনেকেরই কন্যারা অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাদের বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁরা পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞের কাছে বার বার ছুটে গিয়েছেন কিন্তু কেউ অনুকূলে মতামত দেননি, বা দিলেও তা কার্যকর করার মত সাহসও তাঁরা সঞ্চয় করতে পারেননি। কারণ সামাজিক ও শাস্ত্রীয় আচারবিধি লঙ্ঘন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সামাজিক আন্দোলন আরও বৃহৎ ও ব্যাপক এবং তা সমস্ত বাধাকে ঠেলে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরই এই সামাজিক আন্দোলনের পুরোধা।

তবে একথা গৌরবের সঙ্গে বলা যায় যে বিধবা বিবাহ নিয়ে সামাজিক আন্দোলনের প্রস্তুতি বাংলা সংবাদপত্রই ঘটিয়েছে। বিধবা বিবাহের অনুকূলে প্রগতিশীল বাঙালির বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রথম প্রকাশ বাংলা সংবাদপত্রে। সে যুগের সংরক্ষণশীল সামাজিক কাঠামোর মধ্যে এইসব চিন্তাধারা প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।

১৮৩৫ সালের ১৪ মার্চ সমাচার দর্পণে কাচিৎ শান্তিপুর নিবাসিনী লেখেন, "শ্রীযুক্ত ইংরেজ বাহাদুরের রাজ্যমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যাবস্থা হইলে তাহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালির মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সম মেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভবা মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুলনষ্ট হয় না। বিশেষতঃ তাঁহারা মান্যমত ধন্যবাদ পাইতেছেন এবং ধর্মে

কর্মে পৈতৃক আশ্রমে ধর্মবৎ ধর্মের ভারাক্রান্ত আছে তজ্জন্য সমন্বয় ভারাক্রান্ত নহেন। কেবল স্ত্রী লোকের নিমিত্ত সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গলা শাস্ত্রমতে এমত আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। তাহার প্রমাণ আছে।"

বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিয়ে সমাজে বাদানুবাদ উপস্থিত হয় ১৮৩৭ সাল থেকে। বিদ্যাসাগর সে সময় ছাত্র। এই বছরই ভারতীয় ল কমিশন বালবিধবাদের সমস্যাটি বিশেষভাবে চিন্তা করে সে সম্পর্কে আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হন। ল কমিশনের সেক্রেটারি জে. পি. গ্রাণ্ট কলকাতা এলাহাবাদ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি সদর অঞ্চলের বিচারকদের কাছে লেখা চিঠিতে জানতে চান :

বিধবা বিবাহের জন্য আইন প্রবর্তন করলেও তা হিন্দু সমাজের আচারবিরুদ্ধ হবে কি না।

কিন্তু ঐ সমস্ত আদালতের সদর রেজেস্ট্রারেরা পৃথক পৃথক পত্রে লিখে জানান, বিধবারা পুনর্বিবাহ করলে শুধু যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে তাই নয় সমাজের চোখে বিধবাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হবে।

তাঁরা আরও বলেন মানবিকতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিধবা বিবাহ হয়ত সঙ্গত কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু আইনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিধবা বিবাহে আইনের সম্মতি থাকলে তা জনগণের অনুভূতির ওপর নির্দয় আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।[৪৪]

স্বভাবতই নীতিগত কারণে কোম্পানী শাস্ত্রীয় বিধির বিরুদ্ধে যেতে সাহস করেননি। রামমোহনের মৃত্যুর পর প্রগতিশীল শিবিরে সাময়িকভাবে নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছিল. রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভাও কোন রকমে আপন অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখে, চল্লিশের দশক থেকে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাধ্যমে আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে প্রগতিশীল জনমত সুসংহত হতে থাকে। তার আগে ত্রিশের দশক জুড়ে ইয়ংবেঙ্গলরা সমাজকে ধরে নাড়া দিয়ে সমাজ বিপ্লবের নতুনতর পটভূমি তৈরি করে গেছেন বটে কিন্তু তাঁদের উগ্রপন্থা সমাজের বৃহত্তর অংশকে নিয়ে কখনও সামাজিক গণ-আন্দোলনের অনুবর্তী করে তুলতে পারেনি। বরং সংরক্ষণপন্থীদের কাছ থেকে তো বটেই উদারনৈতিকদের কাছ থেকেও তাঁরা অবহেলা পেয়েছেন।

ইয়ং বেঙ্গলদের কলেজী জীবনের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস ও চরম পন্থার প্রতি আকর্ষণ কর্মজীবনে এসে দায়িত্বশীল ও সংগঠনমূলক চিন্তাধারার মধ্যে সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। জ্ঞানান্বেষণ ও বেঙ্গল স্পেকটেটরের লেখাগুলিই তার প্রমাণ।

জ্ঞানান্বেষণ ত্রিশের দশকেই বিধবা বিবাহের পক্ষে অভিমত দেন। ১৮৩৭ সালের ২১ অকটোবর 'জ্ঞানান্বেষণ' 'জ্ঞানান্বেষণ পাঠকস্য' নামে জনৈক পত্র লেখকের একটি চিঠি ছাপেন। সে সময় বিধবা বিবাহের প্রশ্নটি নিয়ে সরকার জনমত সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। পত্র লেখক লেখেন :

"শ্রীযুক্ত জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েষু—৩।৪ বৎসর হইল আপনকার সমাচার পত্র

পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে কতিপয় ধনিলোক হিন্দু বিধবা স্ত্রী লোকের পুনর্বিবাহার্থ এক সভা করিতে মানস করিয়াছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কে ঈশ্বর সমান সুখভোগ করিতে শক্তি দিয়াছেন কিন্তু পুরুষ যত ইচ্ছা তত বিবাহ করিতে পারেন স্ত্রী বাল্যাবস্থায় প্রথম স্বামী মরিলে দ্বিতীয়বার স্বামী করিতে পারেন না কিন্তু স্ত্রী লোকেরদের বন্ধু যাঁহারা তাঁহারা স্ত্রী লোকেরদের চিরকাল বৈধব্যদশা হইতে মুক্ত করিবার উপায় স্থির করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা ঐ বিষয়ে এক্ষণে কি করিতেছেন তাহা আমি জানি না আমি বোধ করি তাঁহারা বিধবাদের পক্ষে যে মনোযোগ করিয়াছিলেন এক্ষণে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন প্রথমে যে সকল উপায় স্থির করিতে প্রবর্ত হইয়াছিলেন তাহা আরম্ভতেই ভঙ্গ হইয়াছে।

"আমি স্বয়ং এ বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলাম কিন্তু ১৫ ভাদ্রের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়া স্মরণ হইল যে বোম্বের কমিশনার সাহেবরা নিজ আমলারদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে হিন্দু-বিধবারদিগের পুনরায় বিবাহ হইলে ইহাতে আপত্তি আছে কিনা আমি এই সময়ে ঐ সকল মহাশয়েরদের নিকট নিবেদন করিতেছি যাঁহারা পূর্বে এই স্ত্রী লোকেরদের বৈধব্য ব্যবস্থা হইতে সকল মুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া ছিলেন, তাঁহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই প্রশংসনীয় বিষয় সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইবেন সম্পাদক মহাশয় আপনি জ্ঞান এবং বিবেচনাপূর্বক এ বিষয়ে যে প্রমাণ দিয়াছেন ইহাতে বোধ হয় আপনি মনোযোগী আছেন এবং আমি জানি যে হরকরা কুরিয়র ইঙ্গলিসমেন রিফর্মর ও দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েরা ইহারাও হিন্দু বিধবারদিগের এই দুরবস্থা হইতে মোচন করিতে ইচ্ছুক আছেন অতএব আমি আপনারদিগকে মিনতি করিতেছি আপন ২ পত্রে আন্দোলন করিয়া যাহাতে সকলের এবিষয়ে মনোযোগ হয় এমত চেষ্টা পাইবেন ইহা করিলে গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন এবং হিন্দু মহাশয়েরাও বিধবাদিগের দ্বিতীয় বিবাহ না দেওয়া অন্যায় বিচার জানিতে পারিবেন।"

জ্ঞানান্বেষণের পত্র লেখক সংবাদপত্রের মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে তুলতে বলেন, পরবর্তীকালের বাংলা সংবাদপত্র সে মহান দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৮৪২ সালের : এপ্রিল বেঙ্গল স্পেকটেটর বিধবা বিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রীয় যুক্তি সম্বলিত এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। অনুমান হয় চিঠিখানি পত্রিকার সম্পাদক গোষ্ঠীদেরই কেউ লিখেছিলেন।

এই দীর্ঘ চিঠিখানিকে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের 'যবনিকা উত্তোলক' বলা যেতে পারে। কারণ বিদ্যাসাগর পরবর্তীকালে শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করে যে 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব' লিখেছিলেন, সেই ধরনের প্রচেষ্টা বেঙ্গল স্পেকটেটরেই প্রথম দেখা যায়।

পত্র লেখক তাঁর চিঠিতে বলতে চান :

"যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতীয় বিধবার

পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ।"

পত্রলেখক বিধবা বিবাহের সমর্থনে শাস্ত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করেন এবং দেখান ভারতের বহু অংশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত।

"আর এক্ষণে বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিংবা তর্কদ্বারা তাহার বিবরণ অনাবশ্যক যেহেতু এতদ্দেশীয় লোকেরা অবশ্যই স্বীকার করেন যে অস্ত্রীক পুরুষের পুনর্বিবাহ করণে যাদৃশ ক্ষমতা আছে বিধবার প্রতি তাদৃশ শক্তি অর্পণ করিলে অধিক ক্লেশ ও পাপের হ্রাস হইয়া প্রায় অর্দ্ধাংশ হিন্দু জাতীয়দিগের সুখবৃদ্ধির সম্ভাবনা অতএব উক্ত অনিষ্ট নিবারণার্থে সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়-দিগের উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং এতদ্বিষয়ে সর্বথা সচেষ্ট হইলে নিরুদ্যমতা রূপ দুর্নাম হইতে মুক্ত হইবেন। যদ্যপি এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকের বিদ্যার দ্বারা মূর্খতা বিনাশ ব্যতিরেকে প্রস্তাবিত বিষয়ের সম্পাদন দুঃসাধ্য তথাপি সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরা দৃঢ়রূপে কায়িক মানসিক চেষ্টা পুনঃসর বিবেচনীয় সদুপায় সংস্থাপন দ্বারা যত্ন করিলে অবশ্য সম্পন্ন করিতে পারেন।"

বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সমালোচনা ছিল যে কলিযুগে ঔরস ও দত্তকপুত্র ছাড়া অন্য কোন পুত্রের ধনাধিকার নেই অতএব বিধবা বিবাহ হলে বিধবার গর্ভজাত সন্তানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতে হলে সরকারের সাহায্য নিতে হবে। সরকারী হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। কারণ তাহলে "ধর্মাধর্ম বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে তাহাও এই দৃষ্টান্তবলে ক্রমশ গবর্নমেণ্ট কর্তৃক উচ্ছিন্ন হইবেক।"

স্পেকটেটর এই যুক্তি খণ্ডন করে লেখেন: "তাবৎ ব্যক্তিই স্বীয় ধন যথেষ্ট ব্যয় করণে সক্ষম অতএব পুনর্বিবাহ করিয়া জীবদ্দশায় তাহার এবং তদুৎপন্ন সন্তানাদির জীবিকা স্থাপন করা যাইতে পারে যদ্যপি তাহাতেও আশঙ্কা হয় যে অন্য উত্তরাধি-কারিরা উহাদিগের ঐ প্রকার ধনবিভাগে বিবাদ উপস্থিত করিবেক।"

বেঙ্গল স্পেকটেটরের এই চিঠিটি প্রকাশিত হলে ১৮৪২ সালের ২৬ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকরে ওই চিঠির বক্তব্য বিষয়কে কটাক্ষ করে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। সে চিঠির বক্তব্য বিষয় ছিল বিধবার পুনর্বিবাহ হলে কন্যা সম্প্রদানের অধিকারী কে হবেন? কারণ একবার সম্প্রদান করে কন্যার মাতা পিতা তো কন্যার প্রতি অধিকার খুইয়েছেন।

বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪২ সালের জুলাই সংখ্যায় লেখেন, বিধবা বিবাহের সমর্থনে তাঁদের প্রথম সংখ্যায় যে পত্র প্রেরক পত্র লিখেছিলেন তাতে বলা ছিল যে, মনুর মতে বিধবার পুনর্বিবাহে সম্প্রদানের বিধি নেই—সংস্কারমাত্র বিহিত আছে। স্পেকটেটর সেই মত সমর্থন করে লেখেন, "আমরাও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে উক্ত প্রকার বিবাহ দান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় এবং বিধবা স্বয়ং আহ্বান করিতে পারে।"

স্পেকটেটর লেখেন, "এক্ষণে হিন্দুজাতীয় বিধবার বিবাহ পুনঃস্থাপনের অন্য কোন

শাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইতেছে না। উক্ত ব্যবহার যে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল ও অদ্যাপি ইতর লোকদিগের মধ্যে প্রচলন আছে এবং কলিযুগের তন্নিষেধে যে অশেষ দোষ, তৎসমুদায় আমাদিগের পত্র প্রেরক স্পষ্টরূপে সপ্রমান করিয়াছেন এবং আমরাও সম্প্রতি হৃষ্টচিত্তে দেখিতেছি যে উক্ত নিষেধ স্মৃতি শাস্ত্রের বিপরীত।"

বেঙ্গল স্পেকটেটর উদাহরণ দিয়ে দেখান যে ১৭৫৬ সালে ঢাকার রাজবল্লভ রায় নিজের বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য পণ্ডিতদের বিধান চেয়েছিলেন। তাতে দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, বারাণসী, মিথিলা প্রভৃতি স্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরা এসে বিধান দেন যে স্বামীর দেশান্তর গমন, মরণ, সন্ন্যাসধর্মাবলম্বন, ক্লীবত্ব এবং পাতিত্য এই পঞ্চপ্রকার আপদে স্ত্রীলোকের প্রতি বিবাহান্তর করণের বিধি আছে।

"নিজ বিষয়ের নিয়মপত্র আদালতে রেজিষ্টারি করিয়া রাখিলেই ওই সন্দেহ দূর হইতে পারিবেক। অতএব এবিষয়ে গবর্নমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন কি? এবং হিন্দুদিগের বিবাহাদি ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত প্রযুক্ত ইহাতে গবর্নমেন্টের প্রভুত্বের সম্পর্ক বিধান আমাদিগের বিবেচনায় সৎ পরামর্শ নয়, আর হিন্দুজাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহারম্ভের প্রতি পৌনর্ভব পুত্রের ধনাধিকারে নিয়মাভাব রূপ যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহারও এইরূপে খণ্ডন করা যাইতে পারে।"

বেঙ্গল স্পেকটেটর অনুরোধ করেছিলেন যে কিছু সংখ্যক তরুণ যদি বিধবা বিবাহ করে পথ দেখান তাহলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হবার পথ সুগম হবে।

"এক্ষণে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে উক্ত বিষয়ে কি প্রকারে সিদ্ধ হইবেক? তাহাতে আমরা এইমাত্র কহিতে পারি যে অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা ও যুবাদিগের কর্তব্যকর্মে সাহসাবলম্বনের উপদেশ ব্যতিরেকে এতদ্বিষয় ক্রমশ সিদ্ধ হইবার আর সদুপায় নাই আর আমাদিগের বোধ হয় যে কতিপয় হিন্দু ব্যক্তিরা যদ্যপি পুনর্ভূ বিবাহ করিয়া পথ দেখান তবে ইহার প্রতি লোকের যে দ্বেষ আছে তাহাও ক্রমে হ্রাস পাইয়া পরে সর্বসম্মতি রূপ প্রচলিত হইতে পারে।"

৮৫০ সালে সর্বশুভকরী পত্রিকায় 'বাল্য বিবাহের দোষ' নামে একটি প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর বাল্য বিবাহকেই বিধবা সৃষ্টির কারণ বলে অভিহিত করেন। তাতে এক জায়গায় লেখক বলছেন, 'মানুষের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম নির্বাহ হয় তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না।' এই রচনায় বৈধব্য যন্ত্রণার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়। বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার।[৪৫]

এখানে বলা যেতে পারে প্রবন্ধ লেখক অকাল বৈধব্যের কারণটাই এখানে দূর করতে চেয়েছেন বিধবা বিবাহের পক্ষে কোন কথা বলেননি।

আগেই বলেছি, বিধবা বিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগর সরাসরি কলম ধরেন ১৮৫৫

সালে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এই নামে ১৮৫৫ সালের ১৬ মাঘ (সংবৎ ১৯১১, শক ১৭৭৬) তাঁর পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর তাঁর পুস্তিকায় বলতে চেয়েছিলেন যে কলিযুগে পরাশর প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের বিধানই একমাত্র গ্রাহ্য এবং পরাশর বিধান দিয়ে গেছেন যে, স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব বা স্থির হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে অথবা পতিত হলে স্ত্রীদের পুনঃবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। যে নারী স্বামীর মৃত্যু হলে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে সে মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করে। যে নারী সহমরণে যায় তার ভাগ্যেও সুদীর্ঘকাল স্বর্গবাস ঘটে।

বিদ্যাসাগর লিখছেন, 'পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, প্রথম বিবাহ, দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য, তৃতীয় সহগমন। তন্মধ্যে রাজকীয় আদেশ ক্রমে সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুই মাত্র পথ আছে, বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য। ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক। কিন্তু কলিযুগে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া দেহ যাত্রা নির্বাহ করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই লোকহিতৈষী ভগবান পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিতেছেন। সে যাহা হউক, স্বামীর অনুদ্দেশ হওয়া প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, পরাশর কলিযুগের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন। সুতরাং কলিযুগে পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র সম্মত কর্ত্তব্য হইল।'

'কলিযুগে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির হইল।' পুস্তিকার এটাই ছিল মর্মকথা। এই বিধানের পিছনে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুক্তি উত্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে এ পর্যন্ত যত যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে তা খণ্ডন করেছেন। বিদ্যাসাগর এই প্রবন্ধে ২১৫টি শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করেন, তার মধ্যে ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য ছয়টি ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য ৭টি প্রমাণ সংগ্রহ করে দেন।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন আগে বিধবা বিবাহ নিয়ে পণ্ডিত মহলে শাস্ত্রীয় বিতর্কের উৎপত্তি হয়েছিল। 'পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দাস নিজ তনয়ার বৈধব্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করেন' যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবা বিবাহ পুস্তিকার ভূমিকায় ওই ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ওই পুস্তিকায় সমাজকে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে বলেছিলেন। 'সর্ব সাধারণের নিকট বিনয় বাক্যে আমার প্রার্থনা এই আপনারা এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া এই বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা লিখিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্ট রূপ আলোচনা করিয়া দেখুন, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।'[৪৬]

বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাটি তত্ত্ববোধিনীতে পুনর্মুদ্রিত হয় ১৭৭৬ শকের ফাল্গুনে। চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনীতে ওই প্রবন্ধের সমর্থনে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ওই সম্পাদকীয় থেকে জানা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের ওই রচনা সমাজে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। তৎকালীন সমস্ত সংবাদপত্রেই বিধবা বিবাহ আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। তত্ত্ববোধিনী লেখেন: "কয়েক বৎসরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃ সংস্কার প্রচলিত হইবার বিষয় এতদ্দেশে বারংবার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ বৎসর এই বিষয় লইয়া যাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ আন্দোলন অন্য কোন বৎসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বিধবা বিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্ব মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকেই ঐ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে ইদানীং ঐ বিষয়েই সর্বত্র সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া বিধবা বিবাহের নিষেধক বচনের অন্বেষণার্থ অতি বিবর্ণ, কীট নিষ্কুশিত, পুরাতন জীর্ণ পুস্তক প্রভৃতি অশেষ গ্রন্থ উদ্ঘাটন ও পর্য্যালোচন করিতেছেন, কুসংস্কার পরতন্ত্র প্রাচীন সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশয়েরা আপনাদিগের পণ্ডিতবর্গকে পারিতোষিক প্রদানের আশ্বাস দিয়া বিদ্যাসাগর প্রণীত পূর্বোক্ত পুস্তকে নিরাকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন, কি ইংরেজি কি বাঙ্গলা, এতদ্দেশীয় সমুদায় সংবাদপত্রই ঐ বিষয়ের জল্পনায় ঐ আলোচনায় ও ঐ বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং বিষয়ের স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল দ্বিবিধ সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ ঐ বিষয়ে সপক্ষ হইয়া উহার সংসাধনার্থ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ শাস্ত্র ও যুক্তি এই উভয়ের কিছুই অবলম্বন না করিয়া চিরবলম্বিত কুসংস্কার বশতঃ বিষম বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছে। কেহ কেহ ঐ বিষয়ে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছেন, কিন্তু দলপতির ক্রোধাশঙ্কায় অথবা লোকানুরাগের ব্যতিক্রম ভয়ে, বাক্যস্ফুট করিতে সমর্থ হন না। উল্লিখিত পুস্তকে বিধবাদিগের পুনঃ সংস্কার বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বিষয় শাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে।

আর যাহারা নিরপেক্ষ যুক্তি পথ অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিবেন, বিধবা বিবাহ এই দণ্ডেই প্রচলিত করা আবশ্যক "বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ওই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিধবা বিবাহের সমর্থনে মোট নয়টি যুক্তি দেন।

এক: স্ত্রী পুরুষের কামনা বাসনা, বুদ্ধি, ধর্ম অনুভূতির কোন প্রভেদ নেই। বিপত্নীক পুনর্বিবাহ করতে পারেন তবে বিধবা পারবেন না কেন?

দুই: স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী অসহায় হয়ে পড়েন। তার সামাজিক নিরাপত্তার জন্য পুনর্বিবাহ প্রয়োজন।

তিন : বিধবার বিবাহ হলে তার পিতামাতাও দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

চার : মেয়েদের রিপু পুরুষের চেয়ে অন্তত আটগুণ প্রবল। বালবিধবাদের বিবাহের সম্ভাবনা না থাকায় তাঁরা গোপনে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করতে পারেন। সমাজের পক্ষে তার পরিণাম বিষবহ।

পাঁচ : উপরোক্ত কারণের ফলে বিধবা স্ত্রী ব্যাভিচারিণী হয়। ভ্রূণ হত্যার প্রাবল্য ঘটে।

ছয় : বাল্য বিবাহের প্রচলন থাকায় স্বামী স্ত্রীর বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য হয়। বালিকা স্ত্রী বৃদ্ধ স্বামীকে ভালবাসতে পারে না, বৃদ্ধস্বামীর মৃত্যুর পর তার কোন সুখস্মৃতি পত্নীর সামনে থাকে না। পত্নীর ব্যভিচারিণী হবার পথে কোন মানসিক বাধা থাকে না।

সাত : বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় এক পতির মৃত্যু হলে বহু পত্নী বিধবা হন। বিধবাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, পাপাচারের প্রবণতা—ইত্যাদি কারণে অনেক বিধবা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। কৌলিন্যপ্রথাই এই সব ঘটনার জন্য দায়ী।

আট : বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা অনেকেই স্বীকার করেছেন।

নয় : বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে স্বামীর পত্নী পছন্দ না হলে তাকে হত্যা করে দ্বিতীয় বিবাহে লিপ্ত হবেন এ আশঙ্কা অমূলক। এই প্রথা যে পতিহত্যার হেতু নয় তার প্রমাণ ইংলণ্ডে এই প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সেখানে পতিহত্যার ঘটনা ঘটে না।

বিদ্যাসাগর দিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় যুক্তি। তিনি সংস্কারক। যে শাস্ত্রীয় সংস্কার জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করেছে তা থেকে মোহমুক্তি ঘটাবার জন্য শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত বিরুদ্ধ প্রমাণই একমাত্র উপযুক্ত অস্ত্র ছিল। আর তত্ত্ববোধিনী সংবাদপত্র। সংবাদ-পত্রের দায়িত্ব সমস্ত ঘটনার সামাজিক মূল্যায়ন। জাতির বিবেকের মূলে কশাঘাত করা। তত্ত্ববোধিনী ওই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহারে জনসাধারণের বিবেকমূলেই আঘাত করেছেন।

"যাঁহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিনকালে কারুণ্য রসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?' যিনি কোন নব বিধবা তরুণী স্ত্রীকে সদ্যমৃত প্রিয় পতির শোক মোহে মুহ্যমানা, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা, দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' যিনি দেখিয়াছেন, যে সাধ্বী রমণী মাসদ্বয় পূর্ব্বে স্বামি সমাদরে—মানিনী ও গৌরবিনী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাসদ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়-হীনা হইয়া দীনভাবে শীর্ণশরীরে, সাশ্রুনয়নে, দিনপাত করিতেছে এবং স্বামী সম্পর্কীয়

বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাসদাসীগণ কর্তৃক উপেক্ষিত ও অনুদ্ধৃত হইয়া কাতর স্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' যে রূপবান যুবা পুরুষ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, লোকজন দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত, গৃহমধ্যে উৎসব ব্যাপারে সতত ব্যাপৃত সেই ব্যক্তিকে যিনি অতি বালবিধবা অনাথা দুহিতার ম্রিয়মাণ মুখচন্দ্র সহসা স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অবসন্ন হইতে এবং চিরপ্রদীপ্ত-সদারুণ শোক শিখা সদৃশ ভয়ঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?' যিনি দেখিয়াছেন, যে পবিত্র কুলে কোন কালে কলঙ্ক স্পর্শের বাষ্পও শ্রুত হয় নাই, সেই কুলের কোন যুবতী স্ত্রী অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পিতৃকুল, মাতৃকুল ও ভর্তৃকুল চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়াছে এবং ভ্রূণবধ জনিত অশুদ্ধ শোণিত সংস্পর্শে লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারম্বার অশৌচ গ্রস্ত করিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?' কোন পতি বিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথি বিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার সামগ্রী অর্পণ করিল না—জলতৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া, দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল তথাপি কেহ জলবিন্দু প্রদান করিল না, এই হৃদয় বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করি; 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা।'

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন, ১৮৫৫ (১৭৭৭ শক) সালের কার্তিক মাসে। এই পুস্তিকাটি প্রথম পুস্তিকা থেকে অনেক বড়। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত যুক্তি বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করে এখানে খণ্ডন করা হয়েছে। অগ্রহায়ণের তত্ত্ববোধিনী পুস্তিকার উপক্রমণিকা ও উপসংহার অংশ—পুনর্মুদ্রিত করেন। উপসংহারে বিদ্যাসাগর যে কথাগুলি লিখেছিলেন, তা তত্ত্ববোধিনীরই সম্পাদকীয় অংশের প্রতিধ্বনি: 'যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা—অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।'

এইভাবে বিধবা বিবাহের অনুকূলে ও প্রতিকূলে বাংলাদেশের জনমত ক্রমশ ভাগ হয়ে যেতে থাকে এবং বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে বাঙালির ভাব জগতে বিরাট আলোড়নের সূত্রপাত হয়। সংবাদ প্রভাকরের কণ্ঠেও সেদিন বিধবা বিবাহের সমর্থনে দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে।

প্রভাকর লেখেন:

"বর্তমান সময়ে যখন হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব বাহুল্যরূপে অন্দোলন হইতেছে তখন কোন বিধবার গর্ভস্রাব, অথবা তদ্গর্ভজাত কোন সন্তানসন্ততি সঙ্গোপনে

রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইলে বিবেচকদিগের অন্তঃকরণে অসীম দুঃখের সঞ্চার হয় এবং ঐ ঘটনা বিধবা বিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ পোষকতা করে।" (১০মে ১৮৫৫)

প্রভাকরের এই বক্তব্যের পিছনে প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। এর মধ্যে কতখানি আবেগপ্রবণতা ও কতখানি যুক্তি-প্রসূত তা নিয়ে চুলচেরা হিসাব নিষ্প্রয়োজন। যে ঘটনায় প্রভাকর বিচলিত হয় সেই ঘটনাটি হল এই : প্রভাকর অফিসের সামনে কে বা কারা এক সদ্যোজাত শিশু কন্যাকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। এক পুলিশ প্রহরী তা দেখতে পেয়ে জনৈক সারজেণ্টকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিন্তু সারজেণ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অনুমতি না নিয়ে কোন ব্যবস্থা নেন না। কিছু সময় কেটে যায়। পরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ নিয়ে এসে কন্যাটিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রভাকর মনে করেন, 'ঐ কন্যা ভদ্রকুলোদ্ভবা বিধবার গর্ভজাত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, বিধবাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে এরূপ ঘটনা কদাচ হইতে পারে না।' এটাই ছিল প্রভাকরের সিদ্ধান্ত।

'বিধবাদিগের বিবাহের নিয়ম থাকিলে এরূপ ঘটনা কদাচ হইতে পারে না', এই বিধবা বিবাহের নিয়ম প্রবর্তনের জন্যই বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে নিয়ম তখনই সিদ্ধ হবে যখন তার পিছনে থাকবে আইনের সমর্থন। রাজদ্বারের স্বীকৃতি না পেলে বিধবা বিবাহকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এবং বিধবার গর্ভজাত পুত্রদের বৈধ সন্তান বলে স্বীকৃতিও মিলবে না।

এই সামাজিক ও আইন সম্মত স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করছিল পুনর্বিবাহিত-বিধবার সন্তানদের পিতৃধনে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন।

তাই বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ বৈধ করার দাবিতে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে শুরু করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বিরুদ্ধবাদীরাও সংঘবদ্ধ হতে থাকেন ও বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে যাতে কেউ সাহায্য না করেন তার জন্য সচেষ্ট হন। বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধপক্ষরা তখন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নেতৃত্বে সংহত হচ্ছিলেন। কারণ তিনি তখনও সমাজপতি।

১৮৫৫ সালে মেদিনীপুরের বিধবা কামিনীরা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে একটি চিঠি লেখেন। ৪মে সংবাদ প্রভাকর চিঠিটি প্রকাশ করেন। ঐ চিঠিতে বিধবা বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগের প্রশংসা করে পত্রলেখিকা লেখেন, 'কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমারদিগের দেশীয় পণ্ডিত মহোদয়েরা শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের এই উৎকট পরিশ্রমে বাধিত না হইয়া তাহাতে নানা প্রকার ফন্দি তুলিতেছেন এবং স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া এই যুক্তি সিদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথা যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহারই চেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত ভগবান পরাশরের বচন অদ্যাবধি কেহই খণ্ডন করিতে পারেন নাই।'

বিধবা বিবাহ নিয়ে কৌতুককর চিঠিপত্র টীকা টিপ্পনীও সে সময় নানান

সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। যখন কোন সামাজিক বিষয় সমাজকে আলোড়িত করে তখন সিরিয়াস দিকটির সঙ্গে লঘু সরল টীকা টিপ্পনীও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এরই মাঝে ১৮৫৫ সালে ৪ অক্টোবর বিদ্যাসাগর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ক্লার্ক ডবলু মরগানের কাছে 'সার্টেন হিন্দু ইনহ্যাবিটান্টস অব দি প্রভিন্স অব বেঙ্গল' এই নামে ৯৮৬ জনের স্বাক্ষর করা একটি গণদরখাস্ত দেন। ফুলস্কেপ সাইজের কাগজে মোট ৪৪ পৃষ্ঠার এই দরখাস্তটির সবশেষে বিদ্যাসাগর নিজে স্বাক্ষর করেছিলেন। দরখাস্তটিতে লেখা হয়েছিল :[৪৭]

"That in the opinion and firm believe of your petitioners this custom, cruel and unnatural in itself, is highly prejudicial to the interests of morality and is otherwise fraught with the most mischievous consequences to Society."

শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয় :

That your petitioners therefore humbly pray that your Honourable Council will take into early consideration the propriety of passing a law to remove all legal obstacles to the marriage of Hindoo widow and to declare the issue of all such marriages to be legitimate.

এই দরখাস্তের সঙ্গে একটি প্রস্তাবিত আইনের খসড়াও পাঠানো হয়।

এই দরখাস্তের সমর্থনে ও বিপক্ষে সরকারের কাছে প্রচুর দরখাস্ত জমা হতে থাকে। ১৮৫৫ সালের ৭ই নবেম্বর প্রথম দরখাস্তের সমর্থনে ৪৫ জনের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত পড়ে। এরপর ৬ ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরের জনসাধারণ হিন্দু বিধবা বিবাহের আইনগত বাধা অপসারণের জন্য আর একটি দরখাস্ত পাঠান। সর্বাগ্রে স্বাক্ষর করেন মহারাজ শ্রীশ্রীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর। ৭ ডিসেম্বর আর একটি দরখাস্ত আসে ২৪ পরগণা থেকে।[৪৮]

'মহামহিম শ্রীশ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ মহাশয় মহোদয় প্রবল-প্রতাপেষু' বলে সম্বোধন করা।

তাঁদের বক্তব্য :

"যেহেতু স্ত্রী জাতি স্বাভাবিক গুণে পুরুষের তুল্য। পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হইলে অনায়াসে বিবাহ হইতে পারে। অস্মদ্দেশে বিধবাগণ মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত না থাকা নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ। তাঁরা বলেন, বিদ্যাসাগরের বই পড়ে বিধবা বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নয় তা তাঁরা অবহিত এবং এই 'নিষ্ঠুর ও বিধিসম্মত অনিষ্টকর' নিয়ম উলঙ্ঘন করতে তাঁরা উদ্যত আছেন।' কিন্তু পাছে বিচারালয়ে এরূপ বিবাহ বিবাহ বলিয়া গ্রাহ্য না হয় ও তদজাত সন্তান ঔরস সন্তান বলিয়া গণনীয় না হয়, এই আশঙ্কায় অনেকে এই বিষয়ে প্রস্তুত হইতে পারেন না।" "ব্যবস্থা সমাজ থেকে

এই ভয় দূরীকৃত হলে অনায়াসে ও অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত হবার সম্ভাবনা।" একদিকে যেমন দরখাস্ত, আবেদন-নিবেদন চলছিল, অন্য দিকে তেমনি জনমতও ক্রমশ জাগ্রত হতে থাকে। ১৮৫৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর সংবাদ প্রভাকরে শ্রীমতী—দাসী নামে বারো বছরের এক বালবিধবার একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রলেখিকা লেখেন, ১ বৈশাখ প্রভাকরে বালবিধবা সংক্রান্ত লেখা পড়ে তিনি যেমন সুখ ও আশ্বাস প্রাপ্ত হয়েছেন তা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করতে অক্ষম। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে লেখেন: "আবার কি এক হৃদয় বিদীর্ণকরা সংবাদ শ্রবণ করিলাম, শহরের কতকগুলিন সুবিখ্যাত ব্যক্তি তাহার প্রতিকূলে এক সভা সংস্থাপন করত যাহাতে এ নিয়ম প্রচলিত না হয় তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছেন, কি আশ্চর্য! ঐ মহাশয়দিগের অন্তঃকরণে দয়ার লেশও নাই, আমরা আর কতকাল এ অসহ্য যাতনা ভোগ করিব? তাঁহারদিগের মনস্বরূপ আকাশে আর কতদিনে কৃপারূপ চন্দ্রমার উদয় হইবে? সম্পাদক মহাশয়গো! এ অভাগিনী দিগের প্রতি কৃপান্বিত হইয়া যাহাতে শীঘ্র এই নিয়ম প্রচলিত হয় তাহার সাপক্ষে এক একবার লেখনী ধারণ করিলে আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইব, অধিক আর কি লিখিব।"

বিধবা বিবাহ বিলটি ১৭ নবেম্বর প্রথমবার ব্যবস্থাপক সভায় পঠিত হয়। ১৭ জানুয়ারী ১৮৫৬ সম্বাদ ভাস্কর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ করে লেখেন,

"ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এখন কোথায় গেলেন? চতুর্দ্দিক নীরব, আর যে কিছুই শুনিতে পাই না, তবে কি বিধবা বিবাহে সকলে সম্মত হইলেন 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' ইহা সকলেই স্বীকার করেন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক অনেকদিন বাহির হইয়াছে, সকলে পাঠে ২ তাহা পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন তথাপি যে কেহ উত্তরের একখানা ঠাঁট মাত্রও বাহির করিলেন না,..."

ঐ প্রবন্ধে সম্বাদ ভাস্কর সকৌতুকে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে পক্ষীয়দের উদ্দেশ করে লেখেন: 'অতএব আমরা স্মরণ করাইতেছি যাহাতে রাজদ্বারে বড় মুখ ছোট করিতে না হয় শীঘ্র শীঘ্র এমত কোন সদুপায় করুন শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্বরূপ রজ্জুদ্বারা বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থকে কুক্কুরপুচ্ছে বন্ধন করিয়া না দিলে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা আবেদনকারী-দিগের কোন কথা শুনিবেন না, শ্রীল শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুরের সহিত ইহা স্থির হইয়া গিয়াছে এইক্ষণে আপনারদিগের বল বুঝিয়া ফল প্রার্থনা করুন।

১৮৫৬ সালের ১৯ জানুয়ারী আইনের পাণ্ডুলিপি সিলেকট কমিটির কাছে পাঠানো হয়। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে পালটা স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়ে যায় ও কয়েকটি দরখাস্ত পেশ করা হয়, এর মধ্যে একটি দরখাস্তে ৩৬,৭৬৩ জনের স্বাক্ষর ছিল। তাঁরা বলতে চান, হিন্দুসমাজের রীতিনীতির সঙ্গে বিধবা বিবাহের সঙ্গতি নেই। এ আইন শাস্ত্র ও আচার বিরুদ্ধ।

স্বাক্ষর সংগ্রহের আগে বিরুদ্ধবাদীরা এক সভায় মিলিত হয়েছিলেন। ১৮৫৬

সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী সম্বাদ ভাস্কর লিখছেন, 'ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে বিদ্যাশূন্য ধর্ম ধ্বাজিগণের সংখ্যাই অধিক এদেশে ফোঁটাকাটা ভট্টাচার্য্যই অনেক, প্রকৃত পণ্ডিত অধিক নাই, নবদ্বীপ ও বাক্লা চন্দ্র দ্বীপাদি নানা সমাজ বাসি প্রসিদ্ধ অধ্যাপকদিগের মধ্যে বহু লোকে স্বাক্ষর করেন নাই অতএব ব্যবস্থাকারী সভা যদি এই সময়ে একটি কৌতুক করেন তবে শুনিবেন আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারী ধর্মধ্বাজিরা দিগ্বিদিগ পলায়ন করিয়াছেন, সে কৌতুক আর কিছুই নয়, রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবেন ঐ পত্রে যাঁহারা নাম লিখিয়াছেন, টৌনহলে যাইয়া অমুক দিবস তাঁহারদিগের বিচার করিতে হইবেক, সেই বিচার সভায় গবর্ণর বাহাদুর কিম্বা লেপ্টেনেন্ত বাহাদুর উপস্থিত থাকিবেন, এই ঘোষণা দিলেই দেখিবেন ফোঁটাকাটা ভট্টাচার্য্যদিগের এক প্রাণীও টৌনহাল মুখে যাইবেন না।"

সম্বাদ ভাস্করের এই প্রতিবেদন বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে সংরক্ষণপন্থীদের আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতার কথাই প্রমাণ হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম অনুসারেই অর্থমূল্যে মনুষ্যত্ব বিবেক ক্রয়ের চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজে বার বার ঘটেছে। কিন্তু পরিণামে মানুষের নবলব্ধ চেতনা ও জাগ্রত মানবতাবোধের কাছে সে অপচেষ্টা বার বার প্রতিহত হয়েছে। ইতিহাস তার আপন অমোঘ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে এই সময় সংবাদপ্রভাকরে দুখানি কৌতুকপূর্ণ ব্যঙ্গাত্মক চিঠি প্রকাশিত হয়। সম্বাদ প্রভাকর প্রথম দিকে বিধবা বিবাহের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন মতামত প্রকাশ করলেও, আন্দোলন যত সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলে পত্রিকাটিতেও তত ভিন্নধর্মী মতামত প্রকাশিত হতে থাকে। তবু বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তৎকালীন সমাজে যে ধরনের ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রচলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য চিঠি দুটি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আছে। যেমন ১৮৫৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রভাকরে 'ভবানীপুরস্থ কস্যচিৎ বিয়ে পাগলার' একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠির শেষে সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন, 'এই রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে'।

চিঠিখানি এই

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হে সম্পাদক মহাশয়, আমি রামতনু চক্রবর্ত্তী, আমার দুঃখ বর্ণনা করিতে নিরস লেখনীও বিরসমনা হন, আহা কি আক্ষেপ। উদ্বাহ উৎসাহে মানবমণ্ডলী মাত্র কাহার অন্তঃকরণে না সুখের সঞ্চার হয়, বিমনাবালাগণের বদন যন্ত্র হইতে হুলধ্বনিরূপ যে নিরুপম নিনাদ নিস্সৃত হইতে থাকে, তাহা শ্রবণে কাহার না হর্ষ জন্মে। কী ধনী কী দরিদ্র গাত্রে হরিদ্রা লেপনে কোন ব্যক্তি না আনন্দ করিয়া থাকে, নানারূপ শোভনীয় বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া মহাসমারোহ পূর্বক অতিবাহিত অন্ন ভক্ষণে অর্থাৎ আইবড় ভাত খাওয়াতে কাহারও চিত্ত উল্লসিত না হয়। বন্ধন শব্দটি শ্রবণে প্রায়ই ক্রন্দন উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু হস্তে সূত্র বন্ধন কি মিষ্ট, বরং মোচনে

লোচনে নীর নিসৃত হয়, এই বিবাহের বন্ধন তো আনন্দের সীমা থাকে না, আহা! উল্লেখিত এরূপ আনন্দরস আস্বাদনে আমরা প্রায় পুরুষানুক্রমে বঞ্চিত বলিতে হয়, তদ্রূপ কুলীন কামিনী দিগের যৌবন ভাগীরথীতে ভাটা না হইলে তাহারা বিলাসরূপ তরণী খুলিতে সক্ষমা নহেন, তদ্রূপ আমার দিগেরও যৌবনরূপ দিবাবসান না হইলে সন্তোষ সলিলে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হওয়া সুকঠিন, আমরা কেবল রন্ধনশালার নিমিত্ত হরিদ্রা ক্রয় করিয়া থাকি, গাত্রে লেপন করিয়া চিত্তে আনন্দলাভ করিতে পারিলাম না, আমারদিগের স্বপাক ভিন্ন বিপাক উদ্ধারে কোন উপায় নাই, গবাক ছেদনাস্ত্র অর্থাৎ জাঁতি কিরূপ আমরা কখনই তাহা আনন্দ সহিত হস্তে ধারণ করিলাম না, সংপ্রতি এক শুভজনক সংবাদ শ্রবণে বড়ই সন্তোষিত হইয়াছি, শুনিলাম যে চক্রবর্ত্তী, ঘোষাল, হড় গুড়, গড়গড়ি ইত্যাদি উপাধি বিশিষ্ট ব্যক্তি বুহের উপকারক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এরাজ্যে Second Hand (সেকেণ্ড হেণ্ড) রমণী অর্থাৎ দোজবোরে কোনে চলন হইবে, একারণ ভরসা করি যে আমরা অতি সুলভ মূল্যেই মনোহরা মহিলা লাভ করিতে সমর্থ হইব, আর চারি পাঁচশত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অশীতি ও নবতী বৎসরে পঞ্চমবর্ষীয় বালিকা বিবাহ করিতে হবে না, বোধ করি যৌবনরূপ বসন্ত সময়েই আমারদিগের বপুরূপ বিটপিতে উদ্বাহ কুসুম বিকশিত হইতে পারে, কেননা সেকেণ্ড হেণ্ড অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পুরাতন দ্রব্য অল্প মূল্যে পাইবার কোন প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হইতেছে না।

হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী রূপ অসীকে তীক্ষ্ণ ও খরশান করুন, কেননা তদ্দারা এদেশের কুসংস্কাররূপশত্রু সংহারে উক্ত মহোদয় যত্নবান হইবেন এবং আমরাও এই পরিষ্কার পদ্ধতি প্রচলিত প্রার্থনায় স্বস্তায়ন আরম্ভ করিলাম।

মনের হুতাশ আর ধনের বিনাশ।
অংশ নাশ বংশ নাশ আর সর্ব্বনাশ
হবে ক্ষয় বোধ হয় এতদিন পরে।
যথা তথা এই কথা কহে ঘরে পরে
নবীনা ললনা লয়ে বসিবে নবীন।
যেদিন এদিন হবে সেদিন কি দিন

অহং শ্রী দী···নামে আর একটি চিঠি তার কিছুদিন পরে পর পর দু'সংখ্যায় (২০ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত হয়।

২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের চিঠিখানি হল এই :

"মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

(গত শুক্রবারের শেষ)

ভগিনী। আর ভাবিও আমারদিগের পক্ষে এবড় কম পড়তা নয়, একথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিল, ঠিক লো ঠিক এজন্যই বুঝি বোন কাল আমার

কর্তাটি এরূপ কৌতুক করিয়াছিলেন, 'প্রিয়সী মনে রেখো তোমারদের আর বার পায় কে ? আজকাল তোমারদের কচেবারো আর যুগ ভাঙ্গিতে হবে না, বিধবাগণের বিবাহ হইবেক, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ কর তিনি তোমারদের সহজ উপকারক নন এতদিনে তোমারদের সিতের সিন্দুর ও হাতের লোহা অক্ষয় হইল।' পতিমুখে এইরূপ কৌতুক শুনিয়া প্রথমতঃ তাহার মনোরঞ্জন ও সুশীলা স্বভাব প্রদর্শন জন্য বলিলাম ওমা কি ঘৃণা এ কেমন করিয়া হবে, আবার আমরা অন্য পুরুষের নিকট কি প্রকারে ঘোমটা খুলিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিব,, কি লজ্জা মেয়ে হোয়ে কি এত বেহায়া কেউ হইতে পারে, পরে মনে ২ কহিলাম হে জগদীশ্বর ! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শতহস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান করুন, তিনি যেন সহস্র লোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সৎযুক্তি সকল সঙ্কলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবী বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান হউন। পরে মতি নাম্নী একটি বিধবা বলিলেন যথার্থ বোন আমিও অনেক দিন শুনিয়াছি যে আমার দিগের শাকে বালী খুচিয়া দগ্ধে চিনি হইবেক, এ কেবল লোক লজ্জায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই প্রতিদিনই কপালে করাঘাৎচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি ও হে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া থাকি, কিন্তু বোন পা ফাটা মথা চাঁচা পোড়া কপালে ভট্টাচার্য্য ও গোসাঁঞি আটকুড়রা যে পেছু ডাকিতেছে—বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে হোলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিস্তারিনী বলিলেন, না বোন ভট্টাচার্য্য ও গোসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যা বুদ্ধি তাহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয় পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাটা মাথা চাঁচা গায়ে কতকগুলা গুহামৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমারটুলি একমেটে ঠাকুর, আ মরি ! গোসাঞিদের বাকি ঢং ঠিক যেন অক্রুর দত্তের রাসের সংগাময় তিলক ছাব দিয়া যেন সদর দেওয়ানী আদালতের ফয়সালা বেরুলেন, তাঁহারদিগের কর্ম কি বোন বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিয়া বিজয়ী হইতে পারে, বিবেচনা করিলে বোন আমার দিগের বড়ই সুখের সময় উপস্থিত।

ধক ধক করে মন সদা দুখানল,
দিদি সদা দুখানল লো, সদা দুখানল।
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদি
বিবাহের জল লো, বিবাহের জল॥"

বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে ইয়ংবেঙ্গলদলের মুখপাত্ররা ৭ ফেব্রুয়ারি ৩১৫ জনের স্বাক্ষর সহ একটি অঙ্গীকার পত্রের খসড়া সরকারকে পাঠিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল বিধবা বিবাহ হলে নবদম্পতী এই ধরনের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করবেন। বিধবা বিবাহকে নানাদিক থেকে ত্রুটি মুক্ত করাই ছিল এইসব দরখাস্তের উদ্দেশ্য।

অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বাঙ্গালার নবজাগরণের ইতিহাসে আর একটি

শুভ দিনের অভ্যুদয় হয়েছিল। এইদিন বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬ সালের ১৫ আইন, তাং ২৬ জুলাই) পাশ হয়েছিল। আইনসভা থেকে গবর্নর জেনারেলকে জানানো হয়েছিল, "The legislative council have the honour to inform the Rigest Honourable the Governor General that a Bill entitled 'A Bill to remove all legal obstacles to the remarriages of Hindoo widows' has this day been read a third time and passed dated 19th July, 1856."[৪৯]

১লা জুলাই বিলটিতে 'দ্বিতীয় বিবাহের স্থলে পুনর্বিবাহ' কথাটি যোগ করে এক সংশোধনী আনা হয় এবং ১৯ জুলাই গবর্নর জেনারেল বিলে সম্মতি দেন।[৫০]

'আপনারদিগের উদ্যোগে এ দেশের দারুণ কুসংস্কার পরভূত হইয়া বিধবা বিবাহ চালিত হইবে বটে কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক বিলম্ব দেখা যাইতেছে'...

১০৫৬ সালের ২১ আগস্ট ভাস্কর সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন শ্রীবিদ্যা দেবী নামে জনৈকা পত্র লেখিকা। শুধু আইন করলেই হল না, যত শীঘ্র তা কাজে রূপায়িত করা দরকার বিদ্যাসাগরও চুপ করে বসেছিলেন না। আইন পাশ হবার ছমাসের মধ্যে তিনি বিধবা বিবাহ দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। পাত্রপাত্রীও যোগাড় হয়। পাত্র গোবরডাঙ্গা খাঁটুরা নিবাসী রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী বর্ধমান জেলার পলাস ডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর এই বিবাহের দিন ধার্য হয়।

এই বিবাহের পরদিনই পাণিহাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত হরকালী ঘোষের ভাই কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতা নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত ঈষান চন্দ্র মিত্রের দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ হয়েছিল।

তত্ত্ববোধিনী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে এই দুই বিবাহের রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন। ১৭৭৮ শকের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত ওই রিপোর্টের শেষে তত্ত্ববোধিনী লেখেন :

'হা জগদীশ! এ সমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের মধ্যে আমরা কেবল তোমারই মহিমা সন্দর্শন করিতেছি এবং তোমারই প্রসাদ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তুমি যে কোন সূত্রে ও কোন কৌশলে জীবের কল্যাণ সাধন কর তাহা কাহার সাধ্য যে বোধ-গম্য করিতে পারে? কাহার মনে ছিল যে তমসাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে হিন্দু বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া পতিহীনা অবলাদিগের অনিবার্য্য শোকাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবে, কে মনে করিত যে হিন্দু বিধবা বনিতারা দুশ্ছেদ্য শাস্ত্রের শাসন ছেদন করিয়া আপনারদিগের দুঃখরাশিকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে, আহ। তাহাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা স্মরণ হইলে এখনও আমাদিগের অশ্রুপাত হয়, তাহারা যে আবার এ শুভদিন প্রাপ্ত হইবে আমাদিগের আর ইহা মনে ছিল না। কেবল তোমার কৃপাই এ সকলের মূল। ভারতভূমি পূর্ব্বাবধিই ধর্ম্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং হিন্দুজাতি চিরদিনই ধর্ম্মপুত্ররূপে পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের দারুণ দেশ ব্যবহার যে সকল সমস্তই

হরণ করিয়াছিল, আবার তুমিই তাহাদিগকে সে অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিবার পথ প্রস্তুত করিলে। অতএব আমরা তোমাকেই নমস্কার করি। যে বৈধব্য যন্ত্রণাকে এদেশী স্ত্রীলোকে অনিবার্য্য মনে করিয়াছিল, যে রোগকে তাহারা অসাধ্য ও অনারোগ্য ভাবিয়াছিল যাহা হইতে তাহারা কস্মিনকালে মুক্তি পাইবার আশা করিত না, এক্ষণে যে মহাত্মা ব্যক্তির প্রযত্নে সেই যন্ত্রণার শেষ হইল সেই রোগের ঔষধ স্থির হইল এবং তাহা হইতে এদেশীয় অবলারা মুক্তি পাইল তাঁহার এই অসামান্য কীর্ত্তি যেন নিত্যকাল পৃথিবী মধ্যে তোমার মহিমাকে মহীয়ান করে, অবশেষে এই আমাদিগের প্রার্থনা।"

১৭৭৯ শকের অগ্রহায়ণ ও ১৭৮০ শকের শ্রাবণেও তত্ত্ববোধিনী অনুরূপভাবে বিধবা বিবাহের খবরে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলন কলকাতা থেকে গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১২ ও ২৮ আষাঢ়, ১৭৮০ শক, হুগলি জেলার রামজীবনপুর গ্রামে দুটি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্ববোধিনী প্রতিবেদনটি সুরু করেন এই ভাবে :

'কি আহ্লাদের বিষয়, গত ১২ ও ২৮ আষাঢ় হুগলি জিলার অন্তঃপাতী রামজীবন পুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে দুইটি বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা নগরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটি বিধবার উদ্বাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়াছিল, পল্লীগ্রামে রীতিমত বিধবা বিবাহের সূত্রপাত হইল। অনেকে মনে করিতেন, যদিও কলিকাতায় কথঞ্চিৎ এ বিষয়ে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামে সহসা হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নহে। কলিকাতার অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার কুসংস্কার বিমোচন হইয়াছে। এমতস্থলে এরূপ হিতকর ব্যাপার প্রচলিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই অদ্যাপি অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং তাঁহারা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে নিতান্ত বশীভূত। এমতস্থলে এরূপ ব্যাপার হিতকর বলিয়া বোধ হওয়াই অসম্ভব। এই কথা অতি যথার্থ বলিয়া আপাতত প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক ফলোপদায়িনী হইয়া উঠে নাই। ঐ শিক্ষার এইমাত্র ফল লক্ষিত হইতেছে যে অনেকেই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জঘন্যবোধে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোকদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুকরণে কোন বিশেষ ফল নাই, যদি এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরা সাহস দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি সদ্গুণের অনুকরণ শিক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না। (তত্ত্ববোধিনী, সম্বৎ ১৯১৪, পৌষ)

ওই প্রতিবেদনেই জানা যায় যে ওই বিবাহে দুহাজার ব্রাহ্মণ কায়স্থ নিমন্ত্রিত

হয়ে আহার করেন। বর ও কন্যাপক্ষের আত্মীয়দের যোগদানেই বিবাহ হয় এবং কুলপুরোহিত পৌরোহিত্য করেন।

তত্ত্ববোধিনীর এই ধরনের উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিবেদনের পাশে বিধবাবিবাহ নিয়ে শ্লেষোক্তিপূর্ণ প্রতিবেদনেরও অভাব ছিল না। সংবাদ প্রভাকর প্রথম দিকে বিধবা বিবাহের পক্ষে এত লিখলেও তাঁদের পরের দিকের ব্যক্তব্যের সঙ্গে প্রথম দিকের বক্তব্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রতিবেদনটির মধ্যেও প্রভাকরের প্রতিবেদক যথেষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অনুপ্রবেশ ঘটান। প্রতিবেদনটি একবার লক্ষ্য করা যাক।

"জগৎকালীর দ্বিতীয়োদ্বাহের এই রক্তময় পত্র প্রাপ্ত হইয়া বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রামপ্রসাদ রায়, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু নৃসিংহ চন্দ্র বসু, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ভাস্কর সম্পাদক প্রভৃতি অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের বালক ও কৌতূকদর্শী লোকসংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোক সমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সারজন সাহেবরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন, রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকাকালে বর বাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করেন, দুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া প্রায় শতাধিক লোক লাল বলাতাবৃত ভট্টাচার্য ও রামগতি প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও পঞ্চভাট প্রভৃতি কয়েকজন ভাট উপস্থিত থাকিয়া গোল করিয়া হাট বসাইয়াছিল, অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। বিবাহ সময়ে বর বাহাদুর আসনোপবিষ্ট হইলে উভয়পক্ষের পুরোহিতেরা বিবাহ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছুই রূপান্তর করেন নাই, লক্ষ্মীমণি কন্যাদান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর স্ত্রী আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে 'দ্বারষষ্ঠী ঝাটাকে প্রণাম করেন ও স্ত্রী আচার স্থলে উলু উলু ধ্বনী নাকমলা, কানমলা কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাঁধলেম, হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করত বাপু' রঙ্গরমণীগণের একান্ত প্রার্থনায় বর বাহাদুর ভ্যাও করিয়াছিলেন।

এইরূপে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হইলে আহারের ধুম পড়িয়া যায়। প্রায় ছয়শত লোক রঙ্গ দেখিয়া মোণ্ডা ভাঙ্গিয়া গোল করিয়া ঢোল পিটিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, বাসর ঘরের ব্যাপার আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, যাহা হউক এই বিবাহে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাগণও বিলক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিয়াছিলেন, দম্পতির উভয়কুল পরিশুদ্ধ হইল, "যেমন হাড়ি তেমনি সরা মিলল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদনুসঙ্গে বিধবার বিবাহ সঙ্গিগণের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদিগের সাধুবাদ করিয়াছেন।

পাঠাকগণ, আমরা পূর্ব্বেও লিখিয়াছি এক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দু বিধবার এই প্রথম বিবাহ কোন ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহ

হলে দম্পতির পরিবার বা জ্ঞাতি কুটম্ব কেহই উপস্থিত হয় না এবং কন্যার খুড়া কিংবা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকারে রূপ চাঁদের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। বরপাত্রও কেবল মাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন।"[৫১]

বিদ্যাসাগর যখন প্রথম বিধবা বিবাহ দিলেন তখন সেই বিবাহকে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। বিরোধীদের বক্তব্য ছিল, (১) বিবাহ যথার্থ শাস্ত্রমতে হয়নি। (২) লক্ষ্মীমণি কোথাকার নামগোত্রহীন স্ত্রীলোক। এই বিবাহে কোন গৌরব নেই। ১৮৫৬ সালের ১০ ডিসেম্বর সম্বাদ ভাস্কর এর জবাবে একটি উপযুক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"যে খণ্ডজ্ঞান বিতণ্ডাবাদি মহাশয়গণ, এ লক্ষ্মীমণি সামান্যা লক্ষ্মীমণি নহেন, লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতা ৺আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার নিবাস শান্তিপুর, তিনি শান্তিপুরে অতি প্রধান মনুষ্য ছিলেন, লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাঁহার দিগের শিরঃপীড়া হইয়াছে তাঁহারা শান্তিপুরে যাইয়া তদাদি তদন্ত মহোষধ গ্রহণ করুন।"

ওই একই দিনের সম্বাদ ভাস্কর বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করে কস্যচিৎ যথার্থ বাদিন : লিখিত একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে পত্রলেখক লেখেন : "এক্ষণে এদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা যে একটা অতি মহৎকর্ম ও পরম মঙ্গল হেতু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই অতএব এ বিষয়ে যে যে মহোদয়েরা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অতি পুণ্যভাজন এবং সকলেই অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র, বিশেষতঃ প্রধান উদ্যোগী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কত বড় লোক তাহা ব্যক্ত করা যায় না"...

বিধবা বিবাহ আন্দোলন নিয়ে বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগতভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তার কারণ এই বিধবা বিবাহকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বিধবা বিবাহের ব্যয়নির্বাহের জন্য বিদ্যাসাগরকে যাঁরা নিয়মিত অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কার্যকালে তাঁরা সরে গিয়েছিলেন। ফলে বিদ্যাসাগর দেনাভারে জর্জরিত হয়ে ওঠেন। যে দায়িত্ব সমাজে বর্তানো উচিত ছিল, সেই দায়িত্বের বোঝা একা বিদ্যাসাগরকে টানতে হয়েছিল। অথচ এই বিরাট সর্বজনীন সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর্থিক দায়দায়িত্বের বোঝা যে একজন ব্যক্তিবিশেষের ঘাড়ে চাপবে, আন্দোলনের এই উদ্দেশ্য কখনই ছিল না।

বিদ্যাসাগর ডঃ দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবা বিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম।"[৫২]

শুধু বিদ্যাসাগরের বন্ধুবান্ধবেরা প্রতিশ্রুত অর্থ যে দেননি তা নয়, এক শ্রেণীর

প্রতারক অর্থের লোভে বিধবা বিবাহের নামে বহু বিবাহ করেছেন। প্রবঞ্চনা বন্ধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর পাত্রপক্ষের কাছ থেকে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিতেন।

বিধবা বিবাহ বাঙালি হিন্দুসমাজে জনপ্রিয় বা প্রচলিত রীতি হিসাবে প্রবর্তিত কেন হল না তার নানান সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখা দেওয়া যেতে পারে। তবে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ফলে বিধবা বিবাহের প্রতি সংরক্ষণপন্থীদের তীব্র বিরোধিতা ক্রমশ শিথিল হতে শুরু করেছিল। রক্ষণশীলরা স্বয়ং বিধবা বিবাহ করতে বা দিতে স্বীকৃত না হলেও অন্যের বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করার প্রবণতা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। ১৮৬৯ সালের ১১ মার্চ অমৃতবাজার বিধবা বিবাহের সমর্থনে লিখতে গিয়ে এই কথাই লিখেছেন :

'বিধবা বিবাহ নূতন কথা নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তর কথাবার্তা তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে আইন প্রচলিত হইয়াছে, ও অনেকে বিধবা বিবাহও করিয়াছেন কিন্তু আমাদের দেশে যত জন বিধবা অদ্যাপি বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে তাহা ধরিতে গেলে কয়েকটি বিধবা আশ্রয় পাইয়াছে। মোটে না বলিলেও হয়। তবে আশার মধ্যে আমাদের এই আছে যে, বিধবা বিবাহের প্রকৃত বিরোধী কেহ নাই। মুখে যিনি যাহা বলুন, মনোগত প্রায় ভাবতের ইচ্ছা ইহা প্রচলিত হয়।

'বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র সিদ্ধ, ব্যবহার বিরুদ্ধ। ব্যবহার চিরকাল একরূপ থাকে না, সমুদয়ই ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া শিখান পূর্ব্বর কোন কালে ছিলনা, কিন্তু এক্ষণে ভদ্রলোক মাত্রেই বালিকাদিগকে লেখা পড়া শিখাইয়া থাকেন। এইরূপেও বিধবা বিবাহ ক্রমে হিন্দু সমাজে প্রকাশ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

'বিধবা বিবাহ করিলে জাতি কেন যায়, বুঝিতে পারি না, আমরা, এক জাতির অন্য জাতির সহিত বিবাহ হউক একথা বলি না। ঠিক এক্ষণে যেরূপ গোত্র কুল দেখা হইয়া থাকে সেইরূপ হউক, কেবল পাত্রীটি বিধবা হইবে। ব্রাহ্মণ কন্যার হাতে ব্রাহ্মণ, কি কায়স্থ কন্যার হাতে কায়স্থগণ যাইবে ইহাতে কেন জাতি যাইবে? বেশ্যা গমনে, উপপত্নী রাখিলে, ব্যভিচারে আমাদের দেশে জাতি যায় না, ইহাতে জাতি গেলে কয়টি লোকের জাতি আছে? যে বিধবা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তাহারা ব্রহ্মচর্য করুক কিন্তু যাহারা দায় পড়িয়া ব্রহ্মচর্য করে, কি কুকর্মে রত হইবার উদ্যোগী, তাহারদিগকে ধরিয়া বান্দিয়া ব্রহ্মচর্য করিবার কি ফল?

'যখন বিধবারা সহমৃতা যাইত, তখন ছিল ভাল, কারণ ব্রহ্মচর্য করাপেক্ষা সহমরণ যাওয়া অনেকগুণে ভাল, এক্ষণে উহা উঠিয়া গিয়াছে, কাজেই এ দেশীয় বিধবারা নিরুপায়ে পড়িয়াছে। যে দেশীয় স্ত্রীলোকে স্বামীর চিতার উপর আনন্দ সহকারে ও অবলীলাক্রমে ঝম্প প্রদান করিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে কঠোর ব্রহ্মচর্য করিতে অপারগ হইয়াছে। এই সহস্র সহস্র বিধবা নারীর দুঃখ দেখিয়া এদেশীয়গণের বুক

পাষাণ হইয়া গিয়াছে। আর তাঁহাদের এক্ষণে তত দুঃখবোধ হয় না। কিন্তু তাঁহাদের বুক পাষাণ হইয়াছে বলিয়া বিধবাদিগের দুঃখ কমে নাই। তাহাদের সেই আর্ত্তনাদ বরাবর সমান রহিয়াছে। লোকে টের পায় না, কিন্তু দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া তাহাদের হৃদয় পাহাড় হইয়া যাইতেছে। তাহাদের চোখের জল তাহারা চোখে নিবারণ করে বলিয়া রক্ষা, নতুবা তাহারা যদি মনের দুঃখ বলিয়া জানিত, তবে কত কঠিন পাষাণ গলিয়া যাইত।

'আমাদের দেশে যতটি প্রকাশ্য বেশ্যা আছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজন বিধবা বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বেশ্যা হইয়াছে। গ্রাম মাত্রেই কিছু কিছু কুকাণ্ড আছে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে কুকাণ্ডের হেতু বিধবারা। বৎসর বৎসর লাম্পট্য দোষের নিমিত্ত যতটি খুন হয় এত আর কিছুতেই নয়, কিন্তু লাম্পট্য দোষ এত প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ বিধবাদিগের বিবাহ না দেওয়া। কত শত প্রধান লোকে ঘরের মধ্যে কত কুকাণ্ড দেখিতে বাধ্য হইতেছেন, কত প্রধান লোকের কন্যা, ভগ্নি প্রভৃতি বৈধব্য যন্ত্রণার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হওয়াতে তাহাদের বুকে বিষাক্তশেল বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কত প্রধান লোকে বাধ্য হইয়া আপনার কন্যা, কি ভগ্নির উপপতি আপনি যোগাইতেছেন— তবু সমাজের ভয়ে বিধবা বিবাহ দিতে পারেন না। শত শত ভ্রূণ হত্যায় দেশ কলঙ্কিত হইতেছে ও সেই ভ্রূণ হত্যার সহকারিতা কত ভদ্রলোকের করিতে হইতেছে। এ সমুদয় কি মিথ্যা কথা, কবির বর্ণন ? এরূপ চোখের উপর আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি না ?'

বৈপ্লবিক গতিতে না হলেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন ধীরে ধীরে গোটা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জেলায় জেলায় বিধবা বিবাহ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া এরই প্রমাণ

এছাড়া উনিশ-বিশ শতকের কবি ও চিন্তাবিদরা অধিকাংশই বিধবা-বিবাহের সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কবিতায়, গানে, উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ সামাজিক আন্দোলন হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছে। যেমন কয়েকটি কবিতা—

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অইরে।
না হলে এমন দশা নারী আর কইরে।
মলিন বসন খানি অঙ্গে আচ্ছাদন
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ
রমণীর চির সাধ চিকুর বন্ধন,
হাদে দেখ, সে মাথেও
বিধি বিড়ম্বন।
আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে
আহা কি রূপের ছটা
গিয়াছে মিলায়ে

কি নিতম্ব কিবা উরু
কিবা চক্ষু কিবা ভুরু
কি যৌবন মরি মরি শোকে হায়রে।"
(বিধবা রমণী—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।)

"আর কতদিন আহা আর্য সুতগণ
ভুলিয়া থাকবে আহা মোহের ছলনে।"
(বিধবা কামিনী—নবীনচন্দ্র)

"সে কুসুমের মত আপনি ফুটিয়া বালা,
অনাদরে আপনি শুকায়
সঙ্গিহীনা একাকিনী মরমে মরমে জলে
মর্মকথা কহিতে না পায়"
(সোহং সংহিতা—সোহং স্বামী)

"নবীন জীবন নবীন বয়সে কেন বসি আহা এমন বিরসে
কমলিনী কেন ত্যজিয়ে সরসে শিলায় যাপন করিছ দিবা ?"
(তারকনাথ)

"অতৃপ্ত বাসনা লয়ে কেমনে এমন
সংসারের শত কাজে
শত প্রলোভন মাঝে,
তুমি বালে ব্রহ্মচর্য্য করিবে পালন ?
নাই শিক্ষা দীক্ষা যেথা সংযম সাধন।
অথচ স্থবির বৃদ্ধ গৃহ শূন্য ফল
করিতে বিবাহ তার আছে বুঝি অধিকার
সেই শাস্ত্র মেনে হিন্দু গর্ব্ব করে চলে।
বেদান্তের ঋষিদের বংশধর বলে।"
(রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)

"কোন ধর্ম বিবেচনা করি সূক্ষ্মরূপে পরিহরি দেশাচার রাক্ষসের মায়া,
বিধবা বিবাহে করি সম্মতি প্রদান, রাখুন বিদ্যাসাগরের মান।
তা নাহলে বিধবার শাপানল সহ ভ্রূণ হত্যা মহাপাপ হয়ে একত্রিত,
হিন্দুকুল ভস্মীভূত করিবে অচিরে।
(অক্ষয়কুমার দে)

এই সমস্ত চিন্তা আর কিছু না হোক নারীমুক্তি আন্দোলনের পথকেই প্রশস্ত করেছে। সুতরাং পরিসংখ্যানের বিচারে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সার্থকতার পরিমাপ করা সঙ্গত হবে না। সতীদাহ ও বিধবা বিবাহ আন্দোলনের মাধ্যমে

নারীজাতিকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার বিরাট চেষ্টা হয়েছিল বলেই বাংলা দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা এত সহজে আসতে পেরেছে। সেদিক থেকে বাঙালির নব-জাগরণের পথে এই দুই আন্দোলনের মূল্য অপরিসীম।

বহুবিবাহ

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে বহুবিবাহ রোধের জন্যও উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বহুবিবাহ যে এক নবজাগ্রত সমাজের সামাজিক লজ্জা ছাড়া কিছুই নয় তা উপলব্ধি করার মত শুভবুদ্ধি তখন সমাজে এসেছে। কিন্তু সামাজিক আলোড়ন সত্ত্বেও ইংরাজেরা বহুবিবাহ রদের জন্য খুব বেশী ব্যস্ততা দেখান নি এবং এই ব্যাপারে 'ধীরে চল নীতি' অবলম্বন করেছিলেন। হয়ত এর একটা বড় কারণ ছিল: সতীদাহের মত বহুবিবাহ আপাত-দৃষ্টিতে নির্মম নয় এবং একদিক থেকে দেখতে গেলে বিধবা বিবাহের মত কোন পজিটিভ বা স্বীকৃতিমূলক আন্দোলনও নয়। বহুবিবাহ রোধের জন্য নেগেটিভ বা নিষেধার্থক আইন জারী করার প্রয়োজন ছিল এবং এই নিষেধার্থক আইনের ফলে সমাজের বহু সম্রান্ত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির কায়েমী স্বার্থে বাধা পড়ত।

রেনেশাঁসের যে দীপ্ত আলোক মানুষের দিব্যচক্ষুকে উন্মীলিত করে, নারীর প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাতে শেখায় সে আলোক সেদিনও বাংলা ছাড়া আর কোথাও জ্বলেনি। অথচ শুধুমাত্র বাংলা দেশের জন্য এই আইন প্রস্তুত করতে দিতেও ব্রিটিশ সরকার সেদিন সাহস করেননি। কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল এ নিয়ে যে অনর্থক জটিলতা ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে তাতে করে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে তাঁদের গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী আঁতাতে চিড় ধরবে। সাম্রাজ্যবাদ সুরক্ষার জন্য ওই প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী।

এই পটভূমিতে বাংলাদেশের সংবাদপত্র বহুবিবাহের বিরুদ্ধে যেভাবে একক সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে তার সামাজিক মূল্য অপরিসীম।

১৮১৪ সালেই একজন ইংরাজ লেখিকা লিখেছেন, বহুস্ত্রী এখন হিন্দুদের মধ্যে কম।[৫৩] কিন্তু ১৮৩৫ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফ এডিনবরাতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে কলকাতাবাসী কুলীনের তালিকা দিয়েছিলেন। তাদের ৮৫০ জনের প্রত্যেকের স্ত্রীর সংখ্যা ৮।[৫৪]

১৮৩৬ সালের ২৩ এপ্রিল জ্ঞানান্বেষণও ২৭ জন কুলীনের তালিকা প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে ময়াপাড়ার রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশী বিবাহ করেছিলেন।

জ্ঞানান্বেষণ লেখেন: 'কুলীনদের বহুবিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোন ২ সম্বাদপত্র সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহু-বিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত

অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনদের নামের ফৰ্দ্দ ও তাঁহারদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রমাণিকই হইল।'

১৮৪২ সালে (শ্রাবণ ১৭৬৪ শক) বিদ্যাদর্শন বহুবিবাহকে নিন্দা করে কুলীনদের উদ্দেশ্যে লেখেন :

"হে কুলীন ভ্রাতাগণ, যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় সন্ধি পূর্বক আপনাদিগের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তথাচ আপনারা যে কি গুপ্ত মর্মের আস্বাদবশতঃ এই দুশ্চরিত্রকে পরিবার মধ্যে প্রবল রাখিতেছেন, তাহা অনুভব করা আমারদিগের পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর। যদি বলেন বল্লালসেন এই রীতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা করুন, যে বল্লালসেন সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমশীল মনুষ্য, বিশেষতঃ তিনি কুকর্মান্বিত ছিলেন অতএব তাঁহার মতের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি এবং পরামর্শকে অবহেলা করা কি শ্রেয় বোধ হইতে পারে? অবশেষে আপনারদিগকে এক অনুরোধ করিয়া নিরস্ত হই, অর্থাৎ শুভ কর্মে যাত্রাকালীন সম্মুখ দ্বারে, উপস্থিত হইয়া পশ্চাদভাগে একবার ঈষৎ কটাক্ষ পূর্বক দৃষ্টি করিবেন যে অপর দ্বারে কি আশ্চর্য পাপের নৃত্য হইতেছে।"

'বিদ্যাদর্শন' বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একটি নিয়মিত আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশের পরের মাসে (ভাদ্র ১৭৬৪ শক) জনৈক পত্রলেখকের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক বিদ্যাদর্শনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ সমর্থন করে লেখেন, "সম্পাদক মহাশয় আমি যে গ্রামে বসতি করিতেছি, তথায় অনেক বিশিষ্টলোকের অবস্থিতি আছে, এবং বহু বিবাহ আমারদিগের গ্রাম্য লোকের এক প্রকার ব্যবসায় হইয়াছে, কুলীন সন্তানাদিগের এ প্রকার অভিমান আছে, যে বিদ্যাভ্যাস না হইলেও তাঁহারা বিবাহ দ্বারা সংসার নির্বাহ করিতে পারিবেন, এবং অনেক মূর্খ কুলীনেরাও তদবলম্বনে কালযাপন করিতেছেন। এতদগ্রামে এরূপ অনেক কুলীন প্রভু বাস করেন যাহারদিগের ভার্য্যা গণনা করা অতিশয় দুষ্কর।"

পত্রলেখক একাধিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন যেখানে কুলীন কন্যা ব্যভিচারে লিপ্ত এবং অবৈধ সন্তানের জননী হয়েছেন। পত্রলেখক তাই লেখেন; "কুলীনদিগের আচরণ বিষয়, বোধ করি বঙ্গদেশের ব্যক্তি মাত্রেরি বিদিত আছে সে অবধি এই ঘৃণিত কার্য্যের প্রচলন হইয়াছে তদবধি ভ্রূণ হত্যা, স্ত্রী হত্যা, প্রভৃতি যে সকল রাশি রাশি দুষ্কর্মের বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সংখ্যা করা অতিশয় কঠিন। আপনারা সর্বদাই নগর মধ্যে বসতি করেন, পল্লিগ্রামের সকল ব্যাপার জানিতে পারেন না গ্রাম্য সমাজে যাঁহারা কুলীনরূপে পূজ্য হইয়াছেন, তাহারদিগের অহঙ্কার দেখিলে বোধ হয়, তাঁহারাই বল্লালসেনের রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক কুলীন ভার্য্যাগণের পরিত্রাণার্থ মহাশয়কে যত্নশীল দেখিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম এইক্ষণে নিতান্ত মনে প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর মহাশয়কে অচিরাৎ কৃতকার্য্য করুন।" ভাদ্র

সংখ্যায় বিদ্যাদর্শন এই পত্রের উত্তরে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে বিদ্যাদর্শন বহুবিবাহ নিরোধের জন্য সরকারকে আইন প্রণয়ন করতে বলেন। কারণ এই কুরীতির ফলে ব্যভিচার প্রশ্রয় পাচ্ছে। তাছাড়া কৌলীন্য প্রথার প্রতি কোন ধর্মীয় সমর্থনও নেই।

কার্ত্তিক (১৭৬৪) সংখ্যায় বিদ্যাদর্শন কলিকাতা নিবাসিনী জনৈকা বেশ্যার যে চিঠিখানি ছাপেন সেটি চাঞ্চল্যকর। ঐ বেশ্যা লিখছে সে শান্তিপুর নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিল। তিন বৎসরের চেয়ে কম বয়সে গলিত নখদন্ত বিকট দর্শন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অন্তরে তীব্র-ভোগাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাকে সর্বরিক্তা হতে হয়। অবশেষে যুবতীর পদস্খলন হয়—"যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎপথে রহিব এবং কুলধর্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষে জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পূর্বক মেছোবাজার বাসিনী হইয়াছি। আমি এস্থলে বসতি করিলে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীও স্বামীর সহিত অনৈক্য এবং বিবাদ করিয়া গত বৎসর আমার সহবাসিনী হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত আমার বাল্যকালের বিংশতি জন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা আমার ন্যায় কলিকাতার স্থানে অধিবাস করিতেছেন।"

ঐ চিঠিখানি সম্পর্কে বিদ্যাদর্শন সম্পাদকীয় মন্তব্য করেন, 'আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে এদেশে কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে অশেষ প্রকার কুকর্মের ঘটনা হইতেছে। এইক্ষণে দেশীয় ব্যক্তিগণ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করুন, যাঁহারা স্বয়ং দুষ্কর্মের আলোচনা করেন, তাঁহারদিগের চেতনা হইয়াছে তাঁহারাই সাধারণ সমাজের উপদেশ জন্য আপন দোষ পর্য্যন্তও বিজ্ঞাপন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, অতএব এরূপ সুযোগের সময়ে আমরা একান্ত অন্তঃকরণে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং দেশস্থ মনুষ্যবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে তাহারা বহু বিবাহের নিবৃত্তির জন্য দৃঢ় চেষ্টা করুন, আমরাও তাঁহারদিগের অগ্র হইতে প্রস্তুত আছি। (কার্ত্তিক ১৭৬৪ শক)

১৮৫৫ সালের সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্র বহুবিবাহ নিবারণের জন্য ভারত সরকারের কাছে প্রথম আবেদন করেন। সমিতির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাসাগর লিখছেন: প্রথমতঃ ১৬ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্‌যোগে বন্ধুবর্গ সমবায় নামক সভা হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হয়। বহু বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্মলোপ হইবে, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্মে প্রতিকূল পক্ষ হইতেও এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে, এই দুই আবেদন পত্র প্রদান ভিন্ন, এ বিষয়ের অন্য কোন অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় নাই।[৫৫]

বিদ্যাসাগর যে আবেদনপত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তা ছাড়াও বিদ্যাসাগর ১৮৫৫

সালের ৭ ডিসেম্বর একটি আবেদনপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠান। এরপরে ১৮৬৩ সালের অকটোবরে আরও ১৮৫০ জন হিন্দু ভারত সরকারের কাছে বহুবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য লিখেছিলেন।[৫৬]

প্রথম আবেদনপত্র সম্পর্কে সম্বাদ ভাস্কর ১৮৫৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি লিখেছিলেন :

'কুলীনদিগের বহু বিবাহ রূপ কুপ্রথা রহিত করণাভিপ্রায়ে কলিকাতা এবং তদিদন্ততঃ স্থানীয় অন্যূন ১৬০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় প্রদত্ত হইয়াছে, সভার মেম্বারেরা ঐ আবেদন গ্রাহ্য করিয়া ছাপাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন, হিন্দু বিধবা বিবাহ সপক্ষে আর দুই আবেদন পত্র ১৯ জানুয়ারি দিবসীয় সভায় অর্পিত হয়, এক আবেদনে কলিকাতা ও শাখা নগরবাসী প্রায় ৬৫০ জনের স্বাক্ষর ও অন্যান্য আবেদনে বারাসতের প্রায় ৩০০ লোকের স্বাক্ষর আছে।

'ব্যবস্থাপকদিগের বিলক্ষণ হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে বিধবা বিবাহ প্রচলনে ও কুলীনদিগের বহু বিবাহ রহিত করণে এ দেশীয় অনেক লোকের মত আছে,...।'

১৮৫৬ সালের ২৫ নভেম্বর সম্বাদ ভাস্কর আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন :

"একি উৎপাত হইল, এইক্ষণে বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই কেহ না কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয় অবিহিত বিবাহ অর্থাৎ বহু বিবাহ নিবারণের কি হইতেছে, ব্যবস্থা সমাজে লক্ষ ২ লোকের প্রার্থনা পত্র সমর্পণ হইয়াছে ইহাতেও কি সাহেবরা বহু বিবাহ নিবারণ করিবেন না? আমরা কত লোকের জিজ্ঞাসার কত উত্তর দিব, মুখে মুখে উত্তর করিতে ২ মুখ ব্যথা হইয়া যায়, একি উৎপাত, লোকেরা এক ধুয়া ধরিয়া বসিয়াছেন আমরা আর মুখে ২ উত্তর করিতে পারি না অতএব সারাৎসার বলিয়া রাখি সাধারণে স্মরণ রাখিবেন।

"আমরা এ বিষয়ের তথ্য সন্ধানার্থ পুরুষদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, কথায় ২ কথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা বহু বিবাহ নিবারণ না করিলে কি বিধবা বিবাহ প্রচল হইবে? বিধবা বিবাহে রাজ্যেশ্বর বল প্রকাশ করিতে পারেন না, এদেশের বিধবারাও স্বাধীনা হন নাই, কর্ত্তাপক্ষ বিবাহ না দিলে স্বয়ম্বরার ন্যায় পতিম্বরা হইতে পারিবেন না বহু বিবাহ নিবারণে রাজপক্ষের বল প্রকাশের সেইরূপ ক্ষমতা আছে সহমরণ বারণে সেইরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা কেন হয় না? দুইজন রাজপুরুষ কহিলেন 'এই ক্ষণে আমরা কিন্তু শাস্ত্র এবং হিন্দুদিগের ব্যবহারাদি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি, আগামি বৈশাখ মাস পর্যন্ত বিবাহের কাল নাই, পঞ্জিকারেরা কালাশুদ্ধি লিখিয়াছেন অতএব কন্যাবর এই এক বৎসর আইবড় হইয়া থাকিবে, আগামি বৈশাখ পরে যখন বিবাহ কাল উপস্থিত হইবে সেই সময় বহু বিবাহ নিবারণের আইন প্রচার করিয়া দিব।' "

প্রাদেশিক সরকার যে বহু বিবাহ আইন প্রণয়নে সম্মত ছিলেন সে কথা আগেই লিখেছি। সম্বাদ ভাস্করের সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে মনে হয় ভাস্কর প্রাদেশিক সরকারের সূত্র থেকেই আভাস পেয়েছিলেন যে বহুবিবাহ রদ আইন প্রচলিত হতে

যাচ্ছে। কারণ ১৮৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা সরকারের সচিব জেঃ পি গ্র্যান্ট রামপ্রসাদ রায়ের সহযোগিতায় একটি বহুবিবাহ রোধের খসড়া বিল পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন।

দেশের মানুষ যে ওই বিল সম্পর্কে কতখানি আগ্রহান্বিত ছিল ভাস্করের ওই প্রতিবেদনটি তার প্রমাণ। কারণ ভাস্করের কাছে লোকে এ সম্পর্কে বার বার জানতে চাচ্ছিল গণ-আবেদনের কী হল। তাঁরা আশা করেছিলেন যে সিপাহী বিদ্রোহের জন্য সরকার এ দিকটায় মনোযোগ দিতে পারছেন না তবে বিদ্রোহ থামলে এ বিষয়ে আইন প্রণীত হবে।

কিন্তু জনসাধারণের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বহুবিবাহ নিবারণের জন্য একটি খসড়া বিল বড়লাট এলগিনের কাছে পেশ করেছিলেন।

১৮৬৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর সহ বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আর একটি আবেদন ছোটলাট সিসিল বিডনের কাছে পাঠান। বিডন মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় পরিচালিত এক গণ-ডেপুটেশনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই সামাজিক কুপ্রথার অবসান তিনি ঘটাবেন।

১৮৬৬ সালের ৮ আগস্ট ভারত সরকার বাংলা সরকারকে লেখেন যে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয়নি। ভারত সরকারের চিঠি পাওয়ার পর বাংলাদেশে বহুবিবাহ প্রথা সম্বন্ধে সামাজিক অনুসন্ধানের জন্য বাংলা সরকার সাতজন সদস্য বিশিষ্ট এক তদন্ত কমিটি তৈরি করেছিলেন। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৬৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই কমিটিতে আরও ভারতীয় সদস্য ছিলেন। সত্যশরণ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত তিনজন এই অভিমত পোষণ করেন যে শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার হলে বহু বিবাহ আপনা থেকেই কমে যাবে। আর তাছাড়া জীবিকা অর্জনের উপায় হিসাবে কুলীনের বিবাহ ব্যবসায় এখন ক্রমশ লোপ পেতে বসেছে।

বিদ্যাসাগর অবশ্য তাঁদের সঙ্গে একমত হননি। তিনি তাঁর স্বতন্ত্র অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বহুবিবাহের প্রচলন এমন কিছু কমেনি যাতে আইন করার প্রয়োজন নেই বলে মনে হতে পারে।[৫৭]

বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এইবার কলম ধরতে আরম্ভ করেন। ১৮৫০ সালে 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে তাঁর প্রথম সামাজিক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তার ২০ বছর পর ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হল 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'। এ সম্পর্কে ১৮৭৩ সালের এপ্রিলে তার দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই সময় কলকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা বহুবিবাহ নিবারণের জন্য

সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন। বিদ্যাসাগর ধর্মরক্ষিণী সভার আন্দোলনকে সহায়তা করার জন্যই বহু শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তিতর্ক সহকারে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত দেন।

এই পুস্তিকার প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর যে মুখবন্ধ লিখেছিলেন তাতে নারীমুক্তি আন্দোলনের জন্য তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে ওঠে।

"স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষ জাতির অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবন যাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। অত্রত্য পুরুষ জাতি কতিপয় অতিগর্হিত প্রথার নিতান্ত বশবর্তী হইয়া হতভাগ্য স্ত্রীজাতিকে অশেষবিধ যাতনাপ্রদান করিয়া আসিতেছেন তন্মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা এক্ষণে সর্বপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।"

বিদ্যাসাগর ওই পুস্তিকায় বহুবিবাহ নিবারণে বিরোধীপক্ষীয়দের আপত্তিগুলি খণ্ডন করেন। কৌলীন্যপ্রথার উদ্ভবের ইতিহাস দেখান এবং হুগলী জেলা ও জনাই গ্রামের বহু বিবাহকারী কুলীনদের বিস্তৃত তালিকা পেশ করে দেখান যে কৌলীন্য-প্রথার সুযোগে বহুবিবাহ সমাজে ঢালাও ভাবে প্রচলিত।

এই সময় সোমপ্রকাশ পত্রিকায় বহুবিবাহ নিয়ে কিছুটা বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। সোমপ্রকাশ নীতিগত ভাবে বহুবিবাহ রদকে সমর্থন করেন নি। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মত ব্যক্তির কাছে এই ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতা কখনও প্রত্যাশিত ছিল না। তবে যত দিন যাচ্ছিল বহুবিবাহ নিরোধের ব্যাপারে আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু কিছু উদারপন্থীর মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। সোমপ্রকাশ সেই সন্দেহকেই ব্যক্ত করেছেন মাত্র।

২০ আষাঢ় ১২৫৮ সোমপ্রকাশ, 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা : কন্যাপণ ও বহু বিবাহ নিবারণার্থ গবর্নমেণ্টের আবেদন' এই শিরোনামের প্রবন্ধে বহুবিবাহ নিবারণে সরকারের কাছে সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার আবেদনের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন।

সোমপ্রকাশ এই আবেদন-নিবেদনের বিরুদ্ধে ছিলেন। সোমপ্রকাশ মনে করেছিলেন, গবর্নমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক দোষ নিবারণের চেষ্টা করলে আমাদের স্বাধীনতার হানি ঘটবে। সোমপ্রকাশ বলতে চেয়েছিলেন :

"সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণ! আমরা তোমাদিগকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিতেছি, তোমরা রাজার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া স্বয়ং যদি প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হও, তোমাদিগের কৃতার্থতা লাভের কি সম্ভাবনা নাই?

হিন্দু সমাজের যেগুলি প্রধান গণনীয় ও মাননীয় লোক, তোমরা সেই সকলগুলি ত একত্র হইয়াছ, তোমরা কেন এই প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হও না, আমরা নিজ বাটীতে বহু বিবাহ প্রভৃতি দোষের আবির্ভাব হইতে দিব না, আমাদিগের অনুগত লোকদিগকেও তত্তৎ বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিব।" (২০ আষাঢ়, ১২৭৮)

বিদ্যাসাগরের বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৯২৮ সংবৎ ১ শ্রাবণ (১৮৭১ আগস্ট) প্রকাশিত হয়, ওই বছর ৩০ শ্রাবণ সোমপ্রকাশ বইখানির কথা উল্লেখ করেন।

"আমরা এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময়ে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাদের হস্তে পতিত হইল, উহার মূৰ্দ্ধস্থানে বহুবিবাহ বলিয়া লিখিত আছে, আমরা আগ্রহ সহকারে উহার পাঠ আরম্ভ করিলাম।"

সোমপ্রকাশ বিদ্যাসাগরের উক্তির কোথাও বিরোধিতা করেন নি। এখানেও তাঁদের সেই একটি বক্তব্য : যদি গবর্নমেন্টের সাহায্য লইয়া আমাদিগের সমাজ-সংস্কার আবশ্যক হয়, অসংখ্যবার তাঁহাদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রতি পদক্ষেপে দাদাকে ডাকা সুখের নয়। 'সোমপ্রকাশ প্রস্তাব দেন যে নিঃস্ব অপদার্থ বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীনেরাই বহু বিবাহ করেন সুতরাং বহু বিবাহের উপর ৫০০ টাকা করে ট্যাক্স ধার্য হলে এই বিবাহ ব্যবসায় বন্ধ হয়ে যাবে।'

১৩ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে বিদ্যাসাগর সোমপ্রকাশের যুক্তি খণ্ডন করে একটি দীর্ঘ পত্র দেন। সম্পাদকীয় উত্তরের সঙ্গে চিঠিখানি প্রকাশ করা হয়। বিদ্যাসাগর লেখেন, প্রস্তাবিত বহুবিবাহ নিবারণ আইন পাশ হলেও শাস্ত্রানুসারে যেখানে পুনর্বিবাহের বিধান আছে সেখানে পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না।

"এইরূপে স্ত্রী বন্ধ্যা বা অন্যবিধ দোষাক্রান্ত হইলে শাস্ত্রানুসারে এতদ্দেশীয় লোকের পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার যে চিরন্তন অধিকার আছে, রাজবিধি দ্বারা বহু বিবাহ নিবারণ প্রার্থীরা তদ্বিষয়ে প্রতিপক্ষতা করিতে উদ্যত নহেন, এইমাত্র ইহাতে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, পুরুষ, দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারিবেন এই প্রস্তাব করা হইয়াছে, 'এরূপ নির্দ্দেশ কোনমতে সঙ্গত হইতে পারে না,'।"

বিদ্যাসাগর বলতে চান, "সরকারের সাহায্যে আইন করলে সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ হবে আর সরকারের সাহায্য নিয়ে বহুবিবাহকারীদের ওপর কর ধার্য্য করলে সামাজিক হস্তক্ষেপ হবে না, এ কেমন কথা? বরং গুরুতর কর নির্দ্ধারণ দ্বারা বহু বিবাহ প্রথা রহিত করা অপেক্ষা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া এই কুৎসিৎ প্রথা রহিত করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প…"।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক বিদ্যাসাগরের যুক্তির সমালোচনা করে উপসংহারে একটি গঠনমূলক প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি হল :

"অনেকে যোগ্য ঘর পান না বলিয়া এক পাত্রে দুই তিন কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতেই বহু বিবাহ প্রথা প্রাদুর্ভূত হয়। ঐ কারণেই উত্তরোত্তর উহার

এতদূর শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছে। যে মূল হইতে বহু বিবাহ প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার উৎপাটন হইলেই বহুবিবাহ প্রথা আপনা হইতে অন্তর্হিত হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ত্তব্য, তিনি সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্যগণের সহিত মিলিত হইয়া কুলীনদিগকে ডাকিয়া একটি সভা করেন, ঐ সভাতে সকলে মিলিয়া এমন একটি নিয়ম করুন, অপেক্ষাকৃত হীন ঘরে কন্যাদান করিলেও কুলমর্য্যাদার হানি হইবে না। তাহা হইলে বর সুলভ ও বহু বিবাহও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।"

বহুবিবাহ সম্পর্কে সোমপ্রকাশে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও শ্রীকৈলাসনাথ বসুর দুখানি চিঠি ওই একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি বহুবিবাহ নিবারণের পক্ষে ছিলেন পরে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক ক্রোড়পত্রে উল্লেখ করেন যে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহায়তায় বহুবিবাহের সমর্থকেরা বিচারপত্র প্রস্তুত করছে। বাচস্পতি মহাশয় সোমপ্রকাশের এই অভিযোগের প্রতিবাদ করে ওই চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি লেখেন বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত এই অভিমত তিনি পোষণ করেন তবে ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে প্রণালীতে তা সম্পন্ন হয়ে আসছিল তা 'অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস' বিধায় তিনি আইন মারফৎ বহুবিবাহ রোধের সমর্থক ছিলেন, "কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিৎ বহু বিবাহ প্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই। সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্ত্তিত হয়।"

তারানাথ তর্কবাচস্পতির বক্তব্য বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ প্রথম পুস্তকের উপসংহারে বিস্তৃত আলোচনা করেন ও তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক তারানাথ তর্কবাচস্পতির বহু বিবাহ নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রতিবাদ হিসাবেই রচিত হয়েছিল।

সোমপ্রকাশে কৈলাসনাথ বসুর পত্রখানি বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করে লেখা। পত্রলেখক এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেটি হল, একশ বছর আগে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করে যান ও 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। পত্রলেখক এই ব্যাপারে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদকের ৫০০ টাকা করে বহুবিবাহ কর ধার্য নীতির অসারতা প্রতিপন্ন করেন।

সংবাদপত্র ও পুস্তিকা মারফৎ বহুবিবাহ সম্পর্কে এই তীব্র বাদানুবাদের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া জনমানসে না পড়ে পারেনি। বহু বিবাহ নিবারণে আইন রচিত না হলেও সে যুগের সমাজনেতারা তীব্র সামাজিক আলোড়নের সাহায্যে বহুবিবাহের ফলে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাটির প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ লোক-কবিরা গানের মারফৎ কুলীন কন্যার মর্মন্তুদ বেদনার বাণী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচার করেন।

১৮৫৭ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ব কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকে কুলীন কন্যার যে মর্মন্তুদ হাহাকার তুলে ধরেছিলেন সেই হাহাকার ও আর্তি প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে লোকগীতির মধ্যে—

কোন পাপে মোর জন্ম হল কুলীন কুলে
দিলেম যৌবন রতন, কাকের মতন,
বুড় মামার গলে তুলে।
বাতাসে হেলে পড়ে, কথাতে দন্ত নড়ে,
করেতে যষ্টি নিয়ে চলে ধীরে।
এমন অস্থি সারা আধ-মরা
দেখে আমার অঙ্গ জলে।
যে আমায় বাছা বলে, স্নেহে নিয়েছে কোলে
তার কোলে প্রেমের ডালি
দেই কি বলে।
এমন মেল বেন্ধেছে দেবীবর
খাঙ্গরা মারি তার কপালে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র

ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ॥ প্রাচ্য প্রতীচ্য শিক্ষাদর্শের দ্বন্দ্ব ॥ বিভিন্ন স্কুল স্থাপনে বাংলা সংবাদপত্রের উৎসাহ দান ॥ ভার্নাকুলার চর্চার প্রতি সংবাদপত্রের উৎসাহ প্রদর্শন ॥

"এক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড দেশে ইতর লোকের মধ্যে এমত বিদ্যার চর্চা হইয়াছে যে ইহার পূর্বে কোন দেশে এ প্রকার হয় নাই। কলিকাতাস্থ প্রায় সকল লোকেই জ্ঞাত আছে যে কি প্রকার দুর্গতিতে কেতাব বিক্রয় হয় এবং আমরাও সে বিষয় অল্প জ্ঞাত আছি কিন্তু ইংলণ্ডে গত এক বৎসরের মধ্যে এক কেতাব এগার হাজার বিক্রয় হইয়াছে অন্য এক কেতাব বার হাজার অন্য এক শত আর তিন শত এবং ভূগোল বিষয়ক এক কেতাব তেইশ হাজার তিনশত এবং বালকদের শিক্ষার্থে স্পেলিং বুক অর্থাৎ লিপিধারা এক লক্ষ সাত হাজার কেতাব সম্বৎসার বিক্রয় হইয়াছে যদি কলিকাতায় ইতর লোকেরদের এমত বিদ্যার চর্চা হইত তবে চোরা বাগান ভিন্ন সকল বাজারেই এক এক ছাপাখানা হইত।"

১৮২০ সালের ১৩ মে সমাচার দর্পণ এই খবর দিচ্ছেন। দিয়ে লিখছেন, যদি কলকাতায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এইভাবে বিদ্যার চর্চা বাড়ত তাহলে দেশে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ ঘটত এবং স্বভাবতই জ্ঞানের দিগন্ত আরও প্রসারিত হত।

রেনেশাঁসের প্রধান উদ্দেশ্য, জ্ঞানের উদ্বোধন। আর এই জ্ঞান প্রধানত শিক্ষা-নির্ভর। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে জ্ঞানের সম্প্রসার এক কথা ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের জ্ঞান মার্গের দিকে উৎসাহিত করে তোলা আর এক কথা।

বাংলা সংবাদপত্রকে এদেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানের উদ্বোধনে এই শেষোক্ত দুরূহ পথে ব্রতী হতে হয়েছে। কারণ বাংলা সংবাদপত্রের জন্ম এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ঊষালগ্নে। এই নবলব্ধ শিক্ষা যাতে প্রকৃত জ্ঞানের পথে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে বাংলা সংবাদপত্র তার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

শিক্ষা বিস্তারের ফলে নব সাক্ষর প্রাপ্ত ও নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠেচ্ছার তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এই নব্য শিক্ষিতদের পঠনক্ষুধা মেটাবার জন্য বণিকবুদ্ধি যে সেদিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের পথ খোঁজেনি এটাই ছিল মঙ্গলের বিষয়। বাংলা সংবাদপত্র যদি ব্যবসায় হিসাবে গড়ে উঠত তাহলে বাঙালির নবজাগরণের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে রচিত হত।

বাংলার প্রথম সাময়িকপত্র দিগদর্শন শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সূচী দেখলেই সে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে।

এই সূচী হল : আমেরিকার দর্শন, বেলুন দ্বারা আকাশ গমন, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে প্রথমে আসার বিবরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়সূচীর মধ্যে কোন চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়নি। শিক্ষাবিস্তারের সুমহান দায়িত্ব নিয়েই প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রের জন্মলগ্ন সূচিত হয়েছে।

পরবর্তী পত্রিকা সমাচার দর্পণের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা।

"ইউরোপ দেশীয় লোক কর্তৃক যে যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে যে নূতন পুস্তক মাসে মাসে ইংলণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে নূতন শিল্প ও ফল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।"

শুধু সমাচার দর্পণ নয় পরবর্তীকালে জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকাও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয় :

"এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি দেশান্তরীয় ও বঙ্গভাষায় নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতি বিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশুবোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গ দেশীয় ভাষায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিব। এবং অন্য অন্য বিষয়ে যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।"

অক্ষয় কুমার দত্ত ও প্রসন্ন কুমার ঘোষ প্রকাশিত বিদ্যাদর্শন (১৮৪২) ও এডুকেশন গেজেট (১৮৫৬—৪ জুলাই) পত্রিকা প্রধানতঃ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হয়। শিক্ষা বিভাগের ইন্সপেক্টর মিঃ হজসন প্র্যাটের পৃষ্ঠপোষকতায় সাপ্তাহিক এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হত।

বিদ্যাদর্শন পত্রিকার উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল, 'যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তাহার পূর্ব্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে। এতৎপত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে, যত্ন পূর্ব্বক নীতি ও ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতি প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক।'

বাংলা সংবাদপত্র বাঙালির শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার আন্দোলনকে কী ভাবে সহায়তা করেছে তা জানার আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা বিস্তারের পটভূমিটি একবার জানা দরকার।

বাংলা দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা প্রথমদিকে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। জর্জ স্মিথ স্পষ্টতঃই লিখেছেন, ভারতীয়দের সুশিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে শুধু যে ভারতের কোম্পানীর কর্তারা অনিচ্ছুক ছিলেন তা নয়। ইংলণ্ডেও এই একই বিরূপ মনোভাব দেখা দিয়েছিল।

"In the early stages of the Company's Government the question of enlighting the natives of India was regarded not only with indifference—the same feeling was manifested with regard to education in England, and with that strong feeling of aversion to which it gives births."[১]

কারণ ব্রিটিশ শাসকদের ধারণা হয়েছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল কারণ আমেরিকায় শিক্ষা বিস্তার। সুতরাং শিক্ষাবিস্তার হলে ভারতবর্ষেও একদিন আমেরিকার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ১৭৯২ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডাইরেকটরসরা এই অভিমতই দিয়েছিলেন।

"That one of the leading and most efficient causes of the seperation of America from Great Britain, as the anothers country, was the founding of Colleges and establishing seminaries for education in the different provinces. Sound policy dictated that we should in the case of India avoid and steer clear of the rock we had split upon in the case of America. From that time and onward for more than twenty years the opposition of the Indian Government to the Indian education was incessant and unremitting."[২]

আধুনিক শিক্ষা পর্বের সূচনার আগে টিম টিম করে বাঙালির ট্র্যাডিশনাল বিদ্যাচর্চা চলছিল। অ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে সে বিদ্যাচর্চার কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন। বাঙালি হিন্দু ছাত্রেরা জীর্ণ পাঠশালায় বা গাছতলায় গুরুমশাইর কাছে লিখতে পড়তে ও আঁক কষতে শিখত। মুখে মুখে পড়ানো হত। বই পত্তর ছিল না। স্ত্রী শিক্ষার কোন প্রচলন ছিল না। সে সময় যারা এইভাবে লেখা পড়া শিখেছিল তারা বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে পাঁচভাগ।[৩]

এরই মাঝখানে ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে যোগসূত্রস্থাপনের জন্য কলকাতার অভিজাত ও বণিক সমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। কোন সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞানচর্চা নয়, শুধুমাত্র বাণিজ্যিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী নয় এই ছিল সেদিনের বাঙালির ইংরাজী চর্চার পরিধি। এই ইংরাজী বিদ্যার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য সেদিন স্ব উদ্যোগে ফিরিঙ্গিদের পরিচালনায় কলকাতায় বহু ইংরাজী পাঠশালা গজিয়ে উঠেছিল। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে তাঁর একটি প্রবন্ধে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত এমন ৩৪টি ইংরাজী স্কুলের তালিকা দিয়েছেন।[৪] যেমন শেরবোর্নস সেমিনারি, যার ছাত্র ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ ও মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মার্টিন বাউল স্কুল-এর ছাত্র ছিলেন শ্রীমতিলাল শীল। ড্রুমণ্ড একাডেমি বা ধর্মতলা একাডেমির ছাত্র ডিরোজিও।

বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু আধুনিক স্কুলের প্রতিষ্ঠাও হয়েছিল। যেমন ১৮০০ সালে

শ্রীরামপুরের মিশনারিরা মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮০০ সালের ২০ মার্চ কেরি শ্রীরামপুর মিশন স্কুলের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ধোবি খরচা, থাকা খাওয়া শুদ্ধ গণিত হিসাব ভুগোল বিষয় নিলে মাসে ছাত্র পিছু ব্যয় ৩০ টাকা। ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু, পারসিয়ান ও সংস্কৃত নিলে ৩৫ টাকা। ইংরাজী উচ্চারণ শেখাবার জন্য যত্ন নেওয়া হবে বলা হত।[৫]

১৮০০ সালে ভবানীপুরে একটি স্কুল হয়েছিল। ১৮১৪ সালে হুগলীর জেলাশাসক ফ্রবস চুঁচুড়ায় একটি স্কুল করেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার যে কী শোচনীয় অবস্থা ছিল তা লর্ড মিনটোর মাইনিউটটি পড়লে জানা যায়।

১৮১১ সালে লর্ড মিনটো তাঁর মাইনিউটে বলেছেন, ভারতীয় নেটিভদের মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্য ধ্বংসের মুখে। Abstract science-এর চর্চা আর নেই। Polite literature-কে অবহেলা করা হচ্ছে। একমাত্র বিচিত্র ধর্মব্যাপারের সঙ্গে ভারতীদের যোগ আছে। এমন ব্যাপার ছাড়া জ্ঞানের কোন চর্চাই নেই। সরকার যদি এখনই এগিয়ে না আসেন, তাহলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাবে অথবা সেগুলি ব্যাখ্যা করার মত লোকের অভাবে এদেশে জ্ঞানের পুনরুদ্ধার আর সম্ভব হবে না।[৬]

অবশেষে ১৮১৩ সালে চার্লস গ্র্যাণ্ট ও উইলিয়ম উইলবার ফোরস ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টারের সঙ্গে একটি ধারা (৪৩) যুক্ত করে দেন। এই ধারা বলে কোম্পানিকে অধিকার দেওয়া হয় যে তাঁরা ভারতে জ্ঞান ও শিক্ষার উন্নতিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এক লক্ষ টাকা আলাদা করে রাখতে পারবেন।[৭]

এই সমস্ত প্রচেষ্টার মাঝে ১৮১৭ সালে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। কোম্পানির হাতে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ বরাদ্দ হবার পর কোন্ ধরনের শিক্ষার জন্য কোম্পানি সে অর্থ ব্যয় করবেন এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ ছিল। স্বভাবতই কোম্পানির ধ্যান ধারণা অনুসারে দেশীয় শিক্ষার পুনর্জীবনের জন্যই সেই অর্থ ব্যয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হিন্দুকলেজ প্রাতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয়রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভবিষ্যৎ শিক্ষার রূপরেখা কী হবে সে সম্পর্কে আপন কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন। স্থির করেছিলেন, নূতন যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবাসী গ্রহণ করবে তার মাধ্যম হবে ইংরাজী এবং মূলতঃ তা হবে ইংরাজী ভিত্তিক।

১৮১৬ সালের ১৪ মে কলকাতায় সেকালের অভিজাত সমাজের মধ্যে যাঁরা হিন্দু কলেজ স্থাপনে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই ধ্যানধারণার দিক দিয়ে যে প্রগতিপন্থী ছিলেন তা নয়। বরং তাঁদের মধ্যে সংরক্ষণপন্থীদের ভিড় যথেষ্টই ছিল যার জন্য এই কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী রামমোহনকে তাঁরা সে বৈঠক থেকে বাদ দিতে পেরেছিলেন। তবু এই প্রগতি বিমুখিতা সেদিন

ইংরাজী বিরোধিতায় গিয়ে দাঁড়ায়নি এই কারণে যে বাঙালি অভিজাত সমাজ সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজ বণিকদের শাসনে নব্য শিক্ষিত হিন্দুর সামনে অনন্ত সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। নতুন রাজশক্তির সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ইংরাজীর সম্ভাবনাও প্রচুর এবং এই ভাষা অর্থ দেবে সম্মান দেবে। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাতীয় স্বার্থে ও ব্যক্তিগত স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। হিন্দু কলেজের জন্য প্রথমদিনের সভাতেই ১,১৩,১৭৯ টাকা উঠে গিয়েছিল। প্রধান দাতা ছিলেন, বর্ধমানের তেজচন্দ্র বাহাদুর, গোপীমোহন ঠাকুর, প্রমুখ। কমিটিতে ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, গোপীমোহন দেব, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখেরা।

১৮২২ সালে হিন্দু কলেজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছিল : 'To instruct the sons of Hindus in the European and Asiatic languages and science.'[৮]

এবং ১৮২৩ সাল পর্যন্ত কোন সরকারী সাহায্য না নিয়েই এ কলেজ চলে।

১৮১৭ সাল থেকে বাংলা দেশে নব্য শিক্ষা বিস্তারের যুগ শুরু হয়। ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮১৭ সালে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থায়ী সরকারী প্রচেষ্টার গোড়াপত্তন হয় স্কুল বুক সোসাইটির মাধ্যমে।

সোসাইটির কাজ ছিল ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সেগুলি সুলভে বা বিনা মূল্যে বিতরণ। সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। পরিচালক সমিতিতে ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডবলিউ বি. বেলী, ডঃ কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ।

স্কুল বুক সোসাইটির সদস্যরা ১৮১৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি', গঠন করেন। এই সোসাইটি থেকে কলকাতার স্কুলগুলিকে সাহায্য ও অনুদান দেওয়া হত। সোসাইটি কয়েকটি স্কুলও স্থাপন করেন। এর মধ্যে আরপুলি পাঠশালা একটি। ডেভিড হেয়ার এই পাঠশালাটির তত্ত্বাবধান করতেন। সমাচার দর্পণের পাতায় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটির বিভিন্ন প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

১৮২৩ সালের ৮ মার্চ দর্পণ স্কুল সোসাইটির কাজের প্রশংসা করে লিখছেন : "এই স্কুল সোসাইটির স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না বিশেষতো হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের যে পর্যন্ত জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক ঐ ছাত্রেদের মধ্যে গত বৎসর কেহ ২ সম্ভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদের মধ্যে একজন এক প্রধান দপ্তরে তর্জমাকারক আর একজন মোং নাটোরের কালেক্তরি কাছারির প্রধান কেরাণী হইয়াছে এবং যাহারা এখন কালেজে আছে তাহারদের মধ্যে কতক বালক এই

প্রকার কর্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। ঐ কালেজের বালকেরা অন্য লোকেরদের শিক্ষা দিবার নিমিত্তে আপনারদের মধ্যে এক পাঠশালা করিয়াছে। বৈকালে সেখানে তাহারা একত্র হইয়া অন্য ২ বালকেরদিগকে বিনামূল্যে বিদ্যাদান করে। অতএব বিদ্যা একের দ্বারা অন্যকে আশ্রয় করে ইত্যাদি ক্রমে বিদ্যার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে হ্রাস কখনও হইবে না।"

১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেকটরসরা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন গঠন করেন। কমিটির দশজন সদস্যের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এইচ টি. প্রিনসেপ আর এইচ. এইচ. উইলসন। ১৮১৩ সালের চার্টারের বলে কমিটিকে এক লক্ষ টাকার সরকারী অনুদান দেওয়া হয়।

কমিটির সদস্যরা অধিকাংশই ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থক। তাঁরা চেয়েছিলেন সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার পুনর্জীবন। ১৮২৩ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ক্লাসিক্যাল বিদ্যাচর্চার জন্য সরকার উদার হাতে অর্থ ব্যয় করেন। কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠিত হয়। আগরা ও দিল্লিতে নতুন প্রাচ্যবিদ্যার কলেজ স্থাপিত হয়। সংস্কৃত ও আরবীতে মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। ইংরাজী থেকে সংস্কৃত ও আরবীতে অনুবাদ হতে থাকে। কমিটি ১৮২৪ সালের ১ জানুয়ারি কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল:

'Yet it is in the judgenment of his lordship in Council, a purpose of much deeper interest to seek every practicable mean of effecting the gradual diffiusion of European knowledge. It seems indeed no unreasoable anticipation of hope, that if the higher and educated classes among the Hindus shall, through the medium of their sacred language, be imbued with a taste for European literature and science, a general acquaintance with thease, and with the language, whence they are drawn, will be as surely and extensively communicated as by any attempt at direct instruction by other and humbler seminaries. But though the means be different the Community of end must always be held in view.'[৯]

সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি সরকারী এই পৃষ্ঠপোষকতায় রামমোহন সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পরবর্তীকালে এদেশে শিক্ষার প্যাটার্ন নিয়ে প্রাচ্যবাদী ও প্রতীচ্যবাদীদের মধ্যে যে তীব্র বাদানুবাদ দেখা দিয়েছিল সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের উষালগ্নে তার সূত্রপাত করেছিলেন রামমোহন। সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে রামমোহনের বক্তব্য ছিল: 'The

pupils will there acquire what was known two thousand years ago with the addition of vain and empty subtleties since produced by speculative men, such as in already taught in all parts of India.'[১০]

রামমোহন ১৮২০ সালের ১১ ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্ট'কে লেখেন :

'We would therefore be guilty of a gross dereliction of duty ourselves, and afford our rulers just ground of complaint at our apathy, did we omit on occasions of importance like the present to supply them with such accurate information as might enable them to devise and adopt measures calculated to be beneficial to the country, and thus second by our local knowledge and experience their declared benevolent intentions for its improvement.'[১১]

রামমোহন ঐ চিঠিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন যে গণিত, প্রকৃতিক দর্শন, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানে ইওরোপ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছে এবং এদেশে শিক্ষাদানের সংকল্প যখন তাঁরা প্রকাশ করেছেন তখন এই শিক্ষাই তাঁরা ভারতবাসীকে দেবেন।

সুতরাং হিন্দু পণ্ডিতদের দিয়ে সংস্কৃত স্কুল তৈরি করলে (তাঁরা যা করতে যাচ্ছেন) তার কোন প্র্যাকটিক্যাল use to the possessors or society থাকবে না।'...no inprovement can be expected from inducing young men to consume a dozen of years of the most valuable period of their lives in acquiring the niceties of the Byakurun or Sangscrit Grammar.'[১২] বেদান্ত ন্যায়শাস্ত্র ও মীমাংসা পাঠ করে যে মানসিক উন্নতি বা প্রয়োজনীয় উপকার হবে না তা রামমোহন ঐ চিঠিতে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যদি ব্রিটিশ জনগণকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে অন্ধকারে রাখাই উদ্দেশ্য হত তাহলে 'স্কুলমেন' প্রথাকে অপসারিত করে সেখানে বেকনের জীবন দর্শনকে প্রবাহিত হতে দেওয়া হত না।

রামমোহনের এই আশঙ্কা পরবর্তীকালে মর্মে মর্মে সত্যি হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের তুলনায় জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়েন। যে ইংরাজী বিদ্যাকে কেন্দ্র করে কলকাতার নবগঠিত বুদ্ধিজীবী সমাজ আবর্তিত বিবর্তিত হচ্ছে তা থেকে দূরে থাকার ফলে তাঁদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়। ১৮৩৪ সালের ২২ মার্চ জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা মারফৎ শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণঃ শ্রীতারানাথ শর্ম্মণঃ শ্রীঈশ্বানচন্দ্র শর্ম্মণঃ শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণঃ শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ শ্রীআনন্দগোপাল শর্ম্মণঃ শ্রীগোবিন্দচন্দ্র শর্ম্মণঃ ও শ্রীচতুর্ভুজ শর্ম্মণঃ নামে সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র একটি আবেদন প্রকাশ করেন। ওই আবেদনে ছাত্ররা লেখেন :

"শ্রীযুত এডুকেশন কমিটির সেক্রেটারি সাহেব বরাবরেষু।

গবর্নমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রের ছাত্র আমরা আপনকার অতি সম্ভ্রান্ত কমিটির নিকটে অতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে আমরা ১০।১২ বৎসরাবধি গবর্নমেণ্টের সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর নানা শাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে উপযুক্ত বিদ্বান হইয়াছি ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নেতেই আমাদের অধিককাল গত হইয়াছে এবং ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় কমিটির নিকটে আমরা পরীক্ষিত হইয়া সার্টিফিকেটও পাইয়াছি।

কিন্তু তদ্রূপ সার্টিফিকেট পাইয়াও আপনকার অতি সম্ভ্রান্ত কমিটির সাহায্য না হইলে আমাদের বর্ত্তমানাবস্থায় মঙ্গল হওনের কিছু প্রত্যাশা নাই। আমারদের প্রতি স্বদেশীয় মহাশয়েরদের তাদৃশ অনুরাগ না থাকাতে তাঁহারদের স্থানে কোন সাহায্য বা পুষ্টতা প্রাপণের কোন ভরসা নাই। যেহেতুক সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে স্মৃতি শাস্ত্র ব্যবসায়ের দ্বারা আমারদের অল্পোকার মাত্র আছে এবং সরকারের দ্বারাও উপকার প্রাপণের অল্প সম্ভাবনা যেহেতুক জিলা আদালতে পণ্ডিত হওন ব্যতিরেকে আমারদের আর কোন গতি নাই তাহাতে অত্যল্প লোকের প্রয়োজন এবং তাহাও প্রধান ২ সাহেবেরদের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে হয় না অতএব আমরা আপনকার অতি সম্মানিত কমিটির নিকটে অতি বিনীত পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে আপনারা শ্রীল শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে এমত পরামর্শ দেন যে আমারদিগকে জিলা আদালতে কর্ম্মশিক্ষাকারির ন্যায় নিযুক্ত রাখেন।"

সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা যখন তাঁদের এই দুরবস্থার কথা বর্ণনা করছেন তখন দেশে শিক্ষার রূপরেখা কি হবে তা নিয়ে বিতণ্ডা চরমে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে রামমোহনের বক্তব্যই ছিল সেদিনের প্রগতিশীল বাঙালি জনমত।

সংবাদ কৌমুদী জ্ঞানান্বেষণের মত পত্রিকা সেযুগে ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আবার সমাচার চন্দ্রিকা ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতাও করেছিলেন।

১৮৩০ সালে সংস্কৃত কলেজে অ্যানাটমির অধ্যাপক পদে (বৈদ্যক শাস্ত্র) ইংরাজী শিক্ষিত মধুসূদন গুপ্তকে নিয়োগ করলে তার প্রতিবাদে অ্যানাটমির ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে দেন। এই নিয়োগ নিয়ে কলেজে সেদিন সেদিন তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় কারণ মধুসূদন গুপ্ত ইংরাজির মাধ্যমে অ্যানাটমি পড়াতে পারেন ছাত্ররা এমন আশঙ্কা করেছিলেন। সমাচার চন্দ্রিকা প্রথমে এই সংবাদ প্রকাশ করেন 'যে তচ্ছাত্র সকল ইংরেজী বিদ্যাভ্যাস করণাশঙ্কায় কালেজ ত্যাগ করিয়াছেন – ইহাতে বৈদ্যক ক্লাস রহিত হইয়াছে,' পরে ১৮৩০ সালের ১৫ মে তারিখের পত্রে অবশ্য লেখেন যে 'ছাত্ররা মধুসূদন গুপ্তের কাছে পড়তে রাজি নন। কারণ মধুসূদন জুনিয়র। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সহাধ্যায়ী। তাঁকে নিয়োগ করার অর্থ কৌশলে ইংরেজী প্রচলন করা।'

ইংরাজির বিরুদ্ধে সংরক্ষণ পন্থীদের এই ছুঁৎমার্গীতা অবশ্য জনমতকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। ১৮৩১ সালের ২১ মে সমাচার দর্পণ লিখছেন: 'পাঠক মহাশয়েরা

অবগত হইবেন যে ইউরোপে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা নির্বাণ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে বিশেষতঃ ইংলণ্ড দেশে। অতএব আমারদের প্রত্যাশা এই যে ইউরোপের বিদ্বান লোকেরা যে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যার আকর খনন করিতেছেন তৎসমকালীন ভারতবর্ষীয় শিশুগুলো ইংরাজী ভাষার অনুশীলনেতে তাঁহারদের মূল্য পরিশ্রমী হইবেন। ঐ ইংরেজী ভাষার মধ্যে তদ্ভাষা বিদ্যা কোষ হইতে এত ধন প্রাপ্ত হইবেন যে তদ্দারা তাহারদের পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল হইবে।'

এইক্ষণে আমরা চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি নিমিত্তে স্বদেশীয় বালকদিগকে ইংরেজী বিদ্যা অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতুক ইউরোপের বিদ্যালয়স্থেরা নিরন্তর সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদের হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন যে হিন্দুরা ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনারদের পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিবে।

প্রাচ্যবিদ্যার অসারতাও বাংলা সংবাদপত্রের চোখে সেদিন ধরা পড়েছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, নতুন যে যুগ আসছে তার ধারক ও বাহক হবে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা। তাকে অবলম্বন না করে একমাত্র মৃত ভাষা সংস্কৃত ও আরবির চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করা আত্মহনন ছাড়া কিছুই নয়। ১৮৩৪ সালের ১৫ মার্চ জ্ঞানান্বেষণ সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে লিখছেন, 'সংস্কৃত কালেজে ১৯৬ জন ছাত্রের জন্য মাসে খরচ হচ্ছে ১৮০০ টাকা। বাড়ি ভাড়া ২০০ টাকা। অথচ ঐ বিদ্যালয়ে আমারদের বুদ্ধি সাধ্য কহিতে পারি যে তদ্দারা যদ্যপি কোন অনিষ্ট ঘটে নাই তথাপি যে কোন মঙ্গল হইয়াছে এমত কহিতে পারি না।'

প্রাচ্য না প্রতীচ্য শিক্ষার মাধ্যম কী হবে এ নিয়ে সরকারী মহলে বিতণ্ডা দেখা দিয়েছিল। জেনারেল কমিটি তথা পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সদস্যদের মধ্যেও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। দশজন সদস্য সমানভাবে দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। একদল চেয়েছিলেন : প্রাচ্য শিক্ষাই বহাল থাকুক অন্যদল চেয়েছিলেন : ইংরাজী। প্রাচ্যপন্থীদের মধ্যে ছিলেন H. Shakespeare, H. Thoby Princep, James Princep, W. H. Macnaughter, T. C. C. Sutherland প্রমুখ। ইংরাজী-পন্থীদের মধ্যে ছিলেন W. W. Bird, Bushby, Saunders, Trevelyan, J. R. Colbin প্রমুখেরা।

প্রাচ্যপন্থীদের নেতা ছিলেন, এইচ. টি. প্রিনসেপ। তিনি তখন বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিব। ইংরাজীপন্থীদের কোন নেতা ছিল না। তাঁরা কমিটির সভাপতি লর্ড মেকলের দিকেই প্রধানতঃ তাকিয়েছিলেন। এই শিক্ষাদর্শকে কেন্দ্র করে কমিটির আভ্যন্তরীণ বিরোধ এমন পর্যায়ে পৌছেছিল যে কমিটির পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করাই অসম্ভব হয়ে ওঠে। অবশেষে তাঁরা গবর্নর জেনারেল ইন-কাউন্সিলের কাছে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রার্থনা করেন। উভয় পক্ষই তাঁদের বক্তব্যের

সমর্থনে লিখিত বিবরণ দাখিল করেছিলেন। ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ মেকলের অভিমতকে গ্রহণ করেই লর্ড বেন্টিঙ্ক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটান [১৩] ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি সেদিন থেকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়। দেশের সর্বত্র ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের ধুম পড়ে যায়। বাংলা সংবাদপত্র সেদিনে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের সমর্থন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে। ১৮৩১ সালের মধ্যে কলকাতায় দশটির অধিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৮৬৮ জন। এই স্কুলগুলি হল-—হিন্দু স্কুল, স্কুল সোসাইটির বিভিন্ন পাঠশালা, পাদরি ডফ সাহেবের পাঠশালা, চর্চ মিসনারি পাঠশালা, অরিয়েন্টল সেমিনারি, ইউনিয়ন স্কুল, জুবিনিল স্কুল, হিন্দু ফ্রি স্কুল, হিন্দু বিনিবোলেন্ট স্কুল ও নতুন হিন্দুস্কুল।

১৮৩৫ সালের পর থেকে কলকাতা ও কলকাতার বাইরে বহু ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠাও এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সংস্কৃত কলেজে ইংরাজীর মাধ্যমে অ্যানাটমি পড়তে হবে বলে একদা সেখানকার ছাত্ররা ক্লাশ বর্জন করেছিলেন। তার মাত্র কয়েক বছর পরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পিছনে ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতা।

১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ সমাচার দর্পণ (১৮৩৫।১৪ ফেব্রুয়ারি) লিখেছিলেন, 'সংস্কৃত কালেজ ও মদরসাতে যে চিকিৎসা সম্পর্কীয় সম্প্রদায় ছিল এবং নেটিব মেডিক্যাল ইনষ্টিটুশেন অর্থাৎ চিকিৎসালয় এই সকল গবর্নমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া এতদ্দেশীয় যুব ব্যক্তিরদিগকে নানাপ্রকার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ এক কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা ও মঙ্গলের উন্নতিকরণার্থ শ্রীল শ্রীযুত লর্ড উলিয়ম বেন্টিকের অপর এই এক উদ্যোগ।" ১৮৩৫ সালের পর থেকে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুল কলেজ সম্পর্কে বাংলা সংবাদপত্রে উৎসাহব্যঞ্জক খবর প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন ১৮৩৮ সালের ১০ নবেম্বর সমাচার দর্পণ লিখছেন :

"আমারদিগের এক বন্ধু তিনি হুগলির কালেজ সন্দর্শন করিয়াছেন তাহার দ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে উক্ত বিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের অধীনে উত্তমরূপে চলিতেছে ঐ বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০০ বালক ইংরেজী বাঙ্গালা ও পারস্য শিক্ষা করিতেছেন। কিছুদিন গত হইল আমরা বেতনের নিয়ম বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে নির্দ্দাহ হইয়াছে তাথাপি ঐ বিদ্যালয়ে উত্তমরূপে বিদ্যা আলোচনা হইতেছে এবং তৎস্থানে ছাত্রদিগের প্রতি যাহা প্রশ্ন হয় তাহার অতি প্রশংসনীয় উত্তর প্রদত্ত হয়।"

শুধু হুগলি কলেজ নয়—ওরিয়েন্টল সেমিনারি, ডাফ স্কুল, হিন্দু ফ্রি স্কুল, হিন্দু বিনিবোলেন্ট ইনষ্টিটিউশন, টাকী স্কুল, মাহেশপুর ইংরেজী পাঠশালা, মুর্শিদাবাদ

ইংলণ্ডীয় পাঠশালা, শান্তিপুর আকাদামি প্রভৃতি অসংখ্য বিদ্যালয়ের বিবরণ নিয়মিত বাংলা সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হতে থাকে।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি সম্পর্কে সমাচার চন্দ্রিকা পর্যন্ত লিখেছিলেন, '—আমরা অনুমান করি এই স্কুলের ক্রমে উন্নতি হইতে পারিবেক যেহেতুক প্রায় তিন বৎসর হইল স্থাপন হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোন বালকের নাস্তিকতা কলঙ্ক রাষ্ট্র হয় নাই এজন্য ভদ্রলোক ঐ স্থানে বালক পাঠাইতে সন্দিগ্ধ হইবেন না এবং যেসকল পুস্তকাদি পাঠে নাস্তিক হয় তথায় পাঠ হয় না।' (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২)

সম্বাদ কৌমুদির (১৮৩১, ১৮ জুন) আর একটি শিক্ষা সংক্রান্ত খবর লক্ষ্য করা যাক।

"সম্প্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে বিনাবেতনে এক বিদ্যামন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জন বালক ঐ স্থানে শিক্ষা করণার্থে গমন করিয়া থাকেন, তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ্ধমূল্য লন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইহারা বিদ্যা উপার্জন করিয়া আপনার দেশের উপকার জন্য কি শ্রম করিতেছেন…।" সমাচার দর্পণের আর একটি খবর: (৬ এপরিল ১৮৩৩)

"সম্প্রতি নিমতলার রাস্তার গোপীকৃষ্ণ পালের গলিতে কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু হলধর সেন কর্তৃক পৌর্ব্বাহ্নিক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। সেনজা বাবু ইংরেজী ভাবাতে অন্যতম বিজ্ঞ হইয়াছেন, এই পাঠশালার কার্য্য তিনি ও তাঁহার মিত্রগণ এমত নির্ব্বাহ করিতেছেন যে তদ্দারা ছাত্রগণের বিলক্ষণ বিদ্যাপ্রাপ্ত হইতেছেন।"

১৮৩১ সালের ২৫মে জ্ঞানান্বেষণ লিখছেন:

"আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে হুগলি জিলার অন্তঃপাতি মহেশপুর গ্রাম নিবাসি মহাশয়েরা এক চাঁদা করিয়াছেন তাহা বারএয়ারি পূজার নিমিত্ত নহে কিন্তু ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনার্থ, ভারতবর্ষীয় লোকেদের দৃষ্ট ইউরোপীয় বিদ্যা প্রাপণার্থ যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহার এই এক চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে।"

১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই স্যর চার্লস উডের বিখ্যাত শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসে। হাউস অব কমন্স গঠিত একটি সিলেকট কমিটি ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তদন্ত করে একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই বোরড অব ডিরেকটর্সরা বিখ্যাত শিক্ষা ডেসপ্যাচটি তৈরি করেছিলেন।

১৮৫৪ সালের শিক্ষা ডেসপ্যাচ অনুসারে সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা অধিকার (ডি. পি. আই) গঠন করা হয়। ভারতের প্রধান শহরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হয়। শিক্ষক শিক্ষণের জন্য বিদ্যালয় গঠন করার কথা বলা হয়। স্কুলগুলিকে সর্বপ্রথম ঘাটতি পূরণ প্রকল্পের অধীনে আনা হয়। উচ্চতর ক্লাসগুলিতে যেখানে চাহিদা আছে, সেখানেই ইংরাজীকে শিক্ষার মাধ্যম করার সুপারিশ করা হয়। নিম্নতর

ক্লাসগুলিতে বাংলাকেই শিক্ষার মাধ্যম রাখার জন্য বলা হয়। আরও বলা হয় যে স্ত্রী শিক্ষা এখন থেকে সরকারের বিশেষ আনুকূল্য পাবে।

শিক্ষার সম্পূর্ণ দায় ভাগ সরকার গ্রহণ করার পর সংবাদপত্রের ওপর নূতন দায়িত্ব এসে বর্তেছিল। তা হল সরকারী শিক্ষা নীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচনা। এতদিন ছিল নানান বেসরকারী আধাসরকারী শিক্ষা প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়ার প্রশ্ন। এবার আসে সমালোচনার প্রশ্ন।

১২৬৯ (১৮৬২) ২৪ অগ্রহায়ণ সোমপ্রকাশ লিখছেন: '১৮৬০-৬১ অব্দে এই বঙ্গদেশে গবর্নমেণ্টের ১৩ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে, তন্মধ্যে শিক্ষা কার্য্যে কেবল ৮ লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলে প্রতি ব্যক্তিতে দশ আনা পড়ে না। ইংলণ্ডের লোকেরা এত যে সভ্য, সেখানেও গবর্নমেণ্টকে প্রতি ছাত্রে এক টাকা বার দিতে হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে এত কৃপণতা করিতেছেন কেন? আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রজারা বিদ্বান হইলে গবর্নমেণ্ট কি তাহাতে লাভ জ্ঞান করেন না?'

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি না হইলে এবং তাদের যথোপযুক্ত আর্থিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করলে যে শিক্ষার মান উন্নত হবে না তা সোমপ্রকাশ সেযুগেই উপলব্ধি করেছিলেন। ১৮৬৫ সালের ৬ বৈশাখ সোমপ্রকাশ লেখেন: 'এ দেশীয় মুন্সেফদিগের ন্যায় এদেশীয় শিক্ষকেরা পর্য্যাপ্ত বেতন পান না। অথচ তাঁহাদিগের খাটুনি ও পরিশ্রমের ত্রুটি নাই। ইহা কি বেতন বৃদ্ধির শ্রেণী বিভাগ না থাকিলে ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না, ইউরোপীয় শিক্ষকের বিষয়ে এ কারণ যেমন বলবান, এদেশীয় অন্যত্র সুবিধা হইলে কেহ শিক্ষকতা স্বীকারে সম্মত হন না।'

লর্ড মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন তার একটা বড় প্রমাণ লর্ড মেয়োর (১৮৬৯-৭২) রাজত্বকালে ইংরাজী শিক্ষার বদলে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। দেশব্যাপী তার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং এই আন্দোলনে জনমত গঠনে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেন সোমপ্রকাশ পত্রিকা। সোমপ্রকাশ স্পষ্টতই এর মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের 'ষড়যন্ত্র' লক্ষ্য করেন। ভারতবাসীকে অশিক্ষিত করে রাখার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। সোমপ্রকাশ সেদিন দেশবাসীকে 'মহাসভা ও ইংলণ্ডে সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন' করতে বলেছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় সভাকে সভা সমিতির মারফৎ প্রতিবাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন। টাউনহলে এই সভাও হয়েছিল। বাবু রামনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেছিলেন। ২৮ আষাঢ় ১২৭৭-এর সোমপ্রকাশে সে সভার পূর্ণ বিবরণ আছে।

বাঙালিদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সঙ্কোচ করা হচ্ছে বলে সোমপ্রকাশের অভিযোগ ছিল। সোমপ্রকাশ স্পষ্টতঃ অভিযোগ করেন: 'আজিকালি বঙ্গদেশে কতকগুলি বিকৃতবুদ্ধি ইউরোপীয়ের উচ্চশিক্ষার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন,

বাঙ্গালীরা যত অধিক লেখাপড়া শিখিবেন ততই অনিষ্ট ঘটিবে। ভ্রান্তিমূলক এই কুসংস্কার নিবন্ধন বাঙ্গালীদের শিক্ষাপথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।' (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯)

স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ গ্রহণ এবং বর্জনের মধ্য দিয়েই জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়ে চলে। নিরবচ্ছিন্ন গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণেরই শামিল। সেইজন্য প্রয়োজন হয় বর্জনেরও। বাঙালির নবজাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণেও এই ঘটনা ঘটেছে। ইংরাজী শিক্ষাকে যে গ্রহণ করেছে পরম আবেগে, অন্তহীন নির্ভরতার সঙ্গে কিন্তু ইংরাজী চর্চা তার স্বাদেশিক চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। সাধারণ মানুষের মধ্যে যেখানে ইংরাজীয়ানা অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তির মোহ জাগিয়েছে সেখানে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালি প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে।

এ ব্যাপারে পথ দেখিয়েছে বাংলা সংবাদপত্র। তীব্র তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সে অনুকরণের প্রতি আঘাত হেনেছে। শুধু তাই নয়, রেনেশাঁসের প্রধান লক্ষণ হল স্বদেশীয় ভাষার প্রতি তীব্র মমত্ববোধ। বাঙালির নবজাগরণের ক্ষেত্রেও এই লক্ষণ সুপরিস্ফুট। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বাঙালি যেমন অগ্রাধিকার দিয়েছে তেমনি দিয়েছে ভার্নাকুলার চর্চাকে।

একথা ঠিক বন্যার জল যখন আসে তখন তার পলি দৃশ্যগোচর হয় না। সবার আগে চোখে পড়ে স্রোতে ভেসে আসা জঞ্জাল ও শ্যাওলা। ইংরাজী শিক্ষার প্রবল জোয়ারেও এমন অনেক খড়কুটো ভেসে এসেছে। যা দেখে সংরক্ষণবাদীরা হায় হায় করে উঠেছেন। হিন্দু কলেজের ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে অনেকে যে স্বদেশীয় ভাষা ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিকতা প্রদর্শন করতে শিখেছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৮৩১ সালের ১৮ মে সংবাদ প্রভাকরে একটি চিত্তাকর্ষক চিঠি প্রকাশিত হয়।

"পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু —কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতার একজন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনান্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজন পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া ভক্তির সহিত সষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না। ব্রহ্মাদি দেবতার দূরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড মর্ণিং ম্যাডাম। ইহা শ্রবণে অনেকেই কর্ণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবার পর তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্রব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারী করে তোরে হিন্দু কালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি এক ঘরে হইয়াছি ধর্মসভায় যাইতে পারি না। এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া

অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুষ হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে কেন ছেলেদের এমন কুব্যবহার হয়। মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না, দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন ভাবল্লোকের পরকাল টনটনে করিতেন অতএব আমাদের বাঙ্গালী বাবুদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ কালী-কিঙ্করস্য।”

একথা সত্যি যে হিন্দু কলেজের নব্য শিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজীর প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহ এক সময় শোভনতার সীমা অতিক্রম করে।

১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের ভিজিটররা রিপোর্ট দিচ্ছেন যে ছেলেরা বাংলার চেয়ে ইংরাজীই ভাল লেখে। ১৮২৮ সালে বাংলা ক্লাসের রিপোর্টও ভাল নয়।[১৪] কিন্তু বাংলা চর্চায় অবহেলা এক কথা আর বাংলার প্রতি উন্নাসিক মনোভাব আর এক কথা। হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র তথা ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যেও এক শ্রেণীর উন্নাসি-কতা দেখা দিয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন:

“বলা বাহুল্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দু কালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্বান্তকরণে মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্বত্র ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধুয়া ধরিলেন, বলিতে লাগিলেন যে এক সেলফ ইংরেজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষে বা আরব সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেকসপীয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।”[১৫]

বাইবেলের সম্মুখে বেদ বেদান্ত গীতা দাঁড়াইতে পারিল না।

এমনকি ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে যাঁরা মনে প্রাণে দেশীয় ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতিতে বিশ্বাস করতেন তাঁরাও ভাল বাংলা লিখতে পারতেন না। যেমন রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁরা জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকাটি দ্বিভাষিক বার করেন এবং বাংলা অংশটি সম্পাদনার দায়িত্ব গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের ওপর ন্যস্ত হয়। দক্ষিণারঞ্জন যে বাংলা জানতেন না তা সমসাময়িক সংবাদ তিমির নাশক পত্রিকার ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট থেকেই জানা যায়। ইনি বাবু সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গলা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই।

তবে এই উন্নাসিকতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি এবং ত্রিশের দশক অতিক্রম করে পরিণত পর্যায়ে এসে পৌছে ইয়ংবেঙ্গল মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক তাঁর বাগান বাড়িতে সাহিত্য সম্মেলনী ডেকে বাংলা সাহিত্য চর্চায় সতীর্থদের উদ্বুদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল থেকেই

স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দেশবাসীর মনোনিবেশের জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে।

ইংরাজী রাজভাষা এবং অর্থকৌলীন্য ও সমাজকৌলীন্য লাভের উপায়ই হল এই ভাষা। শুধু জ্ঞান আহরণ নয়, অর্থ উপার্জন এবং রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সোপান হিসাবে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালির জীবনে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মনে রাখতে হবে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র যখন প্রকাশিত হয় তখন রাজভাষা বনাম মাতৃভাষার মধ্যে কোনরকম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়নি। কিন্তু ত্রিশের দশক থেকে বাঙালির শিক্ষাচিন্তা ইংরাজীর দিকেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধাবিত হয় এবং মেকলের ঐতিহাসিক মাইনিউটটি গ্রহণের পর সরকারও ইংরাজী সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠেন। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের রূপান্তরের ক্ষেত্রে এই ত্রিশের দশক গভীর সঙ্কট কাল। ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন না জানানো তখন প্রগতি বিমুখিতা বলে পরিগণিত হয় আবার অতিরিক্ত সাহেবিয়ানার আতিশয্যে স্বদেশ, মাতৃভাষা ও জাতীয় সংহতির প্রতি ঔদাসীন্য নব উদ্ভূত জাতীয় চেতনার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে বাংলা সংবাদপত্র এই উভয়ের মধ্যে সাম্য রক্ষা করেছে ও বাংলা শিক্ষার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলার অবহেলায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং বাংলা ভাষা চর্চার জন্য নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা যুগিয়ে গিয়েছে।

বাংলা চর্চার প্রসঙ্গে আসার আগে সে সময় ইংরাজীর সামাজিক আসন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্যের অবতারণা করা যাক।

১৮২৬ সালে হিন্দু কলেজের পরিদর্শকের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে ছাত্ররা বাংলার চেয়ে ইংরাজী বেশি শুদ্ধ করে লিখতে পারে। পরিদর্শকের মতে ছাত্রদের বাবা মা মনে করেন যে, যে ভাষায় ছেলেরা কথা বলে পরিশ্রম করে সে ভাষা শিখে কী লাভ।[১৬]

১৮৩৬ সালে মেকলে ও ট্রেভেলিয়ন ও ১৮৪১ সালে মিলেট হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ইংরাজীর ব্যুৎপত্তি দেখে অবাক হয়ে যান। মেকলে লিখেছেন, "I tried them in a very simple passage of Swift in another much more complicated and artificial from Cowleys Dialogue on Oliver Cromwell ; I gave them also a passage, which more of them had ever read from Shakespaere's King John.

After they had been examined I again called up two or three of the most advanced and gave them passages of considerable difficulty from Lord Bacon's Essays. They all read with ease and most of them with great intelligence."[১৭]

১৮৪১ সালে রামকমল সেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলা পরীক্ষা নিয়ে অভিমত দেন যে তারা বহু দিন বাংলা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তারা মাতৃভাষার চেয়ে ভাল

ইংরাজী বোঝে, "They appear to understand English better than their own language, to which they attach little or no interest in comparison with English."[১৮]

ইংরাজী জ্ঞানের ওপর সেযুগে যে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারী Fred J. Mouat, M. D.-এর স্বাক্ষরিত একটি নোটিশে। তাতে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তিকে আবশ্যিক শর্ত করা হয়েছিল। "All candidates will be expected, to possess a competent knowledge of English, so as to be able to read, write and enunciate with fluency and facility. They must be able to analyse a passage in Milton's Paradise lost, Robertson's Histories of works of a similar classical standard".[১৯] এর ফলে মেডিক্যাল ছাত্রদের মধ্যে বাংলা চর্চা একেবারে লোপ পায়। ১৮৫২ সালে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির জন্য ৩২০ জন ছাত্র টেস্ট পরীক্ষা দেয় তার মধ্যে বাংলাতে মাত্র ২১ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। বাংলা রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছিল—'মিথ্যা কথনের ফল কি ?'

১৮৫২ সালের ১৭ জুন সংবাদ প্রভাকর ব্যঙ্গ করে লিখছেন :

"মিথ্যা কথনের ফল কি ? এই সহজ প্রস্তাব লিখিতেই যখন অক্ষম হইয়া পাল পাল যুবা মেষপালের ন্যায় পলায়ন করিল, এবং অনেকেই যখন শ্রী ফাঁসিতে হতশ্রী হইল, আর অন্নদা মঙ্গলের কবিতার উত্তরে নামতা জিজ্ঞাসা বালকের ন্যায় আমতা মুখে ফ্যা ফ্যা করিয়া ঠোঁট মুখে চাটিতে লাগিল, তখন এ দেশের কল্যাণ ও দেশীয় ভাষার উন্নতি কোথায় ?"

এই নব্য ইংরাজী শিক্ষিতদের বাংলা রচনায় অপারগতা নিয়ে সংবাদ ভাস্করও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। ১৮৫৬ সালের ১৫ জানুয়ারী ভাস্কর এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলছেন…"আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছা হয় বাঙ্গালা ভাষায় কোন ২ বিষয় লিখিয়া সমাচার পত্রে প্রচার করিবেন কিন্তু লিখিতে বসিলেই দুই চক্ষু ললাট পানে উঠিয়া যায় অতি ক্লেশে যাহা লিখিয়া পাঠান তাহা পাঠ করিতে পাঠকদিগের শিরোঘর্ম পাদস্পর্শ করেন এই ক্ষণে আমরা আধুনিক ছাত্রদিগের যে সকল পত্র পাইতেছি তাহা পাঠ করিতে অত্যন্ত ক্লেশ জ্ঞান হয়, অক্ষরগুলি যাহা লেখেন তাহা যেন কাক বকের নখ চিহ্ন সাজাইয়া যান, সে সকল অক্ষর পাঠ করা যায় না এবং অনেক চিন্তায় মর্ম গ্রহণ করিতেও সম্পাদকেরা গলদঘর্ম হন।"

অবশ্য শুধু ইংরাজী শিক্ষার দোষ দিয়েই লাভ নেই। দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের অধীনে বাঙালির মাতৃভাষা কখনই যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৮৩৭ পর্যন্ত ফারসী ছিল রাজদরবারের ভাষা। ইংরাজ আসার পর সরকারী কাজে ইংরাজীর চলন হতে থাকলেও আদালতের কাজকর্ম ফারসীতেই হত। নবাবী আমল থেকে

শিক্ষিত বাঙালি যে ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য বিশেষভাবে উৎসুক ছিলেন তা বাংলা নয়—ফারসী। সুতরাং আদালতের কাজে যখন ফারসীর বদলে বাংলার প্রচলন হল (১৮৩৭ সালের ২৯ আইন) তখন ফারসী-শিক্ষিত বাঙালি বিন্দুমাত্র উল্লসিত হননি। বরং দুঃখই পেয়েছিলেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"ইহার কয়েকদিন পরেই গবর্নমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইল যে এদেশের সমস্ত রাজকার্য দেশীয় ভাষায় চলিবেক। বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্য একরূপ অকর্মণ্য হইল, এবং ইহার আদর এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্নের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথবা উপার্জ্জনাক্ষম পুত্র হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয় সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমার মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রম পূর্ব্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতিলাভের আশা ছিল তাহা নির্ম্মূল হইয়া গেল।"[২০]

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়ের মত অনেক বাঙালি সেসময় ভূমিরাজস্বের কাজে ও আদালতে বাংলা প্রচলনের বিরোধিতা করে সমাচার দর্পণে চিঠিপত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা প্রবর্তনের পক্ষেও অনেক চিঠি প্রকাশিত হয়। সমাচার দর্পণ সেসময় বাংলাভাষা প্রচলনের এই সরকারী নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন (সমাচার দর্পণ, ১৬ মে ১৮৩৫, ২২ জুলাই ১৮৩৭, ৩০ জুন ১৮৩৮ ও ১৩ এপরিল ১৮৩৯ দ্রষ্টব্য)। বাংলা ভাষার প্রতি উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সরকারী আমলাদের উপেক্ষা ছাড়াও সে সময় পাণ্ডিত্যের যূপকাষ্ঠে পড়ে বাংলা ভাষার যে কি দশা হয়েছিল তা বঙ্কিমচন্দ্রের প্যারিচাঁদ প্রবন্ধটি পড়লে জানা যাবে।

"আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন, কদাচ 'চিনি' বলিতেন না, 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, আজ্যই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া দই চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাংলাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে তাহা বিলুপ্ত হইত। কেননা, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালী সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮- ৮৯৪) শিশুকাল অর্থে চল্লিশ দশক। সুতরাং চল্লিশ দশকেও সংস্কৃত পণ্ডিতদের বাংলা সম্পর্কে উন্নাসিকতা কাটেনি। সুতরাং হ্যালহেড যখন বাংলা ব্যাকরণ লিখেছেন (১৭৭৮) তখন তৎকালীন বাঙালিরা বাংলা ভাষার কোন নিজস্ব ডায়ালেকট হতে পারে বলে বিশ্বাস করেননি। ১৮৪০ সালেও যদি বাংলার এই সামাজিক মর্যাদা হয় তাহলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন বলতে গেলে বাংলা গদ্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না, তখন বাংলা ভাষা সম্পর্কে সংস্কৃতজ্ঞদের এই ছুঁৎমার্গিতা আশ্চর্যের নয়। এমন কি সংস্কৃত কলেজেও ১৮৩০ সালের আগে বাংলা পড়ানো শুরু হয়নি। ১৮৩০ সালে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদের পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হয় এবং ১৮৩৮ সালে সংস্কৃত কলেজে গণিত, ভূগোল, ইতিহাস বাংলায় পড়ানোর জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষক নিয়োগ হয়।[২১]

বাংলা ভাষা সাহিত্যের এমত পরিবেশের মধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ভার্নাকুলার চর্চা মিশনারিদের মধ্যেই শুরু হয়েছিল। এবং দেশের শিক্ষিত সমাজকে বাংলা ভাষার চর্চায় প্রণোদিত করেছিলেন বাংলা সংবাদপত্র।

১৮১৫ সালের মধ্যে কলকাতা অঞ্চলে প্রায় দু'শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। ১৮১৫-১৬ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে **Hints Relative to Native Education** নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় Hints মিশনারীদের এদেশে শিক্ষা বিস্তারের যে উপায় বাতলেছেন তার বড় কথা যে শিক্ষাই দেওয়া হোক না কেন তা দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায়। শিক্ষাদানের প্রথম উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল "Improving them in the knowledge of their language."

Hints পরিকল্পনা অনুসারে ১৮১৬ সাল থেকে মিশন মোট ১০৯টি বাংলা বিদ্যালয় বিভিন্ন গ্রামে গড়ে তোলে। জেলাওয়ারি ভাবে স্কুলগুলির সংখ্যা ছিল এই: হুগলি জেলা—৫৪, ২৪ পরগণা—২২, হাওড়া—১৮, বর্ধমান—৭, ঢাকা—৫ ও মুর্শিদাবাদ—৩। মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭১৬৫।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ১৬০টি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর অধিকাংশই প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামপুর মিশন। বাংলা সংবাদপত্রের পাঠক তৈরি করার ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়গুলির অবদান কম নয়। কারণ ওই বছরের মধ্যেই এই সব স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৩ হাজারের মত।[২২] ১৮৩৮ সালে উইলিয়ম অ্যাডাম নিম্ন বঙ্গে বিদ্যালয়গুলির যে তালিকা দেন তাতে দেখা যায় মেদিনীপুর জেলায় ৫৪৮, মুর্শিদাবাদে ৬২, বীরভূমে ৪০৭ ও বর্ধমানে ৬২৯টি বাংলা স্কুল চলছে। সে তুলনায় মেদিনীপুরে ইংরাজি স্কুল মাত্র ১টি, মুর্শিদাবাদে ২টি, বীরভূমে ২টি ও বর্ধমানে ৩টি স্কুল চলছে।[২৩] কিন্তু এই স্কুলগুলির আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। সরকার এই সব স্কুলের অনুদানের জন্য বছরে মাত্র ৮ হাজার টাকা দিতেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের নতুন শিক্ষানীতি ইংরাজী শিক্ষার দিকেই ঝুঁকে পড়েছিল। সেসব ইংরাজী স্কুল

আবার শহরে। অভিজাত নাগরিক শ্রেণীর ও নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের ছাত্ররা সেখান থেকে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে সরকারী চাকুরিতে যোগ দিয়ে নতুন ব্যুরোক্র্যাটিক বা আমলাশ্রেণীতে পরিণত হচ্ছিল। এই নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে বাংলা শিক্ষিত গ্রামের সাধারণ মানুষের সংযোগ বৈষম্য ক্রমেই বেড়ে চলছিল।

সমাচার চন্দ্রিকা এইসব বাংলা স্কুলের শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করে আক্ষেপ করেছেন ঃ 'অস্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে পাঠার্থিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয়…' (১ নবেম্বর, ১৮৩৪)।

বাংলা স্কুলগুলির প্রতি এই সরকারী বৈষম্যের প্রতিবাদ করে সংবাদ প্রভাকর ১৮৪৮ সালের ৫ এপ্রিল লেখেন : 'রাজপুরুষেরা সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার দিগের কিছুমাত্র যত্ন দেখিনা, তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী ভাষা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুর্য্যার্থ অল্পব্যয়ও করিতে পারেন না।"

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এটি অনেকদিন আগেই উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা বাংলা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। "If it be ideas which we want to communicate to the people of India then this object can never be obtained but by transfusing European Knowledge into the languages with which they are familiar."[২৪] অ্যাডাম পরবর্তী কালে ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ সালে মাতৃভাষার পক্ষে তাঁর অভিমত বার বার ব্যক্ত করেন, ১৯৪৮ সালে বি এইচ. হজসন বাংলা ভাষা চর্চার অনুকূলে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

১৮৫৩ সালে ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এইচ. এইচ. উইলসন বলেছিলেন, ভারতে আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গণশিক্ষার। "There is a great want of the mean of instructing the people generally in their own languages. There are very few Bengalies who can read or can write Bengalee with any degree of correctness. The first requisite therefore, is to improve the vernacular education of the people in the different classes, and to adapt that education to their different stations and circumstances of life."[২৫]

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হজসন সাহেবের পুস্তিকার বক্তব্যকে সমর্থন করে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"…যদি বলেন যে, ইংরাজী বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অনেকে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, একথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এই বৃহদ্রাজ্যের অসংখ্য

মনুষ্য বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিরহ অজ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন রহিয়াছেন, কেবল অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বিলাতীয় বিদ্যার আলোকপ্রাপ্ত হইয়া তটস্থ মনুষ্যদিগের সভ্যতা প্রভৃতি সদগুণকে সভ্য করিয়াছেন, অপিচ রাজপুরুষেরা যদ্যপি দ্বেষভাব পরিহার পূর্ব্বক এই দেশের ভাষাদ্বারা এই দেশের মনুষ্যদিগ্যে জ্ঞানশিক্ষা প্রদানের নিয়ম করিতেন, তবে সর্ব্বসাধারণে বিদ্যানুশীলনে অনুরাগি হইয়া অনায়াসে বিদ্যাধন লভ্য করিতে পারিতেন।" (১৯. ১২. ১২৫৪ / ৩১. ৩. ১৮৪৮)

এই সর্বসাধারণের ভাষা যে বাংলা এবং সার্বজনীন বাংলা শিক্ষার অভাবেই যে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে বৈষম্য রচিত হচ্ছে তা প্রভাকরও উপলব্ধি করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীকে প্রথম ভাষা বলে গণ্য করার ফলে যাতে বাংলার অবনতি না হয় সেদিকে প্রভাকরের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। "তাহাদের নিয়মানুসারে সকল ছাত্রেরাই অগ্রে কেবল ইংরাজী ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিতে অগ্রসর হয় দেশীয় ভাষার প্রতি তাহাদের আর তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। অতএব যাহাতে দেশীয় ভাষার কোন প্রকারে অবনতি না হইয়া উন্নতি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের সে বিষয়ে মনোযোগ করা নিতান্ত কর্তব্য।" (১১. ২. ১৮৬০)। ওই একই প্রবন্ধে প্রভাকর চেয়েছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলায় সংস্কৃতের মত পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা করুন। "বাঙ্গালা ভাষার স্বতন্ত্ররূপে উপাধি পরীক্ষার রীতি প্রচারিত হইলে বড় এক দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় হয়।"

সেযুগে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলাচর্চা নিয়ে বাংলা সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছিল। কারণ দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তৈরি হত এই কলেজ থেকে। এবং দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলার প্রতি ঔদাসীন্য বাংলা সংবাদপত্র সেবীদের চিত্ত ব্যথিত করে তুলেছিল।

১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলা শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রসন্ন কুমার ঠাকুর কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন। বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪৩ সালের ১লা আগস্ট এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখছেন যে কলেজের ছাত্ররা বাংলা শিক্ষা করতে অনিচ্ছুক, কারণ তাদের পরিশ্রমের কোন উৎসাহ বা পুরস্কার দেওয়া হয় না। এ ছাড়া স্পেকটেটর বাংলা পঠন-পাঠন পদ্ধতিরও সমালোচনা করেন।

"আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বিদ্যালয়ের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের পণ্ডিত মহাশয়েরা এ পর্য্যন্ত তত্রস্থ ছাত্রগণের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই, ঐ ডিপার্টমেণ্টে নিম্ন চারি শ্রেণীতে কেবল গৌড়ীয় ব্যাকরণের পাঠ ও অনুবাদ করণ দ্বারা বাংলা শিক্ষা হয়, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ঐ ডিপার্টমেন্টের ছাত্ররা বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত হিতোপদেশ ও রঘুবংশ পাঠ করিবেন এবং শ্রুত লিখন ও রচনা করণ দ্বারা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবেন কিন্তু তাহার ঐ প্রস্তাব রিপোর্টে রহিয়াছে, এক্ষণে আমরা এই জানিতে অভিলাষ করি প্রধান

গৃহের ছাত্রদের বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত উক্ত বাবুর প্রস্তাবিত ধারা প্রচলিত হইবেক অথবা অন্য কোন নূতন নিয়ম সৃষ্ট হইবেক।"

বেঙ্গল স্পেকটেটর স্পষ্টভাষায় বলেছিলেন, "এ দেশের লোকদিগকে সভ্য করিতে হইলে এ দেশের ভাষা আলোচনা করা অতি কর্ত্তব্য·· ছাত্রেরা মাতৃক্রোড়াবিধি যে ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং যদ্দারা মনের তাবৎ ভাব অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারে সেই ভাষায় শিক্ষাদানের নিয়ম করিলেই তাহাদিগের মানসান্ধকার দূর হইবেক।" (১ আগস্ট, ১৮৪৩)

বেঙ্গল স্পেকটেটর ছাড়াও চল্লিশের দশকে তত্ত্ববোধিনী ও সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার মাধ্যমে বাংলার নবজাগ্রত আর একদল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আবির্ভূত হচ্ছিলেন। প্রধানতঃ বঙ্গভাষা চর্চার মধ্য দিয়ে এঁদের সারস্বত সাধনার বিকাশ ঘটছিল। তত্ত্ববোধিনীর এই গোষ্ঠীর পুরোভাগে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা। সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু রঙ্গলাল তখন আত্মবিকাশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বস্তুত পক্ষে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্য চর্চার যে বিরাট আয়োজন শুরু হয়ে যায় তত্ত্ববোধিনী ও প্রভাকরে তার প্রস্তুতিপর্ব চলছিল।

১২৭১ সালের ১২ ভাদ্র সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য কয়েক দফা গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন। তাতে সোমপ্রকাশ উপলব্ধি করেন, "ভাষার উন্নতিই মানুষের শরীর মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতির মূল। ভাষার উন্নতি ব্যতিরেকে ধর্ম, ধর্মনীতি, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি কোন গুণই বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ভাষার যে এতগুণ আছে, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারেন না। তাহারা আপাত ফল দর্শনে মোহিত হন। মোহিত হইয়াই অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় একান্ত উপেক্ষা করিয়া স্ব স্ব সন্তানদিগকে এককালে ইংরাজীতে হাতে খড়ি দিয়া থাকেন। এটী বাঙ্গালাদেশের অদৃষ্টের সামান্য বিড়ম্বনা নয়। এই বিড়ম্বনা দোষেই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি নিতান্ত অনুরাগ শূন্য হন।"

সোমপ্রকাশ প্রস্তাব করেন যে, "গবর্নমেণ্ট নিয়ম করুন যে বালক ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা না করিবে তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবেশিত করা হইবে না।"

তত্ত্ববোধিনীও এই অভিমত পোষণ করতেন "যে জাতির ভাষা উন্নত সে জাতি অন্যান্য সকল বিষয়েই উন্নত হইয়া থাকে। ভাষা উন্নত হইলে জাতীয় উন্নতি এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী।" (১৮০১ শক কার্ত্তিক)

ইংরাজী শিক্ষাকে বাংলা সংবাদপত্র একদা দুহাত তুলে অভিনন্দন জানিয়েছিল কিন্তু তার কুফল সম্পর্কে অবহিত করতেও দ্বিরুক্তি করেনি। তত্ত্ববোধিনী ১৮০১ শকে লিখেছিলেন, "বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার চর্চা এক সঙ্গে চলিতেছে। কিন্তু ইংরাজী ভাষার যেরূপ আত্যন্তিক চর্চা ও অনুশীলন হইতেছে

তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ইংরাজী ভাষা বঙ্গভাষার উন্নতির বিশেষ হানিকর হইতেছে এবং ঐ ভাষায় প্রতিভাসম্পন্ন লেখক উদিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জানাইতেছে।------কিন্তু কৃতবিদ্য বঙ্গবাসিগণ যদ্যপি ইংরাজী ভাষার চর্চা ও অনুশীলনের সহিত বঙ্গভাষার সবিশেষ চর্চা ও অনুশীলন করেন তাহা হইলে বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে উল্লিখিত প্রতিবন্ধক সকল অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইতে পারে।"

বাংলা সংবাদপত্রের এই ক্রমাগত সতর্কবাণীর ফলে ইংরাজীকে তার স্বস্থান থেকে প্রতিহত করা না গেলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং পরবর্তী কালের ইংরাজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই বাঙালি লেখক সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে। বাংলা চর্চার ক্ষেত্রও সুবিস্তৃত হয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষা

বাংলা সংবাদপত্রের আর একটি গৌরবজনক ভূমিকা ছিল স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে। সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের মত এদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারও মিশনারিদের দ্বারা শুরু হয়েছিল। কলকাতা ব্যাপ্‌টিস্ট মিশনারি সোসাইটি ১৮১৯ সালে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি নামে মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। ১৮২১ সালে **Ladies Society for Native Female Education in Calcutta** নামে একটি সমিতি হয়। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে নন্দন বাগানে, গৌরীবেড়ে, জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে মেয়েদের পাঠানো নিয়ে রক্ষণশীল সমাজ থেকে যে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে বাংলা সংবাদপত্র সেদিন যে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা জনমত গঠনে প্রবলভাবে সহায়ক হয়ে ওঠে।

১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ লিখে স্ত্রীশিক্ষার এই নবগঠিত আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ১৮২৪ সালে গ্রন্থের নতুন সংস্করণে একটি কাল্পনিক সংলাপ সংযোজন করা হয়। এই সংলাপ দুই স্ত্রীলোকের মধ্যে :

প্রঃ ওলো এখন যে অনেক মেয়্যামানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার মন কেমন লাগে ?

উঃ তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এতকালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে এমন জ্ঞান হয়।

প্রঃ কেন গা। সে সকল পুরুষের কায তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উঃ শুনলো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে কেন না এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্রঃ ভাল। লেখাপড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের

ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলেপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন, তাহা কি পুরুষে করিবে।

উঃ না, পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখাপড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাযকর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে তুইদণ্ড লেখাপড়া নিয়া থাকিলে মনস্থির থাকে এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্রঃ ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে, লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে, লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় একি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি তাহা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উঃ না বইন সে কেবল কথার কথা।

গৌরমোহনের এই কাল্পনিক কথোপকথনে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল তা ছিল সংরক্ষণবাদীদের প্রচারিত মতামত।

১৮২২ সালের ৬ এপ্রিল ও ১৩ এপ্রিল সমাচার দর্পণ পর পর দু সংখ্যায় এই বইটির সমালোচনা করে লেখকের বক্তব্য সমর্থন করেন।

দর্পণ মন্তব্য করেন ঃ

"এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানীং বিদ্যাভ্যাস করেন না। কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোষ লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন।"

রাজা বৈদ্যনাথ রায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশহাজার টাকা দান করলে ১৮২৬ সালের ৭ জানুয়ারি দর্পণ তাঁর প্রশংসা করেন। রাজা বৈদ্যনাথের এই দানের প্রশংসা করে ইণ্ডিয়া গেজেটে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। দর্পণ লেখেন, "এতদ্বিষয়ে তাবৎ ইংরাজী সমাচার পত্রে তাঁহার যেরূপ মহিমা প্রকাশ হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কাহার না আহ্লাদ জন্মে।"

১৮২১ সালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মিস মেরি অ্যালি কুক ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় এসে পৌছান। ঠনঠনিয়া, মির্জাপুর প্রতিবেশী স্কুল, শোভাবাজার স্কুল, কৃষ্ণরাজার স্কুল, শ্যামবাজার স্কুল মল্লিকবাজার স্কুল ও কুমোরটুলিতে কয়েকটি স্কুল গড়ে ওঠে। ১৮২৩ সালে এইসব স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২। ছাত্রীসংখ্যা হয় ৪০০। ১৮২৬ সালের ১৮ মে কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারের পূর্বকোণে চার্চ মিশন যে সেনট্রাল ফিমেল স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৈদ্যনাথ রায় এখানেই ২০ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

১৮২৭ সালের ২৮ জুলাই সমাচার চন্দ্রিকা এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায় যে কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৬০০।

মিশনারিদের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে রাজা বৈদ্যনাথ রায়, কাশীনাথ মল্লিক, মতিলাল

শীল প্রমুখের ঐকান্তিকতা এসে যুক্ত হয়েছিল। রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু বালিকাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠানোতে তাঁর মত ছিল না; বালিকারা বিদ্যালয়ে গেলে তাঁরা পুরুষের কুনজরে পড়বে এবং চরিত্রভ্রষ্ট হবে সেকালে শিক্ষা-বিরোধীদের এটাই ছিল অভিমত। এমনকি ১৮৪৯ সাল পর্যন্তও সমাচার চন্দ্রিকা লিখে গেছেন: "বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎ পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্যখাদক সম্বন্ধ।"২৬

বাংলা দেশে সংরক্ষণপন্থীদের শিবির সর্বদাই সংহত ছিল। ১৮৩১ সালের ২৫ জুন স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদের জনৈক ব্যক্তি সমাচার দর্পণে বঙ্গদূত পত্রিকার স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে প্রকাশিত বক্তব্যের সমালোচনা করে চিঠি লিখেছেন। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান যুক্তি এই যে, শিক্ষিত নারীরা সমাজের কোন কাজেই আসবেন না। "এমন কোন পুংবর্জিত দেশ বিশ্বনির্ম্মাতা নির্ম্মাণ করেন নাই যে যেখানে পাটেয়ারিগিরি ও মহরিগিরি ও নাজীরী ও জমীদারী ও জমাদারী আমীরী নারী বিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়।"

দ্বিতীয়ত বাঙলা বানান শিখলেই যে স্ত্রীজাতির লৌকিক জ্ঞান বাড়বে তার কোন যুক্তি নেই। লৌকিক জ্ঞান এমনিতেই স্ত্রীদের যথেষ্ট। বাংলাতে শিক্ষা পাবার মত কোন বই ই নেই। সংস্কৃতে আছে। কিন্তু সংস্কৃতে জ্ঞানার্জন দুরূহ। "মিশনারি সাহেবরা বিংশতি বৎসরাবধি বাজারে ২ বালিকা পাঠশালা করিয়া বহুবিধ ব্যয়র ও ব্যসন পূর্ব্বক বাগদী ব্যাধ ব্যেদে বেশ্যা বৈরাগি বালিকারদের বাঙ্গালা বিদ্যা বিতরণার্থ বিস্তর ব্যাপার করিতেছেন কিন্তু তাহার ফল কেবল ফলা বানান পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে অধিক হওনের বিষয় কি।"

পত্রলেখকের এই ব্যঙ্গ অনেকাংশে সত্যি। মিশনারিদের বালিকা বিদ্যালয়গুলি অনেক উদারপন্থী হিন্দুকেও আকৃষ্ট করতে পারেনি। ইংরাজী শিক্ষা পুরুষেরা গ্রহণ করলেও মেয়েদের মিশনারিদের স্কুলে পড়ানো সম্পর্কে অনেকেরই আপত্তি ছিল। আর তাছাড়া মিশনারিদের এইসব বালিকা বিদ্যালয়ে খ্রীস্টান শিক্ষা দেওয়া হত। যার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত ব্যক্তিও এই সব স্কুল সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন।

শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বাঙালি পরিবারের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি এই আড়ষ্টতা (বিরোধিতা নয়) বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত ভাঙেনি। ১৮৪৯ সালের ৭ মে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ড্রিঙ্ক ওয়াটার বিটনের অনুরোধে ১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর এই স্কুলের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উদারনৈতিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য বেথুন প্রথম থেকে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁর স্কুলে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা রাক্ষা হয়নি। শিক্ষার পাঠ্যসূচী মেয়েদের উপযোগী করেই নির্বাচিত করা হয়েছিল। মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজকে

আকৃষ্ট করার জন্য এই হিন্দু জাতীয়তাবোধের সুকৌশল ব্যবহার সেযুগের পটভূমিকায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

বেথুনের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিকতা যুক্ত হওয়ায় স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয়। বিদ্যাসাগরকে সেদিন সহায়তা করেছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বেথুন তাঁর স্কুলের ছাত্রীদের আনার জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন। বিদ্যাসাগর সেই গাড়ির পাশে লিখে দিয়েছিলেন 'কন্যাপ্যেবং-পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ' অর্থাৎ শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী পুত্রের মত কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে হবে। বেথুন স্কুলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর দুই কন্যাকে প্রথমেই ভরতি করে দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁর ভাইঝিকে এই স্কুলে ভরতি করেন।[২৭]

বেথুন-প্রবর্তিত এই বিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করেছিল তার কারণ এই প্রথম বিদ্যাসাগরের মত এক বিরাট ব্যক্তিত্ব এই স্কুলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এই প্রথম মধ্যবিত্ত সমাজের অবরোধের বেড়া ভাঙতে শুরু করেছিল। ১৮৪৭ সালে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখেরা বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২৮]

সম্পূর্ণ বাঙালির উদ্যোগে সেটাই বাংলা দেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। "কিন্তু এই অপরাধে প্যারীবাবু, নবীনকৃষ্ণ বাবু এবং বালিকা বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাসাতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।"[২৯]

এই পটভূমিকায় বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৮৬২ সালের ১৫ ডিসেম্বর স্কুল কমিটির সম্পাদক বিদ্যাসাগর বাংলা সরকারকে রিপোর্ট পাঠান: ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস করেন, যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে।[৩০]

এই বালিকা বিদ্যালয়ের সাফল্য দেখে সরকার সর্বপ্রথম এদেশে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে সম্মত হন। আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এদেশের জনগণের মানস মুক্তির জন্য কোন রকম সংস্কারই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করেননি। সংরক্ষণ-বাদকে সংরক্ষণ করাই ছিল তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি। হিন্দু রক্ষণশীল জনমত যদি ক্ষুব্ধ হয় এই আশঙ্কায় স্ত্রীশিক্ষার সরাসরি দায়িত্ব সরকার এতদিন গ্রহণ করেননি।

১৮৫৪ সালে কোম্পানির ডিরেকটররা বাংলা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে যেন প্রয়োজন মত সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। ১৮৫৭ সালে বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হন এবং বিদ্যাসাগরের সহায়তা চান। ১৮৫১ সালের অকটোবর থেকে বড়লাট ডালহৌসি বেথুন-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সব ব্যয় বহন করতে লাগেন। ১৮৫৬ সালের মার্চ ডালহৌসি চলে যান। তার পর থেকে বেথুন স্কুল সরকারী স্কুলে পরিণত হয়।

কিন্তু সরকার স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব স্বীকার করলেও উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেননি। ছোটলাটের কথামত ১৮৫৭ সালের নবেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ৩৫টি বিদ্যালয়ের জন্য মাসে ব্যয় হত ৮৪৫ টাকা। ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৩০০।[৩১]

ডি. পি আই-এর কাছে অন্তত ২৬টি বিদ্যালয় সম্পর্কে সাহায্যের আবেদন এসেছিল। কিন্তু ভারত সরকারের অর্থ অনুদানের ব্যাপারে শর্ত কড়াকড়ি ছিল। স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনসাধারণের কাছ থেকে উপযুক্ত স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য না পাওয়া গেলে ভারত সরকার অনুদান দিতে স্বীকৃত হননি। ১৮৫৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের মোট বেতন বাকী পড়ে ৩৪৩৯ টাকার মত। অনেক লেখালেখির পর ভারত সরকার এই টাকা মিটিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ওই সব স্কুলের জন্য নিয়মিত পৌনঃপুনিক অনুদান দিতে সরকার অস্বীকৃত হন। বিদ্যাসাগর কিছুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিয়মিনত চাঁদা তুলে সেই স্কুল চালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই সব নানান ধরনের বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছিল। তবে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকে মেয়েরা দলে দলে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে এসেছিল একথা বললে ভুল হবে। এই স্কুল স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নানান প্রতিবন্ধকতার অপসারণ করেছিল।

বিদ্যাসাগর তাঁর ১৮৬২ সালের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেনঃ "বড়লোকেরা এখনও সাক্ষাৎভাবে বীটন বিদ্যালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই, এই শ্রেণী হইতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অনেক সম্পন্ন ঘরেই কিন্তু মহিলাদের জন্য গৃহশিক্ষার আয়োজন হইয়াছে ইহা দেখিয়া কমিটি আনন্দানুভব করিতেছেন। বিশেষভাবে বীটন স্কুলের হিতকর প্রভাবই যে ইহার কারণ ইহাই কমিটির বিশ্বাস।"

বেথুন স্কুল সমাজে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল এটাই বড় কথা। এমনকি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর সমাচার চন্দ্রিকাও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে মত পাল্টেছিলেন। ১৮৪৯ সালের ১২ মে সম্বাদ ভাস্কর এই প্রসঙ্গে লেখেন: "কি সুসময়। চন্দ্রিকা পত্রের আশ্চর্য মত পরিবর্তন।" এর পিছনেও ছিল বাংলা সংবাদপত্রের দীর্ঘ বিশ বছরের প্রচার।

বিদ্যাসাগর বেথুন কলেজের গাড়িতে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ' বলে যে শ্লোকটি লিখেছিলেন প্রায় সাত বছর আগে একটি বাংলা সংবাদপত্র স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে প্রচার চালাতে গিয়ে সেটি প্রথম ব্যবহার করেন। পত্রিকাটির নাম বিদ্যাদর্শন। ১৭৬৪ শকের আষাঢ় প্রথম সংখ্যায় 'হিন্দুস্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা' এই প্রবন্ধে বিদ্যাদর্শন লেখেন:

"এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারি কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত

তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ হয় না। ভাল, স্ত্রীগণের বিদ্যায় অধিকার যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় না হইত, তবে তিনি পশুদিগের জড়বুদ্ধির ন্যায় তাহারদিগের বুদ্ধিরও এ প্রকার নির্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করিয়া দিতেন, যে তাহা উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য হইত, এবং পশুরা যেরূপ অল্পকালের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও আত্মরক্ষার উপায় চিন্তাদি কতকগুলিন প্রয়োজনীয় ভাবের পরিপক্বতা প্রাপ্ত হইলে আর উন্নতির উপযুক্ত হয় না, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরাও পশুগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধি বিশিষ্ট হইলে কিয়দ্দিবসের মধ্যে নিজ স্বভাবের পরিণাম লব্ধ করিয়া যাবৎকাল সমতাবস্থায় থাকিতেন, যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ স্বভাব বিরুদ্ধ।"

এই প্রবন্ধে শাস্ত্র থেকে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে নানান উদাহরণ তুলে উপসংহারে বলা হয়—

এইক্ষণে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তির আশু যত্ন করা উচিত নতুবা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথা করা হয়।

উপরিলিখিত বিষয়ে সার সংক্ষিপ্ত।

প্রশ্ন—হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন কি?

উত্তর তদ্ব্যতীত এ দেশে ঘৃণিত অসভ্য অবস্থায় পতিত থাকে।

প্রশ্ন—বিবেচনা মতে তাহা উচিত কি না?

উত্তর—যুক্তি সর্বাগ্রেই ইহার পোষকতা করে।

প্রশ্ন—শাস্ত্রের মত কি?

উত্তর—শাস্ত্র এ বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

প্রশ্ন—তবে ইহা সম্পন্ন না হওনের কারণ কি?

উত্তর—দেশীয় মনুষ্যদিগের অজ্ঞান এবং অযত্ন।

প্রশ্ন—তাহারা এ বিষয়ের অবহেলা করাতে কি পাপ সঞ্চয় করিতেছেন না?

উত্তর—তাঁহারা অবশ্যই পাপ করিতেছেন এবং তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকটে দণ্ডনীয় হইতেছেন।

বিদ্যাদর্শনে ব্যবহৃত মহানির্বাণ তন্ত্রের ঐ শ্লোক 'কন্যাপ্যেবংপালনীয়া' সংবাদ প্রভাকরও ব্যবহার করেন। ১৮৪৯ সালের ১২ মে সংবাদ প্রভাকর চন্দ্রিকার স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যের প্রতিবাদ করে ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন। প্রভাকর লেখেন, "পূর্ব্বতন মহর্ষিরা বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করেন নাই বরং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই দিয়াছেন।"

বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর যে সামাজিক ঝড় উঠেছিল প্রবন্ধটি তার পটভূমিকায় লেখা। চন্দ্রিকা ঐ বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখেছিলেন: "যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন তাঁহারা মান্য ও পবিত্র হিন্দু কুলোদ্ভব না হইবেন।" প্রভাকর লেখেন, "একথার উত্তরে আমরা কি লিখিব, বহুবাজার নিবাসী শ্রীমান নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মান্য নহেন, শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মান্য নহেন। শ্রীযুত বাবু

রামগোপাল ঘোষ মান্য নহেন, বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, বাবু হরিনারায়ণ দে মান্য নহেন। তবে তাঁহার মতে কাহারক মানষ বলা যায়, যাঁহারা কুলবিশিষ্ট হইয়া স্বভাবে আছেন এবং স্বাধীনতা দ্বারা সম্ভ্রমের সহিত সম্বরণ করেন তাঁহারদিগকে অবশ্যই মান্য করিতে হইবেক, এতদ্ভিন্ন অনেক বিশিষ্ট বংশঃ মহাশয়েরা কন্যা প্রেরণ করিতেছেন এবং করিবেন।"

বেথুন স্কুল সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকাকেও প্রচণ্ড সমর্থক পায়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা উৎসবের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে ভাস্কর সংবাদের শিরোনাম দেন 'হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান।' (১০ মে, ১৮৪৯)

সংবাদটি শুরু হয় এইভাবে :

"এতকাল পর হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান হইল, পরমেশ্বর করুন, বিশিষ্ট শ্রেণীস্থ হিন্দু মহাশয়েরা এই অনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিতে মনোযোগী হউন।"

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভাস্কর বেথুনকে 'সহস্র সহস্র নমস্কার' করেন। এবং বেথুন এই বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশ নেবার জন্য সমাজপতি ধনিক গোষ্ঠীকে ডাকেন নি। তাঁরা যাতে অপমান জ্ঞান না করেন এজন্য ভাস্কর ওঁদের অনুরোধ করেন। কারণ 'বেথুন সাহেব স্বকীয় বক্তৃতার মধ্যেই ইহার কারণ সকল ব্যক্ত করিয়াছেন।' ভাস্কর বেথুনের বক্তৃতা পুরো প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি। পরের সংখ্যায় (১২ মে) বক্তৃতার ওপর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে নানান ষড়যন্ত্র হতে থাকে তার প্রমাণ ১৮৪৯ সালের ৩১ মে, ১২ জুন ও ১৯ জুন তারিখের ভাস্কর পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্র স্তম্ভ। এমনকি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সরের মত কাগজ (ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ) বেথুন স্কুলের বিরোধিতা করেছিলেন। ভাস্কর এই সব সমালোচনা ও তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে নির্ভীকভাবে লেখেন : "কলিকাতা নগরে বালিকাদিগের বিদ্যালয় হইয়াছে ইহাতে সকলেই মহা গোলযোগ করিতেছেন, কিন্তু আমরা বারম্বার বলিয়াছি এবং বলিতেছি আরো বলিব এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার প্রথা নবীন প্রথা নহে,…"

৩১ মে তারিখে ভাস্কর একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে পত্রলেখক জানান "আমরা অতিশয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি এই নগরের কতিপয় মান্যবংশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কুতর্ক করিয়া নানা কুমন্ত্রণা করিতেছেন।"

পত্রলেখক দুঃখ করে বলেন, একজন 'ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মহামান্য ব্যক্তি স্বধন ব্যয় পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে যে বিষয়ে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন সেই বিষয় তাঁহারা মহোপকার বোধ না করিয়া প্রত্যুত গ্লানি দ্বারা আপনাদিগের ক্ষুদ্র স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন…পরিশেষে তিনি আবেদন জানান বিরোধীরা যেন অভিনব কলিকাতা স্ত্রী বিদ্যালয়ের আনুকূল্য করেন।'

হিন্দু ইন্টেলিজেন্সরকে ভাস্কর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে,

"হিন্দু বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিলে কি কি অনিষ্ট সম্ভাবনা আপনি একাদিক্রমে তাহা প্রকাশ করুন, আমরা মহাশয়ের প্রতিকথার উত্তর দিব, যদি উত্তর প্রদানে অশক্ত হই তবে আপনি জয়ী হইবেন।"

স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে ও বিপক্ষে ভাস্করে সে সময়ে প্রচুর চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়।

বীটন সাহেবের প্রচেষ্টার প্রতি দেশবাসী দলমত নির্বিশেষে সমর্থন না জানানোর ফলে সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা ১৭৭২ শকের আশ্বিন সংখ্যায় লেখেন যে "এদেশে স্ত্রীশিক্ষা অথবা বিধবা বিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎকার্য্য যখন ঘটিবে, তখন বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্তদ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হা করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন তো সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ত্রুটি করিবেন না। কি লজ্জার বিষয়। কি লজ্জার বিষয়।"

বারাসতে প্যারিমোহন সরকার প্রমুখের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে স্থানীয় ব্যক্তিদের বিরোধিতার সমালোচনা করে সর্বশুভঙ্করী লিখেছিলেন, "বিদ্যালয় স্থাপনার পরে কতকগুলি ঘোর পাষণ্ড রাক্ষস লোকেরা এই সৎ কর্মানুষ্ঠান অসহমান হইয়া সেই সাধুগণের উপর দারুণ উপদ্রব ও ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল তথাপি সেই সাধুগন স্বাবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত না হইয়া বরং অধিকতর প্রয়াস অকুতোভয়ে স্বকার্য সাধন করিতেছেন। ইহাদিগের নামও কেহ জানেন না। এমত সামান্যাবস্থাপন্ন হইয়াও ইহারা কেবল আপন ২ পরিশ্রম ও মনের দৃঢ়তা সহকারে এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। অতএব ইহাদিগের নাম ও গুণগ্রাম পাষাণ নিহিত রেখার ন্যায় সর্বসাধারণের অন্তঃকরণে চিরজাগরুক থাকা অত্যাবশ্যক।"

বাংলার ছোট লাটের সদিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত সরকারের অসহযোগিতার ফলে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরে প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল তা আগেই উল্লেখ করেছি। সোমপ্রকাশ ব্রিটিশ সরকারের এই অসহযোগিতাকে ক্ষমা করেননি। ১২৬৬ সালের ১৭ শ্রাবণ সোমপ্রকাশ লেখেন: "বালিকা বিদ্যালয়ে ব্যয় দান অস্বীকার করাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, বঙ্গদেশীয় স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষের উপেক্ষা আছে। যত্ন থাকিলে তাঁহারা অর্থের অসঙ্গতিরূপ কারণ প্রদর্শন করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেন না।"

সোমপ্রকাশ উদাহরণ দিয়ে দেখান মিশনারি শিক্ষার জন্য সরকার অর্থ ব্যয় করতে কার্পণ্য করেন নি। সোমপ্রকাশ এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরেরও মৃদু সমালোচনা করেন। কারণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে যাওয়া বিদ্যাসাগরের উচিত হয় নি। "স্বদেশের হিতানুষ্ঠান প্রসঙ্গ হইলে বিদ্যাসাগরেরও কিছু জ্ঞানগম্য থাকে না।"

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সে সময় আর একটি বড় বাধা অনুভূত হয়েছিল– সেটি শিক্ষিকা সংগ্রহ। এই অভাব দূর করার জন্য তৎকালীন বিশিষ্ট মহিলা শিক্ষা প্রচারক মেরি কার্পেন্টার বেথুন স্কুলের সঙ্গে নর্মাল স্কুল নামে একটি শিক্ষিকা শিক্ষণ স্কুল খোলার

প্রস্তাব করেন। মেরি কার্পেন্টার ১৮৬৬ সালে কলকাতায় এসে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নিজেকে নিয়োজিত করেন। মিস কার্পেন্টার এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই প্রস্তাব বাস্তবসম্মত মনে করতে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন যে, অবরোধ প্রথার গোঁড়ামি কাটিয়ে বয়স্কা মহিলারা কেউ শিক্ষণ শিক্ষা নিয়ে শিক্ষয়িত্রী হতে চাইবেন না। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগরের এই মতামত দেবার যুক্তিসম্মত কারণও ছিল। কারণ অল্পবয়স্ক অনূঢ়া বালিকাদের স্কুলে পাঠানো শুরু হলেও গৃহের বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার অধিকারও সমাজ দেয় নি।

তবে সে যুগে আশ্চর্য প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন সোমপ্রকাশ। নর্মাল স্কুল স্থাপনের বিরোধিতা করে সোমপ্রকাশে চিঠি পত্র প্রকাশিত হয়। কিন্তু সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সোমপ্রকাশ এই স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্তকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বাগত জানান। সোমপ্রকাশ লেখেন, ইংলণ্ডে যখন রেলওয়ের সৃষ্টি হল তখনও পার্লামেণ্টে এমন বিতণ্ডা উঠেছিল। 'অগ্রে স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেখ সময় হইয়াছে কিনা তাহার পর বুঝা যাইবে।' (৩ পৌষ, ১২৭৩)

সোমপ্রকাশ আরও লিখেছিলেন, "যতদিন স্ত্রী শিক্ষকের নিকট স্ত্রীলোকের শিক্ষা-প্রথা প্রবর্তিত না হইবে ততদিন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ফলোপধায়িনী হইবে না।"

নর্মাল বিদ্যালয় পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ বছরের জন্য খোলা হয়। কিন্তু এই পরীক্ষা সফল হয়নি। সম্রান্ত হিন্দুঘরের মহিলাদের মধ্য থেকে শিক্ষিকা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। এমন কি পাছে পুরুষ সহিস থাকিলে মহিলারা স্কুলের গাড়িতে উঠতে রাজি না হন সেজন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় কর্তৃপক্ষ স্কুলের কাজ শুরু করতে অযথা বিলম্ব করেছিলেন।

সোমপ্রকাশ মিস কার্পেন্টারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান (১০ পৌষ, ১২৭৩)। সেযুগে ইংলিশম্যান পত্রিকা মিস কার্পেন্টারকে সমালোচনা করলে সোমপ্রকাশ ইংলিশম্যানকে তীব্র আক্রমণ করে। মিস কার্পেন্টার বলেছিলেন, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে হিন্দু রমনীরা ইংরাজ রমনীদের তুল্য হতে পারেন। ইংলিশম্যান এই মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হন এবং মিস কার্পেন্টারকে নির্বোধ বলে অভিহিত করেন।

১৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৩ তারিখের সোমপ্রকাশ মিস কার্পেন্টারকে স্বাগত জানিয়ে একটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন।

তবে সমাজের প্রগতিশীল অংশের সমর্থন সত্ত্বেও এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার অত্যন্ত ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছিল। ১৮৫৬ সালে ডালহৌসি তাঁর মাইনিউটে লিখেছিলেন, এদেশে স্ত্রীশিক্ষার যে যথেষ্ট বিস্তার হল না তার কারণ উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের অনাগ্রহ। তারা তাঁদের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য স্কুলে পাঠাতে কিছুতেই রাজি হন নি।[৩৭]

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২ সালের সোমপ্রকাশ অবশ্য এই 'ব্যর্থতার' কয়েকটি কারণ বিশ্লেষণ করেছেন।

১। পুরুষেরাই ভাল লেখাপড়া জানে না। সেখানে তাদের অধীনস্থ মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে কীভাবে ?

২। বাল্যবিবাহ বড় বাধা—বালিকারা বেশি দিন বিদ্যালয়ে থাকতে পারে না।

৩। অল্প বেতনের শিক্ষকদের দ্বারা ভাল শিক্ষা হতে পারে না।

৪। বিবাহের পর মেয়েদের বিদ্যাচর্চার কোন সুযোগ নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়ে না।

৫। মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে রান্নাবান্না করতে হয়। ইউরোপে মেয়েদের এত ঝামেলা নেই। হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে তারা খেতে পারে। এ কারণে ইউরোপীয় মহিলারা অনেকাংশে বিদ্যাবতী।

সোমপ্রকাশের এই বিশ্লেষণ বহুলাংশেই অকাট্য। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ যে স্ত্রী শিক্ষার পথে মস্ত বড় অন্তরায় তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বামাবোধিনী পত্রিকাও লিখেছিলেন (ফাল্গুন ১২৭৪) বাল্যবিবাহ রীতি এদেশ হইতে নির্বাণ না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। বঙ্গদেশে এত বিদ্যার গৌরব প্রতি বর্ষে এত বি. এ. ; এম. এ. হইতেছে কিন্তু স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রায় পূর্ববৎই রহিয়াছে। আমাদিগের এই বিষয় কিছুতেই নিরাকৃত হইল না মুর্খ, কলহপ্রিয় ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র এ স্বর্ণ মণ্ডিত স্ত্রীর সহবাসে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় কিরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করেন ?

বামাবোধিনী পত্রিকা মূলতঃ স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজেই নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্য তাঁরা মহিলাদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করতেন। ভারতবর্ষের সমস্ত বালিকাবিদ্যালয়ে এক কপি করে বামাবোধিনী বিনা মূল্যে পাঠানো হত। 'কন্যায়েবং পালনীয়া' শ্লোকটি বামাবোধিনীর প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকত।

বামাবোধিনী স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ক্রমাগত প্রচার চালান। তাঁরা চেয়েছিলেন একটি সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম। স্বামীরা এই পাঠক্রম অনুসারে স্ত্রীদের অন্তঃপুরেই শিক্ষিত করে তুলবেন। ১২৭২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় বামাবোধিনী এই অন্তঃপুর শিক্ষাদর্শ অনুসরণের পক্ষেই যুক্তি দিয়েছিলেন : স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই লইয়াই জনসমাজ হইয়াছে অতএব স্ত্রীদের পরিত্যাগ করে কেবল পুরুষদের উন্নতি করিলে—তাহাতে জনসমাজের উন্নতি হইল না·· স্ত্রীগণ সকলেই বিদ্যাবতী না হইলে যে দেশের কখনই প্রকৃত মঙ্গল হইবে না ইহা কয়জন ব্যক্তির মনে বিশ্বাস হইয়াছে ?

১৭৯৮ শকের জ্যৈষ্ঠ তত্ত্ববোধিনী লিখেছিলেন, 'বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করাতে ততোধিক বিদ্যাবতী হইতে পারে না, ইহাতে অল্প বিদ্যার যে সকল অনিষ্ট তাহা ঘটিয়া থাকে। বালিকা বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রীরা

কেবল অলীক উপন্যাস ও কুৎসিত নাটক পাঠে সময় ক্ষেপণ করে। যে পর্য্যন্ত না অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে সে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশে স্ত্রী শিক্ষা আশা করা যাইতে পারে না।'

কিন্তু পরবর্তী কালে তত্ত্ববোধিনী আবার বিপরীত কথা লিখেছেন। ১৮৭৮ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার গৃহীত হল। মেয়েরা উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলেন। ১৮৭৮ থেকে তিন বছরের মধ্যে পাঁচটি বাঙালি মেয়ে প্রবেশিকা ও দুটি এল, এ পাশ করে। কিন্তু 'অল্পবিদ্যা'র স্তর পার হয়ে গেলেও তত্ত্ববোধিনী লেখেন: 'আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করি না।' (চৈত্র ১৮০২ শক ৪১২ সংখ্যা)

তত্ত্ববোধিনীর মত প্রগতিশীল পত্রিকাও স্ত্রীশিক্ষা সমর্থন করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বদলে গার্হস্থ্য শিক্ষাই তাঁরা মেয়েদের পক্ষে শ্রেয় বলে মনে করেন। তত্ত্ববোধিনীর আশঙ্কা ছিল:

'বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ধর্মবিশ্বাসশূন্য সুনীতিবিচ্যুত বঙ্গীয় নারীর পুত্রগণ অর্থাৎ ভাবী বঙ্গবাসীগণ যে অত্যন্ত অবনত চরিত্র হইবে তাহা আমরা অনায়াসে বোধগম্য করিতেছি।'

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে পুরুষ-শাসিত সমাজে বিভিন্ন দিকের সংস্কার মুক্তি সত্ত্বেও সর্বতোমুখী ও নিরবচ্ছিন্ন স্ত্রী স্বাধীনতার প্রশ্নে উদারনৈতিক শিবিরেও মতভেদ থেকে গিয়েছিল। প্রগতিমুখী সমাজে এই স্ববিরোধিতা নতুন নয়। ইংলণ্ডেও নারীমুক্তির ব্যাপারে পুরুষেরা বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কার-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে এসেছে। তবু উনবিংশ শতাব্দীর সেই অচলায়তন সমাজে স্ত্রীশিক্ষার নানান সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠনই ছিল বড় কথা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষের মত নারীরও সমান অধিকার স্বীকৃত হল এবং সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও বেশ কিছু সংখ্যক নারী তার সুযোগ গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাচীর ভেঙে অন্তঃপুরের অন্ধকারে সূর্যালোক নিয়ে এল—এটাই নবজাগরণের ইতিহাসে বড় ঘটনা। এবং দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে সংবাদপত্র যে এক্ষেত্রে তার সামাজিক কর্তব্য পালন করতে পেরেছিল এটাই বড় কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র

রেনেশাঁস ও রিফরমেশন ॥ রামমোহনের ধর্মজিজ্ঞাসা ও ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় ॥ খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব ॥ ব্রাহ্মধর্মের আভ্যন্তরীণ বিবাদ ও হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সমন্বয়।

রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন রেনেশাঁসেরই ফলশ্রুতি। ইতালিতে রেনেশাঁসের ফলে পুরাতন ধর্মচেতনা 'প্যাগানিজমে' এসে পরিণতি লাভ করে। অলিম্পিয়াসের পর্বতশীর্ষ থেকে দেব-দেবীরা মর্তের ধুলায় নেমে আসেন।[১] বাংলাদেশে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ধর্মের তামসিক জড়ত্ব দূর করে মানুষের মন ও বুদ্ধিকে পরিশীলিত ও যুক্তিবাদী করে তোলে। এই পরিশীলিত, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী মনই তাকে স্বাধিকার চিন্তায় প্রণোদিত করে। জাতীয় ঐক্যবোধের অঙ্কুরটিও এই প্রগতিশীল ধর্মচেতনার ফল।

তবে বাংলাদেশের রেনেশাঁস জার্মানির মত মুখ্যত ধর্মভিত্তিক ছিল না। ইতালিতে রেনেশাঁসের আবেদন ছিল মুখ্যত হৃদয়ের কাছে, জার্মানিতে তা বুদ্ধির কাছে। In Italy the Renaissance thrills through the senses, in Germany it speaks through the intellect. Thus is it that from the first the awakening assumed in Germany a religious character.[২] জার্মানিতে এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে জার্মান জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এমনকি ১৫২৫ সালের জার্মানিতে যে কৃষক বিদ্রোহ হয় তার আংশিক কারণ ছিল অর্থনৈতিক। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায় এই বিদ্রোহ ঘোষণার মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন 'রিফরমেশন' আন্দোলন থেকে।

বাংলাদেশে ধর্মসংস্কার এত প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়নি বটে তবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যটি ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় এই লক্ষ্যের ইঙ্গিত আছে। এই পরিচ্ছেদে যথাসময়ে তার অবতারণা করব। ইউরোপে ধর্মসংস্কারের প্রবর্তনা চার্চের সঙ্গে বিরোধে। ইংলণ্ডে এই বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে অষ্টম হেনরির সময়ে। পোপ অষ্টম হেনরির বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মতি দিতে গড়িমসি করলে হেনরি পোপের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করে যান (১৫৩৪)।[৩]

বাংলাদেশে হিন্দুধর্ম খ্রীস্টানদের মত সংঘভিত্তিক ছিল না। তবে সংরক্ষণ পন্থীদের শক্তিশালী শিবির ছিল। সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে সংরক্ষণপন্থীদের সংঘর্ষ এখানেও তীব্র হয়ে উঠেছে। আর তাছাড়া সংস্কারকদের এখানে পরোধর্মের প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রভাবের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়েছে। এইসব সংঘর্ষের ফলে জাতীয় ঐক্যবোধের

সৃষ্টি হয়। সংস্কারপন্থী ও সংরক্ষণপন্থীদের মধ্যকার ব্যবধানের প্রাচীর দূর হয়ে যায়। উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে হিন্দুধর্মের মধ্যে এই উদার ও সংস্কারপন্থী আবহাওয়া বইতে শুরু করে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ধর্মসংস্কারকেরা যেমন তাঁদের ধর্মভাবনার দ্বারা স্বাদেশিকতা বোধের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তেমনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের চিন্তাধারা পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনেরও প্রেরণা যোগায়।

তবে বাইরের রাজনৈতিক ও সামাজিক আবর্তন বাংলাদেশের রিফরমেশন আন্দোলনের একমাত্র কারণ নয়। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক চিন্তানায়কদের দেশ। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা যুগে যুগে জাতির মানসলোককে প্লাবিত করেছে। জাতীয় জাগরণের শুভলগ্নেও একাধিক মনীষী আত্মগত অধ্যাত্মচিন্তায় ধ্যানস্থ হয়েছেন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের মনন ও মনীষা পুরোপুরিই অধ্যাত্মভিত্তিক—যার জন্য তাঁকে আখ্যাত করা হয়েছিল 'মহর্ষি' বলে। কেশবচন্দ্র বিবেকানন্দ তো সর্বতোভাবে সাধক। কিন্তু তাঁদের সাধনার ফলশ্রুতি শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্বের জটাজুটের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীক কল্যাণের যুক্তধারায় সার্থক পরিণতি লাভ করেছে। এর জন্য আবার দায়ী নবজাগরণ। নবজাগরণ না হলে শুধু রিফরমেশন হয়ত নিষ্ফল হত। রেনেশাঁসের সঙ্গে এই রিফরমেশন সমানতালে অগ্রসর হয়েছে। এবং উনিশ শতকের বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্রগুলি এই ধর্মসংস্কারের বাণীকে দ্রুত সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেছে।

উনিশ শতকের বাংলা দেশে ধর্মজিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয় রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার (১৮১৫) মাধ্যমে।

১৭৬৯ শকের আশ্বিন সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তত্ত্ববোধিনী লিখছেন, 'পরম শাস্ত্র প্রতিপাদ্য সনাতন ব্রহ্মোপাসনা এদেশ মধ্যে এককালে বিস্মৃত হইয়াছিল। কেবল তিনিই (রামমোহন) তাকে বিলাসের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন, নানা শাস্ত্র সন্ধান দ্বারা তাঁহার চিত্ত সংস্কৃত হইয়া হৃদয়ঙ্গম হইল যে সর্বকারণ পরব্রহ্মের উপাসনাই সত্য ধর্ম এবং কেবল তাহাই পরম পুরুষার্থের একমাত্র কারণ। এই পরম ধর্মকে তিনি একান্তচিত্তে অবলম্বন করিলেন ও স্বদেশীয় মনুষ্যকে আত্মজ্ঞানদ্বারা তৃপ্ত করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। কিন্তু অনেককাল পর্যন্ত ধনসাধনাদি বিষয় ব্যাপারে আবৃত নানাস্থানে তাঁহার অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল, আপনার প্রিয় কার্যে বহুদিবস মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পরন্তু ১৭৩৫ শকে রঙপুর হইতে তিনি কলিকাতা নগরে আগমনপূর্ব্বক বিচার দ্বারা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা রূপ সত্য ধর্ম স্থাপনে অত্যন্ত উদযোগী হইলেন। তৎকালে স্বদেশস্থ লোকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, রাজা পীতাম্বর মিত্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, গোপীনাথ মুনসী, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচন্দ্র রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার নিকট

সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন, এবং তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিতেন। কিন্তু রাজা পৌত্তলিক ধর্ম্মের অনাদরপূর্ব্বক যখন সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন অনেকেই তাঁহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও আলাপাদি পরিত্যাগ করিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীকিঙ্কর ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ মুনসীর সহিত তাঁহার হৃদ্যতা স্থিরতর রহিল। ১৮৩৭ শকে রাজা মানিকতলার উদ্যানগৃহে আত্মীয় সভা স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্ত্ত হইয়া তাঁহার ষষ্ঠীতলার বাটীতে সভা হইত, তদনন্তর কতকদিবস তাঁহার সিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মানিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল।'

আত্মীয় সভাতে সন্ধ্যাবেলা করে বেদপাঠ হত। ব্রহ্মসঙ্গীত হত। কিন্তু বেদ ব্যাখ্যার নিয়ম প্রচলিত হয়নি। রামমোহনের শিক্ষক অধ্যাপক শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করতেন ও গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত করতেন। উপস্থিত থাকতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু ও মদনমোহন মজুমদার প্রমুখেরা। তাঁরা রাজার ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই ধর্মাদর্শ হল, 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম'। এই ধর্মাদর্শ মূর্তিপূজার বিরোধী—এই ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয় এবং নিরাকার। তিনি সর্বত্রব্যাপী এবং আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর। আত্মীয় সভার নানান সামাজিক সমস্যার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মচিন্তা সদস্যদের মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অর্থহীন প্রথার নিগড়ে বাঁধা হিন্দু সমাজ তাঁদের সামনে এক দুর্লঙ্ঘ্য অচলায়তন বলে প্রতিভাত হয়েছিল।

যে সমাজ সেদিন ধর্মের নামে জীবন্ত নারীকে জ্বলন্ত চিতায় ফেলে দেয়, বালিকা বিধবাকে একাদশীতে নির্জলা উপবাস করিয়ে রাখে, মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন বৃদ্ধকে মোক্ষলাভের আশায় নদী তীরে ফেলে রাখে, যে সমাজে অস্পৃশ্যতা, বর্ণভেদ প্রবল, মা ধর্মের নামে সাগরে নিজের সন্তানকে বিসর্জন দেয়, সেই সমাজে একেশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতা-বিরোধী ধর্মভাবনার প্রচার নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। তাই সমাজে এ নিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে এই ধর্মচিন্তার অনুসারী ব্যক্তিরা যেখানে অজ্ঞাতকুলশীল কেউ ছিলেন না। সুতরাং রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের স্বেচ্ছাচারী ও নাস্তিক অপবাদ শুনতে হয়েছে। এমনকি শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সিংহ যিনি পূর্বে রাজার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন, "তিনিও তাঁহার দ্বেষী হইয়া এমত অসত্য অপবাদ প্রচার করিতেন যে আত্মীয় সভাতে গোহত্যা হইয়া থাকে"।[৪]

উনিশ শতকে প্রগতিশীল ধর্মসংস্কার আন্দোলনের এইভাবেই সূত্রপাত। রামমোহনের এই ধর্মভাবনাই পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ এই ব্রাহ্মধর্মপ্লাবিত পলিমাটিতেই সুদৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। ব্রাহ্মধর্ম একদিকে যেমন খ্রীস্টান ধর্মের প্লাবন থেকে হিন্দু

সমাজকে রক্ষা করেছে, অন্যদিকে হিন্দু সমাজকেও কুসংস্কার ও জড়তার মোহ মুক্ত করে তার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ঘটিয়েছে।

১৭৫০ শকের ভাদ্রমাসে (১৮২৮) চিৎপুরে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়।[৫]

ব্রাহ্ম বলতে কোন স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়ের কথা তখনও চিন্তায় আনা হয় নি। জাতিধর্ম নির্বিশেষে একেশ্বরবাদী নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় বিশ্বাসীদের কাছে ব্রাহ্মসমাজ এক মিলন মন্দির হিসাবেই স্থাপিত হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের দানপত্রে লেখা ছিল: "যে কোন প্রকার লোক হউক না কেন, যাহারা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া পবিত্র ও নম্রভাবে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপাতা অকৃত, অমৃত অগম্য পুরুষের উপাসনার অভিলাষ করে, তাহাদের সমাগমের জন্য এই সমাজগৃহ সংস্থাপিত হইল। যেকোন লোক বা যে কোন সম্প্রদায়, নামরূপ বিশিষ্ট যে কিছু পরিমিতি পদার্থের উপাসনা করে, এখানে তাহার উপাসনা হইবেক না…যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপাতা পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্মপ্রীতি পবিত্রতা, সাধু ভাবের সঞ্চার হয়, যাহাতে সকল ধর্মের লোকদিগের মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধন হয়— উপাসনার সময় এইপ্রকার বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র, গান ভিন্ন আর কোন প্রকার ব্যবহৃত হইবে না।"[৬]

রামমোহনের অনুগামীদের মধ্যে অনেকে তাঁকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু যাঁরা তাঁর এই নতুন ধর্মভাবনার অনুবর্তী হয়েছিলেন তাঁদের গুরুত্বও কম ছিল না। তাঁদের মধ্যে টাকীর জমিদার কালীনাথ চৌধুরী, রামকৃষ্ণপুরের মথুরানাথ মল্লিক ও কলকাতার শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ ও তেলিনীপাড়ার শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন।[৭]

অবশ্য এরা সকলেই যে ঘোরতর পৌত্তলিক-বিরোধী ছিলেন তা নয়। প্রসঙ্গত দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা বলা যায়। রামমোহনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সত্ত্বেও তাঁর বাড়িতে যথারীতি মূর্তিপূজা অব্যাহত ছিল। রামমোহনের ধর্মাদর্শ অপেক্ষা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ আরও গভীর ছিল এবং ধর্মসংস্কারের বাহিরেও রামমোহন যে সমাজ-সংস্কার ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন (মুখ্যত সতীদাহ রদ) তাঁরা সেদিকটাতেই বেশি করে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে রামমোহন তাঁর অনুগামীদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে যে পুরোপুরি স্বধর্মে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এমনকি প্রোটেসটান্ট মিশনারি উইলিয়ম অ্যাডামকে তিনি ইউনেটেরিয়ান মতবাদে আকৃষ্ট করান। অ্যাডাম 'বেঙ্গল হরকরা' কাগজের ওপরের তলায় সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যাবেলা ধর্মোপদেশ দিতেন। রামমোহন সেই উপদেশ শুনতে যেতেন। একদিন এই উপদেশ শুনে ফেরার পথে তাঁর অনুগামীরা বলেন, "বিদেশী লোকের ধর্মযাজন গৃহে যাইয়া আমারদিগের উপদেশ শুনিতে হয়, আমারদিগের এমত কোন সাধারণ স্থান নাই যে তথায় বেদ অধ্যয়ন বা অন্য

প্রকার পরমার্থ প্রসঙ্গ হয়, ইহা অতি অসুখের কারণ। এই মহৎ প্রস্তাবেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূত্র হইল।"[৮]

১৭৫১ শকের ১১ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের নতুন গৃহে উপাসনা শুরু হয়।[৯]

রামমোহনের এই ধর্মচিন্তা ও তার পরিণতি হিসাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্রে যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল।

সমাচার দর্পন রামমোহনের বেদান্ত আলোচনা সভার প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করতেন। যেমন ১৮১৯ সালের ২২ মে সমাচার দর্পণ লিখছেন,

'বেদান্তমত—৯মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনাদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি, যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতী স্ত্রীর স্বামী মরণান্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কালক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদ হইতে আপনাদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তে মতানুসারে গীত গাইলেন।"

১২ জুন ১৮১৯ তারিখের সমাচার দর্পণের আর একটি খবর :

"বৈদান্তিক ৩০ মে তারিখে মোং খিদিরপুরে দেওয়ান মতিচাঁদের ঘরেতে অনেক বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন ও সকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচনা ও প্রশংসা করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন। ঐ তারিখে ঐ স্থানে যত বৈদান্তিক লোক একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কখনও অন্যত্র একত্র হন নাই।"

এই সমস্ত সংবাদ বিনা মন্তব্য ব্যতিরেকেই সমাচার দর্পন প্রকাশ করে। তার ফলে রামমোহনের নতুন ধর্মচিন্তার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সমাচার দর্পণকে যে সে যুগের বিদ্বৎসমাজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ রামমোহনের সঙ্গে এই পত্রিকার বিরোধ। ১৮২১ সালের ১৪ জুলাই দর্পণে জনৈক পত্রলেখক হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা সম্পর্কে যে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছিলেন, রামমোহন তার উত্তর দেওয়া যথাকর্তব্য বলে মনে করেন। রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে সে প্রশ্নের উত্তর দিলে দর্পন তা প্রকাশ করেন নি। রামমোহন তখন ব্রাহ্মণ সেবধি (Brahmunical Magazine) প্রকাশ করে সে উত্তর প্রকাশ করেন।

চিৎপুরে ব্রাহ্মসমাজের নতুন গৃহের উদ্বোধন হবার খবর ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। সমাচার দর্পন ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে খবরটি উদ্ধৃত করেন।

চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্মশালা—"গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কএক জন গুনশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

তাহার এষ্টদীড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে এষ্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তাঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোক সকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন। ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সরহদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন—তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না এবং যে ধর্ম্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম্ম যাহাতে জন্মে এতদ্ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং এষ্টিরা তত্রত্যারাধনার্থে একজন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং ঐ স্থানে প্রতিদিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে একদিন আরাধনা হইবে।" (১৬ জানুয়ারি, ১৮৩০)

রামমোহন ১৮১৫ সালে বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার প্রকাশ করেন।[১০] এই বছরই বেদান্তসারের একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় –**Translation of an Abridgement of the Vedant**। বেদান্তসার গ্রন্থে রামমোহন বিভিন্ন উপনিষৎ-এর বচন উদ্ধৃত করে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ব্রহ্ম অবাঙ মানস গোচর, শব্দাতীত ও স্পর্শাতীত।[১১] God is without figure, epithet, definition, and description. The supreme spirit is unchangeable.[১২]

রামমোহনের এই ধর্মীয় মতবাদে খ্রীস্টান মিশনারিরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, রামমোহনের এই চিন্তাধারা ভারতে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারে সহায়ক হবে। "If he can introduce it among his countrymen, it will be a great step taken towards advancing the cause of Christianity in the East."[১৩]

রামমোহন সম্পর্কে ১৮১৬ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটি লিখেছিলেন, রামমোহন শ্রীরামপুর মিশনে এসেছিলেন এবং মিশনারিদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে হিন্দু অবতার কৃষ্ণের প্রসঙ্গ ওঠে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে ননী চুরি করে খাওয়া সম্পর্কে রামমোহন নাকি মন্তব্য করেছিলেন, The sweeper of my house would not do such an act and can I worship a God sunk lower than the man who is a menial servant?[১৪] রামমোহন তাঁদের মতে 'a simple theist admires Jesus Christ but knows not his need of the atonement.'[১৫] এমনকি ১৮১৬ সালে চার্চ অব ইংলণ্ডের মিশনারি রেজিস্টারে একথা লেখা হয়েছিল যে রামমোহন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে অনেক বন্ধু সহ ইংলণ্ডে চলে আসবেন ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন।[১৬]

১৮১৬ সালে রামমোহন তাঁর বন্ধু ডিগবিকে একটি চিঠিতে লিখছেন: The consequence of my long and un-interrupted researches into

religious truth has been that I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of national beings than any others which have come to my knowledge ; and have also found Hindus in general more superstitious and miserable, both in performance of their religious rites and in their domestic concerns, than the rest of the known religious on the Earth.[১৭]

কিন্তু ৮২১ সালে সমাচার দর্পণের প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে রামমোহনের সঙ্গে খ্রীস্টান মিশনারিদের বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

রামমোহন ত্রিতত্ত্ববাদী খ্রীস্টান ধর্মমতকে (Trinitarianism) যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেন এবং ঐক্যবাদী খ্রীস্টান মতকে (Unitarianism) প্রতিষ্ঠিত করেন।[১৮] তাঁরই সংস্পর্শে এসে অ্যাডাম ইউনেটেরিয়ান ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হন।

কিন্তু রামমোহন একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের প্রতি খ্রীস্টান মিশনারিদের আক্রমণ সহ্য করতে পারেননি অন্যদিকে তেমনি খ্রীস্টান পাদ্রীদের প্রচারিত খ্রীস্টের অবতারত্বকেও বরদাস্ত করতে পারেননি। ১৮২০ সালে রামমোহন যীশুর বাণীর একটি সটীক সংস্করণ (The Precepts of Jesus : The Guide to Peace and Happiness extracted from the Books of the New Testament ascribed to the Four Evangelists-প্রকাশ করলে খ্রীস্টান সমাজ রামমোহনের বিরোধী হয়ে ওঠে।[১৯] খ্রীস্টান পাদরিরা খ্রীস্টতত্ত্ব, ইহলোক, পরলোক, স্বর্গ, নরক, পাপপুণ্য প্রভৃতি নানা বিষয়কে ঈশ্বর-উপাসনার অঙ্গ হিসাবে দেখতেন।

এই আচারসর্বস্ব ইনস্টিটিউশন বা প্রতিষ্ঠান থেকে খ্রীস্টধর্মকে উদ্ধার করে তাকে খ্রীস্টের বিশুদ্ধ বাণীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল Precepts রচনার উদ্দেশ্য।[২০]

এই Precepts প্রকাশিত হলে Friend of India তে মার্শম্যান এই গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করেন। মার্শম্যান লিখেছিলেন, যীশুখ্রীস্টের অবতারত্ব উপলব্ধি করার মত শক্তি রামমোহনের মত হিদেনের নেই।[২১] রামমোহনকে এরপর খ্রীস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হতে হয়। তিনি Precepts-এর দুটি appeal প্রকাশ করেন। প্রথম অ্যাপীল ১৮২০ ও দ্বিতীয় অ্যাপীল ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়।

বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করে রামমোহন গোঁড়া হিন্দুদের চটিয়েছিলেন। সহমরণ সম্পর্কে তার প্রবর্তক নিবর্তকের সম্বাদ ১৮১৯ প্রকাশিত হলে রক্ষণপন্থীরা বিচলিত বোধ করেন। আবার Precepts প্রকাশের পর খ্রীস্টান পাদ্রীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। রামমোহন লণ্ডনে ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কাছে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন, "হিন্দু ও ব্রাহ্মণেরা আমার বিরোধী হয়ে উঠেছেন। খ্রীস্টানেরা বিরোধী হয়েছেন আরও বেশী।" "In the first instance, the

Hindoos and the Brahmins to whom I am related, are all hostile to the cause, and even many Christians there are more hostile to our common cause than the Hindoos and the Brahmins.[২৫]

উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পক্ষে এই পটভূমিটুকু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও খ্রীস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে রামমোহন ও পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীদের তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। প্রগতিশীল ধর্মসংস্কার আন্দোলনে যে সমস্ত বাংলা পত্রপত্রিকা সহায়তা করেছিলেন তাঁদের এই দুই প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধেই কলম ধরতে হয়েছে।

রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করে খ্রীস্টানদের যেমন হতাশ করেছিলেন তেমনি রক্ষণশীলদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সমাচার চন্দ্রিকায় প্রায়ই নানান বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হত। সমাজের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে নাকি যবনেরা বাদ্য বাজাত। এই অভিযোগ চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হলে সম্বাদ কৌমুদীতে এক পত্রদাতা তা লিখছেন, রাসযাত্রা দুর্গোৎসবে যখন যবনী নর্তকীরা নৃত্য করে তখন হিন্দুসমাজ তো তাতে দোষ দেখেন না? নীচে পত্রটি হুবহু তুলে দিলাম।

"শ্রীযুত যথার্থবাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। চন্দ্রিকা প্রকাশকের কি বুদ্ধিপ্রকাশ তাহা লিপিদ্বারা প্রকাশকরণে অসমর্থ যেহেতুক কএক নূতন অনুমানের সৃষ্টি করিয়াছেন যে পূর্ব ২ গ্রন্থকারেরা ধূম দৃষ্টি করত অগ্নির অনুমান এবম্প্রকারাদির পরিবর্ত্তে তবলার চাটীর শব্দগ্রহণে যবনকারণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন যে হউক এবম্ভূতানুমানে চন্দ্রিকাকার ধন্যানুমানী হইতে পারেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রের বিপর্যয়ানুমানে অনুমান করি যে চন্দ্রিকাকারের পূর্বনিবাস সেখপাড়া প্রযুক্ত পূর্বস্থান সর্বদাই স্মরণ হয় যেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদপাঠাদি শ্রবণে ব্রাহ্মণের দোষ অব্রাহ্মণেই কহিয়া থাকে এবং শাস্ত্রে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দা অনেকেই করিবেন অতএব এই দুইমতে চন্দ্রিকাকার নির্দোষী স্তবে পাঠানন্তর ঈশ্বর বিষয়ক গীতোপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম যে দোষানুভব করিয়াছেন তাহাতে কেবল মহাভারতীয় 'রাজনসর্ষপমাত্রানি পরচ্ছিদ্রানি পশ্যতি। আত্মনোবিল্বমাত্রানি পশ্যন্নপি নপশ্যতি' এই শ্লোক স্মরণ হইল কেননা দুর্গোৎসব রাসযাত্রা প্রভৃতিতে যবনীয় নৃত্যগীতাদি এবং ইংরেজের মদ্যমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন না বরঞ্চ তৎপক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন যে উর্বশী প্রভৃতির নৃত্যাদি এবং মদ্যমাংসকে পুষ্পচন্দন বোধ করেন কেবল ব্রাহ্মসমাজের দোষ সর্বদা দেখিয়া থাকেন একি আশ্চর্য যদিস্যাৎ বেদ পাঠানন্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে তাহাতে দ্বেষপ্রযুক্ত কিম্বা শাস্ত্রমতে দোষ স্থির করিয়াছেন অনুমান করি শাস্ত্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান নীচস্পর্শে দোষাভাব লিখিয়াছেন।"
(সম্বাদ কৌমুদী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০)

রামমোহন ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর ইংলণ্ড যাত্রা করেন। দেশবাসীর কাছ

থেকে এটাই তাঁর চিরবিদায়। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বিলাত যাত্রার পর প্রগতিশীল শিবিরে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনেও ভাঁটা পড়ে। "তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে সমাজ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। যাঁহারা অর্থ দিয়া আনুকূল্য করিতেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই স্বীয় স্বীয় দাতব্য রহিত করিলেন, কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল প্রতিমাসে প্রথম ৬০ টাকা, পরে ৮০ টাকা করিয়া দিতেন, তাহাতেই সমাজের ব্যয় নির্বাহিত হইত। অত্যল্প লোক প্রতি বুধবারে সমাজে উপস্থিত হইতেন, পরিশেষে এমন হইল যে কেবল ১০।১২ জন করিয়া উপস্থিত থাকিতেন। তথাপি তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয় প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত সমাজ যে জীবিত ছিল, তাহা কেবল শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে।"[২৩]

১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর রবিবার তত্ত্ববোধিনী সভার জন্ম। ১৮৪৩ সালের আগস্ট মাস থেকে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।

সতীদাহ প্রথা রদের বিরুদ্ধে সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজকে সুসংহত করার জন্য রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ১৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪]

একদিকে প্রগতিশীল শিবিরে নেতৃত্বের অভাব অন্যদিকে ধর্মসভার নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াপন্থার প্রতি অন্ধ সমর্থন এই উভয়ের ফলে ত্রিশদশকে বাংলাদেশে খ্রীস্টান মিশনারিরা প্রবল হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ডিরোজিওর নেতৃত্বে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা অর্থহীন আচার-সর্বস্ব হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হিন্দুসমাজের বর্ষীয়ান নেতাদের আচরণ দেখে মানবতামন্ত্রে দীক্ষিত নব্য শিক্ষিত যুবকদের মননে ও মনীষায় প্রচণ্ডভাবে আস্থার সঙ্কট দেখা দেয়। রামমোহনের মত ইয়ংবেঙ্গলরাও পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন এবং হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও চন্দ্রশেখর দেব প্রমুখেরা হিন্দুশাস্ত্র চর্চাও করেছিলেন।[২৫] তবু রামমোহনের সঙ্গে ইয়ংবেঙ্গল দলের ধর্মমতের পার্থক্যটুকু ব্যাপক ছিল। রামমোহন পৌত্তলিক-বিরোধী হয়েছিলেন বেদকে স্বীকার করে। কিন্তু ইয়ংবেঙ্গলদের পৌত্তলিক বিরোধিতার পিছনে এমন কোন বিকল্প আধ্যাত্মিক ভাবনা কাজ করেনি। "Both of them speculatively, reject idolatry, one on the alleged authority of the Vedas and the other solely." (India Gazette, October 25, 1831)

তাঁরা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ বেন্থামের রাজনৈতিক মত, অ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক মত, বেকন, হিউম, টমাস পেইনের যুক্তিবাদী দার্শনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হন। 'ডিরোজিওর শিষ্যগণ হেতুবাদ ও বিবেকের দ্বারা চালিত হইয়া এবং

ফরাসী বিপ্লবের রক্তরঙিন পতাকার ছায়াতলে দাঁড়াইয়া জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।'[২৬]

তবে ইয়ংবেঙ্গলদের চিন্তাধারা হিন্দু অধ্যাত্ম ভাবনার বিরোধী হলেও তাঁরা যে নাস্তিক এবং নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। ডিরোজিও নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী একথা কখনও বলেন নি।[২৭]

বরং তাঁদের ধর্মভাবনা অনেকখানি ইউনেটেরিয়ান খ্রীস্টান তত্ত্বের অনুগামী ছিল। সমসাময়িক ইংরাজী সংবাদপত্র বেঙ্গল হরকরা লিখছেন, "We believe that the Ultra-Radicals reject entirely the Hindoo creed and while they profess Pure Deism or the belief in one God are inclined to lend a favourable ear to the arguments in support of Christianity. Their religious opinions indeed are very little opposed to those of the Unitarian." (Oct. 16, 1831)

রামমোহনও প্রথমে এই ইউনেটেরিয়ান মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে ইউনেটেরিয়ান মতবাদ থেকে বেদান্তাশ্রয়ী ধর্মমতে উত্তরণ তাঁর পক্ষে সহজে সম্ভব হয়েছিল। কারণ তাঁর প্রজ্ঞা সুপরিণত, নানান শাস্ত্র অধ্যয়নে মনন পরিশীলিত। তা বাদে তাঁর সমগ্র চিন্তা গড়ে উঠেছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে কেন্দ্র করে। রামমোহনের এই অন্তর্মুখী ধর্ম আন্দোলন অপরিণত বয়স্ক ইয়ংবেঙ্গলকে আকৃষ্ট করতে পারে নি।

১৮৩১ সালে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে ইয়ংবেঙ্গল দলের ব্যক্তিগত অত্যুগ্র আচরণের তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁরা পরিচিত হন 'আলট্রা র‍্যাডিকাল' বলে। এর উত্তরে ইয়ংবেঙ্গলদল এনকোয়ারার পত্রিকায় তাঁদের যে বক্তব্য রাখেন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্টই বোঝা যায়। হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্ব মতবাদ ও কুসংস্কার থেকে তরুণ সমাজকে বার করে নিয়ে আসাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।"...Our purpose is to ideal with the rising generation, and that we do not consider the loss of our influence over the orthodox (we mean persons that have forty or fifty year been continually wrapt up in prejudice) as of any Consequence." Enquirer (Quoted in India Gazettee, Oct. 20, 1801.)

ওই প্রবন্ধটিতে এনকোয়ারার আরও বলেছেন, ইয়ংবেঙ্গলদলের কয়েকজন সদস্য জনৈক হিন্দুর বাড়িতে গোমাংস নিক্ষেপ করেছেন। ইয়ংবেঙ্গলদল এই ঘটনার যথোচিত নিন্দা করেছেন এবং বলেন তাঁরা এর জন্য অনুতপ্ত। ('We have perceived our guilt and have corrected ourselves.' তাঁরা একথাও বলেন যে, We are always ready to acknowledge our faults when pointed out satisfactorily.

ইয়ংবেঙ্গলদলের অভিযোগ ছিল তাঁরা মডারেটদের সঙ্গে সহযোগিতাই করতে চান কিন্তু মডারেটরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। মডারেটরা থিয়েটার স্থাপন করবেন জেনে তাঁরা সেই প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে রাজি।[২৮] এমনকি লিবারেলদের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজ ও তাঁদের পত্রপত্রিকাগুলির জেহাদ ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে মডারেটদের রাজনৈতিক মিলন সম্ভব। যদি লিবারেলদের ওপর মডারেটরা আর বিদ্বেষ পোষণ না করেন, যদি দীর্ঘদিনের অধঃপতনের ফলে আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ না ঘটে থাকে এবং যদি একজন হিন্দু একজন ব্রিটিশের সমান মর্যাদাসম্পন্ন বলে গণ্য হয় তাহলে এদেশের লোকদের রাজনৈতিক উন্নতি শুধু ভারতবাসীর নিজেদের ওপরই নির্ভর করবে। "If such a junction be for the advantage of everybody politics may be considered obstracted from religion—if the pshysical strictures upon us all out to be removed—if we be lively to all that we suffer—if our senses have not altogether been callous through long degradation—if those sparks which mark the dignity of human nature be also found in us—if heaven in his gifts have not been sparing to us—if a Hindoo born be equal in his natural State to a British born. What soul that is capable of reflection will not appreciate us when we say that the political improvement of the natives depends upon their own energies. They have only to make known their cases exaggeration and then their English rulers will attend to hear and render their hardships."[২৯]

কিন্তু এই সহযোগিতার আহ্বানে রক্ষণশীল হিন্দু এবং মডারেট ব্রাহ্মরা যে সাড়া দিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যদি সংরক্ষণশীল হিন্দু ধৈর্য, যুক্তি ও উদারতার দ্বারা ইয়ংবেঙ্গলদের বিদ্রোহের মূল অনুসন্ধান করতেন তাহলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণার প্রাচীর হয়ত এত তীব্র হত না। এই সংঘর্ষে সমাচার চন্দ্রিকা, প্রভাকর ও সংবাদ তিমির নামক এই তিনটি বাংলা পত্রিকার আক্রমণে ইয়ংবেঙ্গলদল ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের মুখপত্র The Enquirer লিখেছিলেন, "The orthodox looks upon the hetrodox with anger, with malice—with hatred. The Brambin curses all that stab his interests, and exercises his influence in creating violent oppositions against the opostates from prejudice. Heart burning jeolousy is thus entertained against the liberal and persecution comes to be the effects. All these flame is against fanned by the Bengalee Press. The Chundrika, the Prabhakar, the Timirnashak aim their bellery against liberalism, and pursue

all enemies to Hindooism to extremes. Abuses, invectives, slandars and every epithet which the native language pregnant, as it is with indecent vulgarism, is found to contain and which genius incurred to indecencies can invent, are heaped against the heretic with freedom."[৩০]

ইয়ংবেঙ্গল দল সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমাজ ও ধর্ম যেখানে অবিচ্ছেদ্য সেখানে সমাজ-সংস্কার অর্থেই ধর্মসংস্কার। কিন্তু ইয়ংবেঙ্গলদের কোন ধর্মৈষণা ছিল না, আধ্যাত্মিক চিন্তা ছিল না। হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল কিন্তু কোন বিকল্প অস্তিবাচক ধর্মচিন্তা তাঁদের মনকে অধিকার করেনি। বরং "যে কোন ধর্মের প্রতি তাহাদের চিত্ততলে প্রচুর ঘৃণা সঞ্চিত হইতেছিল।"[৩১] তাদের এই আধ্যাত্মিক শূন্যতাই খ্রীস্টান মিশনারি ডাফকে তরুণ সমাজের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে উৎসাহিত করেছিল। ডাফের জীবনীকার প্যাটন ইয়ংবেঙ্গলদলের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখছেন;

"He and his friends were reformers, but they knew themselves to have nothing to give in place of that which they were resolved to demolish. They believed Hindooism false, but what was true they knew not."[৩২]

খ্রীস্টান মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ সালের ২৭ মে সস্ত্রীক কলকাতায় এসে পৌঁছেছিলেন। কলকাতায় এসে তাঁর রামমোহনের সঙ্গে সৌহার্দ্য হয়। বাড়ির ব্রাহ্মসভার পুরনো উপাসনা গৃহটি রামমোহন ডাফকে ছেড়ে দেন। কারণ ওখান থেকে ব্রাহ্মসভা নব নির্মিত বাড়িতে উঠে যাওয়ায় বাড়িটি খালি হয়েছিল।[৩৩] রামমোহন স্কুলের কিছু ছেলেও যোগাড় করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ডাফের উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয় তরুণদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা। তাঁর লক্ষ্য হিন্দু কলেজ। ইয়ংবেঙ্গলদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। ডাফ তাঁদের পৌত্তলিকতা-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগান। ডাফ বলেছেন:

"We rejoiced when we came in contact with a rising body of Indians who had learnt to think and to discuss all subjects with unshackled freedom, though that freedom was ever apt to degenerate into license in attempting to demolish the claims and pretensions of the Christian as well as of every other professedly revealed faith, we hailed the circumstance, as indicating the approach of a period for which we had waited and longed and prayed. We hailed it as heralding the dawn of an auspicious era—an era that introduced something new into

the hitherto undistributed reign of a hoory and tyrannous antiquity."[৩৪]

ডাফ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জন্য বিশেষ বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বক্তৃতাটি হয় তাঁর বাড়িতে। বক্তৃতা দেন তাঁর সহকর্মী জেমস হিল। ২০ জন তরুণ সেই বক্তৃতা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই হিন্দু কলেজের ছাত্র।[৩৫]

ডাফ ও তাঁর সহকর্মীদের বক্তৃতার ফলে হিন্দুসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জনমত তাঁদের এত বিরোধী হয়ে ওঠে যে স্বয়ং বেন্টিঙ্ক ডাফকে পরামর্শ দেন ডাফ যেন কিছুকাল বক্তৃতা স্থগিত রাখেন।[৩৬]

ডাফের বক্তৃতা যে ইয়ংবেঙ্গল দলের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল তা এনকোয়ারার পত্রিকায় ডাফের বক্তৃতার সমালোচনা পড়ে মনে হয় না। বরং এনকোয়ারার ডাফের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যে কোন ব্যক্তির নৈতিক ত্রুটিবিচ্যুতি এবং মস্তিষ্কের অকর্মণ্যতা খ্রীস্টান নামের মহিমাতেই ঢেকে যাবে এ কেমন কথা? আর যারা সত্যকে—সত্য ছাড়া আর কোন কিছুকে নয়, আঁকড়ে ধরে আছেন, যাঁরা কঠোর নীতি মেনে চলছেন, পাপকে আবর্জনার বোঝার মত পরিহার করছেন, তাঁরা খ্রীস্টান নয় বলে এই অপরাধে অবহেলিত থাকবেন এও বা কেমন?[৩৭] কিন্তু এই অবিশ্বাস ও সন্দেহকে ডাফ কিছু পরিমাণে নিরসন করতে পেরেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল দলের কেউ কেউও মানসিক দিক দিয়ে একটি অবলম্বন খুঁজছিলেন। মহেশচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন, তিনি খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে এতদিন সংগ্রাম করেছিলেন। 'In spite of myself I became Christian.'[৩৮]

এর কয়েকমাস পরে ১৮৩২ সালের অক্টোবরে কৃষ্ণমোহন খ্রীস্টান হন। ডিসেম্বরে হন গোপীনাথ নন্দী। এঁরা তিনজনেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। ১৮৩৮ সালের মধ্যে হিন্দু কলেজের দশজন ছাত্র খ্রীস্টান হয়েছিলেন। বাকীরা হলেন কালীকুমার ঘোষ, রসিকচন্দ্র পালিত, চণ্ডীচরণ আঢ্য, জয়গোপাল দত্ত, গোপালচন্দ্র মিত্র, দ্বারকানাথ ব্যানার্জী ও বেণীমাধব মজুমদার।[৩৯]

ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত দেশীয়দের খ্রীস্টান করতেন। কিন্তু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তকরণ এই প্রথম। এরপরে ১৮৪৩ সালের ২ জুলাই লালবিহারী দে খ্রীস্টান হন। ১৮৪৩ সলের ৯ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন খ্রীস্টান হন। ১৮৫১ সালের ১০ জুলাই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছেলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীস্টান হন।[৪০]

১৮৩১ সালে ডিরোজিওর বিরুদ্ধে নাস্তিকতা শিক্ষার অভিযোগেই বহু অভিভাবক হিন্দু কলেজ থেকে ছাত্রদের সরিয়ে নিয়ে আসেন। এই অভিযোগেই ডিরোজিওর পদচ্যুতি (২৫ এপ্রিল, ১৮৩১)। ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ওই বছরের ২৬ ডিসেম্বর।

সুতরাং এই অবস্থায় সামাজিক আবর্ত যে ভয়াবহ আকার ধারণ করবে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

১৮৩০ সালে যে ধর্মান্তরের পালা শুরু হয়েছিল তা পরবর্তীকালে তিনদশক ধরে অব্যাহত থাকে। ত্রিশের দশকে খ্রীস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছিলেন মুখ্যত দুটি বাংলা পত্রিকা—সংবাদ প্রভাকর ও সমাচার চন্দ্রিকা। চল্লিশের দশকে এসে তত্ত্ববোধিনী ও বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রমুখ পত্রিকায় খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের ছলাকৌশল সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করে তীব্র জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা হয়।

১৮৪৫ সালে উমেশচন্দ্র সরকার ও তাঁর নাবালিকা স্ত্রীকে আলেকজাণ্ডার ডাফ খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। উমেশচন্দ্রের বাবা গঙ্গাধর সরকার। তাঁর দাদা রাজেন্দ্রনাথ সরকার ঠাকুর পরিবারের বাণিজ্য হাউসে সরকার ছিলেন। উমেশচন্দ্র ডাফের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। দীক্ষা নেবার জন্য সরকার-দম্পতি ডাফের বাড়িতে চলে আসেন। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উমেশচন্দ্রের বাবা আদালতের আশ্রয় নিয়ে ছেলেকে উদ্ধার করতে যান। কিন্তু ছেলের বয়স ১৮ বছর বলে আদালত রায় দেওয়ায় রিট দরখাস্তের আবেদন অগ্রাহ্য হয়। জনতা এসে ডাফের বাড়ির বাইরে ভাঙচুর করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁদের দীক্ষা দেওয়া হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের কোন দম্পতির খ্রীস্টধর্মে দীক্ষার ঘটনা সেই সর্বপ্রথম। বাংলা সংবাদপত্র তত্ত্ববোধিনী এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ১৭৬৭ শকের ১ জ্যৈষ্ঠ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনীর রিপোর্টে বলা হয় উমেশের বয়স ১৪, তার স্ত্রীর বয়স ১১। উমেশ ছ বছর ডাফ সাহেবের স্কুলে পড়েছে বটে কিন্তু খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা জাগেনি। উমেশ খ্রীস্টান হতে সস্ত্রীক ডাফের বাড়ি গেছে শুনে তার-অভিভাবকেরা তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আনতে চান। কিন্তু উমেশ রাজি হন না। অভিভাবকেরা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করেন কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তখন রাজেন্দ্র সরকার ডাফকে অনুরোধ করেন, আজ উমেশকে খ্রীস্টান করবেন না, আমরা আপীল করব। ডাফ শোনেন না। রাজেন্দ্র তখন উমেশের সঙ্গে দেখা করেন। উমেশ নাকি বলেন যে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁর কৃতকর্মের জন্য তিনি অনুতপ্ত। রাজেন্দ্র যা বলবেন তাই তিনি করবেন। রাজেন্দ্র তাঁকে বলেন যে তুমি সাতদিন অন্য জায়গায় গিয়ে থাকো। আমি আগামীকাল একজন উকিলকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু সেদিন বিকেল চারটের সময় সস্ত্রীক উমেশচন্দ্রের দীক্ষা হয়ে যায়।

রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনীর প্রথম পৃষ্ঠায়। এই ঘটনার ওপর তত্ত্ববোধিনী একটি সম্পাদকীয় লেখেন। এ সম্পাদকীয়ের ভাষা কঠোর, বক্তব্য নির্মম।

"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারদিগের চৈতন্য হয় না?

আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব ? ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমারদিগের হিন্দু নাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল। মিশনারিদিগের দৌরাত্ম্য এ পর্যন্ত সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সহিষ্ণুতার সীমার বহির্ভূত হইতেছে। পূর্বাবধি তাহারা কেবল কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহার সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকলকে মিশ্রিত করিতেছে। ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক এবং ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা ধর্মবিষয়ে কি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় ? ইহারদিগের ধর্মচ্যুত করা কি ন্যায়যুক্ত ব্যবহার হইতে পারে ? অন্য বিষয়ে কেহ উপদ্রব করিলে রাজ নিয়মদ্বারা শাসন হয়, কিন্তু এ উপদ্রবের সম্যক শাসন নাই।"

তত্ত্ববোধিনী ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্পষ্টই বলেন,

"অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতিকর, তবে মিশনারিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ, তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রাদিকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও, এবং যাহাতে স্ফূর্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর।"

তত্ত্ববোধিনী লেখেন, খ্রীস্টানেরা এদেশে এসে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা করছে অথচ এদেশের দরিদ্র সন্তানদের অধ্যাপনার জন্য একটিও ভাল দেশীয় পাঠশালা নেই। সকলে একত্র হলে কি একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হতে পারে না। "যদিও স্বদেশস্থ লোকের মধ্যে কোন বিষয়ে পরস্পর অনৈক্য থাকে তথাপি এ সাধারণ বিষয়ে কাহার না ঐক্য হইবে ? পরস্পর ভ্রাতার মধ্যে কোন অংশে অপ্রণয় থাকিলেও ভিন্ন গ্রামস্থ লোক যখন পরিবারের প্রতি অত্যাচার করে, তখন সে শত্রু দমন জন্য একত্র হওয়া কি উচিত হয় না ?···অতএব হে স্বদেশস্থ বান্ধবগণ ! হিন্দু মধ্যে যিনি যে মতাবলম্বী হউন, এ বিষয়ে সকলের একতা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে।···শঙ্কাকে দূর কর, সাহসকে আশ্রয় কর, উৎসাহকে প্রজ্বলিত কর, এবং দ্বেষ মাৎসরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা কর।"

তত্ত্ববোধিনী এই ব্যাপারে সংরক্ষণপন্থী হিন্দুসমাজ ও মডারেট ব্রাহ্মদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই সংকটের মোকাবিলা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর এই আহ্বান ফলপ্রসূ হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় রক্ষণশীল ও মডারেটদের যৌথ উদ্যোগে ১৮৪৫ সালের ২৫ মে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হয়। এই সভায় প্রায় এক হাজার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্থির হয় পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়তে পায় তেমনি এই বিদ্যালয়েও বিনা বেতনে পড়ানো হবে। ওই সভাতেই চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল। রাধাকান্ত দেব ঐ বিদ্যালয়ের সভাপতি ও সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন। "সেই

অবধি খ্রীস্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"[৪২]

উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুসমাজ ছিল সচল ও সজীব। পরস্পরবিরোধী শক্তির নিয়ত সংঘর্ষ তাকে গতি মুখর করে তুলেছিল। ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি তার পাল্টা আন্দোলনও সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে দেরী হয়'নি। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। (১৮৪৮ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনের পর বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। কারণ এই ব্যাঙ্কে বিদ্যালয়েয মূলধন ত্রিশ হাজার টাকা গচ্ছিত ছিল।) তবে ১৮৬০-৬১ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি কোন রকমে টিঁকে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পরিশিষ্ট পৃঃ ৩৫৮ দ্রষ্টব্য) কিন্তু এই পাল্টা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা দেশের সর্বত্র খ্রীস্টান বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ছেলে খ্রীস্টান হয়ে গেলেও পৈতৃক সম্পত্তিতে তার পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেবার জন্য সরকার যে আইন রচনার উদ্যোগ করেন তার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। আইনটি অবশ্য ১৮৫০ সালে পাশ হয়ে গিয়েছিল।

ডাফ ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকর ছিলেন নির্মম। ঈশ্বর গুপ্ত ডাফ সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত ছড়ায় লিখেছেন :

হেদো বনে কেঁদো বাঘ, রাঙ্গামুখ যার।
বাপ বাপ বুক ফাটে, নাম শুনে তার॥
বাগ করা বাঘ আছে, হাত দিয়া শিরে।
ধরিয়া ধর্ম্মের গলা, নখে ফ্যালে চিরে॥
ছেলে কালে ছেলে ধরা, শুনিয়াছি কাণে।
এখন হইল বোধ, বিশেষ প্রমাণে॥
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
মিশনরি ছেলেধরা, ছেলে ধরে খায়॥

* * *

কামিনীর কোল শূন্য খুন্ন মন তায়।
এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায়॥
বিদ্যাদান ছল করি, মিশনরি ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক, বিধর্ম্মের টব॥
মধুর বচন ঝাড়ে, জানাইয়া লব।
ইশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥
শিশুসবে ত্রাণ কর্ত্তা জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত লবে পোড়ে ডুব দেয় টবে॥

(ছদ্ম মিশনরি)

১৮৪৭ সালের ৮ জুন সুখচর নিবাসী শ্রীরামকমল মজুমদার নামে জনৈক ব্যক্তির একটি চিঠি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে সমসাময়িক খ্রীস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপের প্রতি সাধারণ হিন্দু বাঙালির মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যাবে। ভারতে ইংরাজ অধিকারকে দেশবাসী স্বাগত জানিয়েছিলেন দেশে ধর্মনিরপেক্ষ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। মুসলমান অধিকারে রাজশক্তির পরধর্ম অসহিষ্ণুতার স্মৃতি দেশবাসী ভুলতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত সুসভ্য বিদেশী রাজশক্তির ছত্রচ্ছায়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, ও বৈষয়িক উন্নতি তাঁদের একান্তভাবে কাম্য ছিল।

খ্রীস্টান মিশনারিদের স্কুলে ছেলেদের পড়াবার জন্য যে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তার কারণ ইংরাজী শিখে ভাল চাকরি-বাকরি পাবার আশা। খ্রীস্টান ধর্মমত কখনই আধ্যাত্মিক আন্দোলন হিসাবে সমাজে দাগ কেটে বসতে পারেনি। সুতরাং যখন দেখা গেল, মিশনারিদের আসল উদ্দেশ্য অন্য তখন দেশবাসীর মনে তীব্র হতাশা জাগতে দেরী হয়নি। এদেশে মিশনারি ধর্মপ্রচার সাম্রাজ্যবাদ ও বাণিজ্যের পক্ষে সহায়ক হবে কিনা তা নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী মনোভাব তো ছিলই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে ভারতে মিশনারীদের আগমনের জন্য যখন অনুমতি দেওয়া হল তখন তার পর থেকে দলে দলে মিশনারি ভারতে আসতে শুরু করেন। বহু মিশন ও বাইবেল সোসাইটি ভারতে কেন্দ্র স্থাপন করেন। এদের মধ্যে সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব খ্রীস্টান নলেজ, সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব দি গসপেল, সোসাইটি ফর দি প্রটেকশান অব খ্রীস্টান লিবারটি, দি চার্চ মিশনারি সোসাইটি, লণ্ডন ব্যাপটিস্ট, ওয়েসলেয়ান (Wesleyan) ও স্কটিশ মিশনারি সোসাইটি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।[৪৩]

এই সব খ্রীস্টান মিশনারিদের পিছনে ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারও মদত ছিল।[৪৪] তাঁরা মনে করতেন ইংরেজদের সাম্রাজ্য স্থাপনার লক্ষ্যই হল খ্রীস্টধর্মের প্রচার।[৪৫] লণ্ডনের চার্চ মিশনারি সোসাইটিতে ১৮১০ সালে বক্তৃতা দিতে গিয়ে খ্রীস্টান অবজারভারের সম্পাদক ও ক্রীতদাস মুক্তি আন্দোলনের নেতা ক্লাডিয়াস বুথম্যান বলেছিলেন. ভারতীয়রা ব্রিটেনদের কাছ থেকে গসপেল ও বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভার একসঙ্গে গ্রহণ করবার জন্য বাহু প্রসারিত করে দাঁড়াবে।[৪৬]

ভারতেব সকলে খ্রীস্টান হোক—তা কেউ চেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে, কেউ বাণিজ্যের স্বার্থে, কেউ বা চেয়েছিলেন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য। লর্ড সলিসবেরি মনে করতেন ভারতীয়দের সবাইকে খ্রীস্টান করা হয়নি বলেই সিপাহী বিদ্রোহের মত একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল।[৪৭]

ত্রিশ দশক থেকে মিশনারিদের আসল উদ্দেশ্যটা ধীরে ধীরে এদেশের জনগণের

কাছে প্রতিভাত হচ্ছিল। তাঁদের এই সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছিল সংবাদপত্রের জ্বালাময়ী লেখাগুলির ফলে।

সংবাদ প্রভাকরের জনৈক পত্র লেখক লিখছেন, "পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল এই বঙ্গদেশ ইংরাজ লোক কর্ত্তৃক সম্যকরূপে অধিকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমাবধি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের বাক্য এবং ক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের এমত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা অধীনস্থ প্রজাবর্গের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং সকলে যে আপন আপন বুদ্ধ্যনুসারে তদনুষ্ঠানে যত্নবান থাকেন এই তাহারদিগের কেবল মানস।" (সংবাদ প্রভাকর ২৬. ২. ১২৫৪ | ৮. ৬. ১৮৪৭)

কিন্তু তাঁরা সে প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। মিশনারিরা ধর্মপ্রচার করছেন। ইংরাজেরা প্রবল পরাক্রমশালী। এই "দীনহীন ভয়শীল নম্র ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করা পরমেশ্বরের নিকটে কিম্বা ভদ্রসমাজে ন্যায়নুযায়িক কর্ম্মের মধ্যে গণিত হইতে পারে না যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনাপেক্ষা দুর্ব্বল জনগণকে আঘাত প্রদানে বিশেষতঃ তাহারা ক্ষমতার অধীনে থাকিলে তাহারদিগের মনে দুঃখ পর্য্যন্ত দিতেও নিরস্ত থাকেন।" (সংবাদ প্রভাকর, ঐ)

১৮৪৫ সালে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর খ্রীস্টান হবার স্রোত মন্দীভূত হয়েছিল বটে কিন্তু তা অবরুদ্ধ হয়নি। ১৮৫৩ সালে ডাফ স্কুলের পাঁচ সাত জন নাবালক ছাত্রকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়। ঐ বছর অর্থাৎ ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৯ বৈশাখ সংবাদ প্রভাকর গর্জন করে ওঠেন: "আমরা বিপুল বিলাপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিতেছি সম্প্রতি ওলাওঠার হেঙ্গামা অপেক্ষা 'ইশুখ্রীষ্টী' হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েকদিবসের মধ্যে পাঁচ সাতটি হিন্দু শিশু এঁদের হেঁদোর গ্রাসে পতিত হইয়াছে। কাল ব্যাঘ্র ব্যগ্র হইয়া অগ্রভাগেই গুটিকতকে ভক্ষণ করিয়াছে। শেষের দিকে আক্ষেপের পরিবর্ত্তে ফুটে ওঠে ক্রোধ।"

"আমরা দস্যুদিগ্যে অধিক ভয় করি না, যেহেতু তাহারা শাসনের শঙ্কা করে, পাদ্রিরূপ দস্যুগণ শাসনের ভয় রাখে না। রাজা ঐ ইশুধর্ম্ম ঘোষকদিগের তোষক ও পোষক হওয়াতে ইহারা সর্ব্বশোষক হইয়াছে। ডাকাইতেরা প্রচ্ছন্নভাবে ডাকাইতি করে, এবং কেবল অর্থ লয়, বালক বালিকা হরণ করে না, ডাকাইতেরা প্রকাশ্যরূপে ডাকাইতি করিয়া গৃহস্থের চিরসুখের সম্বল স্বরূপ সর্ব্বস্বধন প্রাণাধিক পুত্র রত্নকে অনায়াসেই হরণ করিতেছে। এইক্ষণে কুলবধূ পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইতেছে। আহা! ডাকাইতি করিয়া যাহারদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি হয়, তাহারদিগের কেমন ধর্ম্ম বলিতে পারি না। কুকুর শৃগাল ও সর্পের নিকট অনেক প্রকারে নিস্তার আছে,—তাহারা দন্তাঘাত করিলে ঔষধাদি দ্বারা প্রতিকার হয়। পাদ্রিরা যাহাকে দংশন করে সে ব্যক্তির আর রক্ষা নাই, সজীব থাকিয়া চিরদিন মৃতবৎ হয়।"

পঞ্চাশের দশকে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের সে পূর্ব গৌরব ছিল না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় একবছর পরেই স্কুলের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন। এর ওপর মধ্যবিত্ত

বাঙালির চাকুরি স্পৃহা এবং রাজ অনুগ্রহ লাভের যে আকুলতা দেখা গিয়েছিল তার পক্ষে মিশনারি স্কুল যথেষ্ট সহায়ক ছিল। একারণে আবার মিশনারি স্কুলগুলি ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে।

প্রভাকর ওই প্রবন্ধে এজন্য দুঃখ করে বলেছেন,

"হে হিন্দুগণ! তোমরা অবিবেচনাপূর্ব্বক আপনারদিগের মস্তকে আপনারা কুঠারাঘাত করিলে আমরা কি করিতে পারি। পাদ্রির স্কুলে পুত্র সমর্পণের গুণ বারম্বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ তথাচ তাহাতে বিরত হওয়া, জেনে শুনে ঠেকেশিখে ডাইনের হস্তে সন্তান সঁপিতেছ। শুদ্ধ তোমারদিগের কার্পণ্য হেতু এতদ্রূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, বাবু মতিলাল শীল মহাশয় এক অবৈতনিক বিদ্যালয়রূপ অসাধারণ কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যাশালা রহিয়াছে, যদি বিনা বেতনে পড়াইতে নিতান্তই বাসনা হয় তবে সেইখানে পাঠাও। তদ্ভিন্ন বৈতনিক পাঠালয় অনেক আছে যৎকিঞ্চিৎ-বেতন দিয়া সেই সেই স্কুলে শিক্ষার্থে সন্তান নিযুক্ত করিলে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সন্তানেরা সুনীতিক্রমে সুশিক্ষা পাইয়া স্কুলের উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেক।"

তবু খ্রীষ্টান বিরোধী পালটা আন্দোলনের ফলে পঞ্চাশের দশকে সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। চোরাবাগান নিবাসী চন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি রেভাঃ জে, ওয়েঙ্গারকে এক চিঠিতে লেখেন তিনি খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন পারিবারিক এক ঝগড়ার ফলে পরিজনের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য। খ্রীস্টধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তিনি খ্রীস্টান হননি। সুতরাং তিনি শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হচ্ছেন। [৪৮]

এই ঘটনা ধর্ম আন্দোলনের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মান্তরের পর প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে সমাজে ফিরিয়ে নেবার জন্য বহুকাল ধরেই হিন্দু সমাজে চেষ্টা চলছিল। ধর্মসভাও এই ব্যাপারে একটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একবার উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু খ্রীস্টান হবার পর হিন্দু সমাজে ফিরে আসার ঘটনা এই প্রথম। পঞ্চাশের দশকে বিধবা বিবাহ নিয়ে আবার যখন রক্ষণশীল ও মডারেটদের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ সুরু হয়েছে তখন খ্রীস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরীকরণ সম্পর্কে সামাজিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গুরুত্ব কম ছিল না।

প্রভাকর ২৫. ৬. ১২৬১ তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিঠিখানি ছেপে দেন এবং এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে গৃহবিচ্ছেদ পরিবার সম্বন্ধীয় বিবাদ, আন্তরিক অভিমান দুরবস্থা প্রভৃতি বহুবিধ কারণের জন্যই এদেশীয়রা খ্রীস্টান হয়ে থাকে। প্রভাকর বার বার এই কথা বলে আসছেন। এবং তাঁদের সেই পুরাতন বক্তব্যের প্রমাণই এই চিঠিখানি। একদিক থেকে এই চিঠিখানির সাংবাদিক গুরুত্বও অসীম। এযুগের সংবাদপত্র হলে এই ধরনের চিঠি প্রথম পৃষ্ঠায় ফোটোস্টাট করে ছাপা হত।

প্রভাকর ওই প্রবন্ধে আবার হিন্দু ঐক্যের কথা বলেন, "একতাকেই এই নিয়ম প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবেক, এই রাজ্যমধ্যে যখন মিশনারি অত্যাচার প্রবল হইয়াছে তখন এ বিষয়ে হিন্দুমণ্ডলীর ঐক্য হওয়াই অতি আবশ্যক বোধ হইতেছে তাঁহারা যদ্যপি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত বিধান গ্রাহ্য করেন, তবে আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে অবোধ বালকগণ যাঁহারা অবিবেচনায় খ্রীস্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা পুনর্ব্বার স্বজাতি সমাজে আগমন করিতে পারে ও মিশনারীদিগের গর্ব্বও খর্ব্ব হইতে পারে, আমরা ঐ ব্যবস্থাপত্র ও অন্যান্য বিবরণ পরে প্রকাশ করিব।"

ত্রিশের দশকে ইয়ংবেঙ্গলদের প্রবল খ্রীস্টানপ্রীতি চল্লিশের দশকে এসে অনেকখানি প্রশমিত হয়। অবশ্য আলেকজাণ্ডার ডাফের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখের দীর্ঘকালই সৌহার্দ্য ছিল। কিন্তু রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অগ্রগণ্যদের কেউই খ্রীস্টান হন নি। এঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন তো পরবর্তী জীবনে অযোধ্যায় গিয়ে টিকি রেখে হিন্দুর মত ব্যবহার করতেন।[৪৯] রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম হয়েছিলেন।

রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচালিত বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪২ সালের আগস্ট সংখ্যায় একটি চিঠি ছেপে ছিলেন। যে চিঠিতে সরকারী তহবিল থেকে খ্রীস্টানধর্ম প্রচারের জন্য ব্যয় করার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ওই বছর ১ নভেম্বর আর একটি চিঠি প্রকাশ করা হয়। ওই চিঠিতে পত্রলেখক লিখছেন "হে সম্পাদকগণ অবগত হওয়া গেল তিন রাজধানীতে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম প্রতিপালনার্থ ১৮৩৬ সালে ৯৪৫১০৯ পৌণ্ড ব্যয় হয় তন্মধ্যে ৭৩৯৮৪ পৌণ্ড কিম্বা ৫৩৯৮৪০ টাকা কেবল বঙ্গরাজ্যের খাজনা হইতে দত্ত হইয়াছিল।...আমি স্বদেশীয় মহাশয়দিগকে এই নিবেদন করি মদীয় প্রস্তাব অপেক্ষা যদি উৎকৃষ্ট উপায় না থাকে তবে তাঁহারা এ বিষয়ে সত্বর হউন এবং তাঁহারা স্মরণ করুন যে কোন জাতি আপনারদিগের শাসনকর্ত্তারদের অত্যাচার ও অন্যায়ের বিপক্ষে চীৎকারধ্বনি বিশেষত অবশ্য প্রাপ্য বিষয়ে দৃঢ়তর চেষ্টা না করিলে কখনই সদবস্থান্বিত হইতে পারেন নাই।"

অবশ্য ১৫ নভেম্বর তারিখে এই চিঠিখানির প্রতিবাদ করে অপর এতদ্দেশীয়স্য নামে আর একটি চিঠিও ছাপা হয়। ধর্মচেতনার দিক থেকে ইয়ংবেঙ্গলরা যে চল্লিশ দশকে এসে আল্‌ট্রা থেকে মডারেটে পরিণত হয়েছিলেন তার প্রমাণ রাজনৈতিক আন্দোলনের মঞ্চে রক্ষণশীলদের সঙ্গে এক সঙ্গে আন্দোলন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি হয়ে উঠেছিল এই মিলনক্ষেত্র। বেঙ্গল স্পেক্টেটর যে তত্ত্ববোধিনী সভার কাজকর্মের প্রতি উৎসাহিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ ১৮৪৩ সালের ১লা জানুয়ারির একটি প্রতিবেদন। ওই প্রতিবেদনে তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতার প্রশংসা করে স্পেক্টেটর লিখছেন, 'তন্মধ্যে কোন কোন বক্তৃতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অতি মনোহর বোধ হয়।'

চল্লিশ দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব গ্রহণ ধর্মসংস্কার

আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিরাট ঘটনা। রামমোহনের অভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ তা পূরণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ধর্মসংস্কারের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় 'যদি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্নভাব চ'লিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রত হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে।'[৫০]

১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ ছিল দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক সভায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন:

'এইক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, এবং এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্খ লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বগত বাক্য মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার, উপাসনা, অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত ধর্ম্ম প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্য ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমার এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।'[৫১]

রামমোহন যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন তা দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে টিমটিম করে চলে আসছিল। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের মিলন ঘটিয়ে তাকে নতুন ধর্ম আন্দোলনে পরিণত করলেন। রামমোহন একটি ধর্মভাবনার, সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তাকে আন্দোলনে পরিণত করার সময় তিনি পাননি, কাজেই ব্রাহ্ম বলে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি তখনও হয়নি। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪২ সালে (বৈশাখ ১৭৬৪ শক) তত্ত্ববোধিনী সভ্যকে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেন। ১৮৪৪ সালের জানুয়ারিতে (৭ পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং আনুষ্ঠানিক ভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এই নতুন ধর্মগ্রহণ দেবেন্দ্রনাথের জন্মান্তর। ব্যক্তিগত ঈশ্বরভাবনা থেকে গোষ্ঠীগতভাবে নতুন বিশ্বাসে উত্তরণ। ১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা করে ব্রাহ্ম হলেন। 'তখন ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য হৃদয়ের মিল ছিল। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা যায় না।'[৫২]

দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও সনাতন বেদান্তধর্মের আদর্শে

উদ্দীপিত এক সমাজ। এই ধর্ম আত্মমুখী পরম ব্রহ্মের স্বরূপ সন্ধানে নিমগ্ন। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তার ধর্মৈষণার আরও এক উদ্দেশ্য সামাজিক মঙ্গল। ভ্রষ্টাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করে ধর্মীয় আচার আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষ যদি তার নৈতিক শক্তিকে বলশালী করে তোলে তাহলে তার সেই শুদ্ধ আচরণের দ্বারা সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করবে অন্যদিকে সমাজকে সে উন্নত করে তুলবে। আর এই ভাবে সামাজিক উন্নতির মধ্য দিয়ে জাতীয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে। দেশ একদিন স্বাধীন হবে। এই মুক্তি একদিকে ঐহিক অন্যদিকে পারলৌকিক। দেবেন্দ্রনাথ পরম ব্রহ্মের কাছে আকুতি জানিয়েছেন।

'হে পরমাত্মন, আমারদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর, তোমার এই সকল দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই—ইহা নানা ক্লেশ নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে—দিন রাত্রি ইহার ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর। পরমাত্মন! ধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া ইহার সকল সন্তাপ হরণ কর।'[৫৩]

দেবেন্দ্রনাথের কাছে ধর্মই ছিল আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক মুক্তির উপায়।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য ব্রাহ্মদের সাতটি প্রতিজ্ঞা পালন করতে হত।

১। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী মঙ্গল-স্বরূপ নিরবয়ব একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতিদ্বারা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি-পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব:

৪। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপকর্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনা পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।[৫৪]

এই প্রতিজ্ঞা বিধির মধ্যে চারটি বিধিই আধ্যাত্মিক আচার-আচরণের অঙ্গ। তিনটি হল নৈতিক আচরণ। উনিশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু নীতিবোধের যুগে এই তিনটি নীতি পালনের প্রতিজ্ঞা ধর্ম সংস্কারের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ চিরাচরিত হিন্দুধর্ম বলে যা চলে আসছিল তার মধ্যে স্মার্ত পণ্ডিতদের ছাপানো নানান কৃত্রিম বিধি-নিষেধ অন্যদিকে শাস্ত্র সমর্থিত লোকাচার যা কুসংস্কারেরই নামান্তর তা ব্যষ্টির (Individual) আত্মোন্নতির পথে বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রাহ্ম মতের প্রবর্ত্তকেরা পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদকে বেদান্ত-বিরোধী এবং কুসংস্কারের অঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন।

সাকারবাদ আত্মোন্নতি বা জাতীয় প্রগতির পক্ষে কতখানি প্রতিবন্ধক হতে পারে তা আবার শাস্ত্রীয় বিতর্কের বিষয়। কিন্তু উপাসনার পদ্ধতি ও প্রকারভেদের মধ্যে না গিয়েও একথা বলা যেতে পারে যে নানান কারণে হিন্দুধর্মের গতি সে সময় অবরুদ্ধ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে বলা যায়, প্রেমের মত প্রকৃত ধর্মও সমুখপানে চলতে ও চালাতে না জানলে তার আধ্যাত্মিক সম্পদ যত শক্তিশালীই হোক না কেন এই ধর্ম তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করতে পারে না। এ ছাড়া ধর্মকে জড়ত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে গতিশীল করে তোলার জন্যও সংঘের প্রয়োজন। এই সংঘ ধর্মের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ নিয়ে আসে, তার গতিশীলতা (mobility) অক্ষুণ্ণ রাখে, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়। সনাতন হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান ধর্মের মত কোন কালে সংঘভিত্তিক নয়, মোটামুটি লোকাচারশ্রয়ী।

এই বিকেন্দ্রীভূত ধর্মনীতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সমাজপতিদের ব্যাখ্যানের ওপরেই নির্ভরশীস ছিল। এই ব্যাখ্যা যে সর্বদা বৈজ্ঞানিক ছিল তা বলা ধায় না।

এদিক থেকে হিন্দুধর্মের ব্যাপক সংস্কারের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। অবশ্য দ্রুত সংস্কারের জন্য যে র‍্যাডিক্যাল বা বৈপ্লবিক মনোভাবের প্রয়োজন হয় ব্রাহ্ম সমাজের সকলের মধ্যেই যে তা ছিল তা নয়। ব্রাহ্মরাও লিবারেল ও র‍্যাডিক্যাল দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। তবু এই টানা পোড়েনের মাঝে ব্রাহ্মরা জাতিভেদ দূর করতে চেয়েছিলেন, অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছিলেন, সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস করায় সহায়তা করেছিলেন, সুরাপান ও অমিতাচার বন্ধের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, বহির্মুখী আড়ম্বর প্রধান ধর্মাচরণের বাহুল্য বর্জন করেছিলেন এবং নারী স্বাধীনতার জন্য আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং শ্রেণীগতভাবে (as a class) বিদেশীর অনুকরণ বর্জন করে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা যেটা আগেই বলেছি সেটি হল হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিক্রিয়া ও অন্যদিকে খ্রীস্টান ধর্মের নানান প্রলোভনের লবণাক্ত সমুদ্রে যাঁরা আশ্রয় নেবার মত দ্বীপ খুঁজছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম তাঁদের এক সুরক্ষিত দ্বীপে এনে তুলে দিয়েছিল।

অবশ্য ব্রাহ্ম সভার অনুকরণে হিন্দুদের সংহত করার জন্য ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার উত্তর বা ধর্মচিন্তার উদ্বোধনের চেয়ে সতীদাহ রদ বা বিধবা বিবাহ প্রভৃতি প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার দিকেই এই সভা অধিকতর সময় ব্যয় করেছেন। উপরন্তু ব্যক্তিগত দলাদলি এর গতি অবরুদ্ধ করেছে। শাস্ত্রের নামে নানান বিধি-নিষেধ জারি করে ধর্মসভা নিজেকে প্রতিক্রিয়াশীলতার এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছে। ধর্ম সভা তাঁদের আভ্যন্তরীণ দলাদলির জন্য অব্রাহ্ম সংবাদপত্রের দ্বারাও ভৎর্সিত হয়েছেন এবং ক্রমশ জনসমর্থন হারিয়েছেন।

১৯৪০ সালের ৪ এপ্রিল সংবাদ ভাস্কর লিখছেন :

'সহমরণ স্থাপনার্থকাবেদন অগ্রাহ্য হইলে ধর্ম সভা যখন পরামর্শ করিলেন

দেশের মঙ্গল ও ধর্ম সংস্থাপনার্থ সভা রাখিবেন তখন আমারদিগের বোধ হইয়াছিল ঐ সভা জগতের উপকার করিবেন এবং যাহারা ধর্ম ত্যাগে উদ্যত হয় তাহারাও সভার শাসনে ভীত হইবে, কিন্তু শেষ দেখিলাম সভার কার্য্য কেবল দলাদলি পর্য্যাপ্ত হইল আর স্বদেশীয় ধ্বনি লোকেরদের অনেক টাকা ব্যর্থ গেল শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ দেব সভার ধনরক্ষক ছিলেন যথার্থ বটে কিন্তু তিনি টাকা রাখেন নাই এবং স্বহস্তেও ব্যয় করেন নাই সুতরাং দাতারা হিসাব চাহিলে ঐবাবু তাহা দিতে পারিবেন না তবে তাহার হিসাব কে দিবেন। সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধনরক্ষক নহেন এই কথা বলিয়া নির্লিপ্ত হইয়া বসিবেন তবে কি ঐ সমুহ টাকা শূন্যে ২ উড়িয়া গেল আমরা দেখিতেছি ঐ টাকার দ্বারা কেবল দলাদলি ক্রয় করা হইয়াছে এবং পরস্পর মনোভঙ্গ হিংসা দ্বেষ মাত্র সুদ বৃদ্ধি হইতেছে।'

এখানে ভাস্কর ধর্মসভার দুর্নীতি ব্যাপারে কিছুটা আভাস দিয়েছেন। ধর্মসভা ৪০-এর দশকে রক্ষণপন্থী হিন্দুদের কাছেও তার ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি। ১৮৪৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ধর্মসভার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে রাজকৃষ্ণ ওই বছরের এপ্রিল মাসে ধর্মসভার সম্পাদক হন। সে সময়কার ধর্মসভা সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকরের অভিমত: 'ধর্মসভা এই শব্দ শুনিতে উত্তম, কারণ ধর্ম শব্দ অতিশয় জাঁকজমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের ধর্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, কেননা এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছে,…'(১৬ ৪. ১৮৪৮)।

সংবাদ প্রভাকরও ধর্মসভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অর্থের অপব্যয়ের অভিযোগ এনেছেন:

"চাঁদার দ্বারা যে প্রচুরার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ন দেবায় ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুড়ভুড়ি কাটিত, তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্মসভার ব্যথার ব্যথী সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল, মূল আশা ভঙ্গ হইলে স্থূলবুদ্ধি সভ্যেরা আর কি করেন, কিছুই ভাবিয়া পান না, সভার কাঁদুনি করিয়া ছাঁদুনি ও বাঁধুনি মাত্র সার হইল, মনসার কাঁদুনি কত গাহিবেন, পরিশেষে বড় ২ চাঁই মহাশয়েরা বুদ্ধির থেই হইতে এক দলাদলির সূত্র তুলিয়া বসিলেন, সেই দলাদলিতে কিছুদিন গলাগলি ভাব হইয়া পরিশেষে ঢলাঢলি আরম্ভ হইল, তাহাতেই একেবারে সৎকার্য্যের সৎকার্য হইল, আর পূর্ব্ববৎ প্রণয়ের সন্ধি রহিল না:"

ধর্মসভার মধ্যে ভাঙন তার আগেই সুরু হয়েছিল। রাধাকান্ত দেবকে পরিত্যাগ করে রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজনারায়ণ রায়, দুর্গাচরণ দত্ত, জয়নারায়ণ মিত্র প্রমুখেরা সিমলায় একটি আলাদা ধর্মসভা তৈরি করেন। এই সভাও আবার দ্বিধাবিভক্ত হল। আন্দুলের রাজা এই সভা থেকে বেরিয়ে এসে আন্দুলে নতুন সভা তৈরি করলেন। কিন্তু তবু বিরোধ থামল না। 'তদন্তর এক এক জায়গার ঢেউ উঠিয়া বিবাদের জলের স্রোতে প্রায় সকল সংহার করিয়া বসিল, রাজপরিবারের

সহিত দেববাবুর বিচ্ছেদ হইল, সেই বিচ্ছেদেই সভার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ রাজদলের সহিত ঘোষবাবু ও মিত্রবাবু প্রভৃতি কতিপয় দলপতি একত্র হইয়া সিংহবাবুদিগের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এইক্ষণে ঘরে ২ ধর্ম্মসভা, যেমন রাজপুর অঞ্চলে বাটোয়ারার গঙ্গা, অর্থাৎ করের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, বসুর গঙ্গা ইত্যাদি সেইরূপ অধুনা অমুকের ধর্ম্মসভা, ফলনার ধর্ম্মসভা বলিয়া পরিচয় হইয়াছে। (১৬. ৪. ১৮৪৮ সংবাদ প্রভাকর)

৮৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার ১৮ বছরের মধ্যে ধর্মসভার পরিণতিটি লক্ষণীয়। এর একটা বড় কারণ রক্ষণশীলদের কাছে কোন কোন গঠনমূলক কমিটি ছিল না। মতবিরোধ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিন্তু তা চলমান জীবনের। সামন্ত শ্রেণী প্রভাবিত ধর্মসভার মধ্যে শুধু ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষই হয়েছে—অদর্শের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত ঘটেনি। রাজায় রাজায় প্রতিপত্তির লড়াই হয়েছে তার শিকার হয়েছে ধর্ম।

ব্রাহ্ম সমাজের ভাঙন দেখা দিয়েছিল পর পর তিনবার। কিন্তু প্রতিবারই এই ভাঙন থেকে নতুন সৃষ্টির অঙ্কুর জন্ম নিয়েছে। এখানে সংঘাত হয়েছে আদর্শের সঙ্গে আদর্শের, তত্ত্বের সঙ্গে তত্ত্বের। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও ছিল বৈকি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যে সংঘর্ষ তা নিশ্চয়ই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। কিন্তু তা নিরঙ্কুশ ব্যক্তি আশ্রয়ী অহংবোধের লড়াই নয়। সেখানে মতান্তর দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতায় পর্যবসিত হয়নি।

দেখা গিয়াছে চূড়ান্ত মত বিরোধের পরও কেশবচন্দ্র নব বিধান সমাজের বার্ষিক উৎসবের (১৮৭১) উপাসনা সভার পৌরোহিত্য করার জন্য ডেকেছেন দেবেন্দ্রনাথকে। মহর্ষি সে সভায় এসেছেন। কিন্তু ভাষণ দিয়েছেন তাঁর আদর্শ অনুসারে। ওই সভায় তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন, কেশব সেন প্রবর্তিত নতুন সমাজ সনাতন পথ ত্যাগ করে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি অধিকতর আস্থাবান হয়েছেন। এই ভ্রান্ত মনোভঙ্গী হল 'ভ্রষ্ট বাতিক'। এর ফলে সভার সকলে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। স্বয়ং কেশবচন্দ্র অপমানিত বোধ করেছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেশব সেনের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগসূত্র অটুট ছিল।[৫৫]

অবশ্য ভারতীর ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধানের মধ্যে কোন্দল পরবর্তীকালে শুধুমাত্র আদর্শগত বিরোধে পর্যবসিত থাকেনি। তা নিয়ে উভয়দলের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িও যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু এই বিরোধ কখনও প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করেনি।

বরং এই অন্তর্বিরোধের ফলে ধর্ম আচরণের দিক থেকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রভেদ অনেক কমে এসেছে। আবার হিন্দুধর্মকেও ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন গতিমুখীন করে তুলেছে। প্রতিক্রিয়াশীলতা নয় প্রগতিমুখীনতাই যে গতিশীল ধর্মের লক্ষণ তা হিন্দু সমাজ ও ধর্মীয় নেতারা উপলব্ধি করেছেন। এই পারস্পরিক প্রভাবের বিস্তৃত

আলোচনার পরে আসছি। এবার ব্রাহ্মধর্মাদর্শ প্রচারের তত্ত্ববোধিনী ও তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কারণ ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে দুই পত্রিকার অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১৭৬৮ শকে ১ শ্রাবণ তত্ত্ববোধিনী কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের নৈতিক অবক্ষয়ের বর্ণনা করেছেন এবং সামাজিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের আত্মোন্নতির আভাস দিয়েছেন। বিত্তমুখী আত্মসুখ সর্বস্ব সম্প্রদায় দেশ সম্পর্কে উদাসীন।

'সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্ত রক্ষা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করেন। ইহার জন্যই দিবা-রাত্রি ব্যতিব্যস্ত, এ কর্ম্মের সমাধা পরে যে কিঞ্চিৎকাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেরই ক্ষেপণ করেন। ইহারদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনারদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় ধর্ম্মের অনুধ্যান করেন। বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রধান সূত্র, নতুবা প্রতিমা অর্চ্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা প্রভৃতির জন্য বিশেষ মনোযোগ হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন করেন? বিষেতঃ তাঁহারদিগের উপাসনায় সাত্ত্বিকতার কি অপূর্ব চিহ্ন দেখা যায়। যাঁহারা আড়ম্বরের সহিত বিবিধ পূজার সামগ্রী সকল সম্মুখে রাখিয়া বিষয় ব্যাপার তাবৎ নিপুণরূপে তৎকালে সমাধা করেন। এই সমুদয় মনুষ্যের ক্রোড়ে রাশীকৃত ধন স্থাপিত হইলেও তদ্দ্বারা স্বদেশের বিন্দুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।'

হিন্দুধর্মের এই ঘোর তামসিকতা ব্রাহ্মদের কাছে এক সামাজিক অন্যায় (social evil) হিসাবেই দেখা দেয়। ধর্মকে বহির্মুখী করলে এবং আধ্যাত্মিকতাকে জীবন চর্চার অঙ্গ না করলে এই অনাচার আসতে বাধ্য বলে ব্রাহ্মরা মনে করতেন।

তত্ত্ববোধিনীর অভিযোগ ছিল :

১। দেশীয় খ্রীস্টানদের স্বদেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিরোধিতা।
২। অসাধারণ বিদ্যাভিমানী কতক যুবা ব্যক্তির নাস্তিকতা।
৩। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্যযুবকদের উগ্র সাহেবিয়ানা।
৪। বেশ্যাগমন।
৫। ধনী পুত্রদের বিলাস বাহুল্য এবং স্বদেশ সম্পর্কে উদাসীনতা।
৬। স্ত্রী জাতির প্রতি অবহেলা ও দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

এই সবই ব্রাহ্মধর্ম ভাবনার বিরোধী। কারণ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রন্থের যোড়শ অধ্যায়ের মধ্যে দশম অধ্যায় হল রিপুদমন, ত্রয়োদশ অধ্যায় ইন্দ্রিয় সংযম, চতুর্থ অধ্যায় পাপ পরিহার, পঞ্চদশ অধ্যায়ে বাক্যমন ও শরীরের সংযম ও যোড়শ অধ্যায়ে ধর্মে মতি।

তত্ত্ববোধিনী আক্ষেপ করে লেখেন, 'যখন প্রাচীন লোক সকল দেশের মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্যই করেন না, যখন যুবকদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক কেহ খ্রীষ্টীয়ান

কেহ যথেচ্ছচারী হইতেছে, কেহ বা নানা অলীক আমোদে ও অসৎকর্মে কালক্ষেপ করিতেছে, যখন ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধি বিদ্যাবিহীন হইয়া ক্রমশঃ অপদস্থ হইতেছেন, যখন দেশের অর্দ্ধলোক স্ত্রীজাতি বিদ্যার আলোক বিরহ অন্ধপ্রায় মুগ্ধ রহিয়াছে ও পতির কদাচারে অহোরাত্র বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তখন এদেশের সুখ সৌভাগ্যের দিন যে কতদূর রহিয়াছে তাহার সীমা করা যায় না। অসংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র রোগ কদাপি দুই এক দেশহিতৈষি মনুষ্যের দ্বারা শান্তি হইতে পারে না। তাঁহারা পরস্পর সাক্ষাৎ করিলে কেবল আক্ষেপের আলাপ করেন, অবশেষে ক্ষুব্ধচিত্তে সজল নেত্রে পৃথক হয়েন।'

তত্ত্ববোধিনী পরিশেষে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, এই অন্ধ তামসিকতা থেকে জাতির মুক্তি ঘটুক এবং পরম প্রতিপাদ্য বেদান্তাশ্রয়ী ধর্ম সেই মুক্তির স্বাদ বহন করে আনুক। "হে পরমাত্মন! আমাদিগের দেশীয় লোককে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত কর এবং অধর্ম্ম পক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল কর, যাহাতে তাঁহারা বেদান্তে প্রতিপাদ্য পরম ধর্ম্ম তোমার উপাসনাতে অধিকারী হইয়া পরম সুখী হইতে পারেন।"

এদিক থেকে ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ ও পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ব-কৌমুদীর আদর্শ ছিল ভিন্ন। তত্ত্বকৌমুদী পাশ্চাত্য ভাবধারা ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সমন্বয় করে নতুন ভাবাদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

"জ্ঞান হৃদয় বিবেক ভক্তি প্রভৃতি মানব প্রকৃতির সমুদয় বিভাগের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম সাধন যাহা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, যাহা প্রধান প্রধান ব্রহ্ম প্রচারকগণ প্রচার করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মগণ বেদ বেদান্তের কাছে নয় আমেরিকার থিওডোর পার্কারের কাছে শিক্ষা করিয়াছেন।" (তত্ত্বকৌমুদী ৬ আষাঢ়, ১৮০১ শক)

তত্ত্বকৌমুদীর বক্তব্য আর একটি লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট:

"ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের নিকট ব্রাহ্মগণ অনেক শিখিয়াছেন। বৈদান্তিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে যে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, ইহার মূল পাশ্চাত্য জ্ঞান ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত না হইলে আজও ব্রাহ্মসমাজকে বৈদান্তিক ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইত, যোনিভ্রমণ প্রভৃতি কুসংস্কারে আস্থা রাখিতে হইত।" (১৬ আষাঢ়, ১৮০১, শক, তত্ত্বকৌমুদী)

তত্ত্বকৌমুদীর এই আদর্শ কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত। যদিও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তত্ত্ব-কৌমুদীর তখন তত্ত্বগত বিরোধ চলছে তবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রের এই প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়বাদকেই নির্ভর করেছিল। কেশবচন্দ্রের মধ্যে এই সমন্বয়বাদ এত তীব্র ছিল যে তিনি জার্মান দার্শনিক ফিকটির বইখানি পড়ে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'এই পুস্তক পাঠ করে আমার চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে।'[৫৬]

১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে

এক স্মরণীয় ঘটনা। সাংবাদিকতার ইতিহাসের দিক দিয়েও ঘটনাটির গুরুত্ব কম নয়। অক্ষয় দত্তের মত কেশবচন্দ্রও বাংলা সাংবাদিকতার এক নতুন গতিপথ নির্ণয় করে গেছেন।

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা এক পয়সা দামের সুলভ সমাচার প্রকাশ করেন। বাংলা সাংবাদিকতাকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে এই পত্রিকার অবদানের কথা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এখানে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কেশবচন্দ্রের ভূমিকার কথাই আলোচনা করব।

ব্রাহ্মগোষ্ঠীর মধ্যে কেশবচন্দ্রের ভূমিকা ছিল র‍্যাডিক্যাল। দেবেন্দ্রনাথের আত্মমুখী নিষ্ক্রিয় ধর্মচিন্তা থেকে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে গতিশীল সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র এ ব্যাপারে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। ভক্তিবাদের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে ফেলেছেন। আবার আপন চরিত্রের পারম্পর্য হীন আচরণের দ্বারা তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনে পুনরায় ভাঙনের সৃষ্টি করে গেছেন।

তবে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে মত বিরোধ ও সংঘর্ষের সুরু অনেক আগে থেকেই। ১৮৪৬ সালে ১ আগস্ট লণ্ডনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। দেবেন্দ্রনাথ পিতৃশ্রাদ্ধে পৌত্তলিকতা বর্জন করেন এবং ব্রাহ্মমতে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন। ব্রাহ্মধর্মের অনুরোধে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এই প্রথম দৃষ্টান্ত।[৫৭]

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজ এটাই। প্রিন্স দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসভাকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে এলেও পৌত্তলিকতা বর্জন করেন নি। তাঁর বাড়িতে নিয়মিত দুর্গাপুজো হত। কিশোর বয়সে সে দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ করতে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং পিতৃবন্ধু রামমোহনের কাছে গিয়েছিলেন। রামমোহন সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। বলেছিলেন, 'আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।'[৫৮]

সুতরাং আপন পিতৃশ্রাদ্ধে শালগ্রাম শিলা বর্জন তাঁর জীবনে নিশ্চয়ই এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল। এছাড়া দেবেন্দ্রনাথ উপনয়ন প্রথা ত্যাগ ও জাতিভেদ দূর করতে উৎসাহী ছিলেন। হিন্দুধর্মের এর চেয়ে বেশী সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেননি। এমন কি তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সামাজিক সংস্কারের কাজে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত করা দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছাবিরুদ্ধ ছিল। এ নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার মতানৈক্য হয়। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা ধর্মীয় চেতনার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ প্রয়োগ করতে শিখেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও বিধবা বিবাহ, স্ত্রী শিক্ষা, বহু বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা বার হচ্ছিল। লিখছিলেন অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখেরা। এ সব রচনা দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানধারণারই অনুবর্তী ছিল না।[৫৯] দেবেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন,

'তিনি যাহা লিখতেন তাহাতে আমার মত-বিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম।'[৬০] তাসত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ অধ্যাত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকার জন্য তত্ত্ববোধিনীর পলিসি সম্পাদক-গোষ্ঠীর হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৬১]

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম মতানৈক্য দেখা দেয় বেদের অভ্রান্ততার প্রশ্ন নিয়ে। ১৮৪৬ সালে জগবন্ধু পত্রিকায় লেখা হয় বেদ অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্র হতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে বলেছিলেন। অক্ষয়কুমার রাজি হননি। তখন দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বাবু নিজের নামে প্রতিবাদ লিখে তা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের মত রামতনু লাহিড়ীও বেদকে ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলে বিশ্বাস করতেন না। দেবেন্দ্রনাথের এই গোঁড়া বিশ্বাসে রামতনু লাহিড়ী সাময়িকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।[৬২]

দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বান্বেষী ছিলেন। বেদ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ভাবে অনুসন্ধানের জন্য তিনি ১৮৪৫ থেকে ১৮৪৬-এর মধ্যে চারজন ছাত্রকে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন।[৬৩] তাঁরা ফিরে আসার পর দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়। ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততা ও নিত্যতায় বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়। ১৮৪৭ সালের ২৮মে তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হয় যে এখন থেকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের বদলে ব্রহ্মধর্ম নামটি ব্যবহৃত হবে। তার তিনবছর পর ১৭৭২ সালের ১১ মাঘ মাঘোৎসবের বক্তৃতায় অক্ষয়কুমার প্রথম ঘোষণা করেন, 'বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে. বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।'[৬৪]

অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার মত বিরোধ ১৮৫৪ সালে উপনয়ন প্রথা ও জাতিভেদ প্রথা অবলুপ্তির ব্যাপারে। অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু মনে করেছিলেন, এখনও জাতিভেদ লোপ করার সময় আসেনি। এছাড়া অক্ষয় দত্তের আত্মীয় সভা (১৮৫২) বলে আলাদা সভা স্থাপন এবং সেখানে হাত তুলে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় দেবেন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রন্থাধ্যক্ষ সভাতেও অক্ষয়-অনুগামীদের প্রতিপত্তি বেশী ছিল। দেবেন্দ্র অক্ষয় দত্তের ওপর এত বিরক্ত হয়ে ওঠেন যে তিনি ১৮৫৪ সালের ৮ মার্চ এক চিঠিতে তাঁদের নাস্তিক বলে অভিহিত করেন।[৬৫] এরপর ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ ও সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপসনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অক্ষয় দত্ত, রাখাল দাস হালদার প্রমুখের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মত বিরোধ চরমে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথ কিছুকাল নিজেকে ব্রাহ্মসভা থেকে গুটিয়ে নেন। এর ওপর পারিবারিক অশান্তির চাপে তিনি কিছুদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যান (১৮৫৬)।[৬৬]

১৮৫৮ সালের ১৫ নভেম্বর দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণ সেরে কলকাতায় ফিরে এসে দেখেন, কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত। অত্ববোধিনীর সম্পাদক তখন নবীনচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবেন্দ্রনাথ ফিরে এসে তত্ত্ববোধিনী সভা ভেঙ্গে দেন (১৮৫৯)। কারণ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথমদিকে যে সেক্যুলার রূপটি ছিল তার আকর্ষণেই বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখেরা এ সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা পুরোপুরি ব্রাহ্মসমাজেরই প্লাটফর্ম হয়ে উঠুক এঁরা তা কোনদিন চান নি। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকাতে প্রবন্ধ নির্বাচনের ব্যাপারেও দেবেন্দ্রপন্থী ও দেবেন্দ্র বিরোধীদের মধ্যে যে মতদ্বৈধ দেখা দিতে শুরু করেছিল তা পরবর্তীকালে আরও প্রবল হয়ে ওঠে। অগত্যা দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা তুলে দেওয়াই সাব্যস্ত করেন।

কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের ফলে সমাজে নতুন কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সমাজের যুগ্ম সম্পাদক হন। একজনের বয়স ৪২ আর এক জনের বয়স মাত্র ২১। পরিণত প্রজ্ঞার সঙ্গে তারুণ্যের সংমিশ্রণে ব্রাহ্ম আন্দোলনের নদীতে ভরা জোয়ার দেখা দেয়। ১৮৬০ সালে কেশবচন্দ্র তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে কয়েকটি tract বা ধর্মপুস্তিকা প্রকাশ করেন। 'Young Bengal this is for you.' 'Be powerful.' 'The religion of love.' 'Basis of Bramhim,' প্রভৃতি পুস্তিকা গুলি তাঁকে তরুণ সমাজের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলে। কেশবচন্দ্র তরুণ ব্রাহ্মদের নিয়ে সঙ্গতসভা গঠন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল 'to promote mutual intercourse amongst its members.'[৬৭]

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণদের সংঘর্ষ শুরু হয় বৈপ্লবিক সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'The old school of Bramhos with a few exceptions conformed to the idolatrous practices of orthodox Hindu Society at home confining their Bramhoism to mere intellectual assent to the preaching of the samaj But the young men under the influence of their young leader daily imbibed a new inspiration from Western Sources.'[৬৮]

ত্রিশ দশকের ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলনের সঙ্গে কেশব-গোষ্ঠীর আন্দোলন তুলনীয়। উভয়েই বৈপ্লবিক সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী এবং পাশ্চাত্যদর্শনের প্রতি আগ্রহী। কেশব-অনুগামীরা এফ ডবলু নিউম্যান, স্যার ডবলু হ্যামিলটন, ভিক্টর কাজিন প্রমুখের রচনা পড়ে উদ্দীপ্ত হতেন। তবে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে। ইয়ংবেঙ্গলদের মনে ছিল সব কিছুতে অবিশ্বাস, শূন্যতাবোধ ও ধর্মের প্রতি অনাস্থা। কেশব-অনুগামীদের চিন্তা ও মনন অধ্যাত্মভিত্তিক। অবশ্য সে অধ্যাত্মচিন্তা দেবেন্দ্রনাথের মত পুরোপুরি বেদান্তাশ্রয়ী নয়। কেশবচন্দ্র গভীরভাবে খ্রীস্টের জীবনী ও খ্রীস্টানতত্ত্ব অনুশীলন করেছেন ও তার দ্বারা তাঁর চিন্তাকে পরিশীলিত করেছেন। কেশব অনুগামীদের বড় কথা ছিল সিনথেসিস বা সমন্বয়।

১৮৬১ সালে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ ব্রাহ্মমতে হয়। অবশ্য এ বিবাহে শুধু পৌত্তলিক অংশ বর্জন করে হিন্দু বিবাহ বিধিই অনুসরণ করা

হয়েছিল। এই বিবাহ দেখে কেশব-অনুগামীরা বিবাহ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

সংস্কারের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন মধ্যপন্থী। কেশবের মত র‍্যাডিক্যাল তরুণকে প্রবীণদের মতের বিরুদ্ধে তিনি ১৮৬২ সালের ১৩ এপ্রিল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য করেছেন। তাঁকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি দিয়েছেন। আবার স্ত্রীকে নিয়ে সমাজে আসার অভিযোগে কেশবচন্দ্রের পৈত্রিক বাড়ির দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেল, যখন তা নিয়ে বিরাট সামাজিক আলোড়ন দানা বেঁধে উঠেছে, তখন দেবেন্দ্রনাথই কেশবচন্দ্রকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন।

কিন্তু একদা যে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের মধ্যে উপবীত ত্যাগ করে জাতিভেদ প্রথা অবলুপ্তির পক্ষে অক্ষয় দত্তের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন সেই দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে উপবীত ত্যাগ ও জাতিভেদ অবলুপ্তি সমর্থন করেন নি। কেশবচন্দ্র যখন একজন ব্রাহ্ম যুবকের অসবর্ণ বিবাহ দিলেন তখন তা দেবেন্দ্রনাথের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল, পাছে এ খবর পেয়ে তিনি অসন্তুষ্ট হন।[৬৯]

১৮৬৪ সালে কেশবচন্দ্র আর একটি অসবর্ণ বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। এতে হিন্দুদের মত ব্রাহ্মসমাজেরও এক অংশ চটে যায়।[৭০]

কিন্তু সংঘর্ষ চরমে ওঠে ব্রাহ্মসভায় উপাচার্যদের উপবীত ধারণ নিয়ে। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের বক্তব্য ছিল উপবীতধারীদের উপাচার্য পদে বসানো চলবে না। এই বিরোধ দেবেন্দ্রনাথের কাছে গেলে তিনি একটা মিটমাটের চেষ্টা করেছিলেন। অথচ এই দেবেন্দ্রনাথ একদা উপবীত ত্যাগের পক্ষে ছিলেন। কেশব-চন্দ্রের মত অব্রাহ্মণকে তিনি আচার্যের পদে বসিয়ে ছিলেন। কেশবচন্দ্র উপবীতধারী দুজন উপাচার্যকে বরখাস্ত করে উপবীত ত্যাগী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে উপাচার্য করেন। সে সময় ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ মেরামত হচ্ছিল। উপাসনা সভা সাময়িকভাবে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে হচ্ছিল। কেশব সেনের নতুন নিয়োগ অনুমোদন না করে দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা সভার বেদীতে উপবীতধারী উপাচার্যদেরই বসিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ট্রাষ্টি হিসাবে ক্ষমতা-বলে দেবেন্দ্রনাথ কর্মপরিষদ বাতিল করে নিজে সব ক্ষমতা নিয়ে নেন। পরে কেশব অনুগামীদের বাদ দিয়ে নতুন কমিটি করেন। দ্বিজেন ঠাকুরকে সম্পাদক করেন। অযোধ্যাপ্রসাদ পাকড়াশী সহকারী সম্পাদক হন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়ে নেন।[৭১]

১৮৬৬ সালের ১১ নভেম্বর কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখেরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন ব্রাহ্মসমাজ পরিচিত হয় আদি ব্রাহ্মসমাজের নামে। ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় মহিলারা যোগ দিতে পারতেন। তবে তাঁদের বসতে হত চিকের আড়ালে। গাড়ি থেকে যখন তাঁরা নামতেন তখন ফুট পাথের দুদিকে পর্দা ধরা হত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী

তাঁদের কাছে এই আচরণ হাস্যকর বলে মনে হত। ১২৭২ বঙ্গাব্দে প্রতিবাদ হিসাবে দুর্গামোহন দাসের পরিবারের কয়েকজন মহিলা পর্দার বাইরে বসলে হৈ চৈ পড়ে যায়। স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতীরা দাবি করেছিলেন যে তাঁদের পরিবারের মহিলাদের জন্য আলাদা বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ভাবতে অবাক লাগে যে কেশবচন্দ্র তাঁর পত্নীকে নিয়ে উপাসনায় গিয়ে একদা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন, তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন নি।[৭২] স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতীরা তখন ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীরের বাড়িতে উপাসনা গৃহ স্থাপন করেন। রাজনারায়ণ বসুর মত সংরক্ষণপন্থী এই সমাজের আচার্যের পদে কিছুদিন অভিষিক্ত ছিলেন।[৭৩] অবশ্য কেশবচন্দ্র মেয়েদের উপাসনা সভায় প্রকাশ্যে বসতে দেওয়ার দাবি মেনে নিলে দল ছুটরা আবার ফিরে আসেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলনের এই টানা পোড়েনের মাঝে একটা জিনিস ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজ বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অঙ্গ হিসাবেই নিজেদের সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে তুলছিলেন। একজন ইংরাজ লেখক বলেছেন, If the Adi Samaj has moved at all, it has moved back towards orthodox Hinduism and its influence in advancing practical reform has not been appreciable.[৭৪]

কিন্তু আদি সমাজ যে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে চলে গিয়েছিল এবং সামাজিক প্রগতির স্রোতকে অবরুদ্ধ করেছিল একথা বলা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে না। একথা সত্যি যে আদি সমাজ জাতিভেদ অবলোপ, পর্যাপ্ত স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতির পক্ষপাতী ছিল না। ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে বাল্য বিবাহ রোধ এবং অসবর্ণ বিবাহ আইনত সিদ্ধ করার জন্য যখন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন পাশ হতে যাচ্ছিল তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে ২০০০ ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র সিমলায় বড়লাটের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ওই বিবাহে পাত্রীর বয়স সর্বনিম্ন ১৪ ও পাত্রের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ রাখা হয়েছিল। কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্য ছিল ব্রাহ্মদের জন্য আলাদা করে বিবাহ আইন হলে ব্রাহ্মরা যে হিন্দু নন তা আইনের চোখে প্রমাণিত হবে। অবশ্য বিলের বিরুদ্ধে অন্যান্য যুক্তিও ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে ১৮৭২ সালে তিন আইনে সিভিল ম্যারেজ আইন পাশ হয়েছিল। 'আমি হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ পার্শি শিখ কিম্বা জৈন কোন ধর্মাবলম্বী নই' ঘোষণা করে যেকোন ব্যক্তি ওই বিবাহ বিধির আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকারী হলেন। কেশব-অনুগামীরা নিজেদের হিন্দু নয় বলে ঘোষণা করে ওই নতুন আইনেই বিবাহ দিতে লাগলেন। এর ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজ আরও বেশি করে হিন্দু ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে শুরু করলেন।

এই সময় তত্ত্ববোধিনী ও তত্ত্বকৌমুদীর মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে

হিন্দু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সগর্বে স্বীকার করে নেওয়ায় হিন্দুধর্মের মধ্যেও প্রগতিশীলতার হাওয়া বইতে শুরু হয়। হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করে জাতিকে আবার পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতারা আহ্বান জানাতে থাকেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের তরুণ গোষ্ঠীরা হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রীষ্টান মিশনারিদের আক্রমণের মোকবিলা করতে থাকেন। তাঁরা বলেন হিন্দুধর্ম সকল ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ (১) কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামে এর নামকরণ হয় নি। (২) ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই ধর্ম কোন মধ্যস্থ মানে না। (৩) হিন্দুরা ঈশ্বরকে পূজা করেন আত্মার আত্ম হিসাবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কি বিষয় কর্মে, কি আনন্দে, কি সামাজিক আলাপ আলাপনে। (৪) অপরাপর শাস্ত্রগুলির মতে উপাসনা পুরস্কার সাপেক্ষ। কিন্তু হিন্দুগণ ঈশ্বরের উপাসনা এবং ধর্মচর্চা করেন কোন পুরস্কারের অপেক্ষা না করে, ঈশ্বরপ্রেম এবং ধর্মচর্চাই এই উপাসনার প্রথম ও শেষ কথা। (৫) এই ধর্ম অসাম্প্রদায়িক এবং সকল ধর্মের কল্যাণে বিশ্বাসী। (৬) এই ধর্ম কাউকে ধর্মান্তরিত করে না। এই ধর্ম এত সহনশীল এবং এতদূর ভক্তিমূলক যে সম্পূর্ণভাবে কাল ও বোধ নিরপেক্ষ। (৭) এই ধর্ম সকল জ্ঞানের আদি উৎস।[৭৫]

হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের কাছে এই আত্মসমর্পণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে প্রাচীন ভারতের পুনঃমূল্যায়ন রেনেশাঁসের অন্যতম প্রধান শর্তটি পূরণ করে তোলে। সে শর্ত হল অতীত ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা। ষাটের দশকে যে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ, যে স্বাদেশিকতার বিস্তার যার কথা অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে তার পটভূমি কিন্তু এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। এই পটভূমিতে হিন্দু ও ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবীরা এই জাতীয়তার ঐক্যসূত্রেই মিলিত হয়েছিলেন। এই জাতীয়তার আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে ব্রাহ্ম নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলা গঠন করেছেন, হিন্দু রঙ্গলাল হেমচন্দ্র নবীন সেন বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধক লেখা লিখেছেন।

ষাট ও সত্তর দশকের এই ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে হিন্দুধর্মের গৌরব উদ্দীপনায় বাংলা সংবাদপত্রের অবদানটুকু স্মরণীয়।

হিন্দু ধর্মকে প্রয়োজনমত সংস্কার করে তা সর্বসাধারণের গ্রহণের উপযোগী করে তোলবার জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

"আমাদিগের দেশে অনেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি স্বদেশীয় ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা অবজ্ঞেয় পদার্থ নহে। যদি তাহাতে তাঁহাদিগের কোন আপত্তিজনক বিষয় থাকে, তাহা সংশোধিত ও পরিমার্জিত করিয়া লইতে পারেন। আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে আমরা গ্রহণ কারতে পারি এবং তদনুযায়ী আমাদিগের বর্ত্তমান ঈশ্বরোপসনা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান পদ্ধতিও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পার। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যধর্ম্মের ন্যায় আমাদিগের দেশে সহস্র পরিমাণে জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হউক, তথাপি

আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনা এরূপ উচ্চ যে তাহাকে তাহা কখন ছাড়িয়া যাইতে সক্ষম হইবে না।" (আশ্বিন, ১৭৯০ শক)

বৃহত্তর মিলনের ক্ষেত্র তৈরী করবার জন্য হিন্দুধর্মের কোন আপত্তিজনক অংশকে পরিবর্তন করে তা গ্রহণ করার জন্য তত্ত্ববোধিনী আহ্বান জানিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম অন্নদাচরণ খাস্তগির শুধু শালগ্রাম শিলা না এনে হিন্দু মতে নিজের কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ দেন।[৭৬] এই বিবাহ হিন্দু ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সম্পর্ক আরও নিকটতর করেছিল। এই বিবাহ সভায় রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ওই পৌত্তলিকতা অংশ বাদ দিয়ে ১৮৭৩ সালে ব্রাহ্ম উপনয়ন পদ্ধতিও প্রবর্তিত হয়েছিল। নতুন প্রবর্তিত প্রথানুসারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দুই ছেলে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন দেন।[৭৭]

এমন কি ১৭৮৮ শকে দুর্গোৎসবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী দুর্গোৎসব সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয়ে লেখেন :

'এই উৎসব থাকাতে এতদ্দেশীয় শিল্প নানারূপ শিল্পের উদ্ভাবন করিতেছে, বাণিজ্য সজীব রহিয়াছে, নৃত্যগীত বিলুপ্ত হয় নাই, কবিত্ব অপ্রতিহত স্রোতে চলিতেছে, দয়া নির্বাণ হয় নাই, প্রীতি স্নেহ নতুন বলে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং শত্রুতা বিদূরিত ও সদ্ভাবও বদ্ধমূল হয়। ফলতঃ এই উৎসবের উপকারিতা যথেষ্ট। ইহা দ্বারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের ধর্মভাবও রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই উৎসবের যেরূপ গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা যদি তাহা মূর্ত্তি বিশেষের প্রতি নিয়োজিত না হইয়া অনন্ত ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইত তাহা হইলে ইহার শোভা কতই না বৃদ্ধি পাইত। যাহা হউক এই উৎসবে হিন্দুসমাজে যতটুকু উপকার হয় তাহা কিছুতেই অস্বীকার করি না, গুরুজনকে প্রণিপাত, স্নেহের পাত্রকে আশীর্বাদ এবং প্রীতিভাজনকে আলিঙ্গন এই সমস্ত সুরীতি অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু, এই উৎসব প্রসঙ্গে যে ভয়ানক পাপাচার সকল প্রশ্রয় পায়, মদ্য যে অতিমাত্রায় হ্রস্ব হইয়া উঠে আমরা হৃদয়ের সহিত তাহা ঘৃণা করিয়া থাকি।"

কেশবচন্দ্র সেনের সুলভ সমাচার ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ১ কার্তিক দুর্গোৎসবে নাচ তামাসা আলোর ধুমধাম বারাঙ্গনার নৃত্য দেখে ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু তার জন্য দুর্গোৎসবের অসারতার পক্ষে কোন যুক্তি দেন নি। বরং লিখেছেন, "নব্য বাবুদিগের নিকট আমাদের অনুরোধ যে তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু হইয়া দুর্গোৎসব করিতে পারেন করুন, নতুবা এইরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার হইতে নিরস্ত হউন।"

এখানে লক্ষণীয় যে তত্ত্ববোধিনীর বক্তব্যে সাকার সাধনার বিরুদ্ধে শুধু একটি মাত্র বাক্য থাকিলেও দুর্গাপূজার দার্শনিক, সামজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্যকে তত্ত্ববোধিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। সুলভ সমাচারও দুর্গাপূজাকে নস্যাৎ করেন নি। এই Synthesis বা সমন্বয় সাধনই ছিল ধর্ম-আন্দোলনের বড় কথা।

এই সমন্বয়কে উন্নতিশীল হিন্দুরাও যে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ সোম-

প্রকাশ। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাসাগর কেউই ব্রাহ্ম ছিলেন না। ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১৩ মাঘ সোমপ্রকাশে হিন্দু ব্রাহ্ম ঐক্যের বিরুদ্ধে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক বলতে চেয়েছিলেন যে হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মদের সম্পর্ক রাখা অন্যায় হচ্ছে। সোমপ্রকাশ ২৭ মাঘ ওই চিঠির বক্তব্যের প্রতিবাদ করে লেখেন :

"হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বী ও স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, ব্রাহ্ম ও হিন্দু সেরূপ নহে। ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। হিন্দুদিগেরও এই আদি ধর্ম্ম। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। আজিও সচরাচর অনেক পরমহংস দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারা কি স্বতন্ত্র জাতীয় লোক, হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণব শাক্ত গাণপত্য প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় আছে, তাহারা কি স্বতন্ত্র ২ জাতি বলিয়া পরিগণিত হন, রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের কি অনুষ্ঠান ও চিহ্ন ভেদ নাই? অনুষ্ঠান ও চিহ্ন ভেদ থাকাতে কি তাঁহারা পর পর ঈশ্বরের একান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়া নরকগামী হইবেন? ফলতঃ ব্রাহ্মে ও হিন্দুতে বৈলক্ষণ্য নাই, উভয়ে এক জাতীয় ও এক ধর্ম্মাবলম্বী, কেবল কিঞ্চিৎ স্থান ভেদ এই মাত্র। যদি এরূপ হইল, তবে পর পর সংস্রব পরিত্যাগ চেষ্টা কি উপহাসাস্কর ও অসঙ্গত নয়?"

এ দেশে যতদিন পুরাণাদির প্রাদুর্ভাব না হইয়াছিল, ততদিন কি হিন্দুধর্ম্মের এরূপ অবস্থা ছিল? তদানীন্তন তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা কি কেবল এক ঈশ্বরের উপাসনা বিধি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় ব্যগ্র ছিলেন না? একমাত্র ঈশ্বর নিরূপণই কি ষড় দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে? শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনার্থই কি দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ান নাই? ফলতঃ অদ্বৈতবাদই এদেশে প্রধান ধর্ম, সেই ধর্ম নানা কারণে ক্রমে বিকৃত হইয়া ইদানীন্তন দুর্দশাপন্ন হিন্দুধর্ম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সংস্কার আবশ্যক। ইহাকে সংস্কার করিয়া পুনর্বার পূর্বেকার অবস্থায় লইয়া যাইতে হইবে। ব্রাহ্মেরা সেই সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি হিন্দুদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করেন ইহার সংস্কার হইবার সম্ভাবনা কি? শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "দ্বারকানাথ নিজে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার একটি সহজ সহানুভূতি ছিল। এই নবধর্ম্মের আদর্শ ও মতামতের উদারতা তাঁহাকে আকৃষ্ট না করিয়া পারে নাই।"[৭৮]

ব্রাহ্মরা যে বেদান্তনির্ভর অদ্বৈতবাদকে নির্ভর করে তাঁদের নতুন ধর্মমত গড়ে তোলেন পরবর্তীকালে এই বেদান্তনির্ভর অদ্বৈতবাদের ওপর ভিত্তি করেই বিবেকানন্দের ধর্মভাবনা গড়ে উঠেছিল। রামকৃষ্ণের ধর্মভাবনাতেও সাকার ও নিরাকার এসে এক হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিয়ে বলেছেন, সাকার ও নিরাকার হল "যেমন বরফ এবং জল। ইহার দুইটি প্রত্যক্ষ অবস্থা। একটি কঠিন আকার বিশিষ্ট এবং অপরটি তরল ও আকার বিহীন। জলের এই পরিবর্তন উত্তাপ এবং তাহার অভাব হিম শক্তি দ্বারা সাধিত হয়। সেই প্রকার সাধকের জ্ঞান এবং ভক্তির ন্যূনাধিক্যে ব্রহ্মের সাকার নিরাকার অবস্থা হইয়া থাকে।"[৭৯]

উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব আর একটি যুগের সূচনা করে। হিন্দুধর্মের আপাতবিরোধের সীমা অতিক্রম করে মহামিলনের ক্ষেত্র তিনি রচনা করে যান। তাঁর আবির্ভাবে হিন্দুদের মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস ফিরে আসে, সংরক্ষণপন্থী ও নাস্তিক্যবাদী হিন্দুদের মনেও ভক্তিভাবের উদ্বোধন ঘটে। এযুগের বড় ঘটনা বিদ্রোহী কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য। কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে।

রামকৃষ্ণদেবের মাহাত্ম্য প্রচারের ব্যাপারেও সংবাদপত্রের অবদান কম ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

'তখনও (১৮৭৫) শক্তি সাধক পরমহংসের অলৌকিক শক্তির সংবাদ কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে বিশেষ পৌছায় নাই। পরবর্তীকালে ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্র সেন নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং তিনি পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার ফলে দেশবাসী এই সাধক সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠেন।'[৮০]

কেশবচন্দ্র তাঁর ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় লেখেন :

A Hindu saint—we met one (a sincere Hindu devotee) not long ago and were charmed by the depth penetration and simplicity of his spirit. The never ceasing metaphores and analogies in which he indulged, are most of them as apt as they are beautiful. The characteristics of his mind are very opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being so gentle tender and contemplative as the latter is sturdy, masculine and polemical. Hinduism must have in it a deep sense of beauty, truth and goodness to inspire such men as these (28th March 1875).[৮১] রামকৃষ্ণের প্রভাবে এসে কেশবচন্দ্র ভক্তিবাদের প্রতি আসক্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তিনি সংকীর্তন করেছিলেন।

"শুভক্ষণে মাতৃভক্ত রামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রের যোগ হইয়াছিল, সেই মণিকাঞ্চন যোগ হইতেই ব্রাহ্মসমাজে সুমধুর মাতৃভাবের অবতরণ হইল। যদিও তখন সাধারণ ও নববিধান সমাজে ঘোর বিরুদ্ধভাব বর্ত্তমান ছিল। তথাপি বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে এই মহাভাব সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হইয়া পড়িল। কেশবচন্দ্রের সুমধুর কণ্ঠে উচ্চারিত 'মা' নাম তড়িত প্রবাহের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।'[৮৮]

রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে এসে কেশবচন্দ্রের নিরাকার ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন শ্যামামূর্তিতে পরিণত হল। ব্রহ্মের ধ্যান পরিণত হয় শ্যামা সঙ্গীতে। একটি ব্রহ্মসঙ্গীত থেকেই বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে।

মা যদি আসিলে হৃদে কর বর দান,
চেয়ে আছি তব পানে মাগো চাতক সমান।
ধনং দেহি রূপং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো দেহি
মা তোর শ্রীপদে বর চাহিনা এমন।
চাহি মাগো করযোড়ে সবে মিলি সমস্বরে
ভারতের ভক্তিধর্ম কর উদ্দীপন।
বিশ্বগ্রন্থে পত্রে পত্রে মা মা মা মা নাম মাত্রে
যেন বহে দু নয়নে অশ্রু প্রস্রবণ।[৮৩]

সুলভ সমাচারে সংবাদটি আরম্ভ হচ্ছে এই ভাবে :

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

"পাঠকগণ উপরি উক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন, ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিনক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রাণী রাসমণির কালীবাটিতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাঁহার উচ্চজীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার মতন লোক আর এদেশে আছে কিনা সন্দেহ।" ইত্যাদি

আবার ১৮৮১ সালের ১৭ ডিসেম্বর সুলভ সমাচার আবার লিখছেন, সাপ্তাহিক সংবাদ—"দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে কলিকাতার ভদ্রলোকেরা ক্রমেই চিনিতেছেন। তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটিতে আনিতেছেন এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত ধর্মকথা কীর্ত্তনাদি শুনাইয়া সুখী করিতেছেন। উক্ত মহাত্মা দ্বারা কলিকাতায় হিন্দুসমাজে ধর্মভাব জাগ্রত হইতেছে।"

ধর্মতত্ত্ব পরিচারিকা, তত্ত্বকৌমুদী, তত্ত্বমঞ্জুরী প্রভৃতি পত্রিকাগুলিতেও রামকৃষ্ণদেবের খবর নিয়মিত প্রাকাশিত হত। ১৮৭৫ সালের ১৪ মে ধর্মতত্ত্ব রামকৃষ্ণদেবের বিস্তৃত পরিচয় দিয়ে লেখেন :

"দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে তাঁহার থাকিবার স্থান, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মত একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই!"

১৮৭৮ সালের জানুয়ারিতে কেশবচন্দ্র পরমহংসের উক্তি নামে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের একটি সঙ্কলন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশ করেন। এরপর থেকে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রায়ই রামকৃষ্ণের উপদেশ ও বাণী প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে বেলঘরিয়ার তপোবনে রামকৃষ্ণ ২৫।৩০ জন ব্রাহ্মের সঙ্গে মিলিত হন। ওই মাসের ২১ সেপ্টেম্বর কেশব সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন। সেখানে তাঁর সমাধি হয়। দণ্ডায়মান অবস্থায় সমাধিরত রামকৃষ্ণের

বিখ্যাত ফোটোগ্রাফটি ওইদিন তোলা হয়েছিল। এই খবরটি ১ অকটোবর ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন, "তাহার সুমিষ্ট স্বরের মধুর ভাবের সঙ্গীতে পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। সেদিন সমাধির অবস্থায় তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ ঘন এই নাম শ্রবণ মাত্র তাঁহার সমাধি হইয়াছিল।"

রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে যে একেশ্বরবাদী নিরাকার ধর্ম আন্দোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে হিন্দুধর্মকে নবজীবন দান করে তার আপন ঐতিহাসিক কর্তব্য শেষ করে। রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে সত্তর দশক থেকে হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানের যুগ শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে প্রগতিশীল ব্রাহ্মশিবিরে আবার বিশ্রী আত্মকলহ দেখা দেয়। এবং তার পরিণামে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পায়। ১৮৭৮ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে আবার দু টুকরো হয়। কেশব অনুগামীরা গঠন করেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ। আনন্দমোহন বসু, শিবচন্দ্র দেব, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ গঠন করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

এই ভাঙনের জন্য প্রধানত কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতিদেবীর বিবাহই দায়ী। বিবাহের সময় মহারাজার বয়স ছিল ১৫। কেশবকন্যার বয়স ১৪। যে সিভিল ম্যারেজ আইন পাশ করার জন্য কেশবচন্দ্র একদা আন্দোলন করেন সেই আইন অনুসারে এই বিবাহ অসিদ্ধ। কারণ বরকনে কারও বিবাহযোগ্য ন্যূনতম বয়স নেই। এ বিবাহ ব্রাহ্মমতে না হয়ে রাজ পরিবারের ইচ্ছা অনুসারে হিন্দুমতে সম্পন্ন হয়। এর ফলে, কেশবচন্দ্রের ইমেজ বা ভাবমূর্তি তাঁর অনুগামীদের অনেকের কাছেই নষ্ট হয়ে যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে নারীমুক্তির সমর্থক, সংবিধান বাদী, ফাইভ ল্যাম্পস মেন ও সিক্রেট লীগ মেন প্রভৃতি র‍্যাডিক্যাল ব্রাহ্ম উপদলের সভ্যরা কেশবচন্দ্রের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানান বাদ প্রতিবাদের তুফান উঠতে থাকে।

কেশব বিরোধীরা ১৮৭৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট হলে সভা করতে গিয়ে সভা করতে পারেন না।[৮৪] ২৮ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে সে প্রতিবাদ সভা হয়। কিন্তু প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কেশবচন্দ্র এ বিবাহ দিয়েছিলেন।

এর ফলে কেশব বিরোধীরা তাঁকে আচার্যের পদ থেকে চ্যুত করার জন্য ব্রাহ্ম-মন্দিরে এক সভা ডাকেন। সেই সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কেশবচন্দ্র সেন আর সমাজের আচার্য ও সম্পাদকের কাজ করতে পারবেন না। নতুন আচার্য নিয়োগ করা হল। এর পরদিন ব্রাহ্মমন্দিরে যে ঘটনার অবতারণা হয়েছিল তা ব্রাহ্মধর্মের ভাব-মূর্তি উজ্জ্বল রাখার পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। কেশব অনুগামীরা মন্দিরের দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে ভেতরে উপাসনায় বসেছিলেন। গেটে পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল। কেশব বিরোধীরা ঢুকতে গিয় পুলিশের বাধা পান। বেদীতে বসার

জন্ম হ'লে বচসাবচসি হয় এবং কেশবচন্দ্র নাকি এক ফাঁকে বেদিতে উঠে বসে পড়েন। ক্রুদ্ধ বিদ্রোহীরা নাকি সেদিন চিৎকার করে বলেছিলেন, এটা ব্রাহ্ম মন্দির নয়, চলুন এ মন্দির ত্যাগ করে যাই।

তাঁরা মন্দির ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের অবসানও সূচিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মধর্মের এই অন্তর্বিরোধ সেদিন সংবাদপত্রের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। কেশব বিরোধীরা ১২৮৪ বঙ্গাব্দের ৬ ফাল্গুন (১৮৭৮) সমালোচক নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ১৮৭৮ সালে (৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮০০ শক) তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এই উভয় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সমালোচক পত্রিকার প্রথম দু-তিন সংখ্যা পরে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক হন।

ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধের ভেতর দিয়ে ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে পট পরিবর্তন ঘটছিল তার রূপান্তর সংবাদ হিসাবেও পাঠকসমাজের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সোমপ্রকাশের মত পেশাদার সংবাদপত্র এই তর্ক বিতর্কে অংশ গ্রহণ না করে পারে নি। অবশ্য মতামতের দিক থেকে সোমপ্রকাশ ছিল কেশব বিরোধী এবং মূলত আদি ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শের সমর্থক।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের ১০ বৈশাখ ও ১৪ জ্যৈষ্ঠ সোমপ্রকাশে দুখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। প্রথম চিঠিখানি লেখেন মোকামা থেকে শ্রীভগবতীচরণ দে। দ্বিতীয় চিঠিখানি লেখেন শ্রীঈশানচন্দ্র বসু। কেশবচন্দ্রের কোচবিহার মহারাজার সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহের ব্যাপার সমর্থন করে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গৌরগোবিন্দ রায় ইণ্ডিয়ান মিরর ও ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতে একটি দীর্ঘ চিঠি প্রকাশ করেন। ভগবতীচরণের চিঠিখানি ওই পূর্বোক্ত চিঠির প্রতিবাদ। প্রতাপচন্দ্র প্রমুখের বক্তব্য ছিল যে কেশবচন্দ্র বিবেকের আদেশে এই কাজ করেছেন। এই বিবাহ অপৌত্তলিকভাবে হোক কেশবচন্দ্রের এই মনোগত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে তা পুরোপুরি পালিত হতে পারেনি। আংশিকভাবে পৌত্তলিকতা অংশ বজায় রাখতে হয়েছে।

পত্রলেখক ওই সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় লিখেছিলেন, 'কন্যাকে রাজরাণী করাই কেশববাবুর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।'

পরের চিঠিতে ঈশানচন্দ্র বসু কেশবচন্দ্রের আচার্যপদ থেকে অপসারণে খুশি হয়ে লিখছেন. 'কেশববাবু যে কুসংস্কারজালে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় সকলেরই বিদিত আছে। এখন সেই আকাশ পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু কিছু ফরসা হইয়া আবার ঘোর ঘনঘটা, ঝড় তুফান ও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেও দেখা যায়। কে জানে, এই নূতন সমাজ আবার কি করিবেন?' (১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫)

অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং ব্যক্তিস্বার্থে ক্ষতবিক্ষত তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের রূপটি এই চিঠিতে ফুটে উঠেছে। দেবেন্দ্রনাথ যে 'আড়ম্বরে' ব্রাহ্মসমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন পরবর্তীকালে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্য থেকে সে আড়ম্বর দূর হয়ে গিয়েছিল। 'অনুষ্ঠানকারী উন্নতিশীলেরা দুইদলে বিভক্ত হইয়া এখন পরস্পরের কপটতা, মিথ্যাবাদিতা, অকৃতজ্ঞতা, স্বার্থপরতা, দ্বেষ-হিংসা কিনা দেখাইয়াছেন? ইহাতে প্রতিপন্ন হইয়েছে যে লোক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে "অনুষ্ঠানকারী" ও "উন্নতিশীল" হয় সময় ক্রমে তাহাদের প্রকৃত মূর্তি প্রকাশ পায়, আপাততঃ তাহাদের বহিরাবরণ দেখিয়া তাহাদিগকে "উন্নতিশীল" মনে করা উচিত হইবে না।' (সোমপ্রকাশ, ঐ)

আমরা আগেই বলেছি যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক কর্তব্যটুকু পালন করে ব্রাহ্মধর্ম অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আপন প্রভাবকে খর্ব করেছে বটে কিন্তু এই ভাঙনের অবশ্য কোন সামাজিক ক্ষতি করতে পারেনি। বরং হিন্দুধর্মকে আরও উদার ও প্রশস্ত করেছে। চারিত্রিক স্ববিরোধিতা এবং একনায়কত্বের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্রের কয়েকটি অবদান নিঃসন্দেহে স্মরণীয় ছিল। কেশবচন্দ্রই বাংলার বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে সর্বভারতীয় জাতীয়তা উন্মেষে সহায়তা করেছেন। জাতীয় উজ্জীবনের পক্ষে এই সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত কেশবচন্দ্রের চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরোপলব্ধি মানুষের সমস্ত আচার আচরণকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে শিখিয়েছিল। এর ফলে তাঁর প্রেরণায় তরুণেরা চিন্তায় ও কর্মে ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হবার অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

কেশবচন্দ্রের আন্দোলনের ফলে নারী মুক্তি সম্পর্কে পরবর্তী কালের বাঙালি লেখকেরা সচেতন হয়েছেন।

তদুপরি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সাধু সন্তদের সঙ্গে ভক্ত প্রজাদের যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছিলেন সেই আদর্শ নব ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালিকে নিরঙ্কুশ পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে প্রতিহত করেছে। মনে রাখতে হবে বাঙালির পুনর্জাগরণের মূল অনুপ্রেরণা হল পাশ্চাত্য শিক্ষা। এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নব পাশ্চাত্য মতবাদ বাঙালির মনন ও মনীষাকে অধিকার করতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ বা রামনারায়ণ বসুর পক্ষে তা অতিক্রম করা সহজ হলেও সাধারণ শিক্ষিতের কাছে তা সহজ নাও হতে পারে। সুতরাং এই সমন্বয়বাদ বাঙালির মনকে প্রশস্ত করেছে। এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যেও এই সমন্বয়বাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

এই সমন্বয়বাদের আদর্শকে আরও পরিপূর্ণ রূপ দিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল সমন্বয়বাদী ধর্মব্যাখ্যার ফলে হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে বিরোধ প্রশমিত হয়েছিল। হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে গোঁড়াদের মনোভাব শক্তিশালী হলে নবজাগরণের পথ আরও বিলম্বিত হত।

কেশবচন্দ্রের মত তাঁর বিরোধী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বৈপ্লবিক চিন্তাধারাও পরবর্তী কালে প্রশমিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। 'যত মত তত পথ' এই বিশ্বাসবোধে তিনি উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের অধ্যাত্ম ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন।

হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আপাত ভেদ বন্ধন এই ভাবেই লুপ্ত হয়েছিল। হিন্দু-সমাজ ব্রাহ্ম আন্দোলন থেকেই নবজন্মান্তর লাভ করেছিল। সোমপ্রকাশ পরবর্তী কালে এই সমন্বয়ের কথাই লিখেছিলেন।

"হিন্দু সমাজ বহুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভাবগতিক উন্নতি ও অবনতির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের উপর লোকের যে বিদ্বেষভাব ছিল ক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে হিন্দু সমাজ যে কোন উপকার লাভ করেন নাই একথা বলিলে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়। ক্রমে ব্রাহ্ম হিন্দুকে চিনিতেছেন। কেশবের নববিধান হইতে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুকে আদর করিতে শিখিয়াছেন, জনকয়েক অজাতশত্রু ধার্ম্মিক বেশধারী চালক ভিন্ন বয়স্থ ব্রাহ্মণ হিন্দুর মাহাত্ম্য প্রচার করিতে শ্লাঘা মনে করিতেছেন, অনেক কার্য্যে হিন্দু ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন।' (৮ আষাঢ়, ১২৯৩)

বাংলার রিফরমেশন সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে সমন্বয়ের মধ্যে পরিণতিলাভ করেছিল। আর এই সুষম পরিণতির পক্ষে বাংলা সংবাদপত্র যে সহায়ক হয়েছিল ওপরের উদ্ধৃতি তারই প্রমাণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা

স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমি॥ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা॥ সভা সংগঠনের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার বিকাশ॥ জাতীয় ঐক্যচেতনা॥ বিদ্রোহের যুগ॥ সিপাহী বিদ্রোহ থেকে নীল বিদ্রোহ ঃ

বাংলাদেশের রেনেশাঁস আন্দোলন সমাজসংস্কার শিক্ষাপ্রসার ধর্মসংস্কার স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে স্বাধিকার চিন্তায় দেশবাসীকে উত্তরণ করায়। এই সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-বিপ্লব থেকে যে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল সে কথা আগেই বলেছি। আমরা একথাও বলেছি রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবনার মধ্যে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ কেউই ইংরাজ রাজত্বের আশু অবসান এবং দেশবাসীর ওপর ক্ষমতা হস্তান্তর চান নি। উনিশ শতকের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোয় ভারতীয় জনগণকে উপযুক্তভাবে তৈরি না করে স্বাধীনতার কথা বলা তাঁদের কাছে অর্থহীন বলেই বোধ হয়েছিল। বরং সমাজ নেতারা অনেকেই ইংরাজ শাসনের দীর্ঘজীবনই কামনা করেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের ফলে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের সম্মুখে নতুন সুযোগ সুবিধা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল। বণিক, ধনিক ও সামন্ত শ্রেণীও উপদ্রবহীন বিত্ত সঞ্চয়ের সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলেন। সুতরাং হিন্দু বাঙালির পক্ষে ইংরাজ রাজত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশই স্বাভাবিক ছিল। তাই ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহ হয়েছে একমাত্র নীল বিদ্রোহ ছাড়া তার একটিও বাংলা দেশে জনসমর্থন লাভ করতে পারে নি। নীল বিদ্রোহকে বাঙালি সমর্থন করেছিল তার একটা বড় কারণ এ বিদ্রোহ অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজপুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। রাজপুরুষদের অত্যাচারে দেশবাসী আগে থেকেই ক্ষিপ্ত হয়েছিল। অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধেও সে সময় মধ্যবিত্তের ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। এই নীল বিদ্রোহ বাদ দিলে বাঙালি ইংরাজ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বই কামনা করেছে। এবং অনেক সংবাদপত্রে ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রতি এই অবস্থার কথাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন রাজপুতনায় পিণ্ডারীদের পরাভব এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির সুপ্রতিষ্ঠায় আনন্দিত হয়ে সমাচার দর্পণ একদা লিখেছিলেন, "এতদ্দেশীয় দুঃখী প্রজারা যে কোম্পানির সুকীর্ত্তি গান করিতেছে সে খোসামোদ নহে কিন্তু সে যথার্থ। সম্প্রতি সেখানকার প্রজারা অকুতোভয় হইয়া মাঠে ও জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে কৃষি প্রভৃতি করিয়া পরম সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে। মোং ওদয়পুরেও সেইরূপ। সেখানকার প্রজারদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তোমরা কাহার প্রজা তবে তাহারা উত্তর করে আমরা 'এই ভয়ানক সময়ে মহারাজাধিরাজ

রাজচক্রবর্ত্তি ইংলণ্ডাধিপতির এ প্রদেশ অধিকার হইবার কেমন হইল যেমন তৃণকাষ্ঠ নিৰ্ম্মিত গৃহদাহ হইতেছে এমতসময়ে ঐ গৃহোপরি মুষলধারে বারিবর্ষণ হইলে ঐ গৃহস্থিত ব্যক্তিদিগের যে প্রকার আনন্দ হয় তাহা বিবেচনা করিবেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুঃখসকল দূর হইল প্রজার ধন হইলে প্রকাশ করিবার শঙ্কা নাই নানাবিধ বাণিজ্য ব্যবসায়ে কালযাপন হয় রাজাকে কখন কেহ দেখে নাই লোকদিগের এমন সংস্কার হইয়াছিল রাজার নাম শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পল্লীগ্রামে অদ্যাপি অনেক লোকের এমতবোধ আছে। এজন্য সদ্বিচারাদিতে সর্ব্বপ্রাপ্ত হইলেই কহে কোম্পানির জয় হউক এবং শ্রীযুত তদ সাহেবের প্রজা। যেহেতুক ঐ সাহেব তৎ প্রদেশের অধ্যক্ষ।" (৬ মে ১৮২০) 'প্রজারা কোম্পানির সুকীর্তি গান করিতেছে।' এই দৃশ্য দেখে সমাচার দর্পণ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। দর্পণ ইওরোপীয় মিশনারিদের মালিকানাধীন সংবাদপত্র। তাঁদের এ আনন্দ স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু বাঙালির সম্পাদনায় ও মালিকানাধীনে একটি বাংলা সংবাদপত্রের ইংরাজ রাজত্ব সম্পর্কে কী মনোভাব ছিল তা নীচের অংশটি পাঠ করলে জানা যাবে। "ধাৰ্ম্মিক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলের উচিত কর্ম্ম প্রতিদিন রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন তাঁহারাও অদ্যাপিও কহিয়া থাকেন কোম্পানি বাহাদুর চিরদিন রাজত্ব করুন।"

ওই মন্তব্য সমাচার চন্দ্রিকার ১৮৩১ সালের (১২৩৮)। হয়ত একথা উঠতে পারে ত্রিশের দশকে যখন স্বাধিকার চিন্তার পূর্ণ অঙ্কুরোদ্গম হয়নি তখন সমাচার চন্দ্রিকার মত প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রের পক্ষে এই ইংরাজ স্তুতি অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কেশবচন্দ্র সেনের মত প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারকও ১৮৭৪ সালে (২৭ জৈষ্ঠ ১২৮১) সুলভ সমাচারে লিখেছিলেন: "ইংরাজেরা কেবল রাজা নহেন, আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা বলিলেও হয়। আমরা আর্য্যজাতি, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন ইহা বলিয়া আস্ফালন করা কাপুরুষতা মাত্র। মুসলমান রাজত্বকালে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল সেই দুর্দ্দশা হইতে কে উদ্ধার করিল এখন যে একটু লেখাপড়া শিখিয়া আপনাদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছে, সেই লেখাপড়াই বা কে শিখালে, এসকল কথা স্মরণ করিলে কোন মূর্খ ইংরাজকে ঘৃণা করিতে পারে; এবং ইংরাজদের দূর করিয়া আপনারা রাজা হইতে চায়? যে সকল নীচাশয় ইংরাজ, বাঙ্গালী দিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে তাহারা ইংরাজজাতির আদর্শ নহে, এজন্য তাহাদের কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া সমুদয় ইংরাজ জাতিকে ঘৃণা করা নিতান্ত অন্যায়। যাঁহারা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া ক্ষেপিয়াছেন, ইংরাজদিগের প্রতি ঘৃণাই তাঁহাদের ক্ষেপিবার কারণ।

"যাহারা কেবল ইংরাজের নিন্দা করিয়া বড় লোক হইতে চায়, দেশহিতৈষী হইতে চায় তাহাদের অপেক্ষা মহামূর্খ জগতে নাই। যে ইংরাজ জাতি আমাদের রাজা, রক্ষক, উপদেষ্টা ও সুহৃদ তাঁহাদের প্রতি দেশের লোকের মনে ঘৃণা জন্মাইয়া দেওয়া ইহা অপেক্ষা গর্হিত কার্য্য কি আছে?"

এই 'উদ্ধারকর্তা' ইংরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতাই বুদ্ধিজীবীদের অনেককে রাজভক্ত করে তুলেছিল। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী তথা রেনেশাঁসের প্রবক্তাদের প্রায় সকলেই ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত করে গিয়েছেন। রাজা রামমোহন তো এদেশে ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেই বলেছিলেন। ইংরেজরা এদেশে 'নীলকুঠি' করুক চেয়েছিলেন। রামমোহনের মতে এর ফলে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন ত্বরান্বিত হত। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে ভারতীয়দের মানসিক উন্নতি হত।[১]

তবে এই ইংরাজ আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েও বাঙালি মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রখর আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় দিয়েছেন ও স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এবং উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকটি সংবাদপত্রে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণা ও ইংরাজ রাজপুরুষদের অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। এদিক থেকে এইসব সাংবাদপত্রগুলিকে স্বাধীনতা চিন্তার বার্তাবহ বলা যেতে পারে। রাজনৈতিক সভাসমিতি সংগঠনের মাধ্যমে বাঙালিরা যে সময় নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদেশী রাজশক্তির কাছে আবেদন নিবেদন এবং কখনও প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন, তখন কিছু বাংলা সংবাদপত্র আরও স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে ইংরাজ শাসনের সমালোচনায় মুখর হয়।

ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকে, রেনেশাঁসের মশাল শিখা প্রজ্বলিত হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত বাঙালির মনন ও মনীষায় স্বাধিকার চিন্তার কোন প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দীরও অধিক সময় বাঙালি বিদেশী রাজশক্তির রাজনীতি ও দণ্ডনীতিকে নিয়তির অমোঘ পরিণাম বলেই মেনে নিয়েছে। রামমোহন এসে সর্বপ্রথম জাতির স্বাধিকার চেতনাকে উজ্জীবিত করেন।

বিশ্বের পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা সম্পর্কে রামমোহনের প্রবল আগ্রহ ছিল। রামমোহনের বন্ধু জন অ্যাডাম ১৮৩৮ সালের বোস্টনের এক জনসভায় উল্লেখ করেছেন. যে সদ্যমুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও সে দেশের প্রশাসন সম্পর্কে রামমোহন খুঁটিনাটি খবর রাখতেন।[২] ফরাসী বিপ্লবের অপমৃত্যু ও নেপলিয়নের ক্ষমতা অধিকারে রামমোহন ব্যথিত হন। আবার ১৮৩০ সালে জুলাই বিপ্লবের সাফল্যে তিনি এত উদ্দীপিত হয়েছিলেন যে তিনি সাময়িক ভাবে অন্য কিছু চিন্তা করতে বা অন্য কিছু আলোচনা করতে পারতেন না।[৩] নেপলসে কারবোনারি সম্প্রদায় বুরবন রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাম্য ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র দাবি করেছিলেন। এই বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং বিদ্রোহের দুই নেতা মরেলি ও সিলভ্যাতির ফাঁসি হয়। এই সংবাদ যেদিন ভারতে এসে পৌছয় সেদিন পূর্বনির্ধারিত কার্যসূচী অনুসারে জেমস সিলক বাকিংহামের গৃহে রামমোহনের নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। স্বাধীনতা-কামীদের পরাজয়ের সংবাদে রামমোহন এতখানি ব্যথিত হয়েছিলেন যে তিনি ভোজসভায় যোগদান বাতিল করে দিয়ে বাকিংহামকে একটি চিঠি লেখেন। এই

চিঠিখানির মধ্যে রামমোহন লিখেছিলেন, এই অশুভ খবরটি শুনে তাঁর মনে হ. যে এশিয়ার ও ইউরোপের পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা তিনি হয়ত জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবেন না।

"From the late unhappy news I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations, especially those that are European Colonies possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy.

Under these circumstances, I consider the cause of the Nepolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful."[৪]

এই চিঠির দ্বারা এটি স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে রামমোহনের অন্তরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চিন্তা সুপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতার অগ্রে দেশবাসীর মানসিক প্রস্তুতি চেয়েছিলেন। সংস্কারবর্জিত মন, উদার ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বাঙালি সর্বাগ্রে দেশবাসী হিসাবে তার ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক রামমোহন সর্বাগ্রে এটিই চেয়েছিলেন। এই 'অধিকার'কেই আমরা স্বাধিকার বলেছি। বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বাঙালির এই স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলন নানান ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এবং এই আন্দোলনই উনিশ শতকের শেষ অংশে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে নতুন বাঁক নিয়েছে।

কোন কোন সংবাদপত্রে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হলেও সরকারী স্তাবকতাকে কোন বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রই নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন নি। বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে বাংলা সংবাদপত্রগুলি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। তাঁদের এই সমস্ত চিন্তাধারার মধ্যে এক নবজাগ্রত জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার বাণী মূর্ত হয়ে ওঠে। রামমোহন যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন বাংলা সংবাদপত্রগুলির মধ্যে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।

উনিশ শতকের বাঙালির স্বাধিকার চিন্তার সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে। আমরা এই গ্রন্থের প্রথম দিকেই আলোচনা করেছি যে বাঙালির রেনেশাঁসের পুরোধা প্রায় সকলেই ছিলেন সাংবাদিক। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা চিন্তাও সাংবাদিকদের মাধ্যমেই সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে সাংবাদিকরা শুধু সম্পাদকীয় লিখেই ক্ষান্ত নন—সংবাদপত্রের কার্যালয় থেকে তাঁরা নেমে এসেছেন জনসাধারণের কাছে। সভা সংগঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কলকাতা থেকে যে দুজন

প্রতিনিধি যান তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সাংবাদিক—নব বিভাকর সম্পাদক গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দমনের বিরুদ্ধে তাই বাঙালি সাংবাদিকেরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং পত্র-পত্রিকার বাহিরে সভাসমিতির মাধ্যমেও সমান ভাবে জনমত গঠন করেছিলেন। স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে বাংলা সংবাদপত্র কীভাবে জাতিকে এগিয়ে দিয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করলেই তা স্পষ্ট হবে।

(১) বিভিন্ন সভাসমিতি ও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বাঙালি সংবাদপত্র-সেবীরা জড়িত ছিলেন। অনেক সংবাদপত্র এই সব সংগঠনের মুখপাত্র হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করে। ওই সমস্ত সভাসমিতি ও সংগঠনের মাধ্যমে বাঙালির যে সব স্বাধিকার চিন্তা প্রকাশ পেত বহু বাংলা সংবাদপত্র তা সমর্থন করতেন এবং জাতীয় লক্ষ্যের দিকে নিজেদের পরিচালিত করতেন। বহু ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্র এই সব সংগঠনগুলিকে সাহস ও প্রেরণা যোগাতেন এবং অনেক অগ্রবর্তী রাষ্ট্রচিন্তাও এই সব সংবাদপত্রে প্রকাশ পেত। রাজনৈতিক সংগঠনগুলি যেসব ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করতেন বাংলা সংবাদপত্রগুলি সেগুলি নিয়ে জনমত গঠন করতেন।

(২) বাংলা সংবাদপত্রগুলি প্রশাসনিক দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। রাজপুরুষদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তাঁরা নির্মম ছিলেন। 'রাজা কোনো অন্যায় করতে পারেন না' এবং করলেও জনগণকে তা মুখ বুঁজে সহ্য করে যেতে হবে এই ধারণা বাংলা সংবাদপত্রই সাধারণের মন থেকে দূর করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে তাঁরা কৃষকদের ন্যায্য দাবিকে সমর্থন করেছিলে। পরাক্রমশালী জমিদারদের বিরুদ্ধে কলম ধরে সেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন।

(৩) বাংলা সংবাদপত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সপক্ষেও সোচ্চার হয়েছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে বাঙালিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হবার জন্য বলেছিলেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নামে বিদেশী বণিকদের ভারতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে এক অপরিহার্য অঙ্গ।

(৪) স্বাদেশিকতার উদ্বোধন ও জাতীয়তার প্রসারে বাঙালি মনীষীদের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি বাংলা সংবাদপত্রের সমর্থন ছিল। জাতীয়তার উদ্বোধনে বাংলা সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ছিল গৌরবময়।

(৫) নীল বিদ্রোহের প্রতি বাংলা সংবাদত্রগুলি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। নীল বিদ্রোহ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রাষ্ট্রিক কাঠামোয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর অর্থবহ ঘটনা। এই সংগ্রামে জয়ী হয়ে বাঙালির স্বাধিকার রক্ষার মনোবল আরও দৃঢ় হয়।

এইবার বিস্তৃতভাবে এই বিষয়গুলির অবতারণা করা যাক

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধের ফলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লর্ড ওয়েলেসলী ১৭৯৯ সালে সংবাদপত্রের ওপর কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ জারি করেন। অবশ্য এই বিধিনিষেধ শুধু ইওরোপীয় সংবাদপত্রের ওপরেই প্রযোজ্য ছিল। তবে এই বিধিনিষেধের কতগুলি শুধু যুদ্ধকালীন অবস্থার পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল। পরবর্তী কালে "the duty of the censor had been exercised in a manner which while it prevented the publication of articles calculated to weaken the authority of Government, to shock the religious feelings or prejudices of the natives to violate the peace and comfort of Society, allowed to the editor sufficient scope for the useful discussions of questions of general interest."[৬]

মারকুইজ হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩) ক্ষমতায় আসার পর সংবাদপত্রের ওপর এই সব বিধিনিষেধ তুলে দেন। সম্পাদকদের শুধুমাত্র কয়েকটি সাধারণ আচরণবিধি পালন করতে বলা হয়। যে সমস্ত আলোচনা সরকারের প্রতি বিরূপতা জাগিয়ে তুলতে পারে বা জনস্বার্থের হানি ঘটাতে পারে তা থেকে সংবাদপত্রকে বিরত থাকতে বলা হয়।[৭] হেস্টিংসের নতুন উদার সংবাদপত্র নীতি ১৮১৮ সালের ১৯ আগস্ট থেকে প্রচলিত হয়। হেস্টিংস সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন :

'Inter communication of thought by printing ought to be unrestrained for the sake of the Governed and should be so under his administration'[৮]

প্রকাশিত সংবাদপত্র সেক্রেটারীর অফিসে পেশ করার বিধি অবশ্য বহাল ছিল। হেস্টিংস এই নিয়মও বাতিল করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পরিষদ সদস্যরা তাতে সম্মত হন নি।[৯] কিন্তু তাহলেও সংবাদপত্রের উপর থেকে প্রাগসেনসরশীপ বিধি প্রত্যাহার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ ছিল। হেস্টিংসের সেই ঐতিহাসিক আদেশটি যা তাঁর চীফ সেক্রেটারি জন অ্যাডামের নামে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম লাইনেই ছিল সরকার সম্পাদকদের বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধির উপরই সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য রচনা বাছাইর ভার ছেড়ে দিলেন।

"Relying on the prudence and discretion of the editors for their careful observance of these rules, the Governor-Ceneral-in-council is pleased to dispense with their submitting their papers to an officer of Government previous to publication. The editors will, however, be held personally accountable for whatever they may publish in contravention of the rules now

committed, or which may be otherwise at variance with the general principles of British law as estabilished in this country, and will be proceeded against in such manner as the Governor-General-in-council may deem applicable to the nature of the offence, for any deviation from them.

The editors are further required to lodge in the Chief Secretary's office one copy of every newspaper, periodical or extra, published by them respectively.

তবে এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদকদের পক্ষে পালনীয় একটি আচরণ বিধি তৈরি হয়েছিল। এই আচরণ বিধিতে মোট চারটি ধারা সংযোজিত হয়। তাতে মোটামুটি বলা হয় যে কোম্পানির পরিচালকবর্গের কাজকর্মের সমালোচনা, বিচারপতি, বিশপ ও কাউনসিল সদস্যদের সমালোচনা, স্থানীয় জনসাধারণের ধর্ম বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন রচনা, ব্যক্তিগত কুৎসা ও সমাজের অসন্তোষ বৃদ্ধি করতে পারে এমন কিছু লেখা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা কখনও সঙ্গত হবে না।

কিন্তু ১৮২৩ সালের ১৩ জানুয়ারি জন অ্যাডাম অস্থায়ী গবর্নর হন। এ সময় আবার নতুন করে সংবাদপত্র দলনের ব্যবস্থা হয়। এই সংবাদপত্র দলন নীতির বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সুর তখন থেকেই। মারকুইজ হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর (১ জানুয়ারী ১৮২৫) লর্ড আমহার্স্ট গবর্নর মনোনীত হন। কিন্তু ভারতে এসে কর্মভার গ্রহণ করতে তাঁর সাতমাস লেগে যায়। এই সময়ের জন্যই অ্যাডাম অস্থায়ী গবর্নর হয়েছিলেন। তার আগে তিনি ছিলেন কাউন্সিলের প্রবীণতম সদস্য।

কাউন্সিলের সদস্য থাকার সময়ই তিনি সংবাদপত্রের ওপর খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৮২২ সালের ১৭ মে ক্যালকাটা জার্নাল একটি চিঠি ছাপার জন্য তাঁর বিষনজরে পড়ে। জন অ্যাডাম তাঁর দ্বিতীয় মাইনিউটে বলেছিলেন : 'the license recently claimed and exercised in this respect has tended to weaken the proper influence of the Government and to excite much discontent and insubordination without any corresponding belief.[১০]

চীফ সেক্রেটারি থাকার সময় থেকেই অ্যাডামের লক্ষ্য ছিল ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক বাকিংহামকে বিতাড়িত করা। হেষ্টিংস এই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে রাজি হননি।[১১] কিন্তু হেষ্টিংসের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাকিংহামকেও ভারত থেকে বিদায় নিতে হয়। ১৮২৩ সালের ১২ ফেবরুয়ারি এক আদেশ বলে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে বাকিংহামকে ভারত ত্যাগ করতে বলা হয়। ১৮২৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর জন অ্যাডাম সুপ্রীম কোর্টের আছে সংবাদপত্র দলনের জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পেশ করেন।

এই ব্যবস্থা অনুসারে বলা হয় যে, এখন থেকে সমস্ত সাময়িকপত্র প্রকাশ করতে

গেলে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। সাময়িকপত্র প্রকাশের জন্য যাঁরা দরখাস্ত করবেন তাঁদের নামধাম পরিচয় সম্বলিত এবিডেভিট করতে হবে। গবর্নর জেনারেল যখন খুশি সাময়িকপত্রের লাইসেন্স বাতিল করতে পারবেন। বিধান ভঙ্গকারাদের অর্থদণ্ড দেওয়া হবে, আর একটি রেগুলেশনে ছাপাখানা রাখার জন্যও লাইসেন্স নেওয়া আবশ্যিক করা হয়।

এই রেগুলেশনের বিরুদ্ধে তৎকালীন বাঙালি সংবাদপত্র প্রকাশকেরা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার ফ্যানসিস ম্যাকর্নটেনের কাছে একটি আবেদন করেন। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন: চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরচরণ ব্যানার্জী ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখেরা।[১২]

এই দরখাস্তের মূল সুরের মধ্যে বিনয় ও রাজানুগত্য প্রকাশ পেলেও বিদেশী শাসকদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রজারা ব্রিটেনে যে স্বাধিকার ভোগ করে থাকেন ভারতের ব্রিটিশ প্রজারাও যে সেই সমান অধিকার ভোগ করবেন এটাই ভারতবাসীরা প্রত্যাশা করেছিলেন। রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তরকে তাঁরা স্বৈরাচার থেকে মুক্তি বলেই গ্রহণ করেছিলেন। সেই মুক্ত ও পরিবর্তিত পরিবেশে এদেশে ব্রিটেনের মতই ন্যায়, নীতি ও আইনের চোখে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই তাঁদের অভিপ্রেত ছিল। ওই আবেদনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে তাঁরা right বা অধিকার বলেই গণ্য করেন।

"After this sudden deprivation of one of the most previous of their rights which has been freely allowed them since the Establishment of the British Power, a right which they are not, and cannot be charged with having ever abused, the inhabitants of Calcutta would be no longer justified in boasting, that they are fortunately placed, by providence under the protection of the whole British Nation, or that the King of England and his Lords and Commons are their legislators, and that they are secured in the enjoyment of the same civil and religious privileges that every Briton is entitled to in England."[১৩]

এর পরে ইংলণ্ডের রাজদরবারে প্রেস আইন রদের জন্য একটি আপিল পাঠানো হয়। তাতে তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন আইনের বিচারে কোন অপরাধ প্রমাণিত হলে তাঁদের শাস্তি নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু "not at the will and pleasure of one or two individuals without investigation or without hearing any defence or going through any of the forms prescribed by law to ensure the equitable administration of Justice."[১৪] আইনের চোখে সমবিচারের দাবি এই স্বাধিকার চেতনা থেকেই উদ্ভূত।

শুধু তাই নয়, ১৮২৩ সালের প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে রামমোহন তাঁর ফারসি পত্রিকা মীরাৎ-উল আখবার-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৮২৩ সালের ৪ এপ্রিল মীরাৎ-উল আখবারের অতিরিক্ত সংখ্যায় পত্রিকা বন্ধের পিছনে রামমোহন যে কারণ দিয়েছিলেন তাতে তাঁর প্রখর আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় পাওয়া পাওয়া যায়।

"প্রথমতঃ প্রধান সেক্রেটারির সহিত যে সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ, এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দ্বার পরিহার হওয়াও কঠিন। কথা আছে—

"আব্রুকে বা সদ খুন ই জিগর—
দস্ত দিহদ
বা উমেদ-ই করম-এ, মানা বা
দ্বারবান মা ফরোশ।"

অর্থাৎ যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহে তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

"দ্বিতীয় প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধা বাধকতা নাই যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বে আইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।"[১৫]

রামমোহনের এই বক্তব্যের মধ্যে বিদেশী শাসকবর্গের সংবাদপত্র শাসননীতির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। তবে সংবাদপত্রের স্বাধিকার রক্ষার এই সংগ্রাম রামমোহনে মৃত্যুর পর শেষ হয়ে যায়নি। বরং সংগ্রাম আরও জোরদার হয়ে ওঠে। যা ছিল বিনীত নিবেদন তা ক্রমে প্রতিবাদের ভাষায় পরিণত হয়।

১৮২৩ সালের প্রেস রেগুলেশন আইনের বিরুদ্ধে ইওরোপীয় প্রকাশকেরাও বাঙালি প্রকাশকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বড়লাট বেন্টিঙ্কের কাছে ১৮২৩-এর কালা প্রেস আইন বাতিলের দাবি জানিয়ে যে গণদরখাস্ত পাঠানো হয়েছিল তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন উইলিয়ম অ্যাডাম, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসিকলাল মল্লিক, ই এম গরডন, রসময় দত্ত, এল এল ক্লার্ক, সি হগ, টি এইচ বারকিন ইয়ং, ডেভিড হেয়ার, জে সাদারল্যাণ্ড প্রমুখেরা।[১৬]

১৮৩৫ সালের ১৮ মে ভারতের সুপ্রীম কাউন্সিলের বৈঠকে একাদশ আইনের খসড়াটি পেশ করা হয়। এই আইনের খসড়াটি বেন্টিঙ্কের আদেশে সুপ্রীম কাউন্সিলের লেজিসলেটিভ মেম্বর মেকলে রচনা করেছিলেন। কিন্তু বেন্টিঙ্ক এটিকে আইনে পরিণত

করে যেতে পারেন নি। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৮৩৫-এর মার্চ মাসে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। অস্থায়ী গবর্নর হন চার্লস মেটকাফ। মেটকাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে প্রিনসেপ ও মরিসন দেশীয় সংবাদপত্রগুলির নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু মেটকাফ মনে করেছিলেন: "restraint on the native Press beyond what is imposed on the European would be injudicious ; and that and restraint on either beyond that of the laws is not requisite"[১৭]

৩ আগস্ট কাউন্সিলের সভায় আইনটি গৃহীত হয়।

১৮২৩ সালের প্রেস রেগুলেশন বাতিল করে ১৮৩৫ সালের আইন গ্রহণ স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামের পক্ষে বিরাট বিজয়। কলকাতার নাগরিকেরা সেদিন মেটকাফকে ধন্যবাদ দেবার জন্য টাউনহলে সভার ব্যবস্থা করেছিলেন (৮ই জুন ১৮৩৫)। সভায় ঠিক হয়েছিল মেটকাফের কীর্তি অক্ষয় করে রাখার জন্য তাঁর নামে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। মেটকাফের কাছে যে যৌথ আবেদন পাঠানো হয়েছিল তার প্রতিলিপি টাউনহলে প্রোথিত করা হয়েছিল।[১৮] এই সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যা বলেছিলেন অন্ধ ব্রিটিশ আনুগত্যের যুগে তা ছিল বৈপ্লবিক। দক্ষিণারঞ্জন বলেন—

"আমরা যে স্বাধীনতা চাই তা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা নয়, তা দায়িত্বপূর্ণ অথচ অবাধ স্বাধীনতা। দোষী ব্যক্তি আইনের অধীন নিশ্চয় হবে। সে যদি দণ্ডার্হ হয় বিচারালয় নিশ্চয়ই তাকে দণ্ড দেবে। আমি এজন্য দুঃখিত যে প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ না করার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে। যদি তিনি এ আইন ভাল বিবেচনা করতেন তবে তাঁর উচিত ছিল এ আইন প্রয়োগ করা, যদি ভাল বিবেচনা না করতেন তবে উচিত ছিল আইনটি তুলে দেওয়া। এর কোনটিই না করা নিছক ভণ্ডামী মাত্র।"[১৯]

১৮৩৫ সালের আইনে সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণের নিয়ম বাতিল করে দেওয়া হয়, যে কেউ সাময়িকপত্র প্রকাশের অধিকারী হন। অবশ্য মেটকাফের এই উদারনীতিকে ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডাইরেক্টরসরা সুনজরে দেখেননি। ১৮৩৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি কোর্ট অব ডাইরেক্টরসরা গবর্নর জেনারেলকে লেখা একটি চিঠিতে মেটকাফের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন।[২০]

১৮২৩ সালের প্রেস রেগুলেশনের মত ১৮৭৮ সালের ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধেও জনমত সংগঠিত হয়েছিল। ভার্নাকুলার প্রেস আইনের (১৮৭৮ সালের নবম আইন) মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা। এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে যাতে সরকার-বিরোধী বা সরকারের অনভিপ্রেত কোন মন্তব্য প্রকাশিত না হতে পারে তার চেষ্টা করা। এই উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

তাঁরা ইচ্ছা করলে যে কোন দেশীয় সংবাদপত্রের প্রকাশককে এই মর্মে মুচলেকা দিতে বাধ্য করতে পারবেন যে সরকারের প্রতি অসন্তোষ জন্মাতে পারে এমন কিছু তাঁরা কদাচ প্রকাশ করবেন না। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিদ্বেষ জাগতে পারে এমন কিছু খবর প্রকাশও করতে তাঁরা বিরত থাকবেন।

ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে সেক্রেটারি অব স্টেট কাউন্সিলের তিনজন সদস্য নিজেদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। মোট দশজন সদস্যের মধ্যে দু'জন এই আইনের সমর্থন করেন। একজন নিরপেক্ষ থাকেন। ১৮৭৮ সালের জুলাই মাসে হাউস অব কমন্সের সদস্য গ্লাডস্টোন প্রস্তাব দেন যে ভারতে ভার্নাকুলার প্রেস আইন অনুসারে যে সব মামলা হবে তার সমস্ত বিবরণ সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানাতে হবে এবং পার্লামেন্টে তার বিবরণ মাঝে মাঝে পেশ করতে হবে। কিন্তু পার্লামেন্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে জনমত যে প্রবল হয়ে উঠেছিল তার একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে সোমপ্রকাশের রচনায়। সোমপ্রকাশ এই বিধিনিষেধের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ১২৮৫ সালের ২১ শ্রাবণ সোমপ্রকাশ লেখেন: "গ্লাডস্টোন সাহেবের প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্ট সভায় অগ্রাহ্য হওয়াতে আমাদিগের আর একটি সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ইংরেজ জাতির সেই পূর্ব্বেকার সমদর্শিতা ধর্ম্ম ও ন্যায় নিষ্ঠা আর নাই। তাহা থাকিলে তাঁহারা কখন অনায়াসে অক্ষুণ্ণ মনে ঘোর পক্ষপাত দূষিত ৯ আইনে মত প্রদান করিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেবকে পরাস্ত করিয়া দিতেন না। আমাদিগের রাজপুরুষেরা যদি সমদর্শী হইয়া ইংরাজী বাঙ্গালা সমুদয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র থাকুক আর উঠিয়া যাউক তাহাতে আমাদিগের ক্ষোভ হইত না। আমাদিগের কর্ত্তারা ঘোর পক্ষপাতী হইলেন। এরূপ পক্ষপাতী হইয়া কিরূপে রাজ্য করিবেন। এদেশীয়দিগকে তাঁহারা যে অসন্তুষ্ট দেখিতে পান তাঁহাদিগের পক্ষপাতিতাই তাহার কারণ। আমরা স্পষ্টাক্ষরে মহানুভব লর্ড লিটনকে জানাইতেছি, এদেশের কোন লোকেরই এমন ইচ্ছা নয় যে ইংরাজরা রাজ্যচ্যুত হন বা উৎসন্ন যান। ইংরাজেরা কতকগুলি অন্যায় কাজ করেন বলিয়াই এদেশীয়েরা সময়ে সময়ে চটিয়া ওঠেন এবং রুক্ষভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাহাতেই ছালপাতলা রাজপুরুষেরা এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে বিদ্রোহী বোধ করেন। কিন্তু মহানুভব লর্ড লিটন যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, ইংরাজী পত্রের ইংরাজ সম্পাদকদিগের অপেক্ষা এদেশীয় সম্পাদকেরা গভর্ণমেণ্টকে অধিক কটু বলেন না। এদেশীয় সংবাদপত্র হইতে অধিক অনিষ্ট হয় বলিয়া তাঁহাকে যে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছলমাত্র, বাস্তবিক নয়।"

ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুধু সাংবাদিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণ এই আইনের প্রচলনে সংবাদপত্র-

সেবীদের মত সমানভাবে আহত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এই আইন নেমে এসেছিল বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত।[২১]

কিন্তু এই বজ্রপাতে বাঙালি সমাজ ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল হলেও মৌনবাক হয়ে যাননি। তাঁরা এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। এই প্রতিরোধের আন্দোলনের প্রতি অবশ্য বিত্তশালী সমাজ নিরাসক্তি দেখিয়েছেন। এ পর্যন্ত বাঙালির রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন বিত্তশালীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে আসছিল। ষাট দশক থেকে স্বাধীন মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব জন্ম নিতে থাকে। বিশেষ করে এই ভার্নাকুলার প্রেস আইনকে কেন্দ্র করে বিত্তশালী ও মধ্যবিত্তের শ্রেণী-স্বার্থের সীমারেখা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন, ভার্নাকুলার প্রেস আইন থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালি যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁরা কখনও ভোলেন নি। মধ্যবিত্ত এর ফলে শ্রেণী-স্বার্থ সচেতন হয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথের মতে তাই ভার্নাকুলার প্রেস আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাতীয় বিবর্তনের ক্ষেত্রে এক সুনির্দিষ্ট এবং প্রগতিশীল অধ্যায়।[২২]

ভার্নাকুলার প্রেস আইন নিয়ে দেশব্যাপী উত্তালতার পটভূমিতে অমৃতবাজারের কণ্ঠ ছিল সর্বাপেক্ষা সরব। কারণ অমৃতবাজারের প্রবন্ধকে কেন্দ্র করেই এই আইনের অবতারণা করা হয়েছিল। ১৮৬৮ সালের ২১ মার্চ বাংলা থেকে ইংরাজীতে রূপান্তরের পর অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেন :

"A subservient Press means no Press in the long run. But what is the good of a Press at all that is subservient ? It will not represent the feelings and wishes of the nation. It will not lead but mislead the nation. The institution will not be wanted in the country, but it will stand a huge lie deceiving both the Government and the nation. It is far better to grope in the dark than to have a light which misleads. It is better to have no advocate and depend upon the good sense of the Judge than to trust one who is false and treacherous."

১৮৮১ সালের ৭ ডিসেম্বর লর্ড রিপন ভার্নাকুলার প্রেস আইন বাতিল করেছেন। জন অ্যাডাম থেকে লর্ড লিটন পর্যন্ত অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সংবাদপত্র সম্পর্কে সহনশীলতা শাসনকর্তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচির ওপর নির্ভর করেছে। যখনই উদারনৈতিক কোন শাসনকর্তা এসেছেন সংবাদপত্র সম্পর্কেও তিনি উদারনীতি গ্রহণ করেছেন। লর্ড লিটনের পর লর্ড রিপন ভারতীয়দের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না 'স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন

বলেই পরবর্তী শাসকেরা জনমত প্রশমনের জন্য জনবিরোধী আইন বাতিলের কথা ভেবেছেন।' (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

সভা-সংগঠন-সংবাদপত্র

উনিশ শতকের বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলি স্বাধিকার চেতনা বিকাশে বিশেষ সাহায্য করে। এর মধ্যে গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মত সামাজিক সংগঠন যেমন ছিল তেমনি ছিল জমিদারি অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মত রাজনৈতিক সংগঠন। বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকদের অধিকাংশই এইসব সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অনেক সংবাদপত্র সমিতির মুখপত্র হিসাবে কাজ করেছিল।

সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জড়িত ছিলেন গৌড়ীয় সমাজের সঙ্গে। বেঙ্গল স্পেকটেটর সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢ্যও সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার সভ্য ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণের দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও রঙ্গরাঙ্গনী সভার সঙ্গে সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জড়িত ছিলেন। তাছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতো তত্ত্ববোধিনী (পূর্ণ নাম তত্ত্বরঙ্গিনী) সভার মুখপত্র হিসাবেই প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল স্পেকটেটরের রামগোপাল ঘোষ আবার বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সহ সভাপতি ছিলেন। ইণ্ডিয়ান লীগের সহ-সম্পাদক ছিলেন অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ। শিশিরকুমার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশে বাঙালির উদ্‌যোগে প্রথম সমিতি রামমোহনের আত্মীয় সভা (১৮১৫)। আধ্যাত্মিক আলোচনা ছাড়া এ সভায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। এই সমস্ত আলোচনা নিঃসন্দেহে সমাজ সচেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। কারণ স্বাধিকার চিন্তা ও স্বাদেশিকতার জন্য তীব্র সমাজ সচেতনা থেকে ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'গৌড়ীয় সমাজ'। আত্মীয় সভার মত শুধু বিত্তশালীরাই এর সদস্য ছিলেন না। মধ্যবিত্তশ্রেণীও এই সমাজের সদস্য হয়েছিলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী সেই সর্বপ্রথম সামাজিক সংগঠনের ভিতর দিয়ে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। এ সংগঠনে চন্দ্রকুমার ঠাকুর, লাডলিমোহন ঠাকুর, রাধাকান্ত দেবের মত বিত্তশালীরা যেমন ছিলেন, তেমন ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাধর আচার্যের মত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরাও। সেসময় সংবাদ প্রভাকর গৌড়ীয় সমাজকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেছিলেন। ১৮২৩ সালের ১৭ মে দর্পণ লিখেছেন, 'আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি উত্তর ২ হইবেক যেহেতু এ

সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক তৎপযুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগ্রাহক লোক অত্যন্ত আকর্ষণ করিতেছেন সুতরাং বোধ হয় এ সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন।'

১৮২৭-২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন। সভার সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও। সম্পাদক ছিলেন উমাচরণ বসু। তরুণ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্যরা—যাঁদের ইয়ংবেঙ্গল বলা হত। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্রবচন, জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তীব্র বিতর্কমূলক আলোচনা হত। অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল স্বাধীন ইচ্ছা (free will) ও স্বদেশপ্রেম। ডিরোজিও এই দেশকে স্বদেশ বলেই মনে করতেন এবং স্বাদেশিকতার চিন্তা তিনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সঞ্জীবিত করেছিলেন।

ডিরোজিওর শিষ্য হিন্দু কলেজের ছাত্ররা পুরাতন সংস্কার মুক্তির জন্য এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ভঙ্গের জন্য কিছু কিছু মাত্রাতিরিক্ত কাজ করে ফেলেছিলের। কিন্তু অন্য দিকে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের আলোচনা সভা ও মুখপত্রের মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনের ভিত্তিভূমি আরও দৃঢ় করে যান। ১৮৩০ সালে অ্যাসোসিয়েশন পার্থেনন নামে যে ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন তাতে আদালতের দুর্নীতি ও অবিচার প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছিল। হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই পার্থেনন বন্ধ করে দেন। কারণ কলেজের অধ্যক্ষ সভা ছাত্রদের রাজনীতি ও সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা সমর্থন করেন নি। ১৮৩১ সালের ২৫ এপ্রিল হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।'[২৩]

রামমোহন ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে তীব্র সমাজ সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধের ধারা প্রবাহিত হলেও ত্রিশ শতকের আগে কোন রাজনৈতিক সংগঠন এদেশে তৈরি হয়নি। রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তার কোন সাংগঠনিক রূপ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি।

এমন কি ১৮২৩ সালে যখন গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত হল তখন সভার প্রারম্ভিক বৈঠকে রসময় দত্ত বলেছিলেন, 'সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে আমার দিগের ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি।[২৪]

১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে বাঙালির প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন বলা যেতে পারে। "ধর্ম্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনার জন্য অপর যে একটি সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক। ঐ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সি আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"[২৫]

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরও

ছিলেন। আর ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, পূর্ণ চন্দ্রোদয় সম্পাদক ও সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক।

তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকেরা এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় বাংলা সংবাদপত্রে সমিতির প্রচারের অভাব হয় নি। যে সমস্ত প্রচলিত আইন জনস্বার্থ-বিরোধী বলে সভা মনে করেছিলেন রাজদ্বারে আবেদন নিবেদন মারফত তা দূরী-করণের জন্য সভা সচেষ্ট হন।

১৮২৮ সালের আইন অনুসারে নিষ্কর প্রজাস্বত্ব-সংক্রান্ত আইনটি পাশ হলে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা তার প্রতিবাদে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। সংবাদ-প্রভাকর সমিতির এই আন্দোলন সমর্থন করে লেখেন: "বাঙ্গালীর মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মেতে লিপ্ত আছেন অথবা নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ করত উচিত কার্য করিতেছেন নতুবা এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকেরাই কহেন রাজারা এ বিষয়ে অন্যায় করিতেছেন কিন্তু দেশস্থ লোকেদের উচিত হয় না গবর্ণমেণ্ট অন্যায় করিতেছেন জানিয়া মৌনাবলম্বনে থাকেন অতএব বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা এই বিষয়ের কোন সদুপায় করণার্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি দেশস্থ সমস্ত মহাশয়েরা তাহাতে অনুৎসাহ প্রকাশ না করেন।" (২ মার্চ ১৮৭২)

১৮৩৭ সালের ১২ নভেম্বর কলকাতায় ভূম্যধিকারী সভা বা জমিদারি অ্যাসো-সিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ভূম্যধিকারী সভা পুরোপুরি রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৬] এই সভা পুরোপুরি জমিদারদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল বটে কিন্তু এই সভার সদস্যরা মনে করতেন রায়ত ও জমিদারদের স্বার্থ একই সূত্রে জড়িত, জমিদারদের ক্ষতি হলে রায়তদেরই ক্ষতি।[২৭]

১৮৩৮ সালে ভূম্যধিকারী সভার পরিবর্তিত নাম হয় ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি। যুগ্ম সম্পাদক হন ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর।

সোসাইটির মাধ্যমে ভারতীয় ও ইংরাজ জমিদাররা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হন। এই ঐক্য আর যাই হোক বিত্তশালী ভারতীয়দের ইংরাজদের সঙ্গে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

দ্বিতীয়ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বাধীনতার অঙ্কুরটিও এই সোসাইটির মাধ্যমে বিকশিত হয়ে ওঠে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছেন, 'It gave to the people the first lesson in the art of fighting Constitutionally for their rights, and taught them manfully to assert their claims and give expression to their opinions'.[২৮]

তার অনেক আগে ১৮৩৯ সালের ৩০ নভেম্বর সোসাইটির অন্যতম নেতা মিঃ টারটন বলেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে তিনি কোন বিজিত জাতির

মত বাস করতে চান না। ইংলণ্ডে একজন ব্রিটিশ প্রজা যে অধিকার ভোগ করেন, যেভাবে চিন্তা করেন, যেভাবে সমস্ত কিছু সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন সেইভাবে ব্রিটিশের সতীর্থ হিসাবে তিনি এদেশে বাস করতে চান।[২৯]

ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ নাগরিকদের এই মর্যাদাবোধ, সমানাধিকার দাবি ও স্বাধিকার চিন্তা ভারতীয়দেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল এবং ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটির মাধ্যমে শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে ভারতীয় ও ব্রিটিশ নাগরিকেরা একই অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন।

১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা। সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী। সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। ইতিহাস সাহিত্য শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিধি নিয়ে এই সভায় নানান আলোচনা ও বাদ প্রতিবাদ চলে।

জ্ঞানোপার্জিকা সভার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার চিন্তা ও আত্মমর্যাদাবোধ কত গভীরভাবে অন্তরে দাগ কেটে বসেছিল তার একটি প্রমাণ সভার অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতা। ১৮৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হিন্দু কলেজ গৃহে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনে ফৌজদারি আদালত ও পুলিশের সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি এল. রিচার্ডসন সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে রাজদ্রোহের গন্ধ পেয়ে দক্ষিণারঞ্জনকে প্রবন্ধ পাঠে বাধা দেন। সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী রিচার্ডসনের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, এটি হিন্দু কলেজের সভা নয়। রিচার্ডসনের কিছু বলার অধিকার নেই। এই ঘটনা নিয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল।

তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে এই পাঁচজনের উদ্যোগে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পঠিত বিদ্যার জ্ঞানবর্ধন ও প্রসার—এই ছিল সভার উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনাও এই সভায় স্থান পেত। রাষ্ট্রনীতি ও আইনেরও সমালোচনা হত। জ্ঞানোপার্জিকা সভাকে রাজনৈতিক সংগঠন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অঙ্কুর বলা যেতে পারে।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক জর্জ টমসন ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় আসেন। জ্ঞানোপার্জিকা সভার রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয়। এই আলোচনা থেকে একটি সভা স্থাপনের পরিকল্পনা হয়। এই সভা হল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।[৩০]

৩১নং ফৌজদারী বালাখানাতে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অফিস স্থাপিত হয়। সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন জর্জ টমসন ও সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। এই সোসাইটিও ইয়ংবেঙ্গলদের অবদান। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সদস্যরা "গরম গরম বক্তৃতা দিতেন এবং ভারতের শুভদিন সন্নিকট বলিয়া আনন্দ করিতেন

এবং শ্যাম্পেনের বোতল খুলিয়া সে আনন্দের উপসংহার করিতেন।"[৩১] বলে শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক তথ্য থেকে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় জর্জ টমসনের বক্তৃতা শিক্ষিত বাঙালির মনোরাজ্যে সেদিন স্বাধিকার রক্ষার যথার্থ প্রেরণা জুগিয়েছিল। এই শ্রেণীর ইংরেজ পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি এটি ভাল চোখে দেখেননি। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন: "এখন দুদিকে বজ্রধ্বনি হচ্ছে পশ্চিমে বালাহিসারে ও কলকাতায় ফৌজদারি বালাখানাতে।"[৩২]

রামমোহন রায়ের বিলাতযাত্রার সময় থেকেই ব্রিটেনের একদল মানবতাবাদী ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তির দৃষ্টি ক্রমশই ভারতীয়দের সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল। রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডাম ও বিখ্যাত ব্রিটিশ মানবতাবাদী জর্জ টমসন ১৮ ৯ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল 'ভারতীয় জনগণের অবস্থার উন্নতি'। ১৮০৯ সালের ৩০ নভেম্বর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ভারতের ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই দুই সমিতির যৌথ আন্দোলন প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দাবিগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। (১) নিষ্কর প্রজাস্বত্ব প্রথার প্রবর্তনের বিরোধিতা। (২) ভারতের সমস্ত প্রদেশের মত একই নীতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ। (৩) বিচার পুলিশ ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার। (৪) অনাবাদী জমি প্রজা সাধারণের মধ্যে বিলি।

জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভূম্যধিকারী সভার কোন কোন দাবি বাংলা সংবাদপত্র সমর্থন করেছিলেন। যেমন ১৮৪১ সালের সূর্যাস্ত আইনের অপসারণের জন্য ভূম্যধিকারী সভার প্রস্তাব প্রায় সব সংবাদপত্রই সমর্থন করেন। ওই আইনে নির্ধারিত দিনে খাজনা না দিলে পরের দিন বিনা নোটিশে জমিদারি বিক্রয় হয়ে যেত।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, সামন্ততন্ত্র প্রভাবিত সেই সমাজে রায়ত ও জমিদারদের প্রশ্নে বাংলা সংবাদপত্র রায়তদেরই সমর্থন করে এবং রায়তদের প্রতি জমিদারদের অত্যাচারের কথা নিঃসঙ্কোচে বিবৃত করে। ১৮৪২ সালে ১ নবেম্বর ও ১৫ নভেম্বর মিয়াজান নামে একজন গরীব মুসলমান প্রজার ওপর জমিদারের ছলনা ধূর্ততা ও অত্যাচারের কথা বেঙ্গল স্পেকটেটর বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। জমিদার তালুক কিনবেন তার জন্য খাজনা বৃদ্ধি করা হল। "যতমূল্যে তালুক ক্রয় হইয়াছে প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া তৎসমুদায় সংগ্রহ করিবেন, এই অভিলাষ সিদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া (জমিদার) অধিকারস্থ তাবদ্ব্যক্তিকে বিজ্ঞাপন করিলেন যে সকলকে স্বহ ভূমির খাজনার বন্দোবস্ত করিতে হইবেক, যদ্যপি ইহাতে কেহ সম্মত না হয় তবে তাহাকে অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করা যাইবেক, এবং অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় পূর্ব্বক বাকী খাজনা আদায় হইবেক।"

১১.৩.৫৮ তারিখের সংবাদ প্রভাকর জনৈক জমিদারের অত্যাচারের বিবরণ সমন্বিত

একটি পত্র প্রকাশ করে লেখেন : "পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন ইহার একটি কথাও মিথ্যা নহে, বরং জমিদার ও মহাজনেরা প্রজার উপর আরো অধিক দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন, আমরা পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি।..."

জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৭৭২ শক বৈশাখ সংখ্যায় 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' শিরোনামে এক প্রবন্ধে জমিদারদের সম্পর্কে লেখেন : "'যে রক্ষক সেই ভক্ষক' এই প্রবাদ বুঝি বাঙ্গলার ভূস্বামিদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক। ভূস্বামী স্বাধিকারে অধিষ্ঠান করিলে প্রজারা একদিনের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না? কি জানি কখন কি উৎপত্তি ঘটে ইহা ভাবিয়া তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তিনি কি কেবল নির্দ্দিষ্ট রাজার সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন? তিনি ছলে বলে কৌশলে তাহারদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণে একাগ্রচিত্তে প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন।"

ওই বছরের শ্রাবণ সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ পেশ করেন। তত্ত্ববোধিনী লেখেন, "ভূস্বামী ও দারোগারা প্রজাদের কয়েদ করে ১৮ রকমের শারীরিক দণ্ড দিয়ে থাকে।"

"এইরূপ অত্যাচার করা দুঃশীল দুরাশয় ভূস্বামীদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। যেরূপ নরহন্তাদস্যুরা অবলীলাক্রমে অম্লানবদনে মনুষ্যের মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করে, সেইরূপ তাঁহারাও নিতান্ত নির্দ্দয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা শূন্য হইয়া লোকদিগকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করেন।"

১২৬৯ সালের ২০ শ্রাবণ সোমপ্রকাশ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনাম দেন 'অত্যাচার বিষয়ে এদেশীয় জমিদারেরাও বড় কম নয়'। ঐ প্রবন্ধে লেখেন : "সম্প্রতি এদেশে ইউরোপীয়দিগের অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতিকার চেষ্টাতেই সকলে ব্যস্ত সমস্ত আছেন। সুতরাং আমাদিগের দেশের জমিদারদিগের পাপক্রিয়া ও অত্যাচারের প্রতি কেহ বড় দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। উহা এক্ষণে এক প্রকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মহাপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে ক্ষুদ্র প্রদীপ তাহার নিকটে দীপ্তি পায় না। অত্রতা অসৎ ইয়োরোপীয়দিগের অত্যাচার ক্রমে ক্রমে আর সকল অত্যাচারকে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু পাঠকগণ! এইরূপ অনুমান করিবেন না যে, এদেশের পুরান পাপিরা (জমিদারেরা) সকলেই সাধুশীল হইয়াছেন।"

...বাংলা সংবাদপত্র রায়ত ও জমিদার উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কৃষকদের সমস্যা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবহার ত্রুটি অনুসন্ধানে প্রয়াসী হন। কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে রবিনসনের সমীক্ষা প্রকাশিত হলে ১৮৫৭ সালের ২০ আগস্ট তারিখে সংবাদ প্রভাকর লেখেন, 'তিনি একটি কথাও মিথ্যা লেখেন নাই।' সংবাদ প্রভাকর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেন নি। পত্তনিদার, তালুকদার দরপত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে বলে প্রভাকর মনে করেছিলেন। সোমপ্রকাশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থক

ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মতে ১৮৪১ সালের ১২ আইন, ১৮৪৫ সালের ১ আইন ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইন কৃষকদের দুরবস্থার কারণ। 'এ প্রকার অসঙ্গত বিধি বিধান কৃষকদিগের বল হ্রাস করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত কার্য হয় নাই।[৩৪]

সোমপ্রকাশের মতে প্রজার সর্বনাশের আরও কারণ হল (১) জমিদারি হস্তান্তরের রীতি। (২) জমিতে জ্যেষ্ঠাধিকারের রীতি প্রবর্তন না থাকায় জোতের খণ্ড বিখণ্ড হওয়া। (৩) ভূমি জরীপের সাধারণ বিধিবদ্ধ নিয়মের অভাব ও পত্তনিদার মারফৎ জমি জরীপের দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা। (৪) জোতস্বত্ব সংরক্ষণ আইনের ত্রুটি প্রভৃতি। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেযুগে একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রবল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও রুখে দাঁড়িয়েছিল। পত্রিকাটির নাম 'গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা'। সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)। পত্রিকাটি ১৮৬৯ সালের এপ্রিল থেকে সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ সালের এপ্রিল থেকে পাক্ষিক হয়। এই পত্রিকার সম্পাদককে ভীতি প্রদর্শনের জন্য পাঞ্জাবি গুণ্ডা পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছিল।[৩৫]

সুলভ সমাচারও রায়তদের দাবি সমর্থন করে লেখেন :

"চাষারা দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া যে সকল ফল শস্য প্রস্তুত করে তাহা লইয়া বড় মানুষ ভদ্রলোকে কত সুখভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যাহারা এত খেটে মরে তাহাদের দুঃখ ঘোচে না। তাহাদেরই হাতের জিনিস লইয়া অন্যলোকে সুখী হয়, কিন্তু তাহাদের নিজেদের পরিবার পুত্র কন্যাগণ খাইতে পরিতে পারে না। কৃষিকর্ম্মে যাহা কিছু জন্মে তাহা জমিদার এবং মফস্বলের কর্ম্মচারিগণ নানাপ্রকার দাবী দাওয়া করিয়া হাত করিয়া লয়েন। নির্দ্দোষী পল্লী গ্রামবাসী চাষা কিছুই জানে না কেবল ভূতের মত সারাদিন পরিশ্রম করিয়াই মরে। জলে ঝড়ে শীতে রৌদ্রে কত কষ্ট পেয়ে যাহা কিছু উপার্জন করিতেছে তাহা পাঁচজনে লুটিয়া খাইতেছে। বড় লোকদিগের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পমান। পুলিশ থানার আমলারাও অনিষ্ট করিতে পারিলে ছাড়েন না। দরিদ্রদের প্রতি গবর্নমেন্টের তত অনুরাগ নাই। প্রজারা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কেহ চেয়ে দেখে না। কিন্তু তাহাদের গায়ের রক্ত লইয়া সকলে বড়মানুষী করেন।" (সুলভ সমাচার, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৭৭)

প্রজার প্রতি জমিদারের অত্যাচারের সময় রাজকীয় আমলারা কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। সামাজিক বিচার বা Social Justice-এর বাণী সে সময় একেবারে অশ্রুত ছিল। বিশেষ করে পুলিশের সঙ্গে জমিদারদের যোগসাজস সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম দুর্লক্ষণ। বাংলাদেশেও এই অশুভ আঁতাত সামন্ততন্ত্রের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮৭২ সালের ৭মে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় 'পল্লীগ্রামের পুলিশ এত অকর্মন্য কেন ?' এই শিরোনামে লিখেছেন :

"আমরা জানি অনেক স্থলেই পুলিশ কার্য্যকালে উপস্থিত হয় না। পরে কার্য্য শেষে কার্য্য ক্ষেত্রে আসিয়া এরূপ ধুমধাম ও অত্যাচার করিতে থাকে যে তাহাতে নির্দ্দোষী

লোকদিগের প্রাণ বাঁচানো ভার হইয়া ওঠে। এবং অনেক পল্লীগ্রামের পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তত্রস্থস্থানের জমিদারদিগের একান্ত আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে।...পুলিশ কর্ম্মচারীগণ শীতকালে ভেকের নিদ্রার ন্যায় ভঙ্গ হয় না। ইহারা কুম্ভকর্ণের বড় দাদা সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব ইহারা গবর্নমেন্টের লোক কি জমিদারের লোক তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না।"

ভূম্যধিকারী সভা শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে সংগঠন গড়েছিলেন পরবর্তীকালে আভ্যন্তরীণ দলাদলি ও নেতৃত্বের অভাবের জন্য তার ভগ্নদশা উপস্থিত হয়। সভার সদস্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব প্রশ্রয় পেতে থাকে। সভার সদস্যরা স্ত্রী শিক্ষার প্রতি পর্যন্ত সমর্থন জানাননি।[৩৬]

রায়তদের সমর্থনে সংবাদপত্রের বিভিন্ন লেখাগুলি এটাই প্রমাণ করে যে উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণ শুধু বুদ্ধিজীবীদের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না। সামাজিক সাম্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি এবং রাজনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি একই সঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। বাংলা সংবাদপত্রের পরিচালকদের একথা উপলব্ধি করার মত মানসিক প্রস্তুতি ছিল যে ভাববিপ্লব সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত না করলে অচলায়তন থেকে জাতির মুক্তি নেই। সোমপ্রকাশ পুরোপুরি চাষীর পক্ষে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে যে তার কর ধার্য হওয়া উচিত সোমপ্রকাশ এ কথা বলেন। অন্যদিকে প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যান অনুসারে জোতদারকে জমির মজুর বলে গণ্য করার নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। 'লাঙ্গল যার জমি তার' বিশ শতকের এই সাম্যবাদী বৈপ্লবিক নীতি যেন সোমপ্রকাশেরই প্রতিধ্বনি। "যখন ভূমির প্রকৃত অধিকারী জোতদারকে রাজনিয়মে মজুর করিয়া তুলিল তখন তাঁহাদিগকে হতভাগ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।"[৩৭]

ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে সোমপ্রকাশের বক্তব্য কতগুলি দৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সোমপ্রকাশ মনে করেছিলেন, 'বঙ্গদেশীয় প্রজাগণের এত দুরবস্থার কারণ হল, ১৮৪১ সালের ১২ আইন, ১৮৪৫ সালের ১ আইন ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইন।'

১৮৫৯ সালের ১০ আইনে জোতস্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু জমিদার প্রজাকে যে দাখিলা দেন তাতে জমির চৌহদ্দির পরিমাণ স্বরূপ ও মেয়াদ সুনির্দিষ্ট লেখা থাকে না বলে আইনের ফাঁক দিয়ে জমিদার জোত ছাড়িয়ে নিতে পারেন এই ব্যবস্থার সংস্কার দরকার। তাছাড়া প্রজার দেয় রাজস্ব যথাসময়ে আদায় না হলে অনাদায়ী রাজস্বের ওপর শতকরা পঁচিশ টাকা সুদ ধরা হয়। সুদের এই উচ্চহার ভারতে কোনকালে ছিল না। সোমপ্রকাশ এই প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেন।[৩৮]

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিও রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এখানে একটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই সোসাইটিতে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ জমিদার শ্রেণীর কেউ যোগ দেননি। সোসাইটির

সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে। মধ্যস্বত্ব প্রথা, জমিদার ও পুলিশের অত্যাচার, নায়েব গোমস্তাদের উৎপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর বক্তব্য লিখে গেছেন। সোসাইটি ক্রমে জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয়।

রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত সমীক্ষা গ্রহণের জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে ৩০ দফা প্রশ্নাবলী রায়তদের কাছে পাঠানো হয়। ১৮৪৩ সালের ২৪ জুলাই বেঙ্গল স্পেকটেটরে প্রশ্নগুলি ছাপা হয়েছিল।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে কেন্দ্র করে জমিদারশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিশেনের মাধ্যমে এই বিরোধ দূরীভূত হয়ে যায়।

১৮৫১ সালের ২৩ অক্টোবর ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছয়দিন পরে ন্যাশনাল আসোসিয়েশনের নাম পালটে রাখা হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। সভাপতি হন রাজা রাধাকান্ত দেব। সহ সভাপতি : রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, সম্পাদক : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামগোপাল ঘোষ পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল ভারতীয়দের নিজস্ব জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন। তবে এই অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে 'ব্রিটিশ' নামটি জুড়ে দেওয়ার অর্থ সমসাময়িক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের রাষ্ট্রচিন্তা তখনও ব্রিটিশ রাজশক্তিকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে পারেনি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অধিকার রক্ষার যে সংগ্রামের কথা বলেছে, সে সংগ্রাম ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করেই।

সোসাইটির উদ্দেশ্যের যে বিবরণ ১৮৪৩ সালের ২৫ এপ্রিলের বেঙ্গল স্পেকটেটরে প্রকাশিত হয় তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছিল, "এতৎ সভার মত এই যে পৃথক ২ ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র হইয়া দেশের উপকার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিরা একমত হইয়া যাহাতে ভারতবর্ষের উৎকৃষ্টতা এবং কর্ম্মক্ষমতা ও এতদ্দেশে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের চিরস্থায়ী রাজত্বে সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্য এই সভা স্থাপিত করা গেল, ইহাতে জাতি, ধর্ম্ম, জন্মভূমি এবং পদের কোন প্রভেদ থাকিবেক না, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য আসিতে পারিবেন।'

আর একটি উদ্দেশ্য বলা হয় : 'এই সভার সভ্যেরা রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।"

এই সমস্ত সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে তুমুল আলোড়ন ওঠে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে কোনদিনও ব্রিটিশ বিরোধিতা করা সম্ভব হয়নি। বরং রাজানুগত্যই প্রকাশ পায়।

এই রাজানুগত্যের প্রকাশ পাওয়া যাবে ১৮৫১ সালের আর একটি ঘটনায়। এই বছর ভাইসরয় ও গবর্নর জেনারেল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বিদ্রোহ দমন করে কলকাতায় ফিরে এলে তাঁকে ওই বছরের ৭ মার্চ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। ঐ অভিনন্দন পত্রে ১৫৫৭ জনের স্বাক্ষর ছিল। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ।[৩৯]

এই পরিস্থিতিতে বাংলা সংবাদপত্র ও বাংলা সাহিত্যেই প্রথম ব্রিটিশ অধীনতার নিগড় ভেঙে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অস্ফুট ভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। ১২৬৯ সালের ১৫ পৌষ সোমপ্রকাশ 'ভারতবর্ষের আত্মশাসন' নামে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে ইংলণ্ডের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি মন্তব্যের সমর্থন করেন। সোমপ্রকাশ প্রস্তাব করেছিলেনঃ "এদেশে একটি জাতি সাধারণ সভা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বারম্বার ইহার প্রস্তাব করিয়াছি। আমাদিগের সুখের বিষয় এই যখন আমাদিগের ভারতবর্ষীয় সভা নিদ্রিত আছেন, এ বিষয়ে ইংলণ্ডে আন্দোলিত হইতেছে। যতদিন ইহা না হইতেছে ততদিন আমাদিগের যথার্থ স্বাধীনতা ও যথার্থ উন্নতি হইতেছে না।"

যথার্থ স্বাধীনতা বলতে সোমপ্রকাশ কি বলতে চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট না হলেও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের কথা যে বলেছিলেন একথা স্পষ্টই বোঝা যায়। সোমপ্রকাশ জাতীয় সভার প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছিলেন ১৮৬২ সালে। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) ২৩ বছর আগে এই ধরনের সংগঠন গড়ার দাবি বাংলা সংবাদপত্রের পক্ষ থেকেই এসেছিল।

'স্বাধীনতা' কথাটি স্পষ্টভাবে প্রথম উচ্চারিত হতে শোনা যায় রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানে। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়'—এই গানটি টমাস মুরের ভাবাশ্রয়ী বলে অনেকে কবিতাটির রাজনৈতিক গুরুত্ব দিতে চাননি। কিন্তু এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলাদেশের সাংগঠনিক রাজনীতিতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মারফৎ যখন আবেদন নিবেদনেরই পুরাতন পালা চলছে তখন সাহিত্য ও সংবাদপত্র সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাকে অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

১৮৫৪ সালের ১ জুন সম্বাদ ভাস্কর একটি কবিতা প্রকাশ করে। কবি ওরিয়েন্টাল সেমিনারির চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযদুনাথ দাস। কবি স্বপ্ন দেখছেন নিরুপমা এক নারী ছিন্ন বেশে এক গাছের তলায় বসে ক্রন্দন করছেন। নারীর নাম স্বাধীনতা। নারী কবিকে বলছেন :

শুন ওরে যাদুধন, দুঃখিনীর বিবরণ
যে কারণ অরণ্যের রোদন।
শুনিলে আমার দুঃখ বিদরে পাষাণ বুক
সরে নীর হইতে নয়ন॥

স্বাধীনতা মম নাম, এ ভারতে ছিল ধাম
পূর্ব্বকালে যত পুত্রগণে।
যতনে সকলে মোরে শত্রু হতে রক্ষা করে
রেখছিল, বহুকাল মানে॥
একালের পুত্র যত, মোহমদে অনুগত,
একবার না দেখে ফিরিয়া।
কি দশা এবে হইল কুলশীল না রহিল
ম্লেচ্ছজাতি অধীনে থাকিয়া॥
কোথা ওহে রঘুপতি, দুঃখিনী এ দুর্গতি
ধরা আসি কর তুমি নাশ।
কোথা গেলে রণজিত, রণে কর পরাজিত
ম্লেচ্ছে আসি করহ বিনাশ॥
ফিরে আসি রাজ্য কর, সম্পদ সম্ভোগ পর
প্রজাগণে করহ পালন।
সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান, অজ্ঞানে করিয়া দান
দুহে এবে করহ মিলন॥
তাহে প্রজা পাবে সুখ, পাসরিবে সব দুঃখ
সুখে কাল করিবে যাপন।
না ঠেকিবে পুনরায়, মূত্রে কড়ী দেয়া দায়,
আসিলে তোমরা দুইজন॥
বিধর্মী হইলে ছেলে, নাহি পায় কোন কালে,
পিতৃধনে নিজ অধিকার।
না হব হুইল ট্যাক্স, প্রাকেকটি চৈতন্য পাশ
না হইত কোম্পানি চাটর॥

'ম্লেচ্ছে আসি করহ বিনাশ'—একটি অপরিণত স্কুল ছাত্রের অংসলগ্ন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বলে একে সমালোচকেরা অভিহিত করতে পারেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই এই ধরনের রচনা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা বলতে হবে।

রামমোহন থেকে রামগোপাল ঘোষ এই ষাট দশক পর্যন্ত ইংরাজ অধিকারকে যে চোখে দেখা হয়েছে ষাট দশকের পর থেকে সে দৃষ্টিভঙ্গির ক্রমশঃ রূপান্তর ঘটছিল। জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় এবং স্বাদেশিকতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর বাঙালি মনে ভাবতে শুরু করেছিলেন যে ইংরাজের শোষণ ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং স্বার্থহীন কণ্ঠে এর প্রতিবাদ জানানো অবশ্য কর্তব্য। আবেদন নিবেদন নয়—তীব্র তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ।

১৮৬৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর অমৃতবাজার লিখছেন :

"১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধে কোম্পানি বাহাদুরের প্রাণ ধ্বংস হয়। আর যে দিবস কোম্পানি বাহাদুরের লয় হয়, সেই দিবস হইতে আর একটি বৃহত্তর সমরের সূত্রপাত হয়। বাঙ্গালি মাত্রের যেন মনে থাকে যে ইংরাজ বাহাদুরেরা বাঙ্গলা কখন সমরে অধিকার করেন নাই। সিরাজদ্দৌল্লার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বাঙ্গালিরা ইংরাজদিগকে আহ্বান করে, আর এই ছুতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজেরা বাঙ্গলা শাসন করিতেছেন। সমরে পরাজিত হইলে অধিবাসিগণ যেরূপ নিস্তেজ হইয়া যায় বাঙ্গালিদের সে অবস্থাটি হয় নাই।

"বাঙ্গালিরা যদিও স্বভাবতঃ ভীরু, কিন্তু এক্ষণে অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের লোক যেরূপ ভীরু ও নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালিরা সেরূপ হয় নাই। কোম্পানি বাহাদুর একশত বৎসর পর্যন্ত নানাপ্রকারে দেশের ধন শোষণ করিয়া অধিবাসীদিগকে যন্ত্রণার শেষ দিলেন, তখন পৃথিবী আর ভার সহ্য করিতে পারিলেন না, কোম্পানি বাহাদুরের ধ্বংস হইল, মহারাণীর স্বীয় হস্তে ভারতের ভাগ্য ন্যস্ত হইল। বাঙ্গালির শুষ্ক হৃদয়ে তখন বারি সঞ্চারিত হইল। নিরাশ বাঙ্গালির আশার অঙ্কুর হইল, আর মহারাণীর সুশাসনে সেই অঙ্কুরের ক্রমে সম্বর্দ্ধা হইতেছে, এই আশা, ইংরাজদিগের স্বেচ্ছাচারিতার বাধা পদে পদে জন্মাইতেছে। আধা ডিক্রি আধা ডিসমিসের সময় আর নাই, অনেক কাল গিয়াছে।

"সূক্ষ্মদর্শী দেখিবেন যে ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইংরাজের ইচ্ছা বাঙ্গালিকে পদানত রাখা, বাঙ্গালির ইচ্ছা উঠিয়া দাঁড়ান। কাহার না ইচ্ছা করে অন্যকে পদানত করা, আর কাহার অন্যের পদানত থাকিতে ইচ্ছা করে? চোখ পাকান, অন্তর টিপনি, উৎকোচ প্রভৃতির দ্বারা অগ্রে যেরূপ বাঙ্গালিদিগকে অনায়াসে করায়ত্ত করা যাইত, এক্ষণে আর তাহা যায় না, কাজেই ইংরাজদিগের যথাসাধ্য বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে।" (অমৃতবাজার, ৩১ ডিসেম্বর ১৮৬৮)

ষাট দশকের যে দুটি বাংলা সংবাদপত্রে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে ওঠে সে দুটি হল অমৃতবাজার ও সোমপ্রকাশ। অমৃতবাজার পত্রিকার ১৭শ সংখ্যায় (১২।৬।৬৮) ঘোর অত্যাচার ও ১৯ সংখ্যায় (২৬।৬।৬৮) পাঠকগণের প্রতি দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকা সম্পাদক মুদ্রাকর ও ফৌজদারি হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্রের বিরুদ্ধে সরকার থেকে মানহানির মামলা রুজু করা হয়। বিচারে সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ অব্যাহতি পেলেও রাজকৃষ্ণ মিত্রের এক হাজার টাকা জারিমানা ও একবছর জেল ও মুদ্রাকর চন্দ্রনাথ রায়ের ছয়মাস জেল হয়। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে 'আমাদের লাইবেল' মামলা নামে অমৃতবাজার যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন উপরের উদ্ধৃতিটুকু তারই অংশ।

১৮৬৯ সালের ২৯ জুলাই অমৃতবাজার আবার লেখেন, "একটি অত্যাচার আর

মহারাণীর ১০ সহস্র শত্রু বৃদ্ধি হওয়া সমান। একটি অত্যাচারে সহস্র ২ উপকার ধুইয়া যায়। একটি অত্যাচার হয় আর ব্রিটিশ রাজ্যের আয়ু শতবর্ষ কমিয়া যায়। কারণ কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিতে ও ক্রোধ ক্ষান্ত করিতে যত্ন করিতে হয়, একটি আস্তে আস্তে আইসে শীঘ্র যায় আর একটি শীঘ্র আইসে আস্তে যায়।

"সচরাচর অশুভ ঘটনার হেতু অপেক্ষা বক্তাই অধিক দোষী হইয়া থাকে, কিন্তু সেটী কি অন্যায় না? আমরা বলিলাম বলিয়া আমরা রাজবিদ্রোহী না যাহারা করেন তাঁহারা রাজবিদ্রোহী। কাহারা মহারাণীর পরম শত্রু বা কাহারাই বা মিত্র? অপার বুদ্ধিকৌশলে, বিস্তর যত্নে ও শোণিত পতনে জগদীশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে ইংরাজেরা ভারতাধিকার করিয়া তাঁহাদের আধিপত্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। মফস্বলস্থ হাকিমেরা একটি একটি অত্যাচার করেন আর এই ভিত্তিভূমিতে কুঠার মারেন। এই কুঠারের শব্দ সর্বদা গবর্নমেণ্ট শুনিতে পান না বাঙালিরা অনেক সময় শুনিয়া থাকেন, আর উভয়ে কেহ শুনুন না শুনুন নিসর্গ সমুদায় শুনিয়া থাকেন। সেথানে ইহার একটাও অশ্রুত থাকে না।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিজিত ভারতীয়দের সঙ্গে বিজয়ী ইংরাজদের যে 'শান্তিপূর্ণ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ' সহাবস্থান চলে এসেছিল, দ্বিতীয়ার্ধে এসে তাতে নানা কারণে চিড় ধরে। বিশেষ করে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচারব্যবস্থায় যে বৈষম্য ছিল ১৮৪৯ সালে আইনসচিব বেথুন তা দূর করে কয়েকটি নতুন আইনের খসড়া তৈরি করেন। এই খসড়া আইনে ইংরেজদের স্বার্থহানি হয়েছিল। তারা একে কালাকানুন বলে অভিহিত করে এবং তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এতে করে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে ইওরোপীয়দের তিক্ততা বাড়তে থাকে। ইংরাজ রাজ-কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরোধিতা ও নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রায়তদের পক্ষই অবলম্বন করেন। নীলকরদের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করে রামগোপাল ঘোষ একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন বলে 'ইওরোপীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সংগঠন এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি'র সহ-সভাপতির পদ থেকে রামগোপাল ঘোষ বহিষ্কৃত হন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর নব্যশিক্ষিত বাঙালি যুবকদের মধ্যে সিভিল সারভিসে যোগ দিয়ে দেশের প্রশাসনে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়। এ ব্যাপারে ইংরাজ শাসনকর্তাদের কাছে তাঁরা যত বাধা পান ততই ইংরাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। সরকারি চাকুরিতে প্রবেশাধিকারের দাবির সঙ্গে সঙ্গে আইনসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি নেবার দাবিও উঠতে থাকে। এই শ্রেণীস্বার্থের সংঘর্ষ থেকেই বাঙালির তীব্র সংগ্রামমুখী মনোভাবের জন্ম হয়। রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে তার অতখানি বহিঃপ্রকাশ না ঘটলেও সংবাদপত্রে তার সুস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে।

সম্বাদ ভাস্কর তাই নিঃসঙ্কোচে লিখতে পারেন :

"ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট যদিও ডাকাইতদিগের ন্যায় দলবল সহিত প্রজাদিগের গৃহে যাইয়া অর্থ লুণ্ঠন করেন না তথাচ তাঁহারা গৃহে বসিয়া প্রতারণা দ্বারা যেরূপ অর্থ হরণে পটু হইয়াছেন তাহাতে তস্করেরাও তাঁহারদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করে, গৌরাঙ্গদিগের তস্কর লীলা বর্ণন করিতে হইলে আমারদিগের কাষ্ঠ লেখনীও পরাজয় স্বীকার করিয়া বর্ণ প্রসবে অক্ষম হইবেক, অতএব আমরা অস্ত বর্ণ প্রসবিনীকে বিশ্রাম দিলাম, অবশেষে পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি তিনি করুণাপূর্ব্বক আমারদিগের অসহ্য কষ্ট নিবারণে মনোযোগ করুন, যিনি ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারেন তাঁহার অনুগ্রহে আমারদিগের এ ক্লেশ অবশ্যই দূরীকরণ হইবেক, ...।" (সম্বাদ ভাস্কর, সম্পাদকীয়, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫০)

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশা সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। আবেদন নিবেদনই ছিল তাঁদের স্বাধিকার অর্জনের পথ। প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে সোসাইটি সরকারকে এক বিস্তারিত আবেদন-পত্র দেন।

ভারত সুশাসনের উপায় ও ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পথনির্দেশ—এ দুটিই ছিল আবেদনপত্রের মর্মকথা। আবেদনের বক্তব্য ছিল মোগল যুগে সব অর্থই ভারতবর্ষে থাকত কিন্তু ব্রিটিশ অধিকারে রাজস্বের মোটা অংশ বিলাতে চলে যায়। ফলে কোম্পানির শাসনে ভারতবাসী খুব সামান্যই উপকৃত হচ্ছে ও গরিব হয়ে পড়ছে। ১৮৩৩-এর সনদে দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিয়োগের কথা ছিল কিন্তু তা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হয়নি। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতবাসী যতখানি সুবিধা সুযোগ লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করেছিল এতদিনে তা অংশতও পূর্ণ হয়নি। বিচারে বৈষম্য, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা, প্রবলের উৎপীড়নে দুর্বলের ধন নাশ, লবণ ও আফিমের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রভৃতি অব্যবস্থা দূর করে, এবং ভারতীয় শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে ভারতবাসীর শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করে ও উচ্চতন সরকারি পদগুলিতে ভারতবাসী নিয়োগ করে শাসনব্যবস্থা সুসংস্কৃত করার দাবি এই আবেদনপত্রে জানান হল।

অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব ছিল শাসন সংস্কারের—শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার আর শাসনপরিষদ ও ব্যবস্থাপরিষদকে আলাদা করে গঠন করার। প্রশাসনের স্বার্থে বড়লাটের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে একটি নতুন ব্যবস্থা পরিষদের হাতে আইনকানুন রচনার ক্ষমতা অর্পণ করা হোক এটাই তাঁরা চেয়েছিলেন। এই ব্যবস্থাপরিষদের গঠন কি হবে সে সম্পর্কেও তাঁদের সুস্পষ্ট সুপারিশ ছিল। বাংলা, বোম্বাই, মাদরাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে তিনজন করে নেতৃস্থানীয় ভারতীয় সদস্য, প্রত্যেক প্রদেশের সরকারের তরফ থেকে একজন করে চারজন সিবিলিয়ান সদস্য ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নিযুক্ত সভাপতি মোট সতের জন সদস্য নিয়ে ব্যবস্থাপরিষদ গঠনের প্রস্তাব রেখেছিলেন অ্যাসোসিয়েশন।

মোট একুশ দফা বিষয়ের ওপর অ্যাসোসিয়েশন স্মারকলিপিতে আলোচনা করেন। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে তাঁদের সুস্পষ্ট সুপারিশ ছিল।[৪০]

চাকুরিতে সমমর্যাদা

অ্যাসোসিয়েশনের দাবিদাওয়াগুলির মধ্যে অনেকগুলি নিয়ে বাংলা সংবাদপত্র আগে থেকেই লেখালেখি করে আসছিল।

এর মধ্যে সিবিল সার্ভিসে (কভেনেন্টেড পদ বলে পরিচিত) ভারতীয়দের নিয়োগের দাবি হল প্রধান।

এদেশে ক্লাইভ যে সরকারের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন তাতে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ছিল ভারতীয়দের হাতে। ইওরোপীয়রা শুধু তদারক করত। এই প্রথা ভাল কাজ করছিল না। গরিব আরো গরিব হচ্ছিল আর নেটিভ কর্মচারী ও জমিদারশ্রেণী ফুলে ফেঁপে উঠছিল। এজন্য রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন কোম্পানি ইউরোপীয়দের হাতে আনেন। ১৭৯৩ সালে আইন করে কভেনেন্টেড পদে শুধু ইওরোপীয়দের নেওয়া হতে লাগল।[৪১] এর ফলে ত্রিশ দশকে এসে ইয়ংবেঙ্গলরা সরকারি উচ্চতর পদগুলিতে ভারতীয়দের গ্রহণ করার জন্য দাবি জানাতে থাকেন। এই দাবির পিছনে বাংলা সংবাদপত্রের যে কী প্রচণ্ড সমর্থন ছিল তা ১৮৩৩ সালের ২ মার্চ তারিখে সমাচার দর্পণের 'গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এদেশীয় লোকেরদের কর্ম্মে নিয়োগ' শিরোনামায় লিখিত প্রতিবেদন থেকে জানা যাবে।

১৮৩১ সালের পাঁচ নং রেগুলেশন অনুসারে প্রিনসিপ্যাল সদর আমিনের পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়। ১৮৩৩ সালের নয় নং রেগুলেশন অনুসারে ডেপুটি কালেকটরের পদও ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়।

অবশ্য ভারতীয়দের চাকরি দেওয়ার পিছনে কোম্পানির কিছুটা স্বার্থও ছিল। মোটা বেতনের ইওরোপীয় অফিসারদের মোটা বেতন দিতে হত। সরকারের ব্যয় এজন্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অ্যাংলো-পর্তুগীজ প্রভৃতি হাফ কাস্ট বা দো-আঁশলারা দলে দলে সরকারি চাকরিতে আসতে থাকে। কারণ তাঁদের ওপর কোন বিধিনিষেধ ছিল না। এই কারণেই ১৮৩৩ সালের আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে কোন ব্রিটিশ প্রজাকে ধর্ম, জন্মস্থান, বংশ বা বর্ণের জন্য সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।[৪২]

সমাচার দর্পণ এতে খুশি হয়ে লেখেন: "নিয়মের এতদ্রূপ পরিবর্ত্তন হওয়াতে আমারদের পরমাহ্লাদ হইয়াছে কারণ এই যে পরিশেষে ইহাতে দেশের পরম মঙ্গল হইবে এমত প্রত্যয় আছে। আমারদের আরো এই প্রত্যয় আছে যে গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববৎ বিরুদ্ধ বার্ত্তাবলম্বন করিয়া যদ্যপি এদেশীয় লোকেরদিগকে স্বদেশী সরকারী কার্য্যের আশা হইতে হতাশ করিতেন এবং সম্ভ্রমজনক উদ্যোগের তাবৎ পথ অবরুদ্ধ করিতেন তবে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যকার্য্য যে হয় নাই এমত অবশ্য করা যাইতে পারিত। ঐ মহানুভব

কার্য্য নির্ব্বাহার্থ যত বুদ্ধি ও দক্ষতার আবশ্যক তত বুদ্ধি ও দক্ষতা যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে বর্ত্তে এমত আমাদের নিতান্তই বোধ আছে।" (২ মার্চ ১৮৩৩)

বিচার-বিভাগীয় পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হবে শুনে সেকালে এদেশীয়দের সকলে খুশি হতে পারেন নি। কারণ ভারতীয় বিচারকেরা দুর্নীতিপরায়ণ হবেন এবং তাঁদের কাছ থেকে সুবিচার পাওয়া দুর্লভ হবে এমন একটা আশঙ্কা অনেকের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল। জনমত গঠনের জন্য সমাচার দর্পণ এই অমূলক আশঙ্কা দূরীকরণে উদ্যোগী হন। দর্পণ লেখেন, এদেশের লোকদের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে তা না হলে ফল হবে মারাত্মক। বিদ্যাচর্চা এবং ইওরোপীয়দের সঙ্গে সাহচর্যের ফলে ভারতীয়দের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবেই। আর "তাঁহারা যদি কোন দোষ করেন তবে সংবাদপত্রের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়া তাঁহারা অপমানিত হইবেন এবং সর্ব্বসাধারণের যে বিবেচনা তাহা ক্রমে ২ সুনীতির পক্ষেই আসিবেই।" আর উৎকোচ নেবার দুর্নাম তো বিদেশী বিচারকদেরও কম ছিল না। "ইহার পূর্বে ইংলণ্ড দেশীয় জজেরাও উৎকোচবিষচক্রের বহির্ভূত ছিলেন না এবং সদর আমীনী পদের নিমিত্ত এদেশীয় ব্যক্তিরা যেমন উপাসক তেমন ইংলণ্ড দেশের সর্বাপেক্ষা প্রধান জজ সাহেবও ছিলেন এমন দৃষ্ট হইয়াছে অতএব যে নানা উপায়ে ইংলণ্ডীয় জজ সাহেবেরা সম্ভ্রম ও ন্যায্য বিচারের বিষয়ে অপূর্ব্বরূপ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন তদুপায়েতে ভারতবর্ষীয় লোকেরদেরও তত্তুল্য ফল বিনির্মিত্ত হইতে পারে না।"

অবশ্য বিচারালয়ের দুর্নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ১৮৪৮ সালের ৫ই জুলাই সংবাদ ভাস্কর বিচারালয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

"বিচারস্থলে যদি উৎকোচ সম্বন্ধ প্রচল থাকে তবে ঐ সম্বন্ধ সুবিচারের। প্রতিবন্ধক হয়, আমারদিগের গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে বিলক্ষণ জানেন, তথাপি বিচারস্থলে উৎকোচ সম্বন্ধ রাখিয়াছেন, যদি কহেন গবর্নমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন রাজকর্ম সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি উৎকোচ লইলে দণ্ডার্হ হইবেন তবে গবর্নমেণ্ট কিরূপে বিচারস্থলে উৎকোচ সম্বন্ধ রাখিলেন, ইহাতে আমরা এই উত্তর করি কর্ম্মচারিরা আহারাচ্ছাদনে ব্যয়ার্থ কাতর হইয়া উৎকোচ লইলে কি রাজ্যশ্বরের ব্যবস্থায় তাহা নিবারণ করিতে পারে, বহুল বেতনভোগি রাজজ্ঞাতিরাই রাজব্যবস্থায় ভয় করেন না অন্নবস্ত্রে লালায়িত ক্ষুদ্র বেতনভোগি আমলাগণ কি জঠরানলে ব্যাকুল হইয়া ব্যবস্থার ভয়ে তুলসীপত্র ভক্ষণ করিয়া জীবনরক্ষা করিবেন, সিবিল ও মিলিটারি সম্পর্কীয় সাহেবদিগের পক্ষে নিশ্চিত আছে উত্তমরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে ক্রমে ২ উচ্চপদস্থ হইবেন, এবং গবর্নমেণ্টের ত্রেজুরি, বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক, সদর দেওয়ানি ইত্যাদি স্থানীয় আমলারাও উচ্চ পদস্থ হইয়া থাকেন, সকল স্থলেই কর্ম্মকারকদিগের আশা আছে পবিত্রতারূপে কর্ম্ম-নৈপুণ্য দেখাইলে উপরে উঠিবেন, এই কারণ ত্রেজুরী এবং বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থানে আমলারাও উৎকোচের নামে ঘৃণা করেন সুতরাং তাঁহারদিগের কার্য্যেতেও

তঞ্চকতা হয় না, কিন্তু মুন্সেফাবধি কমিস্যনর পর্য্যন্ত মান্য বিচারকদিগের এবং কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটাদির অধীন কর্ম্মকারকগণের মধ্যে উৎকোচপ্রবাহ দুই কূল ভঙ্গ করিয়া বেগবান হইতেছে, ১৮৪৩ সালের পঁচিশ নং আইনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয়।"

কিন্তু ততদিনেও কভেনেন্টেড পদ ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয় নি। যে পদগুলি উন্মুক্ত হয়েছিল তাতেও যথেষ্ট ভারতীয় নিয়োগ করা হত না। আর তাছাড়া ভারতীয় ও ইওরোপীয় রাজকর্মচারীর মধ্যে বেতনহারের প্রচণ্ড ফারাক ছিল। কোম্পানির চাকরিতে একজন দেশীয় অফিসারের সর্ব্বোচ্চ বেতন ছিল ১২০০ টাকা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পেতেন ২০০ থেকে ৪০০ টাকা। দারোগা ১০০ টাকা। একজন প্রিন্সি-প্যাল সদর আমিন পঞ্চাশ বছর কাজ করে ৬০০ টাকা বেতন পেতেন। অথচ দশ বছর চাকরি করলেই একজন ইওরোপীয় অফিসার ১২০০ টাকা পেতেন।[৪৩] সৈন্য দলে কোন ভারতীয় সর্ব্বোচ্চ সুবেদারের পদের বেশি উঠতে পারত না।[৪৪]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের আবেদনে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যে একজন জেলা জজ যেখানে মাসে ২৫০০ টাকা বেতন পান সেখানে একজন সেরেস্তাদারের বেতন মাসে ১০০ টাকা। যদিও সেরেস্তাদারের কাজ জেলা জজের চেয়ে অনেক বেশী।[৪৫]

১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ত্রৈমাসিক সভায় কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর মিঃ সলিবান ভারতীয়দের চাকরিতে নিয়োগের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন। ১৮৪৩ সালে ১৮ই মার্চ বেঙ্গল স্পেক্টেটরে কোম্পানির সভার পুরো বিবরণটি প্রকাশিত হয়। ঐ বিবরণ অনুসারে জানা যাচ্ছে যে ভারতে প্রতি ৮২৫ জন ইওরোপীয় সরকারি কর্মচারী পিছু একজন মাত্র ভারতীয় সরকারি কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিমতের জন্য সলিবান সাহেব অন্য সদস্যদের কাছে অপদস্থ হন। কিন্তু সংশোধিত আকারে সলিবান সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, বোর্ড অব ডিরেক্টরেরা ভারতবাসীদের পদবৃদ্ধির ব্যাপারে ভবিষ্যতে সযত্ন হবেন।

সলিবান সাহেবকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য কলকাতার নাগরিকেরা টাউন হলে এক সভা ডাকেন। ঐ সভার প্রাক্কালে বেঙ্গল স্পেক্টেটর নাগরিকদের বলেন, তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যেন সুচিন্তিত যুক্তি থাকে এবং তাঁদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে যেন কোন অনৈক্য দেখা না দেয়, "ঐ সভাতে এতদ্দেশীয়েরা বক্তৃতা ও যোগ্যতা প্রকাশ করিবেন সভাদ্বারা তদ্রূপ শুভাশুভ ফল হইবেক অতএব উক্ত সভায় কর্ম্ম সকল বিবেচনা, সদান্তঃকরণ, বিশিষ্ট তর্ক ও বিশেষ ধীরতাপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইলেই ভাল হয়।"

১৮৪৩ সালের ১৮ এপ্রিল টাউনহলে এই সভা হয়েছিল। রামগোপাল ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জর্জ টমসন প্রমুখেরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের অধ্যক্ষ বা পরিচালকদের কাছে একটি স্মারক-

লিপি পাঠানো হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে ১৮৩৩ সালের চার্টার অনুসারে আগের চেয়ে ভাল পদে ভারতীয়দের নেওয়া শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু যে অভিপ্রায়ে আইন করা হয়েছিল তা সিদ্ধ হয়নি। অতএব সলিবান সাহেবের প্রস্তাব যেন ডিরেক্টররা গ্রহণ করেন।

উচ্চতর পদে অর্থাৎ সিবিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগের জন্য এর পর থেকে দাবি আরও জোরদার হতে থাকে।

১৮৫১ সালে সংবাদ প্রভাকর সিবিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ করার আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন।

"কোম্পানি বাহাদুরেরা যে সময়ে চলিত চার্টর গ্রহণ করেন সেই সময় পার্লিয়া-মেণ্টের মেম্বর মহাশয়েরা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া এরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে সমুদয় বিশ্বাসযোগ্য রাজকীয় পদে বাঙ্গালি ও অন্যান্য প্রজারা নিযুক্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে তাহাদিগের সহিত ইংরাজদিগের কোন প্রকার ভেদবোধ থাকিবেক না, কিন্তু কি পরিতাপ! ঐ নিয়ম প্রচার দ্বারা কোর্ট অফ ডিরেকটর্স প্রভৃতি কর্ম্মকারকদিগের আত্মীয়গণের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাহারা তাঁহা প্রচার করিলেন না, ঐ অনুমতি একেবারে অপ্রচলিত রাখিলেন, অতএব সহজেই বলিতে হইবেক যে কোম্পানিরা এদেশে লবণ বাণিজ্য যে প্রকারে একচেটিয়া করিয়াছেন গবর্নমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্য সকলও সেই একচেটিয়া করিয়া এদেশের সকল ধন স্বদেশীয়দের উদরে প্রদান করিতেছেন।" (১২।১০।১২৫৮)

১৮৫৩ সালের সনদে সিবিল সারভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতীয়েরাও যোগ দিতে পারবেন ঠিক হয়। কিন্তু এই সরকারি নীতিকে সোম-প্রকাশ 'হাস্যরসের অভিনয়' বলে বর্ণনা করেছেন (১৫ বৈশাখ ১২৮৭)। "প্রথমতঃ বলা হইল সিবিল সার্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে নিরপেক্ষভাবে গৃহীত হইবে। এ পরীক্ষায় কি ইংলণ্ডীয় কি ভারতবর্ষীয় সকলের সমান স্বত্ব। ভারতবর্ষীয়েরা যদি ইচ্ছা করে ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে। প্রথমে পরীক্ষা দিবার জন্য ২১ বছর নির্দ্ধারিত হইল। তাহার পর যখন দেখা গেল ভারতবর্ষীয়েরাও ২১ বৎসর অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে, তখন ঐ বয়স কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল।" (সোমপ্রকাশ, ঐ)

প্রথম দিকে পরীক্ষার মান এত উঁচু রাখা হয়েছিল যে প্রথম দশবছরে ষোল জন ভারতীয় পরীক্ষা দিয়েও মাত্র একজন ছাড়া কোন ভারতীয় এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। যিনি কৃতকার্য হবার দুর্লভ সম্মান পান তিনি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬৩ সালে তিনি এ পরীক্ষায় পাশ করেন।

১৮৭০ সালে লর্ড লিটন লিখেছিলেন, "ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে নিয়োগের দাবি পূরণ করা আদপে সম্ভব নয়। কাজেই তাদের এ দাবি অস্বীকার

করা অথবা তাদের প্রবঞ্চনা করা এ দুটির মধ্যে একটি পথ আমাদের বেছে নিতে হবে। আমরা দ্বিতীয়টিই বেছে নিয়েছি।"৪৬

সুরেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই 'প্রবঞ্চনার পথটিই' ব্রিটিশ সরকার যে বেছে নিয়েছিলেন অনতিকাল পরেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮—১৯২৫): ১৮৬৯ সালে আই সি এস পাশ করেন। কিন্তু বয়সের অজুহাতে তাঁকে বাতিল বলে গণ্য করা হয়। যাই হোক ইংলণ্ডের বিচার অধিকর্তাদের কাছে আবেদন করার পর তাঁকে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৮৭৩ সালে আর একটি ছুতোয় তাঁকে আবার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

সুলভ সমাচার এই ঘটনার প্রতিবাদ করে সেদিন লিখেছিলেন: "পাঠকগণ শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, এতদিনের পর সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ম্মটি গেল। লর্ড সেলিসবেরি সুরেন্দ্রবাবুকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন মাসিক ৫০ টাকা পেনশন দিয়াছেন। সামান্য পুরস্কারে সুরেন্দ্রবাবুর গৌরব নাই বরং অগৌরব, তবে 'লাভপরমোগোবধঃ'। সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ সামান্য অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইলেন, ইংরাজ সিবিলিয়ানেরা ইহার অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ করিয়া উন্নতিলাভ করিয়া থাকেন। এই সকল অবিচারেই ইংরাজদিগের প্রতি সাধারণের অভক্তি হয়। সুরেন্দ্রবাবুকে সামান্য দণ্ড দিলে আমরা দুঃখিত হইতাম না। একবারে কর্ম্মচ্যুত করা লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবু সুবিচারের জন্য বিলাতে গিয়াছেন, তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইতে না হইতেই তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সাতসমুদ্রের জল খাওয়াই সার হইল. এখন যদি ব্যারিস্টার হইতে পারেন তবে বিলাতে যাওয়া সার্থক হইবে। যাঁহারা সাহেবের পোষাক পরিয়া সাহেবদের সঙ্গে সমান হইতে চান, তাঁহারা ইহা শিক্ষা করুন যে সুরেন্দ্রবাবু সাহেব সাজিয়াও বাঙালির ন্যায় দণ্ড পাইলেন। তবে দেশশুদ্ধ লোককে বিরক্ত করিয়া শোলার টুপি মাতায় দিয়া লাভ কি?" (সুলভ সমাচার, ৩০ বৈশাখ ১২৮১ সাল)

সুলভ সমাচারের এই প্রতিবেদনে সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্রের প্রতি কিছুটা কটাক্ষ আছে। তবে অমৃতবাজার তাঁকে শর্তহীন সমর্থন জানিয়েছিল:

"সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় যদিও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস কমিশনারগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছেন তবু আমরা তাঁহাকে এখন পর্যন্ত হারাই নাই। তিনি তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থে যে সমুদয় যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অকাট্য। সদ্বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাকে নির্দ্দোষী বিবেচনা করিবেন। কমিশনারগণ তাঁহাকে এই ঘোর কলঙ্ক হইতে মুক্ত করুন বা না করুন, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে মুক্ত করিবে। ওদিকে ইংরেজ জাতি, যাঁহারা আপনাদের মহত্ত্ব দেশ বিদেশে রচনা করিয়া বেড়াইতেছেন, সুসভ্য জাতির নিকট চির কলঙ্ক পাশে আবদ্ধ হইবেন।" (১ শ্রাবণ ১২৭৬। ১৫ জুলাই ১৮৬৯)

সিবিল সারভিসে ভারতীয়দের প্রতি নানান বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভারতসভা

ভারতীয় জনমতকে সংহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৭৭ সালের ২৭ মার্চ কলকাতা টাউনহলে মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা আয়োজিত হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভাকে তৎকালীন কলকাতার বৃহত্তম গণবিক্ষোভ বলে অভিহিত করেছেন। সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হল যে, ভারতীয় প্রতিনিধি মারফৎ একটি সিবিল সার্ভিস মেমোরিয়াল বা স্মারকলিপি পার্লামেণ্টে পাঠানো হবে।

এই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল যে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের ঊর্ধ্বতম বয়স বাড়িয়ে উনিশ থেকে বাইশ বছর করতে হবে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গৃহীত হবে ভারতে এবং বিলেতে যুগপৎ ভাবে। কিন্তু উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের গুণানুসারে এক তালিকাভুক্ত করতে হবে।

বিলেতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে ভারতবর্ষে বসেই যাতে ভারতীয়রা আই সি এস পরীক্ষা দিতে পারে তার জন্য ১৮৭০ সালেই আইন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। ভারত সভা পার্লামেন্টের সামনে তাঁদের স্মারকলিপি পেশ করার জন্য ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। পার্লামেন্টে ব্রিটিশ এম. পি. জন ব্রাইট ভারত সভার স্মারকলিপি ব্যাখ্যা করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ভারতসভার আন্দোলনে কিছুটা কাজ হয়েছিল।

১৮৭৯ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল ভারতীয়দের জন্য 'স্টাটুটরি সিভিল সার্ভিস।' এর জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হত না। কিন্তু আই সি এস এর সমান বেতন ও মর্যাদা দূরে থাক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর চেয়েও উচ্চতর মর্যাদা এঁদের দেওয়া হয়নি।

সোমপ্রকাশ আবার লিখছেন (১৫ বৈশাখ ১২৮৯) : "বলা হইয়াছিল বিনা পরীক্ষায় নিয়োজিত সিবিল সার্বেন্টদিগের বেতনের দুই-তৃতীয়ংশের অনধিক বেতন পাইবেন, কথার বাঁধনী কেমন ? দুই-তৃতীয়াংশের অনধিক অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশও নয়, শেষে দাঁড়াইল, দুই শত টাকাও নয়। 'কিন্তু নামে গোয়ালা ভক্ষন কাঁজি।' ফলতঃ নামে. সিবিল সার্বিস, আড়ম্বরও সিবিল সার্বিসের অধিক। ... ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের অপেক্ষা হীন।" শুধু সিবিল সার্ভিস কেন অন্যান্য চাকুরির ক্ষেত্রেও যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়দের নিয়োগ করার ব্যাপারে নীতি গ্রহণ করা হলেও তা কাজে পরিণত করা হত না। ১৮৭৭ সালেও সমাচার চন্দ্রিকা লিখছেন : "ইংরাজেরা কি একেবারেই মনস্থ করিয়াছেন, যে এদেশীয়দিগকে আর উচ্চপদ প্রদান করিবেন না। ইংরাজেরা না পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যোগ্যতা দেখিলেই এদেশীয়দিগকে উপযুক্ত পদ প্রভৃতি প্রদান করিবেন ? এখন তাঁহাদিগের এরূপ মতিভ্রম হইবার কারণ কি ? পাঠকগণ আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লেথাব্রজ সাহেবের পদে হুগলি কলেজের বজর সাহেবের নিযুক্ত হবার কথা হয়। তাহাতে আমরা একজন বাঙ্গালীকে উক্ত পদে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত শিক্ষা-

বিভাগের কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহাতে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়। সাহেবের পদে বাঙ্গালীর অধিকার এ অপমান তাঁহাদের সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা উমেশবাবুকে পদচ্যুত করিয়া স্কুল ইনসপেকটর সাহেবকে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়াছেন। আমাদের রাজপুরুষেরা যথার্থ সুবিবেচক।' (১৭ এপ্রিল ৮৭৭)।

এদেশীয় কর্মচারীদের প্রতি ইংরাজ রাজকর্মচারীদের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধেও সমাচার চন্দ্রিকা প্রতিবাদ করেছেন। পাণ্ডুয়ার রুরাল সাব রেজিস্ট্রারকে রবিবার অফিসে না পেয়ে তাঁর উর্ধ্বতন অফিসার রেজিস্ট্রেশন ইন্সপেক্টর হেরিসন সাহেব তাঁকে একমাসের জন্য বরখাস্ত করেন। সমাচার চন্দ্রিকা এই খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে লেখেন, 'ইংরাজরা কি এদেশীয়দিগকে তিষ্টিতে দিবেন না মনে করিয়াছেন? এ দেশীয় রাজকর্মচারীরা কি রবিবারেও স্বাধীনতা লাভ করিবার অধিকারী নহেন? রবিবারের বিশ্রাম কি কেবল ইংরাজ কর্মচারীদিগের জন্যই হইয়াছে?' (১৬ এপ্রিল ১৮৭৭)

স্বনির্ভরতার বাণী

স্বাধিকারের দাবি হিসাবে বাংলা সংবাদপত্র সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের নিয়োগ চেয়েছিলেন। কিন্তু নব্য শিক্ষিত বাঙালির চাকরিমুখীনতাও সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের দ্বারা লিখিত হয়।

ইংরাজী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে চাকুরির স্পৃহা ক্রমশ বাড়তে থাকে। গ্রাম্য মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাও এই সময় কলকাতা শহরাভিমুখে যাত্রা করতে থাকে, কিছু ইংরেজিশিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যৎ চাকরির আশায়।[৪৭] বাণিজ্যবিমুখতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির হাত থেকে ব্যবসা বাণিজ্য ধীরে ধীরে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে হস্তান্তরিত হতে শুরু করে।

বাঙালির এই বাণিজ্যবিমুখতার একটা বড় কারণ বর্ণভেদ প্রথা। বর্ণভেদ প্রথার জন্য উচ্চবর্ণের কৃতিবিদ্য লোকেরা বাণিজ্যের প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করেন নি। সংবাদ প্রভাকর বলেছেন, "বাঙ্গালিরা লক্ষ টাকা প্রদানপূর্ব্বক সাহেব বিশেষের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তদ্দারা স্বাধীনরূপে কোন প্রকার বাণিজ্য কারণে সাহসিক হয়েন না এদেশে জাতিভেদ কার্য্যের প্রভেদ থাকাতে বিদ্বোদগণ কেবল রাজকার্য্যের প্রতি অধিক প্রত্যাশা করিয়া থাকেন।"[৪৮]

বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া যে জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয় বাংলা সংবাদপত্র সেটি অনুধাবন করেছিলেন। সংবাদ প্রভাকর লিখেছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার না হলে জাতির উন্নতি হবে না এবং এতদিন জাহাজে করে, দেশান্তর গমনের নিয়ম না থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্য কিছুতেই প্রসার

লাভ করতে পারে নি। (সংবাদ প্রভাকর ১।৮।১২৬০) এই বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোপুরি বিদেশীদের হাতে থাকায় ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক ভারসাম্য বজায় থাকেনি। ভারত থেকে কাঁচামাল রফতানি করে বিদেশীরা এদেশে শৌখীন বিলাসদ্রব্য পাঠিয়েছে। ১৮৭৬-৭৭ সালে ভারতে বিদেশ থেকে যে সব দ্রব্য আমদানি হত তার মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টারের সুতির কাপড়, মদ, পশমি কাপড়, লবণ, হার্ডওয়ার ও কাটলারি দ্রব্য, কয়লা, সিল্কজাত দ্রব্য, মশলা, ধাতু প্রভৃতি ১৪ রকমের জিনিস ছিল মোট আমদানির শতকরা ৯০ ভাগ। ভারত থেকে যেত কাঁচা তুলা (মোট রফতানিকৃত দ্রব্যের শতকরা ৬০ ভাগ), নীল, খাদ্যশস্য, চামড়া, লাক্ষা, আফিম, তৈলবীজ, কাঁচা রেশম, তামাক, মাইকা, ম্যাঙ্গানিজ, কাঁচা পশম, চা প্রভৃতি যাবতীয় মৌল সম্পদ। এই গোটা বহির্বাণিজ্যটাই ছিল প্রধানত বিদেশীদের হাতে।[৪৯]

সংবাদ প্রভাকর দুঃখ করে লিখেছিলেন: 'বাণিজ্যের নাম লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী এক্ষণে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া তরণী আরোহণে বিদেশবাসিনী হইতেছেন। এ দেশের লোক লক্ষ্মীহারা হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাসত্বের শরণ লইয়াছে। তবে যে, লোকে ইতস্ততঃ চীনাকোট, চাঁদনীর জুতা, শাল, আংটী, গার্ড চেইন ও বাঁকা সিঁতি দর্শন করিয়া অহঙ্কার করে সেটী কেবল অধঃপাত ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। দেশের ধন বিদেশে যাইতেছে, দেশের লোক ফকীর হইতেছে, এই দুর্ভাগ্য সকলে অনুভব করিতেছেন না, অনুভব দূরে থাকুক, স্বপ্নেও বোধ হয় সেটী কেহ চিন্তাও করেন না। তাঁহাদিগের দেশে যে দিন দিন অন্তঃশূন্য হইয়া যাইতেছে ইহা ভাবনা করিবার অবসর তাঁহারা ক্ষণমাত্রও প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের ধনে বিদেশের লোক বড় মানুষ হইতেছে, বঙ্গের রত্নে অনঙ্গ দেব ঐশ্বর্য্যশালী হইতেছে, বঙ্গমাতা এক্ষণে কেবল কতকগুলি মুটে ও চাকর প্রসব করিতেছেন। মুটেরা তাহাদিগের মাতৃগর্ভজাত মহামূল্য রত্নজাত মাথায় করিয়া বিদেশীর বাণিজ্যপোতে তুলিয়া দিতেছে, চাকরেরা সহাস্য বদনে বৈদেশিক সওদাগরী হাউসে সেই সকল রপ্তানী রত্নের তেরিজ জমাখরচাদি শুদ্ধ রোকড় সই হিসাব রাখিতেছে।'

(সংবাদ প্রভাকর, ২৫।১১।৫৯)

এই অর্থনৈতিক অধীনতা যে রাজনৈতিক অধীনতার চেয়ে দুঃসহ তা বাংলা সংবাদপত্রের চোখে সেদিন ধরা পড়েছিল।

১৮৫০ সালে মাঞ্চেস্টার থেকে সাড়ে তিন কোটি টাকার কাপড় এদেশে আসে। ৬৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ কোটি। ১৮৫০ সালে সাড়ে তিন কোটি টাকার কাপড় আমদানি হয়। ৬৯ সালে তা ২০ কোটি টাকায় ওঠে।[৫০]

তত্ত্ববোধিনী লেখেন, "কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে এই বাণিজ্যে বঙ্গবাসীদিগের হস্তে প্রায় কিছুই নাই। আমাদের যুবকেরা আর সকল বিষয়েই যশোলাভ করিয়াছেন, কি রাজনীতি কি বিদ্যা কি শিক্ষা কি ওকালতি কি চিকিৎসা সকল বিষয়েই জয়লাভ

করিতেছেন, কেবল এই এক বিষয়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাঁহারা নিরুদ্যম রহিয়াছেন।" (তত্ত্ববোধিনী, জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক। ৩২১ সংখ্যা)

সমাচার সুধাবর্ষণ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে (১৭ পৌষ ১২৬২) আক্ষেপ করেছিলেন যে রাক্ষসরূপী ইংরাজেরা এদেশ থেকে বহুমূল্য সম্পদ নিয়ে সাগর-পারে পাচার করছে।

উঠ হিন্দু বীরগণ
রাক্ষস হইতে দেশ করহ রক্ষণ
যায় রাক্ষসে লইয়া
ইউরোপে যাত্রা করে সাগর বাহিয়া
কেন দ্রব্য বহুমূল্য।
হিন্দুস্থানে যথাভূমি ফসলা অতুল্য ॥

সুধাবর্ষণ 'লহ স্বদেশীগণ দুঃখিদের ভার' বলে স্বদেশীয়দের এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন। এর পরবর্তী কালে ১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তার জন্য প্রথম অনুপ্রেরণা এসেছিল বাংলা সংবাদপত্রের কাছ থেকেই।

শিল্প বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যই কাম্য ছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন, দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল প্রমুখেরা শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে উৎসাহী হয়েছিলেন। ১৮২৯ সালের ৩১ জানুয়ারি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ঘরে একটি জনসভা হয়। এই সভায় ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের লোকেরা Commercial Patriotic Association নামে একটি বাণিজ্যিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। পরিচালক সমিতির সাতজন সদস্যের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় সদস্য ছিলেন রামমোহন, তিনি অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

এই প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনভাবে এদেশীয় লোকের দ্বারা কৃষি, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সংগঠিত করা, কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের বিরুদ্ধে নবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠন ও অবাধ ব্যবসায় গড়ে তোলা।[৫১]

দ্বারকানাথ ঠাকুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও ডকিং কোম্পানির ডাইরেক্টর ছিলেন। এছাড়া হোপ রিভার ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, গ্লোব ইনস্যুরেন্স কোম্পানি, ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনস্যুরেন্স, বেঙ্গল কোল কোম্পানি ও কার অ্যাণ্ড টেগোর কোম্পানির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মতিলাল শীল নীল, সিল্ক, চিনি, লবণ, তুলা ও লোহা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও কার-ঠাকুর কোম্পানির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[৫২]

কিন্তু বিশ বছরের কম সময়ের মধ্যে বাঙালির এই বাণিজ্য প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৮৪৬ সালের ১ আগস্ট লণ্ডনে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে কার টেগোর অ্যাণ্ড কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কও বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৫৩] ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এই পতনের ফলে বাঙালির অর্থনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল। বাঙালি পরিচালিত শিল্পগুলির অবস্থা দেখে নতুন করে অর্থ লগ্নি করার ঝুঁকি নিতে বাঙালিরা একটু ভীত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এক মিথ্যা অহমিকা বোধ শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রাদায়কে আচ্ছন্ন করে। কারণ সমাজে এক সময় ছিল বিত্তের সম্মান। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিত্তের চেয়ে বিদ্যা সমাজজীবনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। তবু দ্বারকানাথ প্রসন্নকুমার মতিলালের মত বিদ্যা ও বিত্তের সমন্বয় সাধন নিশ্চয়ই করা সম্ভব ছিল কিন্তু তা যে হয়নি তার জন্য পরাধীনতা অনেকখানি দায়ী। রাষ্ট্রিক শক্তির কাছ থেকে স্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যমে কোন উৎসাহ পাওয়া সেদিন সম্ভব ছিল না। তবে তার চেয়ে বড় যে কারণ তা সমাজতত্ত্বগত। বাঙালি হিন্দুসমাজের গঠনের মধ্যেই এই বাণিজ্য পরাঙ্মুখতার বীজ নিহিত ছিল। সোমপ্রকাশ তাই পরবর্তী কালে হিন্দুসমাজ সংস্কারের কথা বলেছেন।

সংবাদ প্রভাকর থেকে সোমপ্রকাশ বার বার বলে এসেছেন, বাঙালিকে বহির্বাণিজ্য বিস্তারের জন্য বিদেশে যেতে হবে। কালাপানি পার হওয়া মানে গর্হিত কোন অন্যায় কাজ নয় – দেশের সমৃদ্ধির তা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই কথাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে বাংলা পত্রিকায়। এরই পরিণতি হিসাবে উনিশ শতকের শেষ হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রীয় মত অনুসারে সঙ্গত কী না তা বিচার করে দেখবার জন্য রমেশচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি ব্যবস্থা দেন যে সমুদ্রযাত্রার ফলে পতিত হবার কোন কারণ নেই।[৫৪]

শুধু বাণিজ্য কেন, কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানে উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে বাঙালির সার্বিক মুক্তির পথ যে প্রশস্ত হতে পারে না বাংলা সংবাদপত্র এ বিষয়ে বার বার জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ১৮১৮ সালে ভারতের সর্বপ্রথম সূতাকলটি কলকাতার কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৫] ১৮২০ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম বাষ্পচালিত কাগজের কল বসে। এদেশে নব্য বিজ্ঞানের যাত্রা এইভাবেই শুরু হয়। সমাচার দর্পণ শিল্পবিপ্লবের সেই উষাকালে এই নবীন শিল্পোদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৮২০ সালের ২৫ মার্চ সমাচার দর্পণ লেখেন :

বাষ্পের কল

'মোকাম শ্রীরামপুরের সাহেবেরা ইংগ্লণ্ড হইতে এক বাষ্পের কল ও তাহা বসাইবার কারণ ইংগ্লণ্ডীয় একজন মিস্ত্রী আনিয়া আপন বাটীতে তাহা বসাইয়াছেন। তাহার দ্বারা এই অগ্নির উত্তাপে জল তপ্ত হইলে সেই জলের বাষ্প নির্গত হয় কেবল তাহার জোরে সেই কল চলে। সে কল বার ঘোড়া ব্যতিরেকে ঘুরান যায় না কিন্তু কেবল একজন মজুর অগ্নি জ্বালাইয়া ঘুরাইতেছে। এই কলের দ্বারা ইংগ্লণ্ডে তাঁতী ও লোহার ও

ছুতার প্রভৃতি সকলের কর্ম নিষ্পন্ন হয় কিন্তু শ্রীরামপুরের এই কলে কেবল কাগজ নিষ্পন্ন হইতেছে অন্য ২ কর্ম করিলেই করা যাইবেক। ইংগ্লণ্ড দেশে এই বাষ্পের দ্বারা বায়ু ও স্রোতের প্রতিকূলেও জাহাজ প্রভৃতি চলে। এতদ্দেশে সে পর্যন্ত এখনও হয় নাই। কিন্তু অনুমান করি যে ক্রমে ২ ইংগ্লণ্ডের তাবৎ শিল্পকর্ম্ম এতদ্দেশে আসিবে।'

ওই ১৮২৩ সালের পর থেকেই শিল্পবিদ্যায় শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য ইংলণ্ডে মেকানিকস ইনষ্টিটিউটগুলি গড়ে উঠতে থাকে [৫৬]

কলকাতায় মেকানিকস ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হয় ১৮৩৯ সালে। কিন্তু রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত যথার্থ শিল্পবিপ্লবের সূচনা হতে পারে নি। শিল্পোদ্যোগ সুরু হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। ১৮৫৪ সালে বোম্বাইয়ে আধুনিক সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৫ সালে শ্রীরামপুরের রিষড়াতে প্রথম চটকল স্থাপিত হয়।[৫৭]

বাংলাদেশে মেকানিক ইনষ্টিটিউটের আয়ু বেশি দিন ছিল না। ইনষ্টিটিউট উঠে যাওয়ায় ১৮৪৩ সালে সংবাদ প্রভাকর দুঃখ করে লেখেনও '—শিল্পবিদ্যার আধিক্য ব্যতীত অবনীর সুখ সৌভাগ্য কদাচ করস্থ হয় না, অতএব যে উপায় দ্বারা এই নগর মধ্যে শিল্পবিদ্যার উপদেশ প্রদানার্থ মেকানিক ইনিষ্টিটিউশান নামক এক সভা হইয়াছিল এবং সুপ্রীম কোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতি শ্রীযুত স্যার জন পিটর গ্র্যান্ট প্রভৃতি অনেকানেক সম্রান্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, ও প্রধান ২ বিদ্বান ব্যক্তিরা তথায় উপস্থিত হইয়া বিনাবেতনে সাধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিতেন, কিছুদিন পরে ঐ মহৎ সভা সাধারণের অনুরাগ বিরহ একবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতি যে বিদ্যার দ্বারা অসাধ্য সাধনায় কৃতকার্য্য হইতেছেন কলিকাতাস্থ লোকেরা কি কারণ যে মহাবিদ্যা প্রকাশিকা সভার প্রতি অনুরাগ শূন্য হইলেন আমরা বুদ্ধির দ্বারা তাহার মর্ম্মাবধারণে নিতান্ত অক্ষম হইতেছি, মেকানিক ইনষ্টিটিউশানের সভার দ্বারা সমুদয় মনুষ্যদিগের যেরূপ উপকার হইতেছিল তাহা তাহার কার্য্যবিবরণে সকলে জ্ঞাত আছেন, বিশেষতঃ ঐ সভার প্রস্তাব সর্ব্বদাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে. অতএব পাঠক মহাশয়েরা দেখুন, এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল আলস্যের অনুগামি হইয়া সর্ব্বারাধ্য শিল্প বিদ্যার অনাদর করিতেছেন।' (৮ ৬ ১৮৪৭)

শিল্পবিদ্যায় বলীয়ান না হয়ে শুধু মাত্র ঐতিহ্য ভাঙিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যে টেক্কা দেওয়া যাবে না তা সুলভ সমাচারও পরবর্তী কালে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

সুলভ সমাচার ইংরাজদের জাতি হিসাবে ভারতীয়দের থেকে বড় বলে মনে করতেন। কিন্তু ইংরাজদের এই শ্রেষ্ঠত্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে। পরানুকরণ বিসর্জন দিয়ে দেশবাসী যদি এই নব্য বিজ্ঞানে পারদর্শী না হন এবং শুধুমাত্র চাকরির জন্য উমেদারি করে জীবন শেষ করেন তাহলে বাঙালির মানসিক জড়ত্ব কিছুতেই ঘুচবে না। এটাই ছিল সুলভ সমাচারের বক্তব্য।

"পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়া ইংরাজদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া লজ্জার বিষয়। আজকাল

আমাদের দেশের অনেকে লেখাপড়া শিখিতেছেন, কিন্তু তাঁরা তোতা পাখী, আজও প্রকৃত বিদ্বান হইতে পারেন নাই। যারা নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতে পারে না তারা আবার বিদ্বান? যাঁরা বিলাতে যান, তাঁরা গায়ে তেল দেওয়া, কাপড় কোঁচান, তামাক সাজা, বিছানা পাড়া, ছেলে কোলে লওয়া, বাজার করা, গালাগালি খাওয়া, জুতাশুদ্ধ লাথি খাওয়া প্রভৃতি চাকরিগিরি শিখিয়া আসেন, কিন্তু ছুতরগিরি, কামারগিরি, তাঁতিগিরি, জাহাজগিরি, রেলওয়েগিরি, পুলবান্দাগিরি, দেশলাইগিরি প্রভৃতি অত্যন্ত দরকারী কাজ কেহই শিখিয়া আসেন না। সুতরাং দেশের লোকের মুখ হাসাইয়া কোট হ্যাট পরিয়াও ইংরাজদের সমান হইতে পারেন না। ইংরাজেরা যে বড় সে বড়ই রহিয়া গেল। যতদিন আমাদের দেশের লোক, কলের জাহাজ, কলের গাড়ী, টেলিগ্রাফ তৈয়ার করিয়া চালাইতে না পারিবে, গঙ্গার পুলের মত পুল তৈয়ারি করিতে না পারিবে, সত্যের জন্য দেশের জন্য প্রাণ দিতে না পারিবে, ততদিন ইংরেজেরা বড় আমরা ছোট।" (১১ কার্তিক ১২৮১)

সম অধিকারের দাবি

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের আইনসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য দাবি ওঠে। ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিনিধিমূলক সরকারের দাবি উঠেছিল মহারাষ্ট্রে ১৮৪৮ সালে। ত্রিশ দশক থেকে মুনরো, এলফিন স্টোন ও মেকলে প্রমুখ ব্রিটিশ লিবারেলরা এই কথা বলে আসছিলেন যে, কালক্রমে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে এবং ব্রিটশদের উচিত এখন থেকেই ভারতীয়দের স্বশাসনের জন্য তৈরি করা। সেটাই হবে ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য ব্রিটিশের বড় অবদান। পঞ্চাশের দশকে ডালহৌসির রাজত্বকালে ম্যানচেস্টার লিবারেল ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অফিসারদের মুখে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।[৫৮]

এই লিবারেলরা মনে করতেন যে ভারতীয়রা খুব সুন্দর অফিসার হবার গুণ রাখে। এমনকি তারা ব্রিটিশ অফিসারদের চেয়েও কর্মদক্ষ।[৫৮] অবশ্য স্বল্পসংখ্যক লিবারেলদের এই মতবাদ কখনই বৃহত্তর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ছিলেন তাদের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় সম্প্রদায় লিবারেলদের এই ভাবনার উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা সংবাদপত্রে এ নিয়ে আন্দোলন করেছেন। সভা সংগঠনের মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্যকে আরও সুস্পষ্ট করেছেন।

আইনসভায় ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি সর্বপ্রথম তোলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব ছিল গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের বাইরে ১৭ জনের একটি ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হবে। তাঁদের মধ্যে ১২ জনই মনোনীত হবেন শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল ভারতীয়দের মধ্যে থেকে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরা পাঁচ বছরের জন্য মনোনীত হবেন। এই পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁদের অপসারিত করা যাবে না। ব্যবস্থাপক সভা যে বিল পাশ

করবেন তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গবর্নর জেনারেলের সুপ্রীম কাউন্সিলের কাছে পাঠানো হবে।

কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আবেদনপত্রটি প্রথম দফায় ব্রিটিশ সরকার নাকচ করেন। ১৮৫৩ সালের ২৫ জুলাই অ্যাসোসিয়েশন তার প্রতিবাদে টাউন হলে এক জনসভা ডাকেন। সভায় প্রায় তিন থেকে দশ হাজার জনসমাগম হয়েছিল।[৩৭] রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতিত্ব করেন এবং রাধাকান্ত দেব ওই সভায় বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

অ্যাসোসিয়েশনের এই আবেদন নিবেদন ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল তা বলা যায় না। ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বারোজন সদস্যের মধ্যে তিনজন বেসরকারী ভারতীয় সদস্যকে মনোনীত করার ব্যবস্থা হয়।

এই তিনজন ভারতীয় সদস্য পাতিয়ালার মহারাজা, কাশী নরেশ ও গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সার দিনকর রাও। একজন বাঙালী সদস্যও গ্রহণ করা হয়নি।

তবে ১৮৬২ সালে ১৮ জানুয়ারি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের বারোজন সদস্যের মধ্যে চারজন বাঙালি সদস্য গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথম বাঙালি সদস্য যাঁরা পরিষদে মনোনীত হলেন তাঁরা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, নবাব আবদুল লতিফ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ১ আগস্ট রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যুর পর সাংবাদিক রামগোপাল ঘোষ ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য মনোনীত হন। কিন্তু মনোনীত সদস্যদের ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হয়নি। গণতান্ত্রিক সভা সংগঠনের মাধ্যমেই যে জনগণের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা সফল পরিণতি লাভ করতে পারে বাংলা সংবাদপত্র এটি উপলব্ধি করেছিলেন। সম্বাদ ভাস্কর ১৮৫৬ সালের ৯ ডিসেম্বর লেখেন, 'প্রজাসভা হইতেই আমেরিকা রাজ্য স্বাধীন হইয়াছে। আমেরিকার ক্রীতদাসরাও সভা সমিতির মারফৎ মুক্তি সংগ্রামকে সংহত করেছেন। তারা অবিলম্বে দাস পাশ হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই।'

কিন্তু ভারতবর্ষে সভা সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্যবোধের অভাব ভাস্করকে পীড়িত করেছিল। বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ দলাদলির ফলে ভূম্যধিকারী সভার অবসানের দৃষ্টান্ত তো ছিলই। এমনকি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনে দেশের সকলে যোগ দেননি বলে ভাস্কর আক্ষেপ করেছেন।

"ভারতবর্ষীয় সভার সভা মহাশয়েরা আপনাদিগের লাভের জন্য সভা করেন নাই, বঙ্গরাজ্য স্বাধীন রাজ্য হইবে, দুঃখ হইলে রাজদ্বারে জানাইবেন, রাজা তাহার প্রতীকার করিবেন ইত্যাদি অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় সভা নামে প্রধান সভা করিয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার এমত অভিপ্রায় নহে সকলে ঐক্যবাক্য হইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উপর গুলিক্ষেপ করিবেন। সভা মহোদয়দিগের এই অভিলাষ ব্রিটিশাধিকারে থাকিয়া প্রজাদিগের যেন সুখ বৃদ্ধি করিবেন। রাজ্যেশ্বর সুখে

থাকুন, প্রজরা যেন দুঃখ পান না এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষীয় সভা স্থাপিত হইয়াছিল, এইক্ষণে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট পদে ২ মান্য ২ প্রজাগণকে অন্যায়রূপে দোষাস্পদ করিতেছেন। আর নানা প্রকার করে ২ প্রজা সকলকে নিষ্কর করিয়া ফেলিলেন এই কারণ ভারতবর্ষীয় সভা প্রজা সুখ চাহেন তবে ভারতবর্ষবাসী মান্য লোকেরা কি কারণ এই সভার সহিত সংযুক্ত হন না ?”

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গণ-সংগঠনের রূপ নেয়নি। অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদার হার বেশি ছিল। জেলায় জেলায় অ্যাসোসিয়েশনের কোন শাখা স্থাপনের চেষ্টাও হয়নি। পরবর্তী কালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে জনতা ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলরে চেষ্টা হয়েছিল। যেমন বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ মিত্রের নেতৃত্বে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু তা সফল হয়নি। ১৮৭২ সালে শিশিরকুমার ঘোষ ও ভ্রাতৃবৃন্দ জেলায় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলায় চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৭২ সালের মার্চে তাঁরা ঢাকায় একটি অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। পরে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুরে অনুরূপ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয়।

১৮৭৫ সালে শিশিরকুমার ইণ্ডিয়া লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাধারণীতে লীগের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছিল। লীগের সভাপতি হয়েছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী। কালীনাথ দাস ছিলেন সম্পাদক। শিশিরকুমার সহকারী সম্পাদক। কিন্তু আভ্যন্তরীণ দলাদলির জন্য লীগে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ভাঙন ধরেছিল।

লীগে ভাঙন দেখা দেওয়ার পর একমাসের মধ্যেই ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই অ্যালবার্ট হলের সভায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়েছিল। লীগ থেকে পদত্যাগ করে এসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মন্মথনাথ ঘোষ প্রমুখেরা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন। এই সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছিল, এই সংগঠন গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনতাকে সঙ্গে নিয়ে চলবে। ব্যক্তিত্বনির্ভর এবং প্রধানতঃ অভিজাতশ্রেণী চালিত রাজনৈতিক সংগঠন থেকে মধ্যবিত্ত চালিত গণ-সংগঠনের উত্তরণ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এতদিন ধরে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি প্রকৃত সংগ্রামী রাজনৈতিক সংস্থার অবয়ব ধারণ করেনি। তা ছিল প্রধানতঃ উনিশ শতকের বাঙালির মনন ও প্রজ্ঞা চর্চার কেন্দ্র। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতির এই ধারা লক্ষ্য করে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন :

‘Politics did not involve in those days any sufferings or sacrifices. The Political authorities in the country did not take our infant political movement seriously. They saw no menace to their authority in it. The whole was more or less, a pastime,

though certainly the more serious minded of our youthful intellectuals did not consciously purpose it as such.'[৬১]

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মধ্য দিয়ে বাঙালির রাজনৈতিক সংগ্রামকে গণমুখী করার প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়।

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

উনিশ শতকের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিভূমি ছিল স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবোধ। এই ধর্ম ও সামাজিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমাজে যে বিরোধ ও বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল নবলব্ধ জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতাবোধ সেই বিরোধ দূর করে জাতিকে একই লক্ষ্যে প্রণোদিত করে তোলে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসেন। যেমন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মাদরাজ ও পুনাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখা খোলা হয়। 'এই অ্যাসোসিয়েশনগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং মোটামুটি তাঁদের একই লক্ষ্য ছিল সেটি হল প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি ও ভারতীয়দের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। এতদিন ধরে বাঙালি, মারাঠি, পাঞ্জাবি ভারতবর্ষে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বাস করছিল, তারা যে একই ভাগ্যচক্রের আবর্তনে সংবদ্ধ এবং একই জাতীয় লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত এই বোধ তখন থেকে দৃঢ় হতে থাকে। এই বোধ থেকেই ১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসভা সৃষ্টি হয়।

এই নবলব্ধ জাতীয়তাবোধের মধ্যে যোগসূত্র ছিল ধর্ম—হিন্দুধর্ম। মুসলমানেরা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। এছাড়া পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিলই। বিধর্মী বিদেশীদের অন্ধ অনুকরণে নব্য শিক্ষিতদের একটি দল সহকার শাখার মত সম্পূর্ণভাবে বিদেশীদের ওপর নির্ভর করে। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের স্রোত অব্যাহত। রাজশক্তির প্রতাপ বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আত্মমর্যাদা বেড়েছে। রামমোহন বিলেতে গিয়ে পেয়েছিলেন অ্যাডাম, মেরি কার্পেণ্টার প্রমুখ ভারতবন্ধুকে। দ্বারকানাথ বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিলেন জর্জ টমসনকে। এঁরা বাঙালির স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামকে নানা ভাবে সাহায্য করে গেছেন। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৭০ সালের বিলেতে গিয়ে ভারতবাসীর স্বাধিকার ও ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করে সেখানকার মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এতে করে বার বার বাঙালির আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় হয়। সোমপ্রকাশ কেশবচন্দ্রকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিলেন। তার কারণ দ্বারকানাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত বিরোধ। কিন্তু অমৃতবাজার বিলাতে কেশবচন্দ্রের সাফল্যে প্রীত হয়ে লেখেন :

"কেশববাবু ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তা বলিয়া ইংলণ্ডে মহাসমাদর পাইয়াছেন, রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার বোধ হয় সেখানে স্থান হইত না। তাঁহার বক্তৃতা শক্তিও চমৎকার আছে। ইংলণ্ডবাসীরা তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী বলিয়া লইয়াছেন। এমত অবস্থায় কেশববাবুর দ্বারা আমরা দেশের কত উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি। অতএব তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই প্রাণপণে সমর্থন না করিয়া যেখানে কেহ কেহ বিপক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে আমরা ইহাই বলি যে ভারতবর্ষের পাপের অদ্যাবধি শেষ হয় নাই।" (অমৃতবাজার পত্রিকা ২১ জুলাই ১৮৭০)

বিলাতে কেশবচন্দ্রের সাফল্যের গুরুত্ব সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ হল কেশবচন্দ্রের এই সম্মান বাঙালির হীনম্মন্যতা বোধ দূর করে তাকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

"In two other ways Keshab helped the development of nationalism. First his victories in dispute and discussions over the Christian Missionaries in India and the great honour he received in England removed to a large extent the inferiority complex from which the Indians were suffering, and gave them a large degree of selfconfidence."[৬২]

এছাড়া কেশবচন্দ্রের ভারত পরিক্রমাও জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনে যথেষ্ট সাহায্য করে। রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র ধর্মভাবনার দিক থেকে তাঁরা নতুন পথের পথিক হলেও তাঁরা সকলেই হিন্দু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সগৌরবে স্বীকার করে গেছেন। একারণে হিন্দু জাতীয়তার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা জাতীয় জাগরণের নেতৃবৃন্দের পক্ষে এক রকম অসম্ভবই ছিল। কারণ বহুধাবিভক্ত পরাধীন জাতির কাছে হিন্দুধর্মই ছিল সবচেয়ে বড় ঐক্যবিধায়ক শক্তি। আর এই ঐক্যের প্রয়োজন ছিল সেদিন সব থেকে বেশি।

১৭৮৯ শকের ৩০ চৈত্র গণেন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার (চৈত্রমেলা) উদ্দেশ্য বিবৃত করে যে কথা বলেছিলেন তাতে হিন্দু শব্দটি ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক অর্থের চেয়ে সর্বভারতীয় ঐক্যরচনার উদ্দেশ্যেই অধিকতর ব্যবহৃত হয়েছে।[৬৩] গণেন্দ্রনাথ বলেন :

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া

থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয় সুখের জন্য নহে কোন আমোদ প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারত ভূমির জন্য।”

তবে হিন্দু জাতীয়তাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ করে তোলার এই আদর্শকে কেউ কেউ সমর্থন জানাতে পারেন নি। হিন্দু জাতীয়তাবাদের পাশে পাশে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদেরও উদ্ভব হয়। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ হিন্দু-মেলার নাম পরিবর্তন করে 'ভারত মেলা' রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। "হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব না।"[৬৪]

এই সেক্যুলার চিন্তাধারা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর। কিন্তু উনিশ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমিতে হিন্দু জাতীয়তা-বাদের অভ্যুদয় অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মাঝেও সেক্যুলার চিন্তাধারার হাওয়া বইছিল। বাঙালির রেনেশাঁসের গতিধারা যে বাঙালি মুসলমানদের বাদ দিয়েই এগিয়ে চলেছিল এবং তার পরিণাম যে সুখপ্রদ হতে পারে না এই ঐতিহাসিক সত্য 'এডুকেশন গেজেট' উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য জাতীয় জাগরণের এই উত্তাল ঝোড়ো হাওয়া কেন মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করেনি সেই বিতর্কে আমরা যাব না, তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। আমরা একথা বলতে চাই এডুকেশন গেজেট সহ হিন্দু কয়েকটি বাংলাপত্রিকা হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা সেযুগে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে গেছেন এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা উচ্চারিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই বাংলা সংবাদপত্রের পাতায় সে সব কথা লেখা হয়েছে। ১৮৭৪ সালের ৪ ডিসেম্বর এডুকেশন গেজেট লিখেছিলেন: 'এদেশের মুসলমানরাও বাঙ্গালী।' এডুকেশন গেজেট হিন্দু মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সেক্যুলার শিক্ষা। 'স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকিলেই সাম্প্রদায়িক জাতিভেদের নিদান থাকিল। স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকিলেই রাজপ্রদত্ত শিক্ষার মুখ্যতম উদ্দেশ্য যে দলবন্ধনের সমূলোচ্ছেদ তাহার পথে ব্যাঘাত থাকিল।' (২৯ নবেম্বর ১৮৭২) এডুকেশন গেজেট মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে শিক্ষিত হিন্দুর সমকক্ষ হতে বলেছিলেন। 'মুসলমানেরা অগ্রসর হউন, হিন্দুরা বরং তাঁহাদের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই এক দশা। উভয়েরই স্বত্ব ও অধিকার এক। অতএব কেহ কাহারও ঈর্ষা না করিয়া যদি পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া সেই স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে উভয়পক্ষেরই শ্রেয় হইতে পারে।' (১০ নবেম্বর ১৮৭৬)

সোমপ্রকাশও চেয়েছিলেন, মুসলমান সমাজ গোঁড়ামি-মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিন। "বঙ্গদেশে এমন অনেক মুসলমান দৃষ্ট হয় যাঁহারা কুসংস্কার

পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের ক্ষমতা এত প্রবল যে কুসংস্কার মুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্যরূপে কোন কাজ করিতে সাহসী হন না।" (১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮)

সোমপ্রকাশও মুসলমানদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের বিরোধিতা করেছিলেন। আরবি ও পারসি-ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষার বদলে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চার বিকাশ চেয়েছিলেন এবং উর্দুর বন্ধন থেকে বাঙালি মুসলমানদের মুক্ত হতে বলেছিলেন। 'মুসলমান হইলেই উর্দ্দু, পারসী ও আরবী মাতৃভাষা হয়, এই সংস্কারটি অনিষ্টের মূল, ইহাতেই মুসলমানগণ কখনই আপনাদিগকে ভারতবর্ষের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিবেন না।' (সোমপ্রকাশ, ১২৭৮, ১৬ জ্যৈষ্ঠ)

এমনকি আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে সাম্প্রদায়িকতার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে মীর মোশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' কাব্য গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমান জাতীয় ঐক্যের কথাই বলে গেছেন।

'বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানের দেশ একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে, যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাংলা লিখিবেন না বা বাংলা শিখিবেন না কেবল উর্দ্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।' (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০)

বাঙালির জাতীয় জাগরণের যাত্রাপত্রে যে ঐক্যবোধের প্রয়োজন সেই ঐক্য অর্জনের ভিত্তি যে ধর্মনিরপেক্ষতা তা বাংলা সংবাদপত্রের চোখে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছিল।

হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে যেমন সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল, কিন্তু আশ্চর্যভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সর্বভারতীয় জাতীয়বাদের পরিপন্থী হয়নি। উনিশ শতকের সাহিত্যে, সঙ্গীতে, স্বাদেশিকতাবোধের যে উন্মেষ ঘটেছে তাতে বাঙালি জাতীয়তা ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ হিসাবেই লালিত হয়েছে।

হিন্দুমেলা স্থাপন করেছিলেন শ্রীনবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালে। এই উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা করেন তা সর্বভারতীয় চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।

আবার পাশাপাশি রাজনারায়ণ বসু যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে।

দেখিয়া উৎসব—সভা পুলকিত প্রাণ
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যাতে বিদ্যমান
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল।
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তাঁর সকলে মিলিল॥
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে।
বঙ্গের মহিমা পূর্ব্ব বঙ্গীয় মাঝারে॥

সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে যে প্রাদেশিক বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল এই প্রাদেশিকতা দূরীকরণের কাজে বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অনেকখানি। ১৮৭১ সালের হিন্দুমেলায় বাঙালি ও পাঞ্জাবি পালোয়ানের মধ্যে কুস্তিতে বাঙালি পালোয়ান হেরে যাওয়ায় সংবাদ প্রভাকরের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা হল এই: "বাঙ্গালী জয়লাভের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও শেষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, গতবর্ষে বাঙ্গালী পাঞ্জাবীকে হারাইয়া ছিল, এবার বাঙ্গালী হারিল তাহাতে দুঃখ কি? চেষ্টা করা হউক, আগামী বর্ষে আবার পাঞ্জাবী হারিতে পারে। ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবীকে শৃগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিত, সেই বাঙালী যে এখন পাঞ্জাবীর সহিত কুস্তী করিতে সমর্থ হইল, ইহাই প্রশংসার বিষয়।"[৬৫]

এই সহনশীলতা এবং খেলওয়াড়িসুলভ মনোভাব জাতীয়তাবোধেরই বহিঃপ্রকাশ। হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যকে কট্টর ব্রাহ্মপন্থী সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচার' যেমন সমর্থন করেন তেমনি উদারপন্থী অমৃতবাজার পত্রিকাও সমর্থন করেছিলেন। উভয়-পত্রিকা থেকে হিন্দু মেলায় প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১২৭৬ বঙ্গাব্দে অমৃতবাজার লেখেন:

চৈত্র মেলা

গত চৈত্র সংক্রান্তিতে কলিকাতার বাবু আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে চৈত্র মেলার তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার অধিকতর সমারোহের সহিত কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। লোকের জনতা বিস্তর হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থান সংকীর্ণ ও উত্তম বন্দোবস্ত না হওয়ায় ভারি গোল হইয়াছিল। এমনকি আমরা শুনিলাম অনেকগুলি ভদ্রলোককে ধাক্কা খাইতে হইয়াছিল। এদেশ জাত অনেক জিনিষপত্রের আমদানী হইয়াছিল। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পজদ্রব্যও বিস্তর প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইগুলি দেখিয়া অনেকে সন্তোষলাভ করেন। গত বৎসরের ন্যায় উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ও বাঙলা প্রস্তাবসকল পঠিত হইয়াছিল। বিশেষ আহ্লাদের বিষয়, সংস্কৃত কলেজের কতকগুলি ছাত্র বেণী সংহার নাটকের

অভিনয় প্রদর্শন করাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। কিন্তু নাট্যশালাটি অতিশয় অপ্রশস্ত হইয়াছিল এবং এই অভিনয় বিষয় দেখিতে লোকের এত সমাগম হয় যে, তাঁহারা অভিনয় ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক ইহাদিগের উদ্যোগ অতিশয় মহৎ। ব্যায়াম চর্চার এবার উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। অনেকগুলি ভদ্র সন্তান ব্যায়াম চর্চার পরীক্ষা দেন। তাঁহাদের নৈপুণ্যতা দেখিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।··· (২১ বৈশাখ ১২৭৬। ২২ এপ্রিল ১৮৭৯)

সুলভ সমাচার তার পরের বছর লেখেন :

"দেশের যাহা কিছু ভাল সেইগুলি সব একস্থানে একত্র করিয়া দেখাইবার জন্যই হিন্দুমেলা হইয়াছে। ইহাতে দেশীয় লোকেরা যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদের মনে আহ্লাদ হইবে যে আমাদের দেশে এমন ভাল ভাল দ্রব্য ও ভাল ভাল ব্যাপার দেখাইবেন তাঁহাদের মনে উৎসাহ হইবে যে লোকে তাঁহাদের জিনিষ ও ব্যাপার সকল দেখিয়া ভাল বলিতেছেন। এ সকল মেলার দস্তুর এই যে ভাল ভাল জিনিষগুলি আবার লোকে পয়সা দিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে লাভের উপায়ও বিলক্ষণ হয়। সকল সভ্য দেশেই ঐরূপ মেলা আছে। বিলাতে বৎসরে বৎসরে ভয়ানক মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে প্রায় পৃথিবীর সকল স্থানের ভাল ভাল আশ্চর্য আশ্চর্য দ্রব্য সকল সংগ্রহ হইয়া থাকে। আমাদের দেশের হাতির দাঁতের পাটি, কাশ্মিরী সাল প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষ সকল সেইখানে গিয়া এ দেশের বহুকালের পুরাতন সভ্যতার পরিচয় দেয়। যাহা হউক সভ্য জাতির মেলার সঙ্গে আমাদের গরীব মেলাতে অনেক তফাত। সে সব মেলার সঙ্গে আমাদের মেলার তুলনা করিতেও আমাদের ইচ্ছা নাই।" (সুলভ সমাচার, ১০ ফাল্গুন, ১২৭৭)

হিন্দুমেলার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরতা। বিদেশীর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আত্মশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের শিল্প বাণিজ্য বিস্তার ও আপন সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোই হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য।

"ভারতবর্ষের এক একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাজ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে, অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"৬৬

এই আত্মনির্ভরতাই হল স্বদেশানুরাগ। তত্ত্ববোধিনী লিখেছিলেন :

"স্বদেশানুরাগ না থাকিলে স্বদেশের হিতসাধন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আনন্দের বিষয় এই যে এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে। এই স্বদেশানুরাগ যতই বৃদ্ধি হইবে ততই তাহাদের দ্বারা স্বদেশের উপকার সাধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ভারতের উদ্ধার কেবল এই স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধির প্রতি নির্ভর করিতেছে। এই স্বদেশানুরাগ দ্বারা ভারতবর্ষীয়

লোকদিগকে যতই ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করা যাইবে ততই ভারতের উন্নতি সাধন হইবে।" (তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন, ১৭৯৮ শক)

তত্ত্ববোধিনী বাঙালির জাতীয় পোশাক থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। কথায় বার্তায় ইংরাজী শব্দ পরিহার এবং চিঠি লেখায় বা বক্তৃতা দেওয়ার সময় বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার পক্ষে তত্ত্ববোধিনী প্রভৃত যুক্তি দিয়েছিলেন। "সকল বিষয়ে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করিয়া আমরা মাতৃভাষার কেন অবমাননা করিয়া থাকি ? প্রকৃত স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি এরূপ কখনই করিবেন না।"

তত্ত্ববোধিনী সভার বেদী থেকে একদা উচ্চারিত হয়েছিল বর্তমান হিন্দু সমাজের ভাবগতি উপলক্ষে দেশানুরাগের প্রকৃত পদ্ধতি কিরূপ, তার পথনির্দেশ। পুনর্বার বলিতেছি যে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ মাত্র থাকিলে হইবে না. বিশেষ অনুরাগ এবং মুখ্য অনুরাগ চাই, সেই প্রকার অনুরাগই প্রকৃতরূপে দেশানুরাগ শব্দের বাচ্য।" (তত্ত্ববোধিনী, বৈশাখ ১৭৯৯ শক)

এই জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার কথাই লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার পত্রিকায়।

"যেমন গ্রীকেরাও কখন আপনাদিগের জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করে নাই— রোমীয়েরাও করে নাই এবং ইংরাজেরাও যাহা করেন নাই এবং করিতে ইচ্ছুক নহেন—আমাদিগেরও সেইরূপ করিয়া চলা উচিত। সাহেবদিগের স্থানে শিক্ষালাভ করায় হানি নাই—অনেক উপকারই আছে—কিন্তু সাহেবী বহি পড়িয়া একেবারে সাহেব হইয়া উঠিবার চেষ্টা করা নিতান্ত স্বার্থপর, নীচাশয়, আত্মগৌরববিহীন ব্যক্তির কার্য্য।" (শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার, চৈত্র ১২৭৩)

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর এডুকেশন গেজেটে লেখেন :

"আমাদের জাতীয় প্রকৃতি যখন ভিন্ন রূপ তখন আমাদিগের উন্নতির পথও যদি কিছু থাকে তাহা ভিন্ন রূপ হইবে।" (১ মে ১৮৭৪।১৯ বৈশাখ ১২৮১)

আমরা আগেই বলেছি কেশবচন্দ্রের বিলাতে সম্মানলাভ বাঙালীর হীনম্মন্যতাবোধ দূরীকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এই হীনম্মন্যতা জাতীয় জীবনকে নানান ভাবে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। বাংলা সংবাদপত্র এই হীনম্মন্যতা বোধ দূরীকরণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। এডুকেশন গেজেট লেখেন : 'সাহেব হইলে এইরূপ হইতে না' এরূপ কথা ভাল নয়। প্রথমতঃ ইহা জাতিবিদ্বেষ হইতেই জন্মে এবং জাতিবিদ্বেষ যে অনিষ্টের হেতু তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

...সাহেব হইলে এরূপ হইত না, এরূপ না ভাবিয়া আমরা নিজে যাহাতে ভাল হই, প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি তজ্জন্য সর্বদা সতর্ক ও সযত্ন হইয়া চলাই আমাদিগের কর্তব্য। সাহেব হইলে এরূপ হইত না, একথাটি সর্ববিধায়ে তাৎপর্যশূন্য এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষ এবং কাপুরুষতা প্রকাশক। (এডুকেশন গেজেট, ১৫ মে ১৮৭৪)

হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে যে ঐক্যবোধের উদ্বোধন তা বাংলা সংবাদপত্র সাধারণের

মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এই ঐক্যবোধ দেশের সীমা ছাড়িয়ে একজন প্রবাসী বাঙালিকেও কীভাবে উদ্দীপিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ১৮০০ শকের ভাদ্র সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনীতে প্যারিস প্রবাসী জনৈক হিন্দু যুবকের চিঠিতে। তাতে ঐ যুবক লিখছেন এই ঐক্যবোধই আমাদের প্রগতির পক্ষে সহায়ক হবে। 'Unity should give us also here as every where else more efficiency should greatly accelerate our progress'.

তত্ত্ববোধিনী লিখেছিলেন: "স্বদেশীয় পৈতৃক আদর্শ বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া যদি দেশস্থ সকল হৃদয় এক হৃদয় না হয় তবে দেশের কস্মিনকালেও উন্নতি হইতে পারিবে, ইহা কি যথার্থই তুমি মনে কর?" (শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক, তত্ত্ববোধিনী)

এডুকেশন গেজেট ১২৮১ (১৮৭৪) ২৮ কার্তিক জাতীয় সঞ্জীবতা শিরোনাম প্রবন্ধে লিখছেন: "আমরা পরস্পর মিলিব—না মিলিলে আর বাঁচিবার যো নাই—যাহারা এইরূপ ভাবিতে পারে তাহাদিগের মধ্যেই জাতীয় সজীবতা আছে। তাহার বিনাশ সহজে সম্পন্ন হইবার নহে।"

এই ঐক্যবোধের প্রণোদনই ছিল সেদিন বাংলা সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বিদ্রোহের যুগ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বাংলাদেশে তিনটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৫৫-৫৭ সালের মধ্যে দেখা দেয় সাঁওতাল বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বাংলাদেশ থেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৬০ সালে দেখা দেয় বাংলার কয়েকটি জেলায় 'নীল বিদ্রোহ'ঃ

এই তিনটি বিদ্রোহের কারণ ভিন্ন ভিন্ন, গতিপ্রকৃতিও অলাদা। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের কারণ ছিল মূলতঃ অর্থনৈতিক শোষণ, রাজকর্মচারী ও শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার। এর মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গি উদার ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহকে তাঁরা আইন শৃঙ্খলার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে শান্তিশৃঙ্খলার পক্ষে একটি উৎপাত বলেই মনে করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের ঘৃণা আরও তীব্র ছিল। কারণ তা ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক বিদ্রোহ। ব্রিটিশ রাজশক্তিকে উৎখাত করার জন্যই সে বিদ্রোহের জন্ম হয়েছিল। তবে নীল বিদ্রোহকে তাঁরা সমর্থন করেছিলেন—শুধু সমর্থনই করেন নি ব্যক্তিগত ভাবে বাঙালি সংবাদপত্র সম্পাদকদের কেউ কেউ বিদ্রোহকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন। কারণ এ বিদ্রোহ ছিল বাঙালির। বিদ্রোহের কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান তার লক্ষ্য নয়। কিন্তু বিশিষ্ট বাংলা সংবাদপত্রগুলি সাঁওতাল বিদ্রোহকে সমর্থন করে নি। ১৮৫৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির সংবাদ প্রভাকর সাঁওতাল নেতা শিবসহায়কে 'দুরাত্মা' বলে অভিহিত করে এবং সাঁওতাল বিদ্রোহকে 'উপদ্রব' হিসাবে দেখে। এই বিদ্রোহ

দমন হয়নি বলে লেঃ গবর্নরের অকর্মন্যতাকেই দায়ী করে। এই প্রশাসনিক ব্যর্থতা এইভাবে লেখা হয়েছিল : "বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনান্ট গবর্নর সাহেব যিনি কোন কালে সংগ্রামের মুখ দেখে নাই, তাঁহার প্রতি ভারার্পিত হওয়াতেই এরূপ হইয়াছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞবর মেং হালিডে সাহেব জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিসানর সাহেব-দিগের প্রতি পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করাতেই আরো অন্যায় হইয়াছে. তিনি সেনাদিগকে ভাগলপুর প্রভৃতি অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কেন আদেশ করিলেন ?"

অবশ্য পরবর্তী কালে যখন বিদ্রোহ দমন হয়েছিল তখন বন্দী বিদ্রোহীদের প্রতি পুলিশের প্রচণ্ড অত্যাচারের বিবরণও বাংলা সংবাদপত্র তুলে ধরেছিলে। ১৮৫৬ সালের ২৫ নবেম্বর চিঠিপত্রের কলমে সম্বাদ ভাস্কর একটি চিঠি প্রকাশ করে। চিঠিপত্র হিসাবে প্রকাশিত হলেও এর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কারণ সেকালে চিঠিপত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হত। নানান প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে বাংলা সংবাদপত্র দিনের পর দিন লিখে গেছে, তাতে করে এটাই প্রমাণিত হয় স্বাধিকার চিন্তা ততদিনে বাঙ্গালীর মর্মমূলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

"বিদ্রোহী সাঁওতালদের অত্যাচারে" সম্বাদ ভাস্কর আতঙ্কিত হয়েছিলেন এবং পুলিশের বদলে মিলিটারি দিয়ে ঐ বিদ্রোহ দমন করতে বলেছিলেন! (সম্বাদ ভাস্কর ২৯ জানুয়ারি ১৮৫৬ দ্রষ্টব্য) এবং সরকারের নরম নীতিরও সমালোচনা করেছিলেন।

অবশ্য পরবর্তী কালে যখন বিদ্রোহ দমন হয়েছিল তখন বন্দী বিদ্রোহীদের প্রতি পুলিশের অত্যাচারের কথাও সম্বাদ ভাস্কর তুলে ধরেছেন ১৮৫৬ সালের ২৫ নভেম্বর তারিখের চিঠিপত্রের কলমে। তবে চিঠিপত্রের কলমে হলেও এর গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কারণ সেকালে সংবাদপত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিঠিপত্রের কলমে প্রকাশিত হত।

"মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, যদি আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে অশ্রুজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দানিনীকো নামক স্থান হইতে ৫০ জন সন্তানকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহাদিগের অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন।"

বিদ্রোহকে সমর্থন না করেও ভাস্কর যে ধৃত বন্দীদের প্রতি অত্যাচারের বিরোধিতা করেছিল তা এই চিঠি প্রকাশের মাধ্যমেই বোঝা যায়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে ভাস্করের বিন্দুমাত্র মমত্ববোধ ছিল না। বরং বিদ্রোহীরা পরাস্ত হলে ভাস্কর উল্লসিত হয়েছেন। বিজিত ইংরাজসৈন্য পরাজিত সিপাহীদের 'মস্তক লইয়া নৃত্য করিতেছেন' জেনে ভাস্কর প্রতিবেদন প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছেন : 'মঙ্গল সমাচার' (২০ জন ১৮৫৭)

"হে পাঠক সকল উর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে ২

নৃত্য কর, হিন্দু প্রজাসকল দেবালয় সকলে পূজা দেও, আমাদের রাজ্যেশ্বর শত্রু জয়ী হইলেন।"

১৮৫৭ সালের ২০ জুন ভাস্কর এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখছেন : ' আগ্রা দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা লাহোরাদি প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহিদিগের আড্ডায় ২ ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহিরা জানুক ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট সিপাহি ধর অধ্বরাবস্ত করিয়াছেন, আর বিদ্রোহি সিপাহি সকল শোন্ ২ তোদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও ব্রিটিশ পদানত হইয়া প্রার্থনা কর ক্ষমা করুন।"

সংবাদ প্রভাকর বিদ্রোহীদের সম্পর্কে লিখেছিলেন, "অবোধ অবাধ্য সিপাহি সেনা সংপ্রতি স্থানে স্থানে যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে তজ্জন্য প্রজাপুঞ্জের ভীত চিত্ত হওয়া উচিত নহে, সাহসিকরূপে তাহারদিগের দমনার্থ সদুপায় করাই উচিত এবং উপস্থিত সময়ে রাজার শুভ স্বস্ত্যয়ন করাই কর্ত্তব্য। পতঙ্গপুঞ্জ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক যে প্রকার প্রজ্জলিত অনল শিখায় পতিত হইয়া নিধন হয় দুরাচারি সিপাহিরাও সেই রূপ আপনারদিগের বিনাশকেই আপনারাই আহ্বান করিয়াছেন।" (সংবাদ প্রভাকর, ২২. ৬, ১৮৫৭

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা সংবাদপত্র তৎকালীন প্রচলিত জনমতের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। সে সময় বাঙালি চিন্তানায়কদের প্রায় সকলেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে কলকাতার সম্রান্ত ব্যক্তিরা একটি সভা করে সিপাহী বিদ্রেহকে নিন্দা করেন।

আর একটি সভা হয় মেট্রোপলিটন স্কুলে, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা এই দুই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

শুধু সাময়িক পত্রিকাতে নয় তৎকালীন সাহিত্যেও সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ইংরাজ রাজশক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ফুটে ওঠে। কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৯ সালে মালতী মাধব নাটক লেখেন। তাতে এই গানটি ছিল :

"ভারতের কর্ত্রী যিনি ভিকটোরিয়া মহারানী/চিরজীবী হোন তিনি প্রিয়পুত্র স্বামী সনে/দুরাত্মা বিদ্রোহী দল যাক সব রসাতলে/রাজ করে হোক বল দুর্জ্জয় হউক রণে।" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ১৮৭৪ সালে চিত্ত বিনোদিনী উপন্যাসে দেখান কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার কারণেই সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল।

ডিরোজিওর ছাত্র কিশোরীচাঁদ মিত্রের মত ব্যক্তিও সিপাহী বিদ্রোহকে মনে করেছিলেন 'সৈন্য বিদ্রোহ মাত্র '৬১ হিন্দু প্যাট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জী যিনি নীল বিদ্রোহের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। আর একজন সমসাময়িক বাঙালি সাংবাদিক শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮২৯-১৮৬৯)

লিখেছিলেন, অসন্তুষ্ট সিপাহীদের ধর্মঘটকে জাতীয় বিদ্রোহ বলে বড় করে দেখান হয়েছে।

'A simple strike among the army has been magnified into national rebellion'![৬৮]

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকের সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না।

শুধু তাই নয়, সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে বাঙালির ভীরুতা ও অন্ধ অশোভন ইংরাজ তোষণ প্রকট হয়ে উঠেছিল। স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যুগে বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে এ ধরনের ভাব বৈপরীত্য যে বিস্ময়কর তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে বাঙালির স্বোপার্জিত স্বাধিকার চিন্তা আপন বিবর্তনের পথ ধরে ক্রমপরিণতি লাভ করেছে এবং রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমানুসারী হয়েছে। এই নিজস্ব রাষ্ট্রভাবনার মধ্যে রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহের কোন স্থান নেই। যদিও রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সমসাময়িক বাঙালি লেখকদের কল্পনায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের কথা আছে কিন্তু তা তখনও রোমান্টিক কল্পনা। সিপাহী বিদ্রোহকে উপলক্ষ করে ১৮৫৭ সালে প্রেস সেন্সরশিপ আইন (১৮৫৭ সালের পঞ্চবিংশতি আইন) চালু করা হয়েছিল। এই আইনে ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের জন্য লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় এবং সংবাদপত্রে প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম ছাপা বাধ্য করা হয়। এই আইন অনুসারে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, বোম্বে টাইমস প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী পরিচালিত পত্রিকা সরকারের বিষনজরে পড়েছিলেন। কিন্তু তা বিদ্রোহকে সমর্থন করার জন্য নয়, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য। সরকারের আশঙ্কা ছিল ঐ ধরনের প্রবন্ধ সাধারণ ভারতবাসীকেও সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে। এই আইনের বলে একমাত্র একটি বাংলা সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল—সেটি হল দ্বিভাষিক পত্রিকা সমাচার সুধাবর্ষণ।[৬৯]

কিন্তু নীল বিদ্রোহের ব্যাপারে বিদ্রোহীরা সংবাদপত্রের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন। জনমতও তাঁদের সমর্থনে গড়ে উঠেছে। এর একটা বড় কারণ নীল বিদ্রোহ কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বিদেশী নিয়ন্ত্রিত বহির্বাণিজ্যে বাঙালির যে কোন স্বার্থ নেই এই সত্য বাংলা সংবাদপত্র আগেই উদ্ঘাটিত করেছিল। সুতরাং বিদেশে নীল রপ্তানির জন্য বাংলার কৃষক খাদ্যশস্য না ফলিয়ে তার জমিতে নীল চাষ করবে কেন? দ্বিতীয়তঃ পুলিশ, মহাজন ও জমিদার শ্রেণী ও ইংরাজ রাজকর্মচারীরা সাধারণ মানুষের ওপর যে অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল তার বিরুদ্ধে বাংলা সংবাদপত্র প্রথম থেকেই সচেতন ছিল। আইনের চোখে ভারতীয় ও ইওরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্য লোপের দাবিও প্রবল হয়ে উঠেছিল। বেথুন যখন বিচারালয়ে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের সমান অধিকার দেবার জন্য আইনের খসড়া করেছিলেন তখন সেই 'কালাকানুনের' প্রতিবাদে ইওরোপীয়রা

সোচ্চার হয়ে ওঠেন। প্রভাবশালী মহলের চাপে পড়ে সে আইন আর পাশ হতে পারে নি। এতে করে ভারতে বসবাসকারী ইওরোপীয়দের সম্পর্কে বাঙালি বুদ্ধিজীবী-দের ধারণা হয়েছিল যে ইওরোপীয়রা ভারতবাসীকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে রাজী নন। তাঁরা ভারতবাসীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখতে চান। এই 'কালাকানুনকে' কেন্দ্র করে ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থের লড়াই যত তীব্র হতে থাকে ততই উভয়ের মধ্যে আত্মিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের ফলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা আশা করেছিলেন এর পর থেকে ইওরোপীয়রা বাঙালিদের সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই দেখবেন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয় না। অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহের অনিবার্য ফল হিসাবে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৮৫৮ সালে ভারত শাসনের দায়িত্ব কোম্পানির হাত থেকে মহারানীর হাতে ন্যস্ত হয়। বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্টের বদলে সেক্রেটারী অব স্টেটের হাতে ভারত শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে। ১৮৫৮ সালে ১লা নভেম্বর লর্ড ক্যানিং ইংলণ্ডেশ্বরীর পক্ষে প্রথম গবর্নর জেনারেল বা ভাইসরয় হয়ে কার্যভার গ্রহণ করেন। কুইন ভিক্টোরিয়া প্রজাদের বদান্যতা, মঙ্গল এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[৭০] কিন্তু তা সত্ত্বেও নীলকরদের অপ্রতিহত অত্যাচার এবং তার সঙ্গে বিদেশী রাজকর্মচারীদের যোগসাজশ দেশবাসীকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে।

দ্বিতীয়ত সিপাহী বিদ্রোহের ফলে বাঙালিরা বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে ব্রিটিশ রাজশক্তির অসহায় রূপটিও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত এবং সর্বশক্তিমান বলে যে ব্রিটিশ শক্তি এতদিন চিহ্নিত হয়ে এসেছেন বিদ্রোহীদের অস্ত্রের আঘাতে সেই চিহ্নটি একেবারে ধুয়ে মুছে যায়। যদি বিদ্রোহীদের সঙ্গে অযোধ্যার বেগম ও ঝাঁসীর রানীর মত অন্যান্য দেশীয় রাজারাও যোগ দিতেন তাহলে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হত। সিপাহী বিদ্রোহ তাই বাঙালির আত্মমর্যাদা বোধকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতীয়দের সমর্থনের ওপরেই যে ব্রিটিশ রাজশক্তির ভিত দাঁড়িয়ে আছে তা সেদিনের ভারতীয়রা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহের পর অত্যাচারী কোম্পানী শাসনের অবসানেও তাঁরা উল্লসিত হয়েছিলেন।

১৮৪৭ সালে কলকাতা থেকে যত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হত তার মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগই ছিল নীল।[৭১] নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে নীলের উৎপাদন বেড়েই চলছিল। ১৯০৩ সালে যেখানে ৭,১১,১৩৭ স্টার্লিং মূল্যের নীলের উৎপাদন হয়েছে, সেখানে ১৮১৬ সালে ১,৭১৪,৩২৫ স্টার্লিং মূল্যের নীলের উৎপাদন হয়।[৭২] ১৮৩২ সালে কলকাতার বাজারে ১২৬৫০০ মণ নীল রপ্তানির জন্য এসেছিল। বিদেশে ভারতীয় নীলের এত চাহিদা ছিল যে এই বিপুল পরিমাণ নীলও ইওরোপের এক বছরের চাহিদা মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।[৭৩]

১৮৫২ সালের ৭ সংখ্যার বিবিধার্থ সংগ্রহ থেকে জানা যায় ঐ সময় ৪০ লক্ষ বিঘা জমিতে নীল চাষ হচ্ছে এবং ৫ লক্ষ ব্যক্তি এতে নিয়োজিত। কুঠি ও যন্ত্রপাতিতে ২ কোটি টাকা নিয়োজিত হয়ে আছে। ১৮৫১ সালে নিম্নবঙ্গে প্রায় ৫০০ নীলকর ছিলেন। নদীয়া ও যশোরে শতকরা ৫০ ভাগ নীল উৎপন্ন হত। নীলকরদের প্রত্যেকের কমপক্ষে তুটি করে কুঠি ছিল। তবে জেমস হিলের মত লোকের নদীয়াতে ১১টি কুঠি ছিল। সবচেয়ে বড় নীলকর কোম্পানি ছিলেন বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বারাসতে ওঁদের কুঠি ছিল। জে. পি. ওয়াইস-এর মনোপলি ছিল পূর্ববঙ্গে। রবার্ট ওয়াটসন অ্যাণ্ড কোম্পানির উত্তর ভারতে মনোপলি ছিল। মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী ও পাবনাতে তাদের ১৩টি কুঠি ছিল।[৭৪]

এই সমস্ত বিদেশী কুঠিয়ালরা গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে পড়ায় তাদের সংস্পর্শে এসে এদেশীয় লোকেরাও আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠবেন বলে প্রথমে অনেকে মনে করেছিলেন। ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন অনুসারে কোন ইওরোপীয়ের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার ছিল না। রামমোহন কলোনাইজেশনের সমর্থক ছিলেন। এবং কলোনাইজেশনের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি নীলকরদের উদাহরণ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাংলাদেশে যেখানেই নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছে সেখানেই যথেষ্ট আর্থিক সমৃদ্ধি এসেছে।

"As to the Indigo Planters, I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Behar and I found the natives residing in the neighbourhood of indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the indigo planters; but, on the whole, they have performed more good to the generality of the natives of this country than any other class of Europeans, whether in or out of the service."[৭৫]

১৮২৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতা টাউন হলের সভায় ইউরোপীয়দের এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার দাবি করা হয়েছিল। অবশেষে তাঁদের এই দাবি স্বীকৃত হয়।

নীল চাষের ফলে নীল শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় মহাজন, মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী, নায়েব গোমস্তা পাইক লাঠিয়াল প্রভৃতিদের অবস্থা যে সচ্ছল হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যাদের জোর করে দাদন দিয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে নীল চাষ করানো হত সেই রায়তদের সকলের নীল চাষের ফলে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তাদের অবস্থা পরবর্তী কালে যে

শোচনীয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদন, মন্তব্য ও পরিণামে নীল বিদ্রোহ।[৭৬]

একবিঘা জমিতে নীল উৎপন্ন হত ১২ টাকার মত। তা থেকে রায়ত মাত্র পেত আড়াই টাকা।[৭৭]

১৮৬০ সালে লেঃ গবর্নর হিসাব দেন যে রায়তরা অন্য ফসলের পরিবর্তে জমিতে নীল বুনলে বিঘা প্রতি সাত টাকা করে লোকসান খেত।[৭৮] এর মধ্যে কুঠির কর্মচারীর ঘুষের খরচা মামলার খরচা লেগেই থাকত। তবু সে বেঁচে থাকত ধান বুনে এবং দাদন নিয়ে। এই দাদনের টাকা সে পরিশোধ করতে পারত না এবং এই ঋণের জন্যই সে আবার নীল চাষ করতে বাধ্য হত।

নীলকররা যে কী হারে মুনাফা করত তা নীল কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছেন, 'Another inequality is this, the planter on a fair calculation looks to a return of two seers of dye from ten bundles of plant which is the fair average of one beegah. Two seers would sell for 10 Rs. when indigo is selling at Rs. 200 a maund. But the return from the same ten bundles to the ryot could not be more than Rs. 2-8, at four bundles the rupee. Thus, the planter would look to derive from the contract about four times the profit which could ever fall to the ryot'.[৭৯]

অর্থাৎ নীলকর পেতেন দু'সের ডাই বিক্রি করে দশ টাকা, আর রায়ত সেখানে পেতেন আড়াই টাকা।

এই অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়া রায়তদের প্রতি চলত অত্যাচার। দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণে যে ভাগ্যহত চাষী পরিবারের কথা বলেছেন এমন অনেক পরিবারের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরাজী সংবাদপত্রের মধ্যে হরিশচন্দ্র মুখার্জীর সম্পাদনায় হিন্দু প্যাট্রিয়ট এমন অনেক অত্যাচারের কাহিনী লিখে গেছেন। প্রসঙ্গত নদীয়া জেলার শ্যামনগর গ্রামের কালু মণ্ডল ও আমীর মণ্ডলের কথা উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ সালের ১৮ জানুয়ারি এই অত্যাচারের খবর সংবাদ প্রভাকর প্যাট্রিয়ট থেকে উদ্ধৃত করেন।

সমাচার চন্দ্রিকা এই অত্যাচার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন :

"নীলকরেরা এদেশের কত লোকের সর্বনাশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত দরিদ্র প্রজা ইহাদিগের অত্যাচারে ঘর দ্বার ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে, কত জমিদার ইহাদিগের জ্বালায় সমস্ত বিষয় বিভাবাদি নষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, কত অসহায় রমণী ইহাদিগের অত্যাচারে অমূল্য সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছে, কত দীন দুঃখী কৃষক ইহাদিগের অত্যাচারে হাল গরু বিক্রয় করিয়া পলায়ন করিয়াছে। নীলকর এবং চা-করদিগের মত অত্যাচারী আর ভারতবর্ষে নাই।

ইংরাজ স্পর্দ্ধা করেন যে তাঁহাদের মত সভ্য জগতে নাই, তাঁহাদের মত দয়ালু ভূমণ্ডলে নাই, তাঁহাদের মত প্রজাপালন করিতে অন্য রাজা জানেন না। একথা হইতে পারে, মহারাজ্ঞী দয়াশীলা হইতে পারেন, তিনি প্রজাদিগের সুখ দুঃখের জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতে পারেন, ইংরাজ যাহাকে সভ্যতা বলেন আমি তাহাকে না বলিলেও বলিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদিগের স্বজাতীয়েরা যে ঘোর অত্যাচারী তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। নীলকর এবং চা-কর সাহেবরা যে সকল অত্যাচার করেন, আদালতে তাহার প্রমাণ হয় না, প্রমাণ হইলেও রীতিমত বিচার হয় না। বিচার যে একেবারে হয় না, এমত কথা আমরা বলিতে পারি না, তবে বিচারপতিরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া আইনের দিকে বিশেষ রূপ দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করেন না। বিচারপতিরা ইংরাজ, চা-কর এবং নীলকরেরাও ইংরাজ, বিচারপতিরা যে গুরুর শিষ্য চা-কর নীলকরেরাও সেই গুরুর শিষ্য। বিচারপতিরা যে রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন চা-কর এবং নীলকর তাহা হইতে বিভিন্ন নহেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত এদেশীয়-দিগের অনেক প্রভেদ। যে অপরাধে একজন ইংরাজের ছয় মাস কারাদণ্ড হয়, সেই অপরাধে একজন এদেশীয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইতে পারে। ইংরাজে এবং এদেশীয়ে স্বর্গ মর্ত প্রভেদ।" (২৭ জুলাই ১৮৭৭)

নীলকরদের এই অত্যাচার যে অর্ধশতাব্দীর ওপর ধরে চলে আসছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ১৮১০ সালে রায়তদের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগে ৪জন নীলকরের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। রায়তদের ওপর মারপিট বা অত্যাচার যাতে না হয় তার জন্য আদালত থেকে হুকুম জারি করা হয়। তবু প্রজাকে জোর করে দাদন দেবার অভ্যাস ১৮১০ সালে যেমন ছিল ১৮৫৯ সালেও তেমনি বহাল থাকে।[৮০]

নীলকরেরা যে এই ধরনের বে-আইনী কাজ করতে সাহস পেত তার কারণ বিচার ব্যবস্থায় ত্রুটি। ফৌজদারি মামলায় মফস্বল আদালতগুলিতে ইওরোপীয়দের বিচার করার কোন অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র কলকাতার সুপ্রীম কোর্ট তাদের বিচার করতে পারত। সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে মামলা লড়া গরীব রায়তদের পক্ষে অসাধ্য ছিল।

তাছাড়া আদালতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ নীলকরেরা আসামী হয়েও বিচারকদের কাছে আলাদা খাতির পেতেন। এমনকি দেশীয় জমিদার বনাম একজন ইওরোপীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যান্টারসের মধ্যে মামলা এলে আদালতে জমিদার দাঁড়িয়ে থাকতেন আর নীলকরকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বসার একটি চেয়ার দেওয়া হত।[৮১] নীলকরদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর আঁতাতের কথা সংবাদ প্রভাকর সাধারণ্যে প্রকাশ করে দেন। ১৮৫৪ সালে (৪।৭।১২৬১) সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন :

"প্রদেশবাসি নীলকর সাহেবরা যেরূপ ভদ্রলোক পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা দুঃখি প্রজাদিগকে বেগার ধরিয়া নীলবীজ বপন ও তাহাতে জল সেচন ইত্যাদি বিবিধ কার্যে নিযুক্ত করেন তাহাদিগের

পারিশ্রমিক বিত্ত কিছুই প্রদান করেন না, বলের দ্বারা জমীদারের ভূমিতে চাস করিয়া লাঠির বলে তাহা কাটিয়া লয়েন, তাহাতে জমীদারদিগের সহিত নীলকর সাহেবগণের বিবাদ হয়, আমারদিগের বর্তমান লিউটিনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুত অনারেবল হালিডে সাহেব এই সকল বিষয় বিশিষ্ট রূপেই অবগত আছে···কিন্তু কি চমৎকার! ইতিপূর্বে সাহেব কয়েক জিলায় ভ্রমণ করিয়া আয়িা আসিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই, মফস্বলে যে সমস্ত খোদাবন্ধ ধর্মাবতারেরা অসংখ্য প্রজার ধন প্রাণের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন, এবং যাঁহারা বিচারক নামে বিখ্যাত, তাঁহারা প্রায় তাবতেই নীলকরের বাধ্য, জিলার অবস্থা দর্শন অথবা শিকারে গমন করিলে নীলকুঠিতেই ভোজন শয়ন ও নীলকর সাহেবদিবের কন্যাপুত্র ও প্রেয়সীর সহিত আমোদ প্রমোদ ও নীলকরের হস্তিতেই আরোহণপূর্বক ব্যাঘ্র, হরিণ, মহিষ ও শূকরাদি পশু হনন করিয়া থাকেন, সুতরাং নীলকরের মোকদ্দমায় পক্ষপাত করিতে হইলেও অনায়াসে করিয়া বসেন প্রজামণ্ডলী, জজ, মাজিস্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতি প্রধান পক্ষ সাহেবগণের সহিত নীলকরদিগের এইপ্রকার পরমাত্মীয়তা দৃষ্টি করিয়া আপনারদিগের ক্লেশ নিবারণ নিমিত্ত বিচার প্রার্থনা করণে সঙ্কুচিত হয় সুতরাং তাহারা মনের আগুন মনেই নির্বাণ করিয়া কেবল উর্ব্ব নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।"

১২৬৫ বঙ্গাব্দের (১৮৫৮) ১লা মাঘ সংবাদ প্রভাকর আবার লেখেন, "নীলকর দিগের দৌরাত্ম্যে জেলার প্রজারা আর কতকাল যন্ত্রণা ভোগ করিবেক···পল্লীগ্রামে কুটিয়াল দিগের অত্যাচার দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বোধ হইবেক, যে এদেশে অদ্যাপি কোন রাজশক্তির অধীন হয় নাই, অর্থাৎ প্রকৃত অরাজক হইয়াছে। নীলকর সাহেবরা যাহা মনে করেন তাহাই করিতেছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে, তাঁহারা উত্তমরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, কতকগুলি দুর্বল ইতর চোর ডাকাত ধরিলেই কি রাজ্য শাসিত হয়? তাহারা রাজনীতিতে অতি গোপনে দস্যুতা করে··· কিন্তু রাজপুরুষদিগের সহিত যাহারা সমভাবে একটেবিলে উপবেশনপূর্বক আহার করিতেছেন, দক্ষিণ হস্তে গ্লাশ ধরিয়া সুরাপান করিতেছেন, একত্রে চার্চে গিয়া বাইবেল খুলিয়া গদ্গদ চিত্তে প্রেমাশ্রুপাত করত মহাপ্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপাসনা করিতেছেন সেই মহাশয়েরাই দিনে দুই প্রহরে এক বাণিজ্য কার্যের ছলনা করিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রকারান্তরে প্রতিদিন ডাকাইতি করিতেছেন, সে বিষয়ে একবারও দৃষ্টিক্ষেপ হয় না, প্রজারা নালিশ করিলে বরং রাজদ্বারে তাহার বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা সামান্য লোক কী করিতে পারে?"

অত্যাচারের ফলে নীলকর ভীতি সে সময়ে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। ১৮৫৪ সালে নড়াইলের জমিদার রামরত্ন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ সভায় গিয়েছিলেন ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। রামরত্ন রায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে গৌরীশঙ্কর লিখছেন,

"শুনিলাম লোক মুখে প্রজাগণ থাকে সুখে
বাবু রামরত্ন অধিকারে।
যশোহর জিলা ময় নীলকর মাত্র ভয়
অন্যে কিছু করিতে না পারে।"

(সংবাদ ভাস্কর, ৭ মে ১৮৫৪)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে জনমত গড়ে উঠতে থাকে সংবাদপত্রের অবদান তার মধ্যে অনেকখানি। নীলকরদের বিরুদ্ধে এই সময় খ্রীষ্টান মিশনারিরাও সোচ্চার হতে থাকেন। ১৮৫৫ সালে বেঙ্গল মিশনারিদের এক সম্মেলনে নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। পাদ্রী জেমস লঙ, আলেকজাণ্ডার ডাফ নীলকরদের বিরুদ্ধে রাইয়তদের পক্ষ নিয়েছিলেন। লঙ নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ মাইকেল মধুসূদন দত্ত করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন তবে অনুবাদের দায়ভাগ লঙই বহন করেন। অবশ্য মিশনারিদের দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের ক্রোধ খ্রীষ্টধর্মের ওপর গিয়ে পড়তে পারে এবং খ্রীষ্টান মিশনারিরা তার শিকার হতে পারেন এমন একটা ধারণা তাঁদের মধ্যে ছিল। তবে লং নীলকরদের অত্যাচারে এবং ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র হরকরা ও ইংলিশম্যানের নীলকরদের প্রতি নির্জলা পক্ষপাতিত্বে সত্যই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। লং নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় বলেছিলেন: "what a surprising power of attraction silver has The detestable Judas gave the great preacher of the Christian religion, Jesus into the hands of Odious Pilate for the sake of thirty rupees, what wonder, then, if proprietors of the two news-papers, becoming enslaved by the hope of gaining one thousard rupees, throw the poor helpless people of this land into the terrible grasp of your mouths."

এই মন্তব্য নিয়ে মুদ্রক Clement Henry Manuel-কে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়।

যেহেতু অনুবাদে লঙ-এর নাম ছিল না সেহেতু মুদ্রাকরকেই অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু লঙ অনুবাদক হিসাবে তাঁর নাম আদালতকে জানিয়ে দেন। বিচারে তাঁর একমাসের কারাদণ্ড ও একহাজার টাকা জরিমানা হয়—মুদ্রককে দশ টাকা জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

সেসময় ছ'টি ইংরাজী সংবাদপত্রের পাঁচটিই ছিল নীলকরদের পক্ষে। কাজেই বাংলা সংবাদপত্রের সমর্থনের ওপরেই গোটা নীল আন্দোলন দাঁড়িয়েছিল।

১৮৬০ সালের ৩১ মার্চ এম. এল. এল নামে শিশিরকুমার ঘোষ হিন্দু প্যাট্রিয়টে

যে চিঠি লেখেন তাতে উল্লেখ ছিল, সমস্ত সাংবাদিকেরাই নীলকরদের সমর্থন করার প্রস্তাব নিয়েছেন। বলা বাহুল্য এখানে বাঙালী সাংবাদিকদের কথাই বলা হয়েছে। ইংরাজ সাংবাদিকেরা আবার কেউ কেউ নিজেরাই নীলকর ছিলেন। যেমন হরকরার সম্পাদক আলেকজাণ্ডার ফ্রবস স্বীকার করেছিলেন যে তিনি পনের বছর নীলকর ছিলেন।[৮২]

নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭২ শকেই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধে ১৭৭২ শকের বৈশাখ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী লেখেন: 'কিন্তু আর কতকগুলি বিদেশীয় দুর্জন এদেশীয় সহিষ্ণুতাশীল মনুষ্যদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করে তাহার প্রসঙ্গ না করিলে উচিত কর্মের অন্যথা করা হয়।'

ঐ বছরের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী লেখেন: 'নীলকরদিগের কার্যের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে কেবল প্রজা পীড়ন করিয়া স্বকার্য উদ্ধার করাই তাঁহাদের সঙ্কল্প।'

তত্ত্ববোধিনী ঐ দীর্ঘ প্রবন্ধে নীলচাষীদের প্রতি নীলকরদের অত্যাচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেন। পরিশেষে মন্তব্য করেন: 'নীলকর ও তাঁহার কর্মচারীরা পদে পদে প্রজাদিগের উপর যে প্রকার অত্যাচার করেন তা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। তাঁহার দুর্জয় লোভ রিপুর উপভোগ যদি এতাবন্মাত্রেও পর্যাপ্ত হইত, তথাপি অনেক লোকের ধন প্রাণ রক্ষা পাইত। কিন্তু তাঁহার ধন লালসা অজস্র উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া এ প্রকার প্রবল হইয়া ওঠে, যে তিনি অন্যের ধন হরণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না।'

"এইরূপে প্রজারা নীলকর ও তদীয় অনুচরদিগের দ্বারা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া দুঃখরূপ দুঃসহ দাবদাহে চিরকাল দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে তাহারদের এ দুঃখ প্রতীকারের সম্ভাবনাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা কাহাকে এ মর্মবেদনা জ্ঞাত করিবেক? কাহার নিকটেই বা ক্রন্দন করিবেক?"

তত্ত্ববোধিনী প্রায় ১০ বছর আগে চাষীদের যে নিঃসহায় অবস্থার কথা লিখেছিলেন যতদিন অতিবাহিত হয়েছে তার সেই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। নিত্যনতুন অত্যাচার ও লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কৃষকসম্প্রদায় অবশেষে বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হয়েছেন।

১৮৫৯ সালে নদীয়া, যশোর, রাজশাহী, পাবনা ও ২৪ পরগনার প্রায় ২০ লক্ষ গরীব চাষী প্রতিজ্ঞা করে তারা নীল চাষ করবে না। এর ফলে কুঠি মালিকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে চাষীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দের ধরে নিয়ে যায়। বাজার গ্রাম পুড়িয়ে দেয় ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে। নীল বিদ্রোহ এই ভাবে শুরু হয়। সরকার বিদ্রোহ দমনে সৈন্যদল পাঠান।[৮৩]

নীল বিদ্রোহের আর একটা বড় কারণ ছিল নীলকরদের সঙ্গে বিবাদে রাইয়তরা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাচ্ছিলেন না। নীল বোনার

চুক্তি নিয়ে রাইয়ত-নীলকর সম্পর্ক খুবই খারাপ হচ্ছিল। নীল বোনার চুক্তি করে দাদন নিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করলে নীলকর চাষীরা জমিতে জোর করে নীল বুনতেন। এ বিষয়ে আইন কাকে রক্ষা করবে সে সম্পর্কেও ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারদের মধ্যে মত-দ্বৈধ চলছিল। লেঃ গবর্ণর জে. পি. গ্র্যান্ট ১৮৫৯ সালে বারাসতের এমন একটি ঘটনায় আদেশ দেন যে চুক্তি মানা হচ্ছে কী না তা দেখার দায়িত্ব দেওয়ানি আদালতের। কিন্তু রায়তের জমিতে নীলকরের জোর করে নীল বোনা বেআইনী।[৮৪]

নীলকররা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে তাঁরা শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। পার্লামেন্টে তাঁদের আবেদন পেশ করার জন্য একজন আইনজীবীকে পর্যন্ত তাঁরা বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন মফস্বল আদালতে নীলকরদের বিচারের ক্ষমতা ও নীল কমিশন নিয়োগ প্রভৃতির দাবি জানান। অ্যাসোসিয়েশন আদালতে রায়তদের মামলা লড়ার জন্য উকিল দিয়ে সাহায্য করতেন।

১৮৬০ সালে ২৪ মার্চ রায়ত ও নীলকর উভয়ের স্বার্থ দেখার জন্য জে. পি. গ্র্যান্ট আইনসভায় একটি বিল আনেন। ৩১ মার্চ Act XI, An Act to enforce the fulfilment of Indigo Contracts and to provide for the appointment of a Commission of Enquiry আইনটি পাশ হয়। এই আইন অনুসারে অস্থায়ী-ভাবে ঠিক হয়েছিল যে কেউ নগদ টাকা দাদন নিয়ে (জালিয়াতি, বলপূর্বক বা ভীতি-প্রদর্শন ব্যতীত) নীল চাষ না করলে তার শাস্তি হবে। নীল গাছের ইচ্ছা করে ক্ষতি করলেও অনুরূপ শাস্তি হবে। এই আইনটিই হয় সর্বনাশের কারণ। রায়তরা এই আইনের প্রতিবাদে ঘর্মঘট করে বসেন। নীলহাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে হাঙ্গামা হয় ঔরঙ্গাবাদ মহকুমায়। ওখানে রায়তরা কুঠি আক্রমণ করে। পাবনাতে এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সামরিক পুলিশসহ আক্রান্ত ও আহত হন। হাঙ্গামা দমনের নীল অধ্যুষিত জেলাগুলির সর্বত্র সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। গ্র্যান্ট জেলাশাসকদের বলেছিলেন নতুন আইন প্রয়োগের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে। কিন্তু এই আইন বলে চুক্তি খেলাপের এত অভিযোগ আসতে স্থুরু করে যে স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বন্ধ হবার উপক্রম হয়।[৮৫]

একাদশ আইন চালু হবার পর নীলকররা রায়তদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা-গুলি রুজু করত। ম্যাজিস্ট্রেটরাও নীলকরদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।[৮৬] গ্রামের মোড়লকে গ্রেফতার করা ও যে নীলচাষ করতে চাইবে না তাকে গ্রেফতার করে জরিমানা করে তিনমাসের জেল দেওয়া প্রচলিত রীতি ছিল। জেলখানাতেও তাদের নিষ্কৃতি ছিল না। কিন্তু তৎসত্বেও রায়তরা নীলচাষ করতে প্রত্যাখ্যান করে।

নীল বিদ্রোহের প্রকৃতি কী রকম ছিল তা নীচের ঘটনাগুলি থেকে জানা যাবে। এ বিদ্রোহ ছিল নেতৃত্বহীন শোষিত মানুষের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। নীলচাষীদের

উত্তেজনা, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ সম্পর্কে সরকার উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেননি। ১৮৬০ সালে লর্ড ক্যানিং লিখেছেন, '...for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi and from that day I felt that a shot fired in anger of fear by one foolish planter might put every factory in lower Bengal in flame.'[৮৭]

নীল বিদ্রোহের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিছু কিছু শাসনসংস্কার ঘটে। নতুন মহকুমা হয়। নিম্ন প্রদেশগুলিতে পুলিশী ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ক্ষুদ্র আদালত বসানো হয়। বিচারব্যবস্থার কিছুটা সংস্কার করা হয়। কারণ নীল কমিশনের রায় বহুলাংশে নীলকরদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। কমিশন মন্তব্য করেছিলেন, নীলকর ও রায়তদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তোষজনক নয় এবং সে সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দরকার। কমিশন আরও উল্লেখ করেন: 'It matters little whether the ryot took his original advances with reluctances or cheerfulness the result in either case is the same, he is never afterwards a freeman.'[৮৮] সংবাদপত্রের পাতায় যে সব অভিযোগ দিনের পর দিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছিল অবশেষে তার পূর্ণাঙ্গ সরকারী স্বীকৃতি মেলে।

কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার কিছুটা প্রশমিত হলেও তা স্তিমিত হয়নি। ১৮৬২ সালে সোমপ্রকাশ লিখছেন: 'একজন সোমপ্রকাশ গ্রাহক পাবনা হইতে লিখিয়াছেন, এদেশের নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের বিবাদের মীমাংসা হয় নাই, এখনও সময়ে সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ খুন জখমের সম্বাদ পাওয়া গিয়া থাকে।' (২৪ ভাদ্র ১২৬৯)

১৮৬৪ সালে (৯ চৈত্র ১২৭৫) 'নদীয়া জেলায় স্থানে স্থানে প্রজায় ও নীলকরে গোলযোগের' ঘটনায় সোমপ্রকাশ লিখছেন:

"যে ক্ষতের পথ ও ক্লেদ নির্গত না করিয়া ঔষধ দ্বারা কেবল উপরিভাগ শুষ্ক করা হয় তাহা দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে না। উহা পচিয়া ক্রমে অতিশয় অপকারক হইয়া ওঠে। প্রজার সহিত নীলকরদিগের বিবাদে অবস্থাও তদনুরূপ হইয়াছে। বিবাদের প্রকৃত কারণের উন্মূলন করা হয় নাই। প্রজার সহিত নীলকরদিগের মিলন করিয়া দেওয়াও হয় নাই। অতএব ঐ বিবাদ যে পুনরুত্থিত হইবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ইদানীন্তন রাজপুরুষদিগের এই বিবাদ শান্তির চেষ্টা নাই। প্রত্যুত কোন কোন রাজপুরুষের নীলকর পক্ষপাতিত্য প্রবহমান বায়ুর ন্যায় ঐ বিবাদ বহ্নিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে, কণ্ট্রাকটবিল প্রভৃতি অনিষ্ট কর কয়েকটি বিষয় পুনঃ পুনঃ বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা দারাই সেই পক্ষপাতিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।"

নদীয়া জেলায় পুনরায় নীলচাষ নিয়ে হাঙ্গামা দেখা দিলে সোমপ্রকাশ লেঃ গবর্নর বিডনের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করে লেখেন:

"সেক্ষণে নীল প্রধান প্রদেশে বিবাদ বহ্নি পুনরায় প্রধূমিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই অবধি আমরা বিডন সাহেবকে সতর্ক করিতে আরম্ভ করি, তিনি তাহাতে কর্ণপাত

না করিয়া দারজিলিঙের শীতল সমীরণ সেবন করিতে গেলেন। কিন্তু এখানে যেরূপ প্রবল জ্বালা সহকারে বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে ইহার শিখা উড্ডীন হইয়া স্বল্পকালের মধ্যে সেই বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিবে। এখন কি তাঁহার সুস্থির হইয়া দারজিলিঙে বাস করিবার সময়? সেকালের হিন্দু রাজাগিগের এই সংস্কার ছিল, প্রজার অকাল-মৃত্যু হইলে তাঁহারা মনে করিতেন, রাজার অপরাধ ব্যতিরেকে কখন প্রজার অকাল মৃত্যু হয় না। এ সংস্কার উপধর্ম দুষিত বটে, কিন্তু ইহা নিরর্থক নহে। রাজার দোষ ব্যতিরেকে কি প্রজার মানুষী আপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে?" (২১ বৈশাখ ১২৭১)

নীল বিদ্রোহের সঙ্গে বাঙালির নবজাগরণের যে সম্পর্কটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল এই বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে এই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সমাজ ও বাংলা সংবাদপত্র শ্বেতাঙ্গদের ও ইংরাজ রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে একটি গণ-আন্দোলন সমর্থন করে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যে প্রত্যক্ষভাবে এই নীল বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল তা আগই বলেছি। আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কয়েকজন সাংবাদিক এই বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের ওতঃপ্রোতভাবে সাহায্য করেছেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অবদান এই ব্যাপারে সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

হিন্দু প্যাট্রিয়টের সংবাদদাতা হিসাবে শিশিরকুমার ঘোষ, মন্মথনাথ ঘোষ (MNG) নামে হিন্দু প্যাট্রিয়টে যশোর জেলায় নীলকরদের অত্যাচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিশিরকুমারের জীবনীকার লিখেছেন, ১৮৫৮ সালে শিশিরকুমারের আহ্বানে যশোরের কৃষকগণ নীলচাষ বন্ধ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। শিশিরকুমার কৃষকদের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করে নীলচাষ বন্ধের পরামর্শ দিতেন।[৮৯]

ইংরাজী সংবাদপত্রের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ফিল্ড (১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। মালিক একজন আর্মেনিয়ান)-এর রাজনৈতিক সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র নীল বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

বাংলার কৃষকসমাজ নেতৃত্বের ও প্রস্তুতির অভাব সত্ত্বেও যে বিদ্রোহ সংগঠিত করে তুলতে পেরেছিলেন তার কারণ নবলব্ধ স্বাধিকারবোধ ষাটের দশকে এসে সাধারণ মানুষকেও আকীর্ণ করেছিল এবং বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল সম্প্রদায় সেই গণবিদ্রোহের সামিল হতে পেরেছিলেন। এই গৌরবময় অনুভূতি সম্পর্কে ১৮৬০ সালের ১৯ মে হরিশচন্দ্র হিন্দু প্যাট্রিয়য়েটে যা লেখেন তা এক্ষেত্রে চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

"Bangal might well be proud of its peasantry···wanting power, wealth political knowledge and even leadership, the peasantry of Bengal have brought about a revolution inferior in magnitude and importance to none that has happened in the social history of any other country···with the Government

against them, the law against them, the tribunals against them, the Press against them, they have achieved a success of which the benefits will reach all orders and the most distant generations of our countrymen. And all this way they have done by sheer force of virtue, by patience, perseverance and fortitude, without committing almost a single."

শিশিরকুমার ঘোষ ইংরাজী অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখেছিলেন, নীল বিদ্রোহ ইংরাজশাসিত বাংলার প্রথম বিদ্রোহ। এবং এর পরে যদি কোনদিন বিদ্রোহ হয় সে বিদ্রোহ হবে বাংলার স্বাধীনতার জন্য, অত্যাচারী জেলাশাসকদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য।

"It was the indigo disturbance which first taught the natives the value of combination and political agitation. Indeed, it was the first revolution in Bengal after the advent of the English. If there be a second revelution, it will be to free the nation from the death grips of the all-powerful police and District Magistrates. Nothing like oppression which brought about the glorious revolution in England and it was the oppression of half a century by indigo planters which at last roused the half-dead Bengalee and infused spark in his cold frame." (Patrika, May 22, 1874).

নীল বিদ্রোহের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বাঙালির সংবাদপত্র পরবর্তী কালের বৃহত্তর স্বাধীনতা-যুদ্ধের তূর্যনিনাদ করেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্য, বাংলা সাহিত্য ও নাট্যমঞ্চ বিবর্ধনে সংবাদপত্র

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ॥ বাংলা ভাষা গঠনের যুগে সংবাদপত্রের ভূমিকা ॥ বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ ॥ শ্রীরামপুর মিশন ও রামমোহন যুগ : বাংলা সাহিত্যের সাময়িকপত্র নির্ভরতা ॥ বাংলা সংবাদপত্র ও সাহিত্য ॥ সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য। বাংলা নাটকের অভ্যুদয় : বাংলা সংবাদপত্রে নাট্য সমালোচনার ধারা ॥ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা ও বাংলা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা।

বাংলা সাময়িকপত্রের একজন গবেষক বলেছেন : "বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষায় সাময়িকপত্রের আবির্ভাবের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত, বস্তুত বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের বর্তমান পরিণতির মূলে সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি দৈনিকের প্রয়াস অনেকখানি বর্তমান। অপরিপুষ্ট এবং অস্ফুট বাঙ্গলা ভাষাকে ইহারাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্ববিধ ব্যবহারে লাগাইয়া সমর্থ ও সক্ষম করিয়া তুলিয়াছেন"।[১]

এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে সত্য। কারণ বাঙালির নবজাগরণের বার্তাবহ বাংলা গদ্য ও বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক গদ্যপুস্তক কেরির কথোপকথন ও রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে। এর মাত্র ১৭ বছর পরে বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাব।

এখানে ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা গদ্যসাহিত্যের মৌল পার্থক্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইংরাজী গদ্যের উদ্ভবের প্রায় ৮০০ বছর পরে ইংরাজী সংবাদ-পত্রের উদ্ভব।[২]

মনে রাখতে হবে ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব প্রথম মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও (১৪৭৬) প্রায় পাঁচশ বছর আগে। একারণে ইংলণ্ডে যখন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে তখন সংবাদপত্রসেবীদের গদ্যাদর্শ সম্পর্কে আলাদা করে চিন্তা করতে হয়নি। ইংরাজী গদ্য তখন যথেষ্টই সুপরিণত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের একটি রেনেশাঁস ঘটে গেছে। প্রথম ক্ল্যাসিক্যাল ইংরাজী গদ্যরীতিতে স্যার টমাস মুর

(১৪৭৮-১৫৩৫) লিখেছেন Life of Pico of Mirandola (১৫১০), Wyolif বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন (১৩৮২), উইলিয়ম টিনডেল (১৪৮৪-১৫৩৬) বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (১৫২৫)। এলিজাবেথীয় যুগে দিকপাল প্রবন্ধ-লেখকদের আবির্ভাব হয়েছে। স্যার ফ্রানসিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) ও রবার্ট বাটনের মত মনস্বী ও শক্তিশালী গদ্যলেখকদের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বেকনের বিখ্যাত গ্রন্থ অ্যাডভানসমেন্ট অব লারনিং (১৬০৫) প্রকাশিত হয়েছে প্রথম ইংরাজী দৈনিক ডেইলি কুরান্টের (প্রকাশকাল : ১ মার্চ ১৭০২) প্রকাশের প্রায় একশ বছর আগে। এক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের আগে বাংলা গদ্যসাহিত্যের কোন সমুজ্জ্বল ঐতিহ্য দূরে থাক, উল্লেখ্য কোন গদ্যসাহিত্যই রচিত হয়নি। তার আগে যে কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হয় বাইবেলের না হয় সরকারী আইন সংক্রান্ত পুস্তিকার অনুবাদ না হয় পাঠ্যপুস্তক। দ্বিতীয়ত গদ্যরীতির মধ্যেও নানা জটিলতা এবং তার রূপটিও স্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রকে ভাষাপথ স্ববলে খনন করে অগ্রসর হতে হয়েছে। প্রথম যুগের বাংলা সংবাদপত্রের ভাষার সঙ্গে তৎকালীন প্রচলিত বাংলা গদ্যগ্রন্থগুলির ভাষার তুলনা করলেই এই পার্থক্যটি সহজে প্রতিভাত হবে।

১৮০১ সালের আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্যের যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলি হল এই :

(১) ষোড়শ শতকে প্রকাশিত সেকশুভোদয়া।
(২) সপ্তদশ শতকে প্রাপ্ত একটি চুক্তিপত্র ও নরোত্তম দাসের দেহবড়চা। এই শতাব্দীতে দাম আন্তেনিও লিখিত খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারমূলক পুস্তিকা ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ।
(৩) অষ্টাদশ শতকে পাদরি মানোএল দা আসসুম্পসাম লিখিত কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন শহরে এ গ্রন্থটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়।

বাংলা দেশে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৭৭৮ সালে হালহেড 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটি ইংরাজীতে রচনা কিন্তু এর মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত মুদ্রিত গ্রন্থ প্রকাশিত হতে সুরু করে ১৭৮৫ সাল থেকে। প্রথম যুগে অনুবাদ দিয়েই বাংলা গদ্যের যাত্রা সুরু হয়েছিল। অনুবাদের বাইরে প্রথম বাংলা মৌলিক গদ্যগ্রন্থ রাম রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রকাশিত হয় ১৮০১ সালে। প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের জন্মের (১৮১৮) আগে পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থের একটি তালিকা আমরা এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে দিয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক গদ্যের জন্ম হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সূতিকা-গারে। 'সিভিলিয়ান দিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া কেরি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের

অভাব বুঝিয়া তাঁহার পণ্ডিত ও সহকারী দিগকে গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে প্ররোচিত করলেন। ইহাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত রূপে গদ্য পাঠ্য পুস্তকের প্রবর্তন করিল।'[৩] কিন্তু বাংলা গদ্য সৃষ্টির পথে কতকগুলি সহজাত সমস্যা এসে সৃষ্টির পথ আকীর্ণ করেছিল। তার মধ্যে মৌল সমস্যাটি ছিল শব্দসম্ভারের।

১৮৩৮ পর্যন্ত ফারসি ছিল এদেশে রাজদরবারের ভাষা। সেহেতু প্রচলিত বাংলার মধ্যে আরবি ফারসির যে আধিক্য ঘটেছিল তা প্রচলিত চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ এবং কিছু বাংলা গ্রন্থ পড়লে বেশ বোঝা যায়। ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে মুসলমান আধিপত্যের ফলে বাংলা ভাষায় প্রায় আড়াই হাজার ফারসি তথা আরবি তুর্কি শব্দ প্রবেশ করে।[৪]

১৭৭৮ সালে হালহেড এবং পরবর্তী কালে হেনরি পিটস ফরস্টার ও উইলিয়ম কেরী প্রমুখেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান বলে মনে করেন এবং বাংলাকে আরবী ফারসীর প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করে যান। বাংলা গদ্যসাহিত্যের একজন ইতিহাস রচয়িতা বলেছেন, "বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া 'গরিবনেওাজ শেলামত' বলিয়া সুরু করিয়া 'ফিদবি' বলিয়া শেষ করিতে হইত।"[৫]

কিন্তু আরবী ফারসীর প্রভাব থেকে বাংলা সাহিত্য বাঁচলেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষা আবার বহুক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুসারী হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত ১৮০৮ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের হিতোপদেশের ভাষার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

'নর্মদা তীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্মিত পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে। অনন্তর নীলবর্ণ ছবির তুল্য মেঘ সমূহেতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইল সেই তরু তলেতে বানরেরদিগকে আদ্রীভূত শীতার্ত কম্পিত কলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ওহে বানরেরা শুন আমারদিগের কর্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে আহৃত তৃণকরণক নীড় নির্মিত হইয়াছে পানি পাদ্যাদি বিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বানরেরা আলোচনা করিল বায়ু রহিত নীড় মধ্যে অবস্থান প্রযুক্ত সুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভাঙ্গিল তাহাদিগের অন্য সকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল।'[৬] এই সংস্কৃত অনুসরণ অনেক লেখককেই প্রভাবিত করে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং গ্রন্থে সংস্কৃত গদ্যরীতিই গ্রহণ করেছেন। 'রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বনে মৃগয়া করেন ইতিমধ্যে এক স্থানে উপনীত হইয়া দেখেন অতিরম্যস্থান চারিদিকে নদী মধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে ২ অনেক পশু পক্ষী আছে নানাপ্রকার শব্দ হইতেছে

রাজা স্থান নিরীক্ষা করিলেন এ অপূর্ব্বস্থান আমি এইখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিব রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্তস্থান করিয়া দিয়া পশ্চাৎ আপনাদিগের স্থান করিয়া সকলেই সেইস্থানে বাস করেন।'[৭] চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়ের তোতা ইতিহাস (১৮০৫) থেকেও অনুরূপ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

এই সংস্কৃত-অনুসারী বাংলা গদ্যরীতির যুগে বাংলা সংবাদপত্রের মাধ্যমেই বাংলা স্বকীয় গদ্যরীতির যথার্থ প্রকাশ হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব আরবী ফারসীর আধিক্য বর্জন ও সংস্কৃত বাক্য গঠন পদ্ধতি পরিহার করে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রে নিজস্ব গদ্যরীতি গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। বাংলা সংবাদপত্র কীভাবে বাংলা গদ্যকে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে তুলে দেয় তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেওয়ার চেষ্টা করব। যেহেতু বিষয়বৈচিত্র্যই সংবাদপত্রের প্রাণ সেহেতু সংবাদপত্রকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ বা প্রতিবেদন রচনার জন্য উপযুক্ত শব্দসম্ভার এবং পরিভাষা সর্বদা হাতে মজুত রাখতে হয়। যেক্ষেত্রে শব্দ ও পরিভাষার অভাব সেক্ষেত্রে সাংবাদিকেরাই সেই শব্দ ও পরিভাষার সৃষ্টি করেন।

বহুল ব্যবহারের ফলে পাঠকসমাজ সেগুলিকে সহজেই গ্রহণ করেন। এইভাবে বাংলা ভাষার বহু শব্দ ও পরিভাষা সংবাদপত্র থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং সাহিত্যের শব্দ-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন অনেক সময় অনূদিত হয়ে থাকে। অনুবাদ তাই সাংবাদিকতার অপরিহার্য অঙ্গ। উনবিংশ শতাব্দীতে কোন সংবাদ এজেন্সি ছিল না। কিন্তু তা না থাকলেও ইংরাজী সংবাদপত্র থেকে নিয়মিত খবরের অনুবাদ থাকত। তার যোগে নিজস্ব প্রতিনিধিদের খবরাখবরও অনুবাদ করতে হত। তাছাড়া ইংরাজী জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, নোটিশ, আইনকানুনের অনুবাদও প্রয়োজনীয় ছিল। এজন্য ইংরাজী থেকে বাংলা একটি অভিধানের প্রয়োজনীয়তা ছিল সবচেয়ে বেশী। ১৮২১ সালে এই অভিধান প্রকাশিত হয়। এই অভিধান সঙ্কলনের কাজ করেছিলেন দুজন—রামকমল সেন ও শ্রী ফিলিকস কেরি। এদের মধ্যে ফিলিকস কেরি সাংবাদিক —দিগ্‌দর্শনের সম্পাদক। ফিলিকস কেরি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র বাংলা অনুবাদ 'বিদ্যাহারাবলী' ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেছিলেন।

প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র দিগ্‌দর্শন ছিল দ্বিভাষিক পত্রিকা। দিগ্‌দর্শনে ইংরাজী ও তার অনুবাদ পাশাপাশি প্রকাশিত হত। বাংলা অনুবাদগুলির দিকে লক্ষ্য করলে এটি স্পষ্ট হবে যে শ্রীরামপুরের সাংবাদিকেরা যে বাংলা অনুবাদ করেছেন তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল এবং কোথাও অনুবাদ বলে মনেই হয় না। তাঁরা একটি নিজস্ব গদ্যরীতি প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন বলেই এটি সম্ভব হয়েছিল। নীচে দিগ্‌দর্শনের একটি অনুবাদ-রীতির উদাহরণ দেওয়া হল তা থেকে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে।

"In the centre of the city over the river was thrown a bridge of extraordinary magnificence ; it was built with such wonderful

art as to create a foundation sufficiently strong; in the bottom of a river which was sandy. The arches were made of huge stones fastened together with chains of iron, and melted load, before they began to build the bridge they turned the course of the river and laid its channel dry." 'নগরের মধ্যে নদীর উপরে অতিসুন্দর এক সেতু ছিল। ঐ সেতু অত্যাশ্চর্যরূপে গ্রথিত যেহেতুক নদীর নীচে বালি ছিল, তাহার খীলান শক্ত প্রস্তরেতে গ্রথিত, এবং লৌহ ও সীসাদ্বারা পরস্পর বাদ সেতু গাথিবার পূর্ব্বে ঐ নদীকে অন্য পথে লইয়া পরে সেতু গাঁথিয়াছিল।'[৮]

অথচ সংবাদপত্রের বাইরে বাংলা অনুবাদের যে আদর্শ ছিল তা এত উচ্চমানের নয়। বিশেষ করে শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত বাইবেলের অনুবাদের ক্ষেত্রে এই মন্তব্য করা অযৌক্তিক হবে না। ১৮০০ সালে গসপেল অফ সেন্ট ম্যাথুর প্রথম বাংলা অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার' মতীয়ের রচিত নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৩২-৩৩ সালে বাইবেলের যে নতুন সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় সেখানেও অনুবাদের মান উন্নত হয়নি।

"পরামনন কর কেননা স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী একথা ঘোষণা করত যোহন তুরক সে কালে য়িহুদাদেশের অরণ্যে আইল য়িহুহের পথ প্রস্তুত কর তাঁহার পথ সোজা কর অরণ্যে চীৎকার কারি এক জনের এই রব যাহার বিষয়ে য়িশঈয়াহ আচার্য্যের প্রমুখাৎ এই কথা কহা গেল এই তিনি।"

এই উৎকট বাংলার পাশাপাশি সংবাদপত্রের বাংলাকে রাখলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ চোখে পড়বে।

দিগ্‌দর্শনের একটি মৌলিক গদ্যরচনার নমুনা:

"ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর ছয় দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিলেন যেহেতুক তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল। এই হেতুক ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের এক দিবস সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিবে এবং সেই এক দিবসে ঈশ্বরের প্রতি আপন মনোনিবেশ করিবেক।"[৯]

এই গদ্যরীতি সমাচার দর্পণে এসে আরও পরিণতি লাভ করে। সমাচার দর্পণে প্রতিবেদন ও প্রবন্ধের যে সব শিরোনাম দেওয়া হত তার মধ্যেই বাংলা ভাষার আধুনিক রূপটি ধরা পড়ে। যেমন, 'মরণ', 'গৃহদাহ', 'আত্মঘাতী', 'রাজকর্মে নিয়োগ', 'অগ্নিদাহ', প্রভৃতি। সমাচার দর্পণের ভাষা সংস্কৃত ও পারসির প্রভাবমুক্ত এবং মুখ্যত তদ্ভব ও দেশী শব্দাশ্রয়ী। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে এই আত্মনির্ভরতা খুবই আশ্চর্যজনক। ভাষার স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিটিও লক্ষণীয়। নীচে সমাচার দর্পণের কয়েকটি প্রতিবেদনের উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১। যাতায়াতের সুগম—জানা গেল যে কলিকাতা অবধি কাশী পর্যন্ত যে নূতন

পথ হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পথিক সাহেব লোকেরদিগের থাকবার কারণ সাত ২ ক্রোশ অন্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক ২ বাঙ্গালা ও পাকশালা নির্মাণ করিয়াছেন ইহাতে সর্বশুদ্ধ বিশ্রামস্থান বত্রিশটী হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই ২ কুঠরি করা গিয়াছে যে এক সময়ে দুই সাহেব উপস্থিত হইলে স্থানাভাব না হয়। ঐ সকল স্থানে উপযুক্ত ভৃত্যগণও নিযুক্ত আছে। (সমাচার দর্পণ, ১১ ডিসেম্বর ১৮২৪)

২। বাবু আশুতোষ দেব—শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বিমাতৃশ্রাদ্ধ অতি সমারোহপূর্বক হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক দান করিয়াছেন কিন্তু আমরা ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তৎসময়ে কাঙ্গালির সমারোহ হয় নাই। (সমাচার দর্পণ, ৫ অকটোবর ১৮৩১)

আর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের রিপোর্টের উদাহরণ দিচ্ছি।

"গত রবিবার রাত্রে যে ঝড় হইয়াছিল সেই ঝড় গঙ্গাসাগর উপদ্বীপেও হইয়া ছিল সেখানে সেই দিবস বজ্রপাত হওয়াতে দুইজন মরিল আর তিনজনের চুল পুড়িয়া গেল ও শরীরে আঘাত হইল কিন্তু মরিল না।" (৩ এপ্রিল ১৮১৯)

এইসব রিপোর্টগুলির সঙ্গে সমসাময়িক গদ্য গ্রন্থগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লে প্রভেদটি বিশেষ ভাবে চোখে পড়বে।

সংস্কৃতকে বাংলা ভাষার জননী স্বীকার করেও শ্রীরামপুরের সাংবাদিকেরা তাঁদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে এটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সংস্কৃতবহুল বাংলা গদ্য-রীতি কখনই জনসাধারণের কাছে আদৃত হবে না।

শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিটারেরি গেজেট পত্রিকায় বাংলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যে ধর্মপুস্তকের বাংলা তর্জমা করেছিলেন তা ইংরাজী বাক্য গঠনরীতি অনুসারে লিখিত হওয়ায় এদেশীয় লোকেরা বুঝতে পারতেন না। এমনকি ফেলিকস কেরি 'ইংলণ্ড দেশের বিবরণ' নামে যে তর্জমা প্রকাশ করেন তাতে সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের আধিক্য ঘটায় সেটিও সাধারণের কাছে আদৃত হয়নি। কাশীপ্রসাদ ঘোষের বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ: 'অবিকল সংস্কৃতানুযায়ী ভাষায় ইংলণ্ডদেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেহ পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।'[১০]

বলা বাহুল্য সমাচার দর্পণ ইতিপূর্বেই সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে বাংলা গদ্যকে এক সাবলীল গতি দান করেছিলেন। সমাচার দর্পণ থেকে এর ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন একটি উদাহরণ:

"কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ করিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার জন্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্ম্মে নাই। ডেকসিয়ানরি কর্ত্তারা বিদ্যার মজুর,

তাঁহারা মাল মশলা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে। যদি আমাদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাঁহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসর পর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতাম।" (১৮ জুন, ১৮২৫)

তবে সমাচার দর্পণ খুঁজলে সংস্কৃতাশ্রয়ী গদ্যরীতিরও উদাহরণ পাওয়া যাবে। আবার আরবি ফারসী বহুল কিছু কিছু রচনাও পাওয়া যাবে। তার কারণ সংবাদপত্র একহাতের লেখা নয়। লেখক ভেদে গদ্যরীতিরও পরিবর্তিত হতে পারে। তবে এই ব্যতিক্রমের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। নীচে সংস্কৃত শব্দবহুল একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করা হল :

বৈকুণ্ঠ গমন। আমরা অপারপরিতাপপয়োধিপয়ঃ প্রবাহে পতিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগর নিবাসি যশোরাশি বৈকুণ্ঠবাসি কীর্তিশশি পবিত্র চরিত্র ভগবদ্ভক্তাগ্রগণ্য ভুবনমান্য পুণ্যশীল সুশীল বিবিধ বিদ্যাবিশারদ দান্ত শান্ত নরবর বাবু নীলমণি হালদার মহাশয় গত ২৪ শ্রাবণ সোমবাসরে সজ্জন সজ্জনাদি পুত্র পৌত্র সমীপে শ্রীশ্রীপতিত পাবনী ত্রৈলোক্য তারিনী তপন তনয়তাপিনী ত্রিদশতরঙ্গিনী তীরে নীরে সজ্ঞানে পরম প্রেমানন্দান্তঃকরণে সরস রসনে মুক্তাবনে অতি সকরুণ স্বরে ঈশ্বরের নামোচ্ছারণ পূর্ব্বক এতমায়াময় সংসার বিনিময় করত লোকান্তর যাত্রা করিয়াছেন, ইতি সমাচার দর্পণ ১৯ আগষ্ট ১৮৩৭।

আবার আরবি ফারসী শব্দযুক্ত বাক্যের নমুনা :

১। বর্দ্ধমানে কালেজ ১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর আপন কালেজের দারোগা শ্রীযুত হীরুবাবুকে কহিলেন যে ইস্তক নাগাইদ কতগুলি বালক আমার কালেজে লিখিয়া গুণবান লইয়াছে। দারোগা কহিলেন যে মহারাজ সুন্দররূপে কেহই হইতে পারে নাই। মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীযুত বসন্ত বাবুকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্যাবধি এই কালেজ তোমার জিম্বা হইল তুমি ইহা তদারক করিবা এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমারা সরকারে একশত টাকা দরমাহা পাইতেছ অদ্যাবধি আর অধিক পঞ্চাশ টাকা পাইবা কিন্তু প্রতিমাস বালকেরদের ইস্তাহাম তোমার লইতে হইবে। (২১ আগস্ট, ১৮১৯)

২। ও বড়লোক কহা যায় না বরং ছোটলোক বিলক্ষণ সাবুদ হয়। (সমাচার দর্পণ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮২১)।

৩। ঐ বালকের জননী জবনী হুজুরে নালিশ করাতে তজবীজের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল। (২৫ জুলাই ১৮২৯)

অবশ্য সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য সমাচার দর্পণের এই প্রয়াস সংস্কৃতপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। ভাবাদর্শ নিয়েও দ্বিমত ছিল। বিশেষ করে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এই নব্য গদ্যাদর্শকে খুব ভাল চোখে দেখেননি।

১৮৩০ সালের ৬ মার্চ বঙ্গদূত পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক বঙ্গভাষা সংস্কারের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে লেখেন, "কেবল সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্য বৃদ্ধি

সম্ভাবনায় সংশোধন সিদ্ধি হইতে পারে না একথাও আমাদিগের সমতা অতএব ভাষার মাধুর্য্য বিধার অস্মাদির অনুমানে ইহাই অনুমেয় যে সংস্কৃতানুযায়ীকে ভাষা যাহা সাধু পরম্পরায় ব্যবহার হওয়াতে সাধু ভাষা রূপে খ্যাতা তাহাই শুশ্রাব্য।"

বঙ্গদূত ওই মত সমর্থন করে লেখেন, 'অতএব সুশ্রাব্য যে সাধুভাষা তাহাই প্রশংসনীয় তদিতরকে ইতর জ্ঞান করিতেই হয় কিন্তু গঙ্গার উভয় তীরেরও সর্ব্বত্র সমান ভাষা নহে সুতরাং ইহার মধ্যেও বিশেষ সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্যভব্য সকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণপূর্ব্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণ কর্ত্তব্য।'

সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মোটামুটি সংস্কৃতানুসারী বাংলা গদ্যরীতির সমর্থক ছিলেন। ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে ভবানীচরণ কলকাতা কমলালয়ে লিখছেন, যেসব যাবনিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আছে সেগুলির বদলে বাংলা প্রতিশব্দই বসানো উচিত।

কলকাতা কমলালয়ে ভবানীচরণ লিখছেন :

"বিপ্র. ভাল মহাশয় শুনিয়াছি যে ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্যজাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন যথা কম, কবুল কমবেশ, কয়লা কর্ম, কষাকষি, কাজিয়া ইত্যাদি ককার অবধি ক্ষকার পর্য্যন্ত ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইহারা পড়ে নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও করেন নাই তাহা হইলে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের অধিক ভাষা থাকিতে যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন না।"[১১]

কলকাতা কমলালয়ে ভবানী চরণ ৮২টি যাবনিক শব্দ ও তার একাধিক তৎসম ও দেশী প্রতিশব্দের তালিকা দেন। যেসব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হয় না সেগুলিকে হুবহু বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা যেতে পারে বলে ভবানীচরণ অভিমত দেন। এই গ্রহণযোগ্য বিদেশী শব্দের সংখ্যা ছিল ১৩। এই শব্দগুলির মধ্যে ছাড়, ছাপা, ছানি, ছুটি, জমীদার, জামিন, ফাঁদ, বেগার, বেচারা, ধমক, সওদা, রওনা, বাজে, বাজার, বাজি, চালাক, গুদাম, তরজমা, দোকান প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংবাদপত্রগুলি বহু ইংরাজি শব্দ হুবহু গ্রহণ করেছিল। তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল। সমসাময়িক উচ্চারণরীতি অনুসারে শব্দগুলির বানান লেখা হয়েছিল। প্রায় দেড়শ বছরেরও অধিককাল ধরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা বানান ও উচ্চারণরীতির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়।

সাময়িকপত্রে উল্লিখিত কিছু ইংরাজি শব্দ : কাপ্তেন, টৌনহল, কালেজ, গ্রিজাঘর, রিবরেণ্ড, কমিটি, ফিস, গবর্ণমেন্ট, গবরনর জেনারেল, চীফ জুষ্টিস, কোম্পানি, কালেকটর আপীল, সেক্রেটারি, টারিফ, মিউনিসিপ্যাল, ইঞ্জিনিয়র, এডবোকেট, মিডিকেল কালেজ, কমিস্তনর, স্কালরশিপ, মেম্বর, ডিরেক্টর, সিবিলিয়ন, সিবিল সরবিস, পোলীস, ট্যাক্স ইত্যাদি।

পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত বিষয়ে বাংলার মাধ্যমে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার অবতারণার প্রথম কৃতিত্ব রামমোহনের। রামমোহন ৭০টি পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছেন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে বহু জটিল শাস্ত্র মীমাংসা ও দুরূহ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। বাহুল্য ও উচ্ছ্বাস বর্জন করে যুক্তিতর্কের সাহায্যে বাংলাভাষার মাধ্যমে জটিল তত্ত্বের যে মীমাংসা সম্ভব রামমোহনের গ্রন্থগুলিই তার উদাহরণ। রামমোহন নিজেও ছিলেন সাংবাদিক। সংবাদ কৌমুদী, ব্রাহ্মণ সেবধি প্রভৃতি পত্রিকার লেখক। তাঁর হাতে পড়ে সংবাদপত্রের ভাষা যেমন যুক্তিপূর্ণ ও বাহুল্যবর্জিত হয়েছে তেমনি তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যেও এই নৈর্ব্যক্তিক, যুক্তিবাদী সাংবাদিক সত্তার পরিচয় রয়েছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামমোহনের রচনা প্রাঞ্জল নয় এবং সংস্কৃতের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। তাঁর রচিত বাক্যগুলির মধ্যে দুরান্বয় রয়েছে। উপযুক্ত ছেদচিহ্নও তিনি ব্যবহার করেন নি।

"সংসারের বিষয় আসক্ত হওয়া এবং আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞানী অঙ্গীকার করা জ্ঞাননিষ্ঠের জন্য নিষিদ্ধ হয় ইহা কেননা ওই বচনের তাৎপর্য্য হয়। একথা যদি কহেন যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রচনাকে নিন্দার্থবাদ না কহিলে তাঁহার নিজের নিস্তার হয় না আর যোগবাশিষ্ঠের বচনকে যথার্থবাদ না মানিলে জ্ঞানীদের প্রতি নিন্দা করিবার উপায় দেখেন না তবে তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনকাঙ্ক্ষী সুতরাং আমরা আর কি কহিতে পারি।"[১২]

কিন্তু এই তুলনায় সম্বাদ কৌমুদীর রচনারীতি আরও প্রাঞ্জল—"ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবারের শোকের সীমা নাই অস্মাদাদিরও মহাখেদ হইয়াছে যেহেতু ঐ বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর হইয়াছিল তাহাকে যুবাপুরুষ বলা যায় আর তিনি অতি গুণবান অর্থাৎ বাঙ্গালা পারসি আর ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বানরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কোন ২ কর্ম্মস্থানে দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১৩]

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকায় বাংলা গদ্যের ভাষাগত উৎকর্ষ আরও বিকাশ লাভ করে। ভবানীচরণ শুধু গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে লেখেন নি, লঘু বিদ্রূপাত্মক লিখনভঙ্গি, তৎসম শব্দের সঙ্গে যাবনিক শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ ভবানীচরণের লেখাতেই প্রথম সার্থকভাবে ফুটে ওঠে। এদিক থেকে ভবানীচরণ ঈশ্বর গুপ্ত এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের যথার্থ পূর্বসূরি।

সমাচার দর্পণে বাবুর উপাখ্যান লিখে ভবানীচরণ বাংলা গদ্যের নতুন মোড় ফেরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ভাষাদর্শ যে রক্ষণশীল পাঠকদের পছন্দ হয়নি তা সমাচার দর্পণে প্রকাশিত একটি চিঠিতে জানা যায়।

১৮২১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর সমাচার দর্পণে জনৈক পত্রলেখক স্ল্যাং প্রভাবান্বিত বাংলাকে নিন্দা করে লিখছেন: 'বাক্যবিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে লি এজা চুঁচড়া চড়া ফারাশ ডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা কামড়িয়াছে কেমড়েছে টাকার নাম ট্যাকা

মুখের নাম ব্যাং করো নাম কড়ো। পরিহাস বাক্য আইস শাশুড়ে বৌ ও ইত্যাদি বাক্য যিনি অনেক কহিতে পারেন তিনি সুবক্তা যাঁহাকে ঐ পরিহাস করে তাহারি বা কত মনোবিনোদ হয় তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র কহেন অমুকের পুত্র বড় সুজন বক্তা সকলকে লইয়া আমোদ করেন।'

ভবানীচরণের গদ্যরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য অনুপ্রাসের প্রয়োগ। নববাবুর বিলাসে এই অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি। সংবাদপত্রের সাধারণ রিপোর্টেও তিনি এই অনুপ্রাস প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্ত এই অনুপ্রাসর যথাযথ প্রয়োগ করেছেন। ভবানীচরণের সমাচার চন্দ্রিকার গদ্যের নমুনা :

"লার্ড উলিয়াম বেন্টিঙ্ক জেনরল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা কথা বা প্রশংসাসূচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি যেহেতু আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয়ে যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত, করিবেন আর যদ্যপি শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্টবোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না করিয়া যখন কোন আজ্ঞা দিবেন না এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগ মাত্র।"

"যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি মহাশয়দিগের আস্ফালন তর্জ্জনগর্জ্জনের বিসর্জ্জন হইবেক।"[১৪]

অবশ্য এই ধরনের প্রাঞ্জল রচনার পাশাপাশি সংস্কৃতানুসারী রচনারীতিও চোখে পড়ে। যেমন :

"অবোধ বৈদ্য বোধোদয়—কাঁচরাপাড়া নিবাসি বৈদ্য শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ রায়ের আদেশে শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন বিরচিত যে বৈদ্যোৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত হইয়াছেন সংপ্রতি কলিকাতা নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মুন্সী ঐ প্রকাশিত গ্রন্থের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক অবোধ বৈদ্যবোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এই যে রায় কৃত গ্রন্থের অপ্রামাণ্য হিতুক দোষ কথন এবং মহারাজ রাজবল্লভ সংগৃহীত ব্যবস্থাসম্মত ও মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রমাণান্বিত পণ্ডিতগণ স্বাক্ষরিত ব্যবস্থা পত্রানুসারে যথার্থ অম্বষ্ঠোৎপত্তি কথন এবং ব্রাহ্মণগণের যথার্থ স্তুতি কীর্তনাদি প্রকাশ করিয়াছেন অপর এতদ গ্রন্থে বহুতর বৈদ্য কর্তৃক স্বাক্ষর হইয়াছে এক্ষণে ঐ পুস্তক চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইলে শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক।" (সমাচার চন্দ্রিকা, ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩০)

দেখা যাচ্ছে, প্রথম যুগের বাংলা সংবাদপত্রগুলি সংস্কৃতের প্রভাব একেবারে কাটিয়ে উঠতে না পারলেও যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। একাধিক ভাষাদর্শের অনুসরণ সংবাদপত্রের পক্ষে অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এমনকি এই আধুনিক কালের অনেক বিখ্যাত সংবাদপত্রে একাধিক রচনা-রীতির প্রকাশ ঘটে থাকে।

সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা ও বঙ্গদূতের গদ্যরীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কতগুলি সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার প্রচলিত রীতি হিসাবেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন 'অস্মাদি', 'তৎসমভিব্যাহারে,' 'তদ্দর্শনে', 'অদ্যাপি', 'এতদ্দেশীয়' প্রভৃতি।

কিছু কিছু ইংরাজী বাক্যের অক্ষম অনুবাদও চোখে পড়ে। যেমন : শ্রুত হওয়া গিয়াছে (ইট ইজ লারনট) মুদ্রাযন্ত্র মুক্তি (ফ্রডম অব প্রেস)।

কতগুলি বাক্যে কর্তৃবাচ্যের বদলে ভাববাচ্যের প্রয়োগ হত। যেমন 'কলিকাতার পুরানো কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহা এখন ভাঙ্গা গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নূতন হাসীল দপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক। (সমাচার দর্পণ ১৬।১।১৮১৯) করণ কারক তে, এত প্রভৃতি সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ : ইংলণ্ডে এক নৌকা কেবল লৌহেতে নির্মিত হইয়াছে। (দর্পণ ২৩।১।১৮১৯)

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল : একাধিক বহুবচন ও বহুবচনে বিভক্তির ব্যবহার। যেমন— স্ত্রীগণের, ভৃত্যবর্গেরা। ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সঙ্গে বহুবচনের দিগবিভক্তির যোগ। যেমন তাহারদিগের, রাজারদিগের। ত্রিশ ও চল্লিশ দশকের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বেঙ্গল স্পেকটেটারে মোটামুটি তৎসম শব্দেরই প্রাধান্য ছিল। সমাসবদ্ধ পদেরও বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। তবে বেঙ্গল স্পেকটেটর ছেদ বা যতিচিহ্নের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় বাক্যের ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

১। হিন্দুধর্ম্মের অথবা পৃথিবী মণ্ডলস্থ অন্য কোন ধর্ম্মে উক্তরূপ কার্য্যের আদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না, হায়! দলবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পিতাপুত্র স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদের কারণ তাহার কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর যে দুরাত্মা আপন পুত্রকে ধর্ম্মদার পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করে ও আশুতোষ বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তি নিমিত্ত এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত আহার ব্যবহার করণার্থ আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত তাহার কথাই বা কি কহিব। (১৮৪২।১ সেপ্টেম্বর)

২। মিয়াজান এইরূপে ১২ দিন পর্যন্ত কারাগারে থাকিলেন, তন্মধ্যে কেবল একবার তাঁহার পীড়ন কর্ত্তার লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি মনে ভাবিলেন বাদানুবাদের যে ফল হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা আমার পক্ষে হইয়াছে এবং আদালতের বিচারেরও প্রায় শেষ হইল অতএব এ সময় প্রতিজ্ঞার অন্যথা করা উচিত হয় না। (১৫ নভেম্বর ১৮৩২)

বেঙ্গল স্পেকটেটরে ভাব ও কর্মবাচ্যের বদলে কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হতে দেখা যায়। শ্রুত হইয়াছি বা শ্রুত হওয়া গেল ইত্যাদি বাক্যের পরিবর্তে স্পেকটেটরে 'আমরা শুনিলাম' 'শুনা গেল', ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সম্বাদ ভাস্কর যথেষ্টই বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন। সম্বাদ ভাস্করের ভাষা আরও প্রত্যক্ষ। যেমন, এইরূপে কলিকাতা নিবাসি মহাশয়েরা সতর্ক হউন, বাটী জরীপ করণের মূলাভিপ্রায় ট্যাক্সবৃদ্ধিকরণ, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে

এই সময়ে, সকলে ঐক্যবাক্যে সভা করিয়া ডেপুটি গভর্নরের নিকট আবেদন করুন, বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গালী পল্লী নিবাসিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখকর হইবে। (২১শে এপ্রিল ১৮৪৯)

৩। আমরা আপাততঃ নবীন হুজুরানীর বিষয়ের এই মাত্র লিখিলাম ইহার পরে যেমন যেমন দেখিব সেইরূপ লিখিব কিন্তু বড় হুজুরের বিষয়ে যাহা শুনিতেছি তাহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তিনি এতদ্দেশে আসিয়া অবধি পীড়ায় পীড়ায় কালক্ষেপ করিয়াছেন পর্বতে পর্বতেই অধিক সময় ছিলেন বরং কোন কোন সময় প্রকাশ করিয়াছেন রাজকার্য সম্পর্কীয় পত্রাদি পর্যন্তও পড়িতে পারিবেন না, বলে ২ স্নিগ্ধ বায়ু সেবনেও পীড়া শান্তি হয় নাই, এদেশের কেমন উগ্র শক্তি যুবা গবর্নর বাহাদুরের তাবৎ রক্ত উষ্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহাতে সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, প্রায় শয্যাগতই থাকেন, শ্রীযুতের শ্রীমুখেও ক্ষত রোগ হইয়াছে। উদর পুরিয়া মন্ত মাংসও গ্রহণ করিতে পারেন না, লেডি ঠাকুরানী যখন বর্তমানা ছিলেন এখন শোণিত উষ্ণ হয় নাই তিনি নানা প্রকরণে সেবা শুশ্রূষায় রক্তশীতল রাখিতেন ঐ শ্রীমতীও স্বর্গারোহণ করিলেন শ্রীযুতের কোমলাঙ্গেও স্পর্শাক্রমক ক্ষত রোগ আক্রমণ করিল, গমন কালে তাঁহার বান্ধবেরা ভোজন পালের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহাতেও যাইতে পারেন নাই, হায়, শ্রীযুত বাহাদুর স্বদেশ যানে সাগর যানে না জানি কত ক্লেশ ভোগ করিবেন আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর যেন তাঁহাকে দুঃখ দেন না, সুস্থ শরীরে সাগর পার হইয়া দেশে যাইয়া যেন বান্ধবগণের সহিত আমোদ করিতে পারেন, নাগপুরের নাগিনীদিগের উষ্ণ নিঃশ্বাসে কি এই দশা হইল, লঘু পাপও গুরুজনে লাগে, পরমেশ্বরের ব্যাপার কিসে কি হয় বলা যায় না। (৪ মার্চ ১৮৫৬)

এই স্বচ্ছন্দ সাবলীল গুরুভারবর্জিত বাংলা গদ্য যা সম্বাদ ভাস্কর থেকে উদ্ধৃত করলাম তার সূত্রপাত সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্তের হাতে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও তাঁর গদ্য আশ্চর্যভাবে তৎসম শব্দের বাহুল্যবর্জিত।

সম্বাদ ভাস্কর গদ্যরীতির প্রয়োগ সংবাদপত্রের অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করতেন: সমাচার পত্র সম্পাদকদিগের যাহা উচিত কর্তব্য আধুনিক সম্পাদকেরা তাহা করেন না, সমাচার পত্রের প্রয়োজন এই যে তদ্দ্বারা সাধারণের জ্ঞান শিক্ষাদি বিবিধ উপকার হইবে তার শুদ্ধ লিখন পঠনে সাধারণে সুখানুভব করিবেন। (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯)

ঈশ্বরগুপ্ত বাংলা গদ্যরীতিতে লঘু স্বরের আমদানি করেছিলেন। বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের জটাজুট থেকে মুক্ত করে তাকে স্বচ্ছ সলিলা নির্ঝরিণীতে পরিণত করেছিলেন। ভাবনীচরণ নববাবুর বিলাসে যে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন পরবর্তী কালে তা আলালি রীতির জন্ম দেয়। কিন্তু এর মাঝখানে বাংলা গদ্যের বন্ধন মুক্তির পিছনে সংবাদ প্রভাকরের অবদান কম ছিল না। ঈশ্বরগুপ্তের কবি-

প্রতিভার অন্তরালে তাঁর সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব এবং গদ্যলেখক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব চাপা পড়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, ঈশ্বরগুপ্তের গদ্যের কোন স্টাইল নেই, তা অলঙ্কারের কৃত্রিমতায় দিগ্‌ভ্রান্ত।[১৫]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : ঈশ্বরগুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন, প্রভাকর বাঙ্গালা রচনা রীতিও অনেকটা পরিবর্তন করিয়া যান।[১৬]

সংবাদ প্রভাকর বাঙ্গালা রচনারীতির যে পরিবর্তন করে যান তা মোটমুটি এই বাংলা গদ্যে শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারের সুষ্ঠু প্রয়োগ। যেমন : ১। অধুনা আলোকে আসিয়া পুলকে পরিপূরিত হইয়াছেন, ইহার মনে আর সামান্য ধনের স্পৃহা নাই, শুদ্ধ পরমধনের প্রিয় হইয়াছেন, তবে যে পিতার নিকট যৌতুকটি লইয়া কৌতুকটি দেখাইলেন, যে স্বতন্ত্র বিষয়…(৩০।৮।১৮৫১) বাঙ্গালি জাতি কাঙালি অপেক্ষাও দুর্বল।…লার্ড বাহাদুর কৃপা বিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন না। (২০।৬।১৮৫৭)

"মিথ্যা কথনের ফল কি?" এই সহজ প্রস্তাব লিখিতেই যখন অক্ষম হইয়া পাল পাল যুবা মেষপালের ন্যায় পলায়ন করিল, এবং অনেকেই যখন শ্রী ফাঁদিতে হতশ্রী হইল,…(১৭।৬।১৮৫২)

হাবার মুখে থাবা দেওয়ার ন্যায় আমাদিগের সামান্য ছলে কখনই ভুলাইতে পারিবেন না। (২১।৭।১৮৫৩)

এইপ্রকার লোকের গ্লানিজনক গ্লানিসূচক বিষয় দ্বারা কিছুদিন ধর্ম্মসভার কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল (১৬।৪।১৮৪৮)

সংবাদ প্রভাকরের গদ্যরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দ, স্ল্যাং এবং প্রবাদবাক্যের সংমিশ্রণ। বাংলা সাহিত্যে যাবনী মিশাল ভাষার প্রবর্তন করেন ভারতচন্দ্র। ভাষার প্রসাদগুণ ও সাবলীলতার জন্য সচেতন হয়েই তিনি যাবনিক শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু গদ্যে দেশী শব্দের সার্থক ব্যবহার এবং বিশেষ করে তৎসম শব্দের পাশাপাশি সমমর্যাদায় তাকে অভিষিক্ত করার সার্থক উদাহরণ সংবাদ প্রভাকরেই প্রথম পাওয়া যায়। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন : যে আটপৌরে ভাষা সৃষ্টি কেরীর আকাঙ্ক্ষা ছিল ঈশ্বরগুপ্তের এবং সমসাময়িক সাংবাদিকগণের কলমে হল তার পত্তন।[১৭]

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে বলেছেন 'গদ্যের জড়তা মুক্তি।'[১৮]

সংবাদ প্রভাকরের এই জড়তাবিহীন গদ্যরীতির একটি উদাহরণ দেওয়া হল :

'…আপীলের মোকদ্দমা জজ সাহেবের সমীপে উপস্থিত আছে, ইহার মধ্যে খোদা-বন্ধ আরেক দিবস আসামিকে কাছারিতে তলব করিয়াছিলেন এবং তিনি কলিকাতায় থাকা প্রযুক্ত উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার জামিনের টাকা ফরফিট অর্থাৎ রাজকোষ ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে ধৃত করণার্থ নূতন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে,

আহা! বারাসতের মহাপ্রভুর বিচারে চালিতাগাছের মোকদ্দমা মনোহরপুকুরের বিখ্যাত দাঙ্গার মোকদ্দমা অপেক্ষাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। (৬।৫।১২৬১)

ওপরের অংশটিতে বিদেশী শব্দেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু তৎসম শব্দের সার্থক প্রয়োগেরও ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। যেমন:

১। তিনি আমারদের সহিত যে একটা বিবাদ ফাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহা পরে তাঁহার পক্ষে বামনের চন্দ্রিমা স্পর্শেন ন্যায় হইয়া উঠিবেক। (১৭।৪।১২৫৯)

২। কলিকাতার পুলিস কর্মকারকেরা সর্বপ্রকার কর্তব্যকর্ম পরিহার করত এক্ষণে কেবল রাস্তায় প্রস্রাব নিবারণরূপ মহাগৌরবজনক বৃহদ্ব্যাপারে আদাজল খাইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন। (১৭।৪।১২৫৯)

৩। সরকার অবশ্য পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিয়াছেন। (৯ বৈশাখ ১২৫৬, এপ্রিল ১৮৪৯)

৪। দত্তবাবুরা যে এই ছয় বৎসর কাল এক ঢোল এক কাঁসীতে এক ঘেয়ে বাদ্য করিয়া সকল দিগ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদিগের মহত্ত্ব ও পুরুষার্থ মহীময় ব্যাপিত হইয়াছে, এইক্ষণে তাঁহারদিগ্যে আর অধিকতর ভারগ্রস্ত করা কর্ত্তব্য হয় না। (১৭।৩।১২৬৫)

সংবাদ প্রভাকর বাংলার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ইংরাজি শব্দ মিশিয়েও বাক্য গঠন করেন। যেমন:

১। সেং লাজ হিন্দু কালেজের হেড গুরু হইয়াছেন। (১১।১।১২৫৮)

২। ঐ মহাশয়ের উত্তরাধিকারিরা যাঁহারা মেনেজিং কমিটির মেম্বর হইয়াছেন। (২৬।২।১০৫৩)

৩। রাজপুরুষেরা ব্যয় সংকোচের চেষ্টায় মহকুমায় খারাপ স্টেসনারী জিনিস পাঠাইতেছেন (মার্চ ১৮৫৩)

সংবাদ প্রভাকরে প্রচলিত প্রবাদের সার্থক প্রয়োগ ঘটে।

১। মাজিস্ট্রেট সাহেবরা একে মনসা তাহাতে আবার ১৮৫০ সালের ক্ষমতাবৃদ্ধি আইনরূপ ধুনার গন্ধ পাইয়া একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছেন। (৬।৫।১২৬১)

২। 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' অর্থাৎ গরলপূর্ণ, কিন্তু বাক্যে মধুবর্ষণ এমত ভয়ানক মনুষ্য অবনীমণ্ডলে বিস্তর আছে। (৬।৩।১২৬৪)

৩। কথায় বলে যাহার খাই তাহার গাই। (১৪।৪।১২৬৫)

৪। তাঁহারা 'গলায় আঙ্গুল দিয়া ফাস বাহির করা' যে আপনারদিগের স্বজাতীয়ের দোষ প্রকাশ দ্বারা আপনারাই দোষি হইবেন এমতও না হইতে পারে। (১৫।৪।১২৬৫)

৫। চারিজন নাক কাণ কাটা 'কম্যাণ্ডার ইন চিফ বাহাদুর' এবং লার্ড গবর্নর জেনেরল সাহেব ইত্যাদিও হইয়াছে। (ঁ।১২।৬৫)

এছাড়া বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য যেমন:

১। পরিশেষে এক নীলকমলি হেঙ্গামা উঠাইতেই একদিনে সমুদয় ঠাই ফুটফাট হইয়া গেল। (১৬।৪।১৮৪৮)

২। আমারদিগের বাহিরে কালো মিসমিস বটে, কিন্তু ভিতরে রাঙ্গা টুকটুক আছে, তুমি হরকরার মত নেকরা বাঁদিয়া ঠুকঠুক শব্দ যত করিতে পার, কর তাহাতে আমারদিগের মনে ধুক পুক নাই। (২৪।৮।১২৬৫)

৩। লক্ষাধিক বিদ্রোহি, নেপাল দেশের অরণ্য পর্ব্বতাদি স্থানে 'কিলবিল কিলবিল করিতেছে।' (৭।১২।১২৬৫)

উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে তত্ত্ববোধিনীর যুগে এসে বাংলা গদ্য আর একটি মোড় নেয়। একারণে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকেরা এই যুগকে তত্ত্ববোধিনীর যুগ বলে অভিহিত করেছে। ১৮৪৩ থেকে বারো বছর ধরে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। আমরা ১৮৪৩ থেকে বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বেকার সময় পর্যন্ত (১৮৭০) তত্ত্ববোধিনী যুগ বলে অভিহিত করতে পারি। অবশ্য অক্ষয় দত্তের সম্পাদনা কালই তত্ত্ববোধিনীর সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কাল।

সমাচার দর্পণ বাংলা গদ্যকে পাঠ্যপুস্তকের আওতা থেকে দৈনন্দিন জীবনের মুক্ত অঙ্গনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। রামমোহন বাংলা গদ্যকে দুরূহ শাস্ত্র আলোচনার ভাষায় পণিত করে যান। ঈশ্বরগুপ্ত বাংলা ভাষাকে আটপৌরে জীবনের ভাষায় পরিণত করেন এবং মুখের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার প্রভেদ মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। অবশ্য ভবানীচরণ নববাবুর বিলাসে এই প্রচেষ্টারই সার্থক রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সংবাদপত্রে গদ্যরীতি নিয়ে আরও বিস্তৃত পরীক্ষা নিরীক্ষা সংবাদ প্রভাকরই সুরু করেছিলেন।

কিন্তু সংবাদ প্রভাকরের বহু গদ্যে ও কবিতায় সাহিত্যিক শালীনতা ও সুরুচির মান যথাযথ রক্ষিত হয়নি বলে সমসাময়িক অনেক সাহিত্য-সমালোচকই অভিযোগ করেছেন। পপুলার গদ্যরীতিও যে সুরুচিপূর্ণ ও সাহিত্যরসসম্পৃক্ত হতে পারে তার প্রকাশ-ঘটেছে আরও পরে—অমৃতবাজার পত্রিকা এবং সুলভ সমাচারের মাধ্যমে। এর মাঝে মুক্তবন্ধ সহজ সাবলীল অথচ ক্লাসিক্যাল গদ্যরীতি গড়ে ওঠার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। তত্ত্ববোধিনী যুগের গদ্যরচয়িতাদের হাতে এই ক্লাসিক্যাল গদ্যরীতির বিকাশ ঘটে। বাংলা গদ্যের আসন ক্রমশ দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাচার দর্পণে যার উদ্ভব, তত্ত্ববোধিনীতে তার বিকাশ এবং বঙ্গদর্শনে তার পরিণতি। বস্তুত ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে যে বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভব হয়েছে তার ধারা বিশ শতকের ষাট দশক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল। ষাট দশক থেকে অবশ্য চলিত ভাষাকে বাংলা সংবাদপত্র গ্রহণ করে। এবং বাংলা গদ্যের আধুনিক রূপটিও সংবাদপত্রে প্রতিফলিত দেখা যায়।

তত্ত্ববোধিনীর লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম পর্বে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর

রত্ন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তত্ত্ববোধিনীর যুগে বাংলা গদ্য আরও সুশৃঙ্খল ভাবে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার বাহন হয়ে ওঠে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : 'তত্ত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের আলোচনাতে প্রবৃত করে।'[১৯]

বস্তুত তত্ত্ববোধিনীর মাধ্যমে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, নব্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়, সম্পর্কে সিরিয়াস আলোচনার সূত্রপাত হয়।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, উপনিষদ, অনুবাদ, ঋগ্‌বেদ অনুবাদ, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের ধর্মব্যাখ্যা," বিদ্যাসাগরের মহাভারতের উপক্রমণিকার অংশের অনুবাদ, অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান ইতিহাস ও ধর্ম সম্প্রদায় পুরাতত্ত্ব বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। বাংলা গদ্য পদ্যের অভিভাবকত্ব ছেড়ে সাবালকত্ব অর্জন করে। একজন বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায় ঃ

"তত্ত্ববোধিনী যুগের সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন আদর্শ হীনবল হইয়া ক্রমশ এক নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পদ্যেরই ছিল একচ্ছত্র প্রভাব। এই যুগে গদ্য সর্ব্বপ্রথম তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। নবোদ্ভূত যে সকল সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে দেশবাসীর কৌতূহল ছিল সর্ব্বাধিক, সেগুলি কেবল গদ্য গ্রন্থাকারের নয় পরন্তু নানা ক্ষুদ্র গদ্য পুস্তিকায়, সাময়িক-পত্রে ও খবরের কাগজে আলোচিত হইতেছিল। পদ্যের দ্বারা এ কাজটি সহজসাধ্য ছিল না, অতএব এ কাজের ভিতর দিয়া গদ্য উত্তরোত্তর অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করিল। বিবিধ শক্তিশালী লেখকের চেষ্টায় বাংলা গদ্য ক্রমশ সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহারের যোগ্যরূপ প্রাপ্ত হইল।"[২০]

পাদ্রী লঙ তত্ত্ববোধিনী সম্পর্কে বলেন : 'To those who wish to know what the expressiveness of the Bengali language mean we would recommend the persual of the Tattobodhini Patrika, a monthly publication in Bengali which yiedds to search any publication in India for the ability and originality of its articles.'[২১] তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকগোষ্ঠীর দুজন অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের নতুন রীতির প্রবর্তন করে গেছেন।

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : "বাঙ্গালা গদ্যের জটিলতা ঘুচাইয়া বাক্যে ভারসমতা ও ব্যবহারযোগ্যতা দিয়াছিলেন অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিলেন লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য্য যোগ করিয়া। বাঙ্গালা গদ্যের নাড়ী দেখিয়া তাহার ধাতুগত স্পন্দন প্রবাহ বা তাল ঠিকমত ধরিয়া সেই ভাবে বাক্য গঠন রীতি দেখাইয়া দিলেন বিদ্যাসাগর।"[২২]

অক্ষয়কুমারের গদ্য প্রসাদগুণ সম্পৃক্ত এবং অলঙ্কারবাহুল্য বর্জিত। সহজ কথা সহজে বলার দুঃসাধ্য ক্ষমতা তাঁর আয়ত্ত ছিল। অথচ কোথাও তাঁর ভাষার মধ্যে

চাপল্য ছিল না। এ ছাড়া অক্ষয়কুমার বাংলা বানানরীতিরও কিছু কিছু সংস্কার করেন ধনী মানী জ্ঞানী প্রভৃতি ইন ভাগান্ত শব্দ বাংলায় কেবল কর্তৃকারকের এক বচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত তদভিন্ন সর্বত্র হ্রস্ব ইকারান্ত হত। অক্ষয় দত্ত সে প্রয়োগ রহিত করে সকল বিভক্তি ও বচনে দীর্ঘ ঈকারান্ত লিখবার নিয়ম করেন।[২৩]

নীচে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের স্বাক্ষরিত একটি রচনার উদাহরণ দেওয়া হল :

"গভীর অরণ্য মধ্যে অকস্মাৎ যদি এক অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এরূপ অনুমান হয় না যে এই অট্টালিকা কোন ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ? অনন্তর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া যদি তাহার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা দ্বারা এরূপ জানা যায় যে অট্টালিকা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাহাতে মনুষ্যের বসতি যোগ্য সমুদয় বিষয় আছে, শয়নালয়, ভোজনালয়, বন্দনালয় প্রভৃতি যথাক্রমে উপযুক্তস্থানে অতি পরিপাটিরূপে রচিত হইয়াছে, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এরূপ চিন্তার উদয় হয় না যে এই ভবন অতি সুখের স্থান, এবং ইহার নির্ম্মাতা অতি নিপুণ ? তদ্রূপ এই আশ্চর্য্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার অন্তঃকরণে এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান না হয় যে এই জগতের এক রচনা কর্ত্তা আছেন। এবং যখন বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে এই বিশ্ব অনন্ত এবং যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট তখন কাহার মনে এরূপ বিশ্বাস না জন্মে যে জগদীশ্বর জ্ঞানে পরপূর্ণ এবং স্বভাবে অনন্ত।" অকুদ (১ অগ্রহায়ণ ১৭৬৫ শক)

তত্ত্ববোধিনীতে বিভিন্ন লেখকদের লেখা প্রকাশিত হলেও স্টাইল বা গদ্যরীতির মৌলিক তফাৎ খুব একটা দেখা যায় না। বিশেষ করে জ্ঞানগর্ভ লেখাগুলি ভার বর্জিত। যেমন :

"বাঁধ ব্যবহার পদ্ধতি উন্নত হওয়াতে রাজার উত্তমরূপ সংগ্রহ হইতেছে, কিন্তু বাঁধ সংস্থাপন জন্য যত ব্যয় হইয়াছে, ততদূর উপকার জন্মায় নাই ও যত সুশৃঙ্খলা মতে বাঁধ সমূহ ব্যবস্থিত করা যাইতে পারিত তাহাও হয় নাই। এমন অনেক বিস্তৃত ভূমি আছে যে বাঁধের অন্তর্গত করিলে অনায়াসে করিতে পারা যাইত, ও করিলেও ব্যয় অপেক্ষা রাজার আদায় দ্বারা সে ব্যয় পুবিয়া যাইত। অনেক স্থলে আবার এমন অকর্মণ্য ভূমি আছে যাহা অনেক ব্যয়ে নিরর্থক বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল, কিন্তু অতি নিম্ন বলিয়া বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়, সুতরাং কর্ষণ সম্ভাবনা নাই। (অগ্রহায়ণ ১৭৮৪ শক)

বাংলা গদ্যে পদলালিত্যের সুরঝঙ্কারের সঙ্গে হৃদয়াবেগের প্রথম প্রকাশ ঘটে তত্ত্ববোধিনীর গদ্যে। দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর এই গদ্যের স্রষ্টা।

দেবেন্দ্রনাথের একটি রচনা 'নিশীথের ব্রহ্মস্তোত্র' থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক :

'হে সর্ব্বশক্তিমৎ পরমাত্মন। প্রাতঃকালের সুমন্দ সমীরণে, মধ্যাহ্ন সময়ের উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণে তোমার মঙ্গল কিরণ বিকীর্ণ হইয়া যেমন মেদিনীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করত তোমার মহিমাকে মহীয়ান করিয়াছে, এই ঘোর নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর রজনীতেও

সেইরূপ তোমার যশঃ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক শোভা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতেছে। দিবসে যেরূপ ভূমণ্ডলস্থ জ্ঞানধর্ম্ম সমন্বিত কৃতজ্ঞ মানবমণ্ডলী হইতে তোমার স্মৃতিধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল সেইরূপ দ্বিপ্রহর রজনীতেও সংসারের চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ হইতে অনাহত গম্ভীর নিনাদে তোমার মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে।' (শ্রাবণ ১৭৮৪ শক)

এখানে দেবেন্দ্রনাথের ভাষার সালঙ্কার প্রয়োগ ও কাব্যধর্মিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পাশাপাশি তত্ত্ববোধিনীর ১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ পুস্তিকার উপসংহার ভাগের পুনর্মুদ্রণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক।

"ধন্যরে দেশাচার তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস ধর্ম্মের ধর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্রও বলিয়া গণ্য হইতেছে অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে হা ধর্ম্ম তোমার ধর্ম্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয় আর কিসে তোমার লোপ হয় তা তুমিই জান।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ভাষার এই সাহিত্যগুণকে বলেছেন 'কলানৈপুণ্য'। 'তিনিই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।'[১৪]

এই সুবিন্যস্ত ও সুপরিচ্ছন্ন গদ্য শুধু বিদ্যাসাগরের রচনায় নয় তত্ত্ববোধিনীর যাবতীয় রচনার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী যখন সগৌরবে সমাসীন তখন (১৮৫৪) একটি বাংলা সাময়িকপত্র সম্পূর্ণ নতুন ভাষাদর্শের সূত্রপাত করে পাঠকসমাজকে বিস্মিত করে তোলেন। এই পত্রিকাটি অতি ক্ষুদ্র কলেবর। নাম : মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : প্যারীচাঁদ মিত্র। রাধানাথ শিকদার পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব-কাল ১৮৫৫। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এই পত্রিকায় কিছুকাল ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। আলালের ভাষা পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও মাসিক পত্রিকার অন্যান্য রচনার ভাষা তত্ত্ববোধিনী যুগের গদ্য থেকে বিরাট ব্যতিক্রম।

মাসিক পত্রিকার ভাষা ঝরঝরে এবং সহজ সরল। স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা বলেই ভাষা এতখানি সহজবোধ্য করা হয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছিল 'যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)

ওপরের বাক্যগুলির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রচলিত গদ্যরীতির 'স্ত্রীলোকেদের' 'আমারদিগের, প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের সঙ্গে বহুবচন দিগ বিভক্তির পরিবর্তে তার আধুনিক প্রয়োগ ঘটেছে।

মাসিক পত্রিকায় সর্বপ্রথম কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করা হয়। প্যারীচাঁদ বাংলা গদ্যের মধ্যে যথাসম্ভব কথ্যভাষা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃতানুসারী গদ্যলেখকদের হাতে যে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হচ্ছিল সাধারণ মানুষ যে তার রসাস্বাদে অক্ষম তা প্যারীচাঁদ উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত বাংলা গদ্য পড়লে বাংলা কথ্যভাষার প্রয়োগরীতির পরিচয় পাওয়াও বিদেশীদের পক্ষে দুরূহ ছিল। একারণে আলালের ঘরের দুলালের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

"The work has been written in a simple style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge of the Bengali language."

সংবাদপত্রের ভাষাকে জনজীবনের ভাষার অনুবর্তী করার কৃতিত্ব সর্বপ্রথম ঈশ্বরগুপ্তের প্রাপ্য। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের মাত্র কিছু লেখায় ওই গদ্যরীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ মাসিকপত্রে এই নতুন গদ্যরীতিকে প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সমসাময়িক প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে সেটি ছিল সাময়িকপত্রের প্রচণ্ড বিদ্রোহ। কারণ মাসিক পত্রিকার এই রচনারীতি উত্তরকালের বাংলা গদ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তত্ত্ববোধিনী ও মাসিক পত্রিকা উভয়ের ভাষাদর্শের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র আবার নতুন ভাষাদর্শের সূচনা করেছিলেন। সেকথা যথাসময়ে আলোচিত হবে।

মাসিক পত্রিকার অন্যান্য রচনারীতিতেও আলালি ছাপ স্পষ্ট।

"যেমন রাগ হইলে লোকজনের ন্যায়, অন্যায় জ্ঞান থাকে না। তাহারা যে কথা কহে, কিম্বা যে কর্ম্ম করে, তা সকলি অসঙ্গত হয়। রাগ পড়িলেই বোধ হয় রাগের সময়ে যে কিছু করিয়াছিলাম, তাহা সমুদয় মন্দ হইয়াছে।" (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬)

"ব্রাহ্মদের মধ্যে কুলীনে মেয়ে দিলে যেমন বাপমার মুখ উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ স্পর্টাবাসিদের মধ্যে ছেলে লড়াইয়ে মরিলে বাপমার মুখ উজ্জ্বল হইত। এই নিমিত্তে ছেলে তখন লড়াইয়ে যাইত, মা আপনি তাহার হাতে ঢাল তলবার দিতেন। দিয়া বলিতেন—বাপু তুমি লড়াইয়ে যাও।" (জুন ১৮৫৭)

এই গদ্যরীতির যেটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেটি হল যথাসম্ভব সরল বাক্যরীতির প্রয়োগ সংক্ষিপ্ত বাক্য।

আলালের ঘরের দুলালের গদ্যরীতির পাশাপাশি তুলনা করলেই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে: "প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময় সেট বসাখ বাবুরা সওদাগরি করিতেন, কিন্তু কলিকাতার একজনও ইংরাজী

ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্তা ইশারা দ্বারা হইত। মনের স্বভাব এই যে চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে ২ কিছু ২ ইংরাজি কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল।" (আলালের ঘরের দুলাল, নং ৪)

"প্রভাত হইয়াছে—সূর্য্যের আভা ঝিলিমিলি দিয়া ঠক চাচার দাড়ির উপর পড়িয়াছে। বেলিগারদের জমাদার তাহার নিকট ঐ সকল কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—'বদজাত আব তলক শোয়া হেয়—উঠ, তোম আপনা বাত আপ জাহের কিয়া' ঠক চাচা অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া চকে নাকে ও দাড়িতে হাত বুলাইতে ২ তসবি পড়িতে লাগিলেন।" (ঐ, নং ২৬)

বাবুর উপাখ্যানে যে গদ্যরীতির সুরু, ঈশ্বর গুপ্তের মাধ্যমে যার বিকাশ আলালি ভাষার প্রবর্তনার মধ্য দিয়ে তার সার্থক রূপান্তর ঘটে। কিন্তু সমসাময়িক সংবাদপত্র কেউই আলালি ভাষাকে সাহিত্যের বা সংবাদপত্রের ভাষা বলে গ্রহণ করেন নি। বিবিধার্থ সংগ্রহ তো তত্ত্ববোধিনীর ভাষাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

"অপভ্রংশ মিশ্রিত প্রলিত ভাষা ভদ্র সমাজের কথোপকথনে সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাই এই পত্রের উপযুক্ত পরিচ্ছদ" বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৭৭৩ শকাব্দ, কার্ত্তিক, ১ম সংখ্যা)

সোমপ্রকাশও তত্ত্ববোধিনী ভাষাদর্শ গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ ভাষার ব্যাপারে কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন এবং যাবনিক প্রভাব থেকে বাংলা গদ্যকে তিনি সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী সোমপ্রকাশের এই বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

"সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালেই প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয় তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিত বটে, কিন্তু তাহা আলালি ভাষাতে লিখিত হইত, ইহা অগ্রে বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব। সেদিনের কথা আমাদের বেশ স্মরণ আছে। এ কাগজ কে বাহির কলিল, এ কাগজ কে বাহির করিল বলিয়া একটি রব উঠিয়া গেল। যেমন ভাষার লালিত্য, তেমনি বিষয় গাম্ভীর্য্য। সংবাদপত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক নূতন যুগ প্রকাশ পাইল।"[২৫]

সোমপ্রকাশের গদ্যও ছিল সাহিত্যরস-সম্পৃক্ত। যুক্তিতর্কের ভাষাকে সোমপ্রকাশ সরস ও হৃদয় গ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন। যেমন, ১২৭৩ সালের ৫ অগ্রহায়ণ একটি সম্পাদকীয়—'নবদলে ময়ূর সজ্জা'।

"গল্পে আছে, কাক ময়ূরের পক্ষ হইয়া ময়ূর সাজিয়াছিল, শেষে সে কাক ও ময়ূর উভয় দল হইতেই তাড়িত হয়। আমরা এক্ষণে সেই ময়ূর সজ্জা প্রত্যক্ষ করিতেছি নব্যদলের কতকগুলি অসার লোক ইংরাজী পড়িলাম সাহেব হইলাম মনে করিয়া সুরা ও সাহেব দ্রব্য ভোজে অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে এই ফল লাভ হইয়াছে, তাহারা হিন্দু ও ইংরাজ উভয় দলেরই অগ্রাহ্য হইয়াছেন।"

তীব্র আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে লেখা শ্লেষ বিদ্রূপ ও সমালোচনাপূর্ণ আরেকটি গদ্যের নমুনা :

'বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণ ভালরূপে লেখাপড়া জানেন বলিয়া অভিমান করেন। আমাদিগেরও এতদিন ঐ সংস্কার ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্য দেখিয়া এখন বিপরীত জ্ঞান জন্মিতেছে। মানুষের চরণরেণুলেহন এটি কি কৃতবিদ্যের এত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, আমরা অগ্রে তাহা জানিতাম না।' (১০ বৈশাখ ১২৫৫)

বাংলা গদ্যে যথাযথ ছেদ বা যতিচিহ্নের প্রবর্তন করে যান বিদ্যাসাগর কিন্তু তত্ত্ববোধিনী ছেদচিহ্ন ব্যবহার করলেও কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি যতিচিহ্নের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। 'মাসিক পত্রিকা'য় এই ছেদ বা যতির যথাযথ ব্যবহার হয়েছে। সংবাদপত্রের মধ্যে সোমপ্রকাশেই বিরামচিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ ঘটেছে। সোমপ্রকাশের মাধ্যমেই আধুনিক গদ্যরীতির সূত্রপাত ঘটে। সংবাদপত্রেও দীর্ঘ বাক্যের বদলে ছোট ছোট বাক্য লিখন পদ্ধতি চালু হয়।

কিন্তু দেশী ও তৎসম শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগকে সোমপ্রকাশ নিন্দা করেছেন। সোমপ্রকাশ ভাষার ক্ষেত্রে গুরুচণ্ডালী দোষকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। ১২৮০ সালের ২৪ ভাদ্র সোমপ্রকাশ প্রবন্ধ লিখেছিলেন : 'বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গ সমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা ?' এই প্রবন্ধে সোমপ্রকাশের মন্তব্য :

"বঙ্গদর্শন হইতে সমাজের কেবল যে এক রুচি বিপর্য্যয়রূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে, বাঙ্গালা ভাষা ও রচনা প্রণালীর মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদর্শন লেখকেরা ভাবেন, মুখে বলিয়াও থাকেন আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথোপকথন করি, ঐ ভাষা লেখাতেও যত প্রচলিত হইবে ততই ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু ওদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, দীর্ঘ সমাসাশ্রিত সংস্কৃত শব্দও তাহাদের নিকটে হতমান নহে। উভয়েরই সমান সম্মান আছে, কিন্তু কোন স্থলে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লেখকদিগের জানা নাই। তাহাতে বঙ্গদর্শনের লেখা এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। যদি সকলে এই লেখার অনুকরণ করেন বাঙ্গালা ভাষাটি অদ্ভুত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গদর্শন প্রসাদে বাঙ্গালা ভাষার যে অপূর্ব্ব আকার লাভের সম্ভাবনা করিতেছি, পাঠকগণ আমাদিগের প্রদর্শিত দুই-তিনটি উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই অনায়াসে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম এই যদি চলিত শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলেই ভাষার শোভা হইয়া থাকে। আর যদি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়, পূর্ব্বাপর সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করাই উচিত। শব শব্দের পর দাহ শব্দ ও মড়া শব্দের পরে পোড়ান শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভাষার সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদিত হয়। কিন্তু আমরা যদি শব পোড়ান এবং মড়া দাহ এইরূপ প্রয়োগ করি, পাঠকগণ বস্তুত তাহা কেমন কৌতুকাবহ হইয়া ওঠে। এক গালে কালি দিলে, সেই দিব্যমূর্ত্তিটী দেখিতে যেমন সুন্দর হয়,

শব পোড়ান ও মড়া দাহ করিলে পাঠকগণ শুনিতে কি সেইরূপ মধুর হয় না? বঙ্গদর্শনের লেখকগণ মাতৃভাষাকে এই দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন।" (সোমপ্রকাশ, ২৪ ভাদ্র ১২৮০)

সোমপ্রকাশ যখন এই মন্তব্য লিখেছিলেন তার আগেই 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' (১৮৬২) প্রকাশিত হয়েছিল। একদিকে আলালি হুতোমি ভাষা, অন্যদিকে সংস্কৃতানুসারী ভাষা—এই উভয়ের টানাপোড়েনে সারস্বতসমাজ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমি ভাষার নিন্দা করলেও তিনি সংস্কৃতপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে স্বতন্ত্র ভাষাদর্শ সৃষ্টি করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী জনমানস এই ঘূর্ণাবর্তের মাঝে প্রকৃত ভাষাদর্শ কী হবে তা নির্ধারণের জন্য একটি অ্যাকাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন।[২৬]

আলালি ও হুতোমি ভাষাকে যতই নিন্দা করা হোক না কেন তার মার্জিত প্রয়োগ কিন্তু বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও কমলা-কান্তের দপ্তরে এ ভাষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এই রীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে সংবাদপত্র সাময়িকপত্রেই সুরু হয় সেকথা বলেছি। সত্তর দশকের একটি সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচারে' এই রীতিরই আবার নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়। সিরিয়াস বক্তব্যের ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী শব্দের যদৃচ্ছ প্রয়োগ যে শ্রুতিমধুর হানি ঘটায় না বরং বক্তব্যকে আরও জোরদার করে তোলে সুলভ সমাচারই তার প্রমাণ। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১। "আমাদের দেশে অনেকে লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা মূর্খদের ন্যায় কত অর্থবিহীন আচার-ব্যবহারে যোগ দিয়া থাকেন। কলেজের একজন টেক্কা জলপানি পাওয়া ছেলে টিকটিকির ডাক শুনলে কিম্বা হাঁচি পড়লে আর বাটীর বাহির হইবে না, যে সকল বিদ্বান, মাথা বাঁকা বাবুরা দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান তাঁহারাও দক্ষিণ মুখ হয়ে আহার করেন না এবং আহার করিতে করিতে হাঁচি হলে নড়িয়া বসেন। যিনি বুট পরে হুটমুট করিয়া বেড়ান এবং প্রতিদিন উইলসেনের হোটেলে ভগবতীর শ্রাদ্ধ করেন, তিনিও আকাশ হইতে তারা পড়িতে দেখিলে সাতটী ফল ও সাতজন ব্রাহ্মণের নাম করিবেন।" (১৫ চৈত্র, ১২৭৭) সুঃ সঃ

২। "এখন আমরা কুটীর পানসীওয়ালাদের বলি আর ভাই, তোমরা আপন আপন পন্থা দেখ, সবে বৎসরটাক আছে বইতো নয়, আর কেন তোমরা ৫ জনে আমাদিগকে টানাটানি হ্যাঁচড়া হেঁচড়ি করিয়া নৌকায় তোল। আমাদের নড়াটা যদি এই কয়দিন বাঁচিয়া রাখ তবেই দেখ আমরা মরণের ভয় হইতে বাঁচিয়া গেলাম। তেঠেহে বাঙ্গালে ডিঙ্গিওয়ালাদেরও আমরা দুই একটা ছেলাম করি ভাই তোমারাও আপন আপন দেশে লাঙ্গল চালাইবার পথ দেখ। একে একে সকলেই সরিয়া পড়, কেন ভাই মাঝখানে ভরাডুবি করিয়া আমাদের বড় পুল দেখার পথ বন্ধ করিয়া দিবে? আর ভাই হালে পানি পালাম না। তোমরা এখন লাঙ্গল চষে ধান সস্তা করিয়া

দেও, তাহা হইলেই আমরা একমুখে তোমাদের গুণ গাইব : মাণিকরাজ, তুমি এই বেলা দিকত বলে ভাল করিয়া চরবি দিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাতায়াত করে কিছু রোজগার করিয়া লও, মানইতো পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য কেহই আসে নাই।" (সুলভ সমাচার, ২৭শে বৈশাখ, ১২৭৮)

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের পরিপূর্ণতা বঙ্গদর্শনে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন কলকাতা ভবানীপুরের ১নং পিপুলপটী লেন থেকে সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন : "এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও কামনায় সমর্পণ করিলাম যে তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।" বঙ্গদর্শন প্রকাশের আগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাদর্শের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর থেকে বহুদূরবর্তী নন। কিন্তু গদ্যেরও যে কাব্যের মত ছন্দ থাকে এবং সেই ছন্দের নূপুর নিক্কণে পাঠকচিত্তে যে দোলা জাগতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রই তা দেখিয়ে দেন। এক কথায় তাঁর হাতে বাংলা গদ্য পরিপূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি হয় ড: সুকুমার সেন লিখেছেন : "বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত সুললিত গদ্য ভঙ্গিতে নমনীয়তা ও সরসতা সঞ্চার করাইয়া বঙ্কিম সাধুভাষার গদ্যকে সকল বিষয়, ভাব এবং রসের বাহন করিয়া তুলিলেন। মুখের ভাষা এবং মনের কথার মধ্যে আর বেশি ব্যবধান রহিল না"[২৭]

বঙ্কিমচন্দ্রও ভাষাকে সহজবোধ্য করতে চেয়েছিলেন। "যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত ততই গ্রন্থের সফলতা।"[২৮]

প্রয়োজন বোধে তিনি সংস্কৃতশব্দ বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেখানে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আছে সেখানে তিনি অপ্রচলিত সংস্কৃতশব্দ গ্রহণ যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। আবার রুচিবিগর্হিত বলে হুতোমি ভাষা তিনি পছন্দ করেন নি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি আলালি ভাষাদর্শ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন : "টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর, হাস্য ও করুণ রসের ইহা বিশেষ উপযোগী, স্কচ কবি বার্ণস হাস্য ও করুণ রসাত্মক কবিতায় স্কচ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরাজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এই ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।"[২৯]

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লঘু ও গুরু দুরকম ভাষাই প্রয়োগ করে গিয়েছেন। তাঁর গম্ভীর ভাবের অথচ মাধুর্যময় ভাষা-ভঙ্গির প্রকাশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উপন্যাসে, সিরিয়াস প্রবন্ধে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিতে। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত সম্পাদকীয় রচনাটি থেকে কিছুটা উল্লেখ করছি।

"এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেন না, তাহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। ভরসা করি বোর্ডের মণি সাহেব এবারকার আবকারি রিপোর্ট লিখিবার সময়ে এই জলপান কথাটা মনে রাখিবেন।" (১২৭৯ বৈশাখ, বঙ্গদর্শন)

বাংলা সংবাদপত্রে লঘুগুরু ভাষার সংমিশ্রণে লিখিত এই সম্পাদকীয় রচনাপদ্ধতি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন দিকনির্ণয় করেছিল। চলতি রীতিতে লেখা হলেও প্রায় শতবর্ষ পরে বাংলা সংবাদপত্রের একজন বিশিষ্ট কলম লেখক সাংবাদিকের হাতে এক গদ্যরীতিরই সুনিপুণ প্রয়োগ দেখতে পাই।

"আমাদের বড়ো অভিমান আমাদের বিদ্বানরা সর্ব্বত্র পূজা পান না। এই দেখুন না, সেই কবে উনিশ শো তেরো সালে, সায়েবরা এদেশের কপালে একবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ ঠেকিয়েছিল। নোবেল কমিটির চেয়ারম্যানের নান্দীমুখ ভাষণে ছিল 'দ্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পোয়েট রবীন্দ্রনাথ টেগোর' এই অফিসিয়াল বয়ানটি ক'জনের নজরে পড়েছে? তার পর এক চোখে ছোটলোক কিনা আর ওরা এ মুখ হল না।"[৩০]

বঙ্কিমের কমলাকান্তের ভাষা যা বঙ্গদর্শনের পাতায় প্রকাশিত হয়ে বিপুল সাড়া জাগায় তার প্রভাবও বাংলা সাহিত্যে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

"বঙ্কিমের মৃত্যুর পর কমলাকান্তের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে এবং ঢঙ চরিত্র অনুকরণ হয়। বঙ্কিমপার্ষদ রাজকৃষ্ণ অক্ষয়চন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানাঙ্কুরে' যাহা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'প্রবাসী'র প্রথম-দ্বিতীয় বৎসরে (১৩০৮-৯) তাহা কৃতিত্বের সহিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই কমলাকান্তী ঢঙের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। পরে চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ও এই ঢঙে লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গকৌতুকে ('কি লিখিব প্রবন্ধের অনুকরণে) এবং চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' (একা প্রবন্ধের অনুকরণে) কমলাকান্তী ঢঙ ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশে যাঁহারাই ব্যঙ্গ ও রসিকতার বেসাতি করিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই কমলাকান্তের নিকট অল্পবিস্তর ঋণ স্বীকার করিতে হইয়াছে।"[৩১]

কিন্তু বঙ্গদর্শনের এই ভাষারীতি যে বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সোমপ্রকাশের পূর্বলিখিত মন্তব্যের দ্বারাই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া মাত্র সোমপ্রকাশে কয়েকখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। তাতে বিভিন্ন পত্রলেখক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গদর্শনের সমালোচনা করেন।

১১ বৈশাখ ১২৭৯ তারিখে সোমপ্রকাশে জনৈক নামহীন পত্রলেখক বঙ্গদর্শনের শব্দ-প্রয়োগ রীতির সমালোচনা করেছেন। 'বিবরিত' 'সাবধানী' 'একেবারে কেবলমাত্র' 'সরলতা চমৎকার' 'পদ্মপলাশ নয়নী' 'শ্যামাঙ্গিনী' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগের মধ্যে ব্যাকরণ-গত ভুল ধরেছেন। এছাড়া বর্ণবিন্যাস দোষেরও পত্রলেখক সমালোচনা করেন। অবশ্য ১২৮০ সালের ৩ ভাদ্রের সোমপ্রকাশে আর একজন পত্রলেখক ওই চিঠির জবাব দেন।

১০ ভাদ্র ১২৮০ পুনরায় বঙ্গদর্শনের বিরুদ্ধে আর একট চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রলেখক কতকগুলি ইংরাজি শব্দ হুবহু বাংলায় ব্যবহার করার প্রতিবাদ করেন। এমন কি কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মুখে 'কস্তং মামনুসর' সংস্কৃত বসানোও নিন্দিত হয়েছে।

এই সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের ফলে বাংলা গদ্যের অ্যাকাডেমিক দিকটি সম্পর্কে পাঠক-সমাজের মধ্যেও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত নানান বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যের রূপরেখাটিও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

বাংলা গদ্যরীতিতে যে চলিত ভাষার অবতারণা এবং যে ভাষা বর্তমান যুগে বাংলা সাহিত্যের প্রায় একমাত্র মাধ্যম বলে স্বীকৃত তার প্রকাশ ঘটেও বাংলা সাময়িকপত্রে। পত্রিকাটির নাম 'ভারতী'।

এই ভারতীর পাতাতেই হুতোমের চলিত ভাষা স্ল্যাং বর্জিত হয়ে মার্জিত রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই চলতি ভাষায় প্রথম লেখা স্থুরু করলেন রবীন্দ্রনাথ। 'য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' লেখাটি চিঠিপত্রের আকারে তাই পাঠকের মনের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে লেখা—বৈঠকি মেজাজে কথোপকথনের ঢঙে লেখা গদ্যের আবির্ভাব ঘটল বাংলা সাময়িকপত্রে।

"সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে কোরে কাটিয়েছি, তা আমিই জানি। 'সমুদ্র পীড়া' কাকে বলে অবশ্যি জান, কিন্তু কি রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পোড়েছিলেম সে কথা বিস্তারিত কোরে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে। ৬টা দিন মশায়, শয্যা থেকে উঠিনি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোট, পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারিদিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্যম্পশ্য রূপ ও অবায়ুস্পর্শ দেহ হোয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র॥" (ভারতী, বৈশাখ ১২৮৬)

সমাচার দর্পণের যুগ থেকে ভারতীর যুগে উত্তরণ মাত্র ৬০ বছরের ইতিহাস। ভাষার ইতিহাসে মাত্র ষাট বছরের মধ্যে এই বিস্ময়কর রূপান্তর নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক ঘটনা।

সাহিত্য

বাংলা গদ্য বিবর্ধনে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের দানের কথা উল্লেখ করা হল। এবার আমরা দেখাব বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র কীভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেছে।

সাহিত্যের সঙ্গে পত্র-পত্রিকার সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ পত্রিকাই হল এযুগের সাহিত্যপ্রকাশের বাহন। একারণে সাহিত্য সব দেশেই কমবেশী পরিমাণে সাময়িকপত্র-নির্ভর। ইংলণ্ডেও চার্লস ল্যাম্ব তাঁর 'এসেস অব এলিয়া', ডি কুইন্সি তাঁর 'কনফেসন্স অব ওপিয়াম ইটার' এবং হুড, হ্যাজলিট ও মিস মিটফোরড তাঁদের বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি লণ্ডন ম্যাগাজিনেই প্রথম লেখেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কবি ও সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সাময়িক পত্রিকা বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে। যেহেতু বাঙ্গালীর নবজাগরণ মূলতঃ সাহিত্যনির্ভর সেহেতু এই সমস্ত কবি ও সাহিত্যস্রষ্টাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলা সংবাদপত্র নবজাগরণের যজ্ঞানলেই পূর্ণাহুতি দিয়েছে।

বাংলা সংবাদপত্রে প্রথম সাহিত্যধর্মী রচনা 'বাবুর উপাখ্যান' প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়। 'সাহিত্য পরিষৎ' গ্রন্থাগারের সমাচার দর্পণের যে ফাইল আছে তাতে দুই কিস্তিতে প্রকাশিত বাবুর উপাখ্যান পাওয়া যাবে। ১৮২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম কিস্তিটি প্রকাশিত হয়। উপাখ্যানের আগে লেখা ছিল : 'এই উপাখ্যান প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইয়াছিলেন অতএব ছাপান গেল।'

এতে বোঝা যায় যে লেখক তাঁর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। বাবুর উপাখ্যানে তৎকালীন হঠাৎ বড়লোক সম্প্রদায়ের অলস কর্মহীন জীবনযাত্রার প্রতি যে তীব্র ব্যাঙ্গোক্তি আছে তার ফলে স্বভাবতই লেখকের আশঙ্কা ছিল যে স্বনামে রচনাটি প্রকাশিত হলে লেখকের বিপদ আছে। বাবুর উপাখ্যানের রচয়িতা হিসাবে অনেকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করেন। কারণ ১৮২৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত নববাবুর বিলাসের সঙ্গে বাবুর উপাখ্যানের কাহিনীগত মিল আছে। কিন্তু বাবুর উপাখ্যান ও নববাবুর বিলাস এক গ্রন্থ নয়। নববাবুর বিলাসেও ভবানী-চরণের নাম ছিল না। যদিও গ্রন্থটি সমাচার চন্দ্রিকার ছাপাখানা থেকে ছাপা হয়েছিল। বাবুর উপাখ্যান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে বিশেষভাবে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ সমসাময়িক ইংরাজি পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'তে এই গ্রন্থের প্রশংসা করে দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি 'দি অ্যামিউজমেণ্ট অফ দি মডার্নবাবু, 'এ ওয়ার্ক ইন দি বেঙ্গলী' নামক প্রবন্ধে লেখেন :

"The work from which we are about to give a few extracts, was published a short time ago in Calcutta from one of the native

presses. It is a satirical view of the education and habits of the rich, and more especially of those families which have very recently acquired wealth and risen into notice. The character of the work, as well as its allusions and smiles, are purely native, and this imparts a value to it superior to that which could be attached to a similar represntation from a European pen. The knowledge of the author respecting the subject he handles must necessarily be more correct than that which a foreigner could acquire, and his descriptions may therefore be received with great confidence. Though the work is highly statirical, and though some of its strokes of ridicule may be too deeply touched, we cannot venture to pronounce it a caricature. Every opportunity we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in its justness. The humour of the work, however is sometimes too broad, its different parts are not invariably in good keeping with each other ; its episodes are occasionally dull and languid, and his poetry often inharmonious as well as prosing ; but with all its defects, it is a valuable document ; it illustrates the habits and economy of rich native families, and affords as a glance behind the scenes.

The Work opens with a pompous eulogium on company, dressed out in all the trappings of eastern hyperbole.

The last two chapters of the work detail the licentious progress and eventual fail of the young baboo. They describe how the flatterer contrived to intoxicate him with pleasure, and to plunge him into debt—how he was constrained to pawn his wife's jewels and to dispose of the articles of luxury he had purchased at less than half their value—how his creditors pressed on him, and finally lodged him in the great jail—how his father released him by sacrificing a great portion of his fortune—how the once-famed baboo, on his liberation from the house of bondage, courted the Society of his former associates and was repulsed—how he sunk into contempt—and how bitterly he lamented his former course, which lamentation is given in the last page quite

in doggrel rhyme. In all this however, there is nothing peculiarly characteristic of the habits and manners of the natives. It is the simple progress of rake, another version of Hogarth's vivid representation. It is such a course as is exhibited in all countries where money is plentiful, and the restraints of conscience or of society, lax. It would not therefore have answered out purpose to swell this article by translating them. We therefore dismiss the work, and intreat the readers indulgence for a very few desultory remarks suggested by its perusal and the view of native Society which it presents.

The author has prudently concealed his name, and ostensibly limited the application of his remarks to families who have recently obtained wealth through channels far from respectable. But they will bear a more extensive application. The domestic scenes he has described, as far as they relate to the vicious education of the Baboos, are equally true of families over whose origin time has begun to draw the veil. The dons are not in general better educated in India becuase the family is more ancient; the tutors may indeed be more respectable, but the proces of education is equally inefficient. (The Amusements of the Modern Baboo, A work in Bengalee, printed in Calcutta. The Friend of India. Quarterly series. No XIII 1825. pp. 289 and 302 303.)

নববাবুর বিলাস পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাঙালীর প্রথম মৌলিক গদ্যসাহিত্য সৃষ্টি এবং রূপান্তরিত অবস্থায় গ্রন্থাকারে পুস্তকটি প্রকাশের আগে সংবাদপত্রেই তার প্রকাশ ঘটে।

সমাচার দর্পণের পাতায় প্রকাশিত বাবুর উপাখ্যানের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ সালে প্রকাশিত প্রথম কিস্তির অংশ:

"অমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে একজন অতি বড় ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, চক্রবর্ত্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমিদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড় ২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

পরে এক চন্দ্রতুল্য পুত্র জন্মিল। তাবৎ সংসারে আহ্লাদের সীমা নাই দেওয়ান স্ত্রীর পুত্র হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হওত যথেষ্ট দানাদি করিলেন ও বাটীতে টিকটিকীর নাচ ও ভেকের গান ইত্যাদি মঙ্গল কর্ম্ম করাইলেন।

এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন বাক শক্তি হইল তিলকচন্দ্র সকলকেই কটু বাক্য কহেন ও মারেন তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু কোন অধর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন তিলকচন্দ্র নামকে ওল্লেখ করে।

অনন্তর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন কেহ কর্ত্তা বলে কেহ ২ বাবু কেহ কর্ত্তা বাবু বড় লোক কতকগুলি নির্দ্ধন দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে।

এখানে ওমেদয়ার মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতকক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবুর ওত্তম মছনন্দে আসিয়া বসিলেন ও প্রথামত আলাপ করিলেন যে অদ্য বড় ক্লেশ হইয়াছে দরবার হইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীড়া হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। বিষয়কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না।”

বাবুর উপাখ্যান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয় ১৮২১ সালের ২রা জুন। কাহিনী আরম্ভের আগে লেখা হয়ঃ

বাবুর উপাখ্যান যাহা পূর্ব ছাপান গিয়াছিল তাহার পরিচ্ছেদ তিনি পুনর্বার পাঠাইয়াছেন,—

“বাবু লেখাপড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যানিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও সকল করা হইয়াছে। এইক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্ম্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল বিশেষ দেখ। বাবু আপনি চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ার সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এইক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব।”

সমাচার দর্পণ বাংলা সংবাদপত্রে কবিতা প্রকাশেরও সূত্রপাত করে যান। সাময়িক পত্রিকার কথা বাদ দিলেও শুধু সংবাদপত্রে কবিতা প্রকাশ বাংলা সংবাদপত্রের পক্ষে পরবর্তী কালে একটি রীতি হয়েই দাঁড়ায়। সংবাদ প্রভাকরে তো কবিতাকে রীতিমত প্রাধান্য দেওয়া হত। সম্বাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট ও অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা প্রকাশিত হত।

সমাচার দর্পণে অবশ্য কবিতার প্রকাশ নিয়মিত ছিল না। ১৮১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি একটি নামহীন পয়ার চোখে পড়ে।

তোমার স্বভাব সিদ্ধ শীতলতা গুণ।
নির্মলতা তোমার যে স্বভাবে অন্যূন ॥
পবিত্রতা তব সে বাক্যের অগোচর।
তোমা স্পর্শ করিলে পবিত্র হয় নর ॥
কি স্তুতি করিব জল জীবের জীবন।
তুমি নীচগামী হইলে কে করে বারণ ॥[৩২]

বাংলা সাহিত্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সিরিয়াস সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয় সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে।

ঈশ্বরগুপ্ত মূলত কবি, কিন্তু তাঁর কবিকৃতি কোথাও নৈর্ব্যক্তিক সাংবাদিক দৃষ্টির পরিপন্থী হয়নি। বরং তাঁর সাংবাদিকসুলভ তির্যক দৃষ্টি ভঙ্গি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। সংবাদের বিষয়কে তিনি কবিতার বিষয়ে উত্তীর্ণ করেছেন। দ্বিতীয়ত তাঁর বড় পরিচয় তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে গিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী কালে আমরা যে সাময়িকপত্র-নির্ভর সাহিত্যিকগোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ দেখতে পাই সংবাদ প্রভাকরেই তার সূচনা হয়।

বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী সাহিত্যিকদের জন্য ঈশ্বরগুপ্ত যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যান কালে তা শস্যশালিনী হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বরগুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তাকর্তা-বিধাতা ছিলেন।"[৩৩]

প্রভাকরের লেখকগোষ্ঠীতে সে যুগের দিকপাল গদ্যলেখকদের প্রায় সকলেই ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাকরের লেখকগোষ্ঠীর যে তালিকা দেন তার মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্মদাস পালিত, কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

১২৬০ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ থেকে সংবাদ প্রভাকরের মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মাসিক প্রভাকর মূলত সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত হয়। ১২৬০ সালের ১ পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্ত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত ও পদাবলী প্রকাশ করেন। এর পরে ধারাবাহিকভাবে হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাই দাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েকজন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত ও পদাবলী

প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। ১২৬২ সালের ১ জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রের জীবনী ও তৎপ্রণীত লুপ্তপ্রায় কবিতা ও পদাবলী প্রকাশ করেন। বাংলা সাময়িক-পত্রে বাংলা সাহিত্য-সম্পর্কিত গবেষণামূলক নিবন্ধের সূত্রপাত ঈশ্বরগুপ্তই করে যান।

ঈশ্বরগুপ্তের বিখ্যাত খণ্ড কবিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।

নীচে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাবলীর একটি তালিকা দেওয়া গেল। তালিকাটি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহ করেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। ১২৯২ সালে ১০১ মসজিদবাড়ি ষ্ট্রিটের সংবাদ প্রভাকর প্রেস থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল।

১। সব হায় ফাঁক ২। সব ভরপুর ৩। কিছু কিছু নয় ৪। ঈশ্বরের করুণা ৫। সাম্য ৬। মায়া ৭। কাল ৮। শরীর অনিত্য ৯। রোজসই ১০। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই ১১। পরমার্থ ১২। সংগীত ১৩। প্রণাম তোমায় ১৪। তত্ত্ব ১৫। খল ও নিন্দুক ১৬। মিশনারি ১৭। বিষয়ে স্থন্দ নাই ১৮। নির্গুণ ঈশ্বর ১৯। শ্রীমদ্ভাগবত ২০। ইংরাজী নববর্ষ ২১। ছদ্ম মিশনরি ২২। বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুরক্তি ২৩। বড়দিন ২৪। নীলকর ২৫। দুর্ভিক্ষ ২৬। আচার ভ্রংশ ২৭। বাবাজান বুড়াশিবের স্তোত্র ২৮। বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব ২৯। বর্ষার বিক্রম বিস্তার ৩০। বর্ষার ধুমধাম ৩১। সুবৃষ্টি ৩২। বর্ষার আবির্ভাব ৩৩। বর্ষার অভিষেক ৩৪। বর্ষায় লোকের অবস্থা ৩৫। বর্ষার ঝড়বৃষ্টি ৩৬। শরদর্শন ৩৭। শরদে আগমনে লোকের অবস্থা বর্ণন ৩৮। শারদীয় প্রভাত ৩৯। শীত ৪০। বসন্ত কর্ত্তৃক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে পুনরায় রাজ্যলাভ ৪১। বসন্ত বিরহ ৪২। শীক সংগ্রাম ৪৩। কাবুলের যুদ্ধ ৪৪। ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম ৪৫। কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা ৪৬। ভাব ও চিন্তা ৪৭। হাস্য ৪৮। কাল কন্যার সহিত বর্বরের বিবাহ ৪৯। গিরিরাজের প্রতি মেনকা ৫০। বর্ষার নদী ৫১। বাবু দ্বারকানাথ-মৃত্যু ৫২। প্রেম নৈরাশ্য ৫৩। প্রেম ৫৪। প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ৫৫। প্রণয় ৫৬। প্রণয়ের আশা ৫৭। বিলাতের টোরি ও হুইগ ৫৮। প্রভাতের পদ ৫৯। কবি ৬০। মাতৃভাষা ৬১। স্বদেশ।

সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতার চরণ লোকমুখে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল।

যতনে মিলায় বিধি—সব ভরপুর
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়—কিছু কিছু নয়।
মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার—খল ও নিন্দুক
তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো (নীলকর)
দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া (স্বদেশ)
এতভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা (পৌষ পার্ব্বণ)

আগেই বলেছি সংবাদ প্রভাকরের বড় কীর্তি প্রতিভা আবিষ্কার। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রমুখেরা ছাত্রাবস্থা থেকেই সংবাদ প্রভাকরে লিখতে থাকেন এবং প্রভাকরের তরুণ লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হন। ঈশ্বরগুপ্ত এই তরুণ কবিদের অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন। প্রভাকরে 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' নামে কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল।

সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ। ১৮৫৩ সালের সংবাদ প্রভাকরের কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কুড়ি টাকা পুরস্কার পান। কবিতাটির নাম 'কামিনীর প্রতি উক্তি তোমাতে লো ষড়ঋতু'। কবিতাটি ১৮৫৩ সালের ১৮ মার্চ সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। হুগলী কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য রচনা নিয়মিত সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হতে থাকে।

সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত বঙ্কিমের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা দেওয়া হল।

১। প্রথম চরণে স্ত্রীর উক্তি দ্বিতীয় চরণে পতির উত্তর	সংবাদ প্রভাকর, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৫২
২। জীবন ও সৌন্দর্য অনিত্য	প্রভাকর, ২৮ মে ১৮৫২
৩। হেমন্ত বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন	ঐ, ১০ জানুয়ারী ১৮৫৩
৪। শিশির বর্ণনাচ্ছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন	ঐ, ৫ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৩
৫। দূরদেশ গমনের বিদায়	ঐ, ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫৩
৬। কামিনীর প্রতি উক্তি	ঐ, ১৮ মার্চ ১৮৫৩
৭। চন্দ্রদূত	ঐ, ৩০ মার্চ ১৮৫৩
৮। বসন্তের নিকট বিদায়	ঐ, ২৮ এপ্রিল ১৮৫৩
৯। বিচিত্র নাটক	ঐ, ২৭ মে ১৮৫৩
১০। বর্ষা বর্ণনাচ্ছলে দম্পতির রসালাপ	ঐ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩
১১। বিষম বিচিত্র নাটক	ঐ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

এছাড়া ২০ এপ্রিল ১৮৫২ সালে সংবাদ প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ছোট গদ্যরচনা ও ১০ জুলাই ১৮৫২ বর্ষাঋতু নামে আর একটি ছোট রচনা প্রকাশিত হয়।

একথা ঠিক, সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত রচনাবলীর দ্বারা বঙ্কিম প্রতিভার পরিচয় লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্ত শুধুমাত্র সম্পাদকই ছিলেন না তিনি ছিলেন তরুণ সাহিত্যিকদের সাহিত্যগুরু। ঈশ্বরগুপ্ত তাঁদের লেখা প্রকাশ করে যেমন আত্মবিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তেমনি অন্যদিকে এই সব তরুণ লেখকদের লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন, কঠোর সমালোচনা করেছেন। এক কথায়

সংবাদ প্রভাকর সাহিত্যপ্রকাশ শুধু নয় সাহিত্য সৃষ্টির একটি সুশৃঙ্খল পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেকথা স্মরণ করেন :

"প্রভাকর বাঙ্গালা রচনারীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। আর একটি ধরন ছিল যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এসকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।"[৩৪]

দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস লিখেছেন :

শিষ্যেরা রচনা পাঠাইয়াছেন, গুরু উৎসাহসূচক টিপ্পনী সহযোগে তাহা প্রকাশ করিতেছন, কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন, এই রীতি এযুগে আর দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র এই উৎসাহ পাইয়াছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব, রংপুরের তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও কুণ্ডি পরগনার ভূস্বামী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল উৎসাহের মূলে ছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত, তিনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না; পথ দেখাইতেন। কথিত আছে, তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রকে পদ্য ছাড়িয়া গদ্য-রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন।"[৩৫]

বঙ্কিমচন্দ্রকে সুললিত গদ্য লিখবার জন্য পথনির্দেশ করেছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত। ১৮৫৩ সালের আগে পর্যন্ত বঙ্কিম গদ্যরচনায় অভিধানের ওপর নির্ভর করতেন। কঠিন কঠিন শব্দচয়নের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। যেমন :

'যে লপনেন্দু শত ২ শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃণ্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অনুরেণু অসি অনুমান হয় বায়স বায়সী নবা ঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক।'

সংবাদ প্রভাকর-সম্পাদক এই রচনারীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

'ইহার লিপি-নৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন। (বঙ্কিম)...রচনায় আর সমুদায় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন -।"

এই উপদেশ পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয়। দুর্গেশনন্দিনীতে স্বচ্ছ সাবলীন ও ঋজু গদ্য দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকেই নিজে অতিক্রম করেছেন। ভাষা শৈলীর এই দ্রুত রূপান্তরের পিছনে ঈশ্বরগুপ্তের প্রেরণা কাজ করেছিল।

"৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর, কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে।"

কিন্তু এর তেরো বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য লিখতেন এইভাবে :

"নিবিড় নীলাঙ্গিনি যমুনাপুলিনে শ্রীরাধা চাতকী নীরদ কদম্ব বিহারি শ্যাম শরীরোপরি তরলিত বিকচ বিমল বনমালা তুলিয়া নীলজলধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহর বিদারক ভীষয়াশনি নিনাদে ভুবন চমকিত হইতেছে, কাদম্বিনী বর্ষিত বারিবিন্দু বিশাল বেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে। বর্ষাঋতু : ১০ জুলাই ১৮৫২। সংবাদ প্রভাকর)

বঙ্কিমের মত দীনবন্ধু মিত্র ও সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্তের আবিষ্কার। হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় থেকেই দীনবন্ধু সংবাদ প্রভাকরে ও সংবাদ সাধুরঞ্জনে কবিতা লিখতেন। 'ছাত্রের রচনা' বলে তা প্রকাশিত হত। সংবাদ প্রভাকরের কালেজিয় কবিতা যুদ্ধে দীনবন্ধু অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৫০ সালের ৯ আগস্ট এই পর্যায়ে তাঁর প্রথম কবিতা 'চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই' সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, ১৭ নভেম্বর প্রকাশিত হয় 'হাতে হাতে পাপের ফল'।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : "আমি যতদূর জানি দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানব চরিত্র' নামক একটি কবিতা। ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদ সাধুরঞ্জন নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও বোধ হয়, ঈশ্বরগুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যতদিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, ততদিন উহাকে ত্যাগ করি নাই।"[৩৬] দীনবন্ধু এর পর থেকে সংবাদ প্রভাকরে মাঝে মাঝে কবিতা লিখতেন। "তাঁহার প্রণীত কবিতাসকল পাঠক সমাজে আদৃত হইত।"[৩৭]

১৮৫১ সালের ৫ জুন ও ১৮৫২ সালের ২৫ মে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে দীনবন্ধু 'জামাইষষ্ঠী' নামে সংবাদ প্রভাকরে দুটি কবিতা লেখেন।

কামিনী যামিনী সুখের কাহিনী
কহিয়া যাপন কর।
বদন মধুরা কেন কামুধরা
ঢাকিতেছে দিয়া কর॥
তব ওষ্ঠাধর জিনি ইন্দীবর
সুধার আধার জানি।
অন্তর চকোর চরিতার্থ মোর
কর, করি যোড় পাণি॥

(জামাইষষ্ঠী। সংবাদ প্রভাকর, ৫ জুন '৫১)

দ্বিতীয়বারের কবিতাটির কয়েকটি বিখ্যাত পংক্তি :

আইল সুখের ষষ্ঠী সুখ জষ্ঠি মাসে।
ধাইল জামাই সব শ্বশুর আবাসে॥
ফুটিল প্রেমের ফুল হৃদয় কাননে।
ছুটিল কামের তীর কামিনী আননে॥

জামাইষষ্ঠী কবিতাটি পাঠকসমাজে এত আদৃত হয়েছিল যে ১৮৫২ সালের ২৫ মে সংখ্যার সংবাদ প্রভাকর পুনর্মুদ্রিত করতে হয়।[৩৮]

সংবাদপত্রে প্রকাশিত দীনবন্ধুর বিভিন্ন রচনার মধ্যে 'বিজয় কামিনী' ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্যটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫২ সালের ২৫ মে সংবাদ প্রভাকরে কাব্যটি প্রকাশিত হয়। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত দীনবন্ধুর অন্যান্য উল্লেখ্য কবিতার একটি তালিকা দেওয়া হল।

১।	মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান	সংবাদ প্রভাকর, ২৬ জানুয়ারী ১৮৫২
২।	প্রভাত	বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৭৯
৩।	সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয় এবং কবিতা পরিমাণের দোষ	সংবাদ প্রভাকর, ২৫ মে ১৮৫৩
৪।	বিধবার বিবাহ	সংবাদ প্রভাকর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

দীনবন্ধু কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি। নাট্যকার হিসাবেই তাঁর প্রসিদ্ধি। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে তাঁর গুরু ঈশ্বরগুপ্তের অনুসারী ছিলেন। শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস এবং ছন্দ নির্বাচনে তিনি ঈশ্বরগুপ্তকেই বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন।

কিন্তু সংবাদপত্রে সাময়িক বিষয়ের ওপর প্রকাশিত বিশেষ করে হালকারসের কবিতাগুলি পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। আর একদিকে যুগসন্ধির কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন :

"সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণদলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ, দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।"[৩৯]

ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন পুরাতন যুগের শেষ কবি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতার একটি যুগের অবসান ঘটে। এরপরে বাংলা কবিতায় নবযুগের সূচনা। এ যুগের কবিরা অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন ইংরাজি কাব্যের রোমান্টিক জগৎ থেকে। এই নবযুগের পুরোধা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-৯৪)। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। কাব্যের মধ্য দিয়ে স্বদেশচিন্তা ও জাতীয়তাবোধ ঈশ্বরগুপ্তের খণ্ড-কবিতাবলীর মাধ্যমেই প্রথম আত্মপ্রকাশ

করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের উজ্জীবন ও পরাধীনতার গ্লানির বেদনা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানেই প্রথম প্রকাশিত হয়। এই স্বাদেশিকতার চেতনা নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের কবিতায় পরিপূর্ণতা লাভ করে।

রঙ্গলালের কবিপ্রতিভার আত্মপ্রকাশও সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং ঈশ্বরগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায়। পদ্মিনী উপাখ্যানের (১৮৫৮) ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখেছেন :

'বাঙ্গালা সমাচার' পত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ প্রকটন করিতে আরম্ভ করি।" এই সমাচার পত্রপুঞ্জের মধ্যে একটি যে সংবাদ প্রভাকর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৪১ সালের ১৪ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকরে ঈশ্বরগুপ্ত রঙ্গলালকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন : 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু।' অবশ্য সংবাদ প্রভাকরের অধিকাংশ কবিতার তলায় লেখকের নাম থাকত না এবং কাব্যরীতির দিক দিয়ে সব কবিতাই ঈশ্বরগুপ্তের স্টাইলের অনুসারী ছিল। কাজেই রচনারীতি দেখে বোঝারও খুব উপায় থাকত না।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন : "ঈশ্বরগুপ্তের বিশেষ স্নেহভাজন রঙ্গলাল সংবাদ প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন। রঙ্গলাল নিজেও একাধিক সাময়িকপত্রের সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। স্বসম্পাদিত 'সংবাদ রসসাগর'-এ (১৮৫০-৫৩) রঙ্গলালের গদ্য পদ্য রচনা প্রচুর বাহির হইল।"[৪০]

সংবাদ প্রভাকরের অন্যান্য কবিদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম কবিতা প্রভাকরে প্রকাশিত হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে যে কবিতা রচনার ব্যাপারে নানান পরামর্শ দিতেন তা কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন।[৪১]

ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাকরের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ওপর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন :

'আমি প্রভাকরের অনুকরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা (খণ্ড কবিতা) লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।'[৪২]

বস্তুত খণ্ড কবিতার মাধ্যমেই নবীনচন্দ্রের (১৮৪৭-১৯০৯) সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশ রঞ্জিনী' প্রথম ভাগ ২২টি খণ্ড কবিতার সংকলন। প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে।

বাংলা সাহিত্যে তত্ত্ববোধিনী ও এডুকেশন গেজেটকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার কিছুটা পরিচয় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। তত্ত্ববোধিনীর মাধ্যমে সেযুগে বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিকদের রচনা প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী মুখ্যত ধর্মপত্রিকা ছিল কিন্তু অক্ষয়বাবুর চেষ্টায় তত্ত্ববোধিনীতে সাহিত্য বিজ্ঞান ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে লেখা হয়েছিল।

অক্ষয় দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রবন্ধগুলি তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। ১৭৭১ সালের ২৮ চৈত্র সম্পাদক নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের অনুমতি চাওয়া হয়। তখন কমিটির সদস্য

রাধাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, শ্রীনাথ ঘোষ, সত্যচরণ শর্মনঃ প্রমুখেরা মিলে অনুমতি দেন।

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত বক্তৃতা তত্ত্ববোধিনীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত। এটি ১৮৬১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এডুকেশন গেজেটের মাধ্যমে হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার আত্মপ্রকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে। তরুণ নবীনচন্দ্র সেনকেও এডুকেশন গেজেট অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। নবীনচন্দ্র যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখন শিবনাথ শাস্ত্রীর আগ্রহে তিনি কোন একটি বিধবা কামিনীর প্রতি' নামে একটি কবিতা গেজেটে প্রকাশের জন্য পাঠান। কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সেসময় (১৮৬৬-১৮৬৮) গেজেটের সম্পাদক ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। তিনি আবার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। কবিতাটি পড়ে প্যারীচরণ নিজে নবীবচন্দ্রকে ডেকে বলেছিলেন: 'তোমার বেশ শক্তি আছে তুমি ইহার অনুশীলন কর। তুমি সর্বদা এডুকেশন গেজেটে লিখিবে।'[৪৩]

এডুকেশন গেজেটের গ্রন্থ সমালোচনার মানও খুব উঁচুদরের ছিল। এইসব গ্রন্থ সমালোচনা সাধারণ পাঠকদের মধ্যে সাহিত্য সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। আমরা এডুকেশন গেজেটে সম্পাদিত রাজনারায়ণ বসুর সেকাল আর একাল গ্রন্থের সমালোচনার নমুনা উদ্ধৃত করছি সমালোচনাটি ১৮৭৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়।

"সুপ্রসিদ্ধ নামা শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা। রাজনারায়ণ বাবুর প্রণীত পুস্তক মাত্রই অমরা বিশেষ মনোযোগ এবং আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকি। পুস্তকে তৎপ্রণেতার বিদ্যাবত্তা একাগ্রতা সরলতা ও অমায়িকতা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিভাত হইয়া আমাদিগকে প্রীত করিয়া থাকে। তাঁহার এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতেও আমরা সেই সকল কারণে যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিলাম।

রাজনারায়ণ বাবুর এই পুস্তকে অনেকগুলি কৌতুককণা একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ হাস্যোদ্রেক হয়। অনেকগুলি গুরুতর বিষয়েরও বিচার আছে মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে আঘাত করিয়া চিন্তাকে জাগরিত করিয়া দেয়। এবং সর্বত্র এমত একটি সূক্ষ্ম কিন্তু সুদৃঢ় আশার সূত্র গ্রথিত আছে যে তদ্দর্শনে মনের প্রফুল্লতা জন্মাইয়া দেয়। আমাদিগের বিবেচনায় এইটাই এই পুস্তকের সর্বপ্রধান গুণ। রাজনারায়ণ বাবু সেকালের সহিত একালের তুলনা করিতে গিয়া অনেক বিষয়েই যেমন প্রাচীন লোকে করিয়া থাকে সেকালকে একাল অপেক্ষা ভাল বলিয়াছেন। কিন্তু যতই বলুন, তাঁহার ভালবাসা যে সেকালের অপেক্ষা একালের প্রতিই অধিক তাঁহার চিহ্ন সমূহ প্রতিপদেই লক্ষিত হয়। এরূপ প্রাচীনতা আমাদিগের চক্ষে বিশেষ আদরণীয়। আমরাও ঐ প্রকার প্রাচীনদিগকে আপনাদিগের আদর্শ স্থানীয় করিতে চাই।

পুস্তক প্রণেতার সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলিলাম। কিন্তু এই পুস্তক এবং রাজনারায়ণ

বাবুর প্রণীত হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা নামক অপর পুস্তক সম্বন্ধে আমাদিগের আরও কিছু বক্তব্য আছে। এই দুইখানি পুস্তকেই আমাদিগের দেশীয় জনসমূহের অন্তঃকরণে একটি নূতন ভাবের সঞ্চার বুঝাইতেছে। তাঁহারা এতদিন শিক্ষাদাতা সাহেবদিগের অনুকরণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং চরমকাল মনে করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে অনুকরণটি একপ্রকার আত্মহত্যা। সেই তথ্যটি ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের অন্তঃকরণে জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। দেশকাল পাত্রভেদে যে তথ্যোপলব্ধির এবং তদনুযায়ী ব্যবহার প্রণালীর ভেদ হওয়া আবশ্যক, তাহা ক্রমশঃ হৃদ্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আড়েগেলা—যা সাহেবী তাই ভাল এমন মনেকরা, অবিধেয়—এই প্রতীতি জন্মিতেছে। রাজনারায়ণ বাবু স্বদেশীয়দিগের মনের এই গতিটি কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করিয়া দিয়া তাদের সম্বর্ধনের উপায় করিলেন। অতএব তিনি অবশ্যই আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন।"

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮) চারটি কাণ্ডে বিভক্ত কাব্যসংকলন। কবিতাগুলি ক্ষুদ্রাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় সোমপ্রকাশ পত্রিকায়। তাঁর দ্বিতীয় কার্য্য পুষ্পমালার কিছু কবিতাও সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশেরও উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল গ্রন্থ সমালোচনা। আমরা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত সেযুগের তিনটি বিখ্যাত পুস্তকের সমালোচনার উদাহরণ দিচ্ছি। এই তিনখানি গ্রন্থ হল : কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী ও দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্য।

১। মহাভারত অনুবাদ, ৫ বৈশাখ ১২৭৭, ২২ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ পুরাণসংগ্রহ নাম দিয়া মহাভারতের অনুবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রথমখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি এই খণ্ডে অনুক্রমণিকা অবধি করিয়া শকুন্তলার উপাখ্যান পর্যন্ত আছে। ইহার অনুবাদ মুদ্রণ ও প্রচারণ বিষয়ে কালীবাবুর বহুতর অর্থব্যয় হইয়াছে, ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া আমাদিগের যেরূপ সংস্কার জন্মিল তাহাতে আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি, অর্থব্যয় বৃথা হয় নাই। ইহা পাঠকগণের প্রীতি হইবে।

কালীপ্রসন্ন বাবু সমুদয় মহাভারত অনুবাদ সংকল্প করিয়াছেন, এই সঙ্কল্প অতিশয় প্রশংসনীয় এতদ্বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পরিলে তিনিই যে কেবল যশস্বী হইবেন এরূপ নহে, দেশেরও বিশিষ্ট উপকার করা হইবে। মহাভারত পাঠে দণ্ডনীতি ধর্মনীতি শিল্প বাণিজ্যাদি ঘটিত নানা বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের দিন দিন অল্পতা দৃষ্টিগোচর হওয়াতে সেই জ্ঞানলাভের ব্যাঘাত উপস্থিত দেখা যাইতেছে। এ সময়ে মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদিত মহোপকারের নিমিত্ত সন্দেহ নাই, এ সময়ে মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইলে বাঙ্গালা দেশীয়েরা সেই অনুবাদরূপে উপায় দ্বারা উল্লিখিত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবেন। বিশেষতঃ ঐ অনুবাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিষয়ে পরিশেষ উপযোগিতা আছে।

আমরা কালীপ্রসন্ন বাবুর এই সৎক্রিয়ানুষ্ঠান প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদিগের দেশীয় যে-সকল ভাগ্যবান লোক অলস ও ব্যসনাসক্ত হইয়া অনর্থক অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া স্বজন্মভূমির দুর্নাম ক্রয় করিতেছেন, তাঁহারা যদি তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া স্বদেশের ক্ষেমঙ্কর কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন স্বল্পকাল মধ্যে বঙ্গদেশের সবিশেষ উন্নতিলাভ হইতে পারে। আমরা তাঁহাদিগের অনুরোধ করিতেছি. তাঁহারা কালীপ্রসন্ন বাবুর এই সৎধীয়সী প্রবৃত্তিকে আদর্শ করুন।

২। দুর্গেশনন্দিনী, ১৩ বৈশাখ ১২৭২, ২৩ সংখ্যা।

এখানি ইতিহাসমূলক উপন্যাস, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ. ইহার রচনা করিয়াছেন, পাঠকগণ গ্রন্থের নামটি দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

আমাদিগের মনেও প্রথমে কৌতুক জন্মিয়াছিল। নামটি শ্রুতিমধুর হয় নাই বটে কিন্তু বিলক্ষণ কৌতুকাবহ হইয়াছে। যদি আমরা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া না থাকি পাঠকগণকে এই অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে গড়নারায়ণ নামক দুর্গের ঈশ্বর বীরেন্দ্র সিংহ তাঁহার কন্যা তিলোত্তমা, তিনিই এই গ্রন্থের নায়িকা।

যাঁহারা আরব্যোপন্যাস পড়িয়াছেন আসিয়ার লোকের অদ্ভুত উপন্যাস রচনা শক্তি কেমন প্রবল, তাঁহারা তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

দুর্গেশনন্দিনী রচনাকার সেই শক্তিকে প্রতীচ্যদিগের প্রদর্শিত নৈসর্গিক রচনা-রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রস্তাবিত উপন্যাসের সবিশেষ মনোহরতা সম্পাদন করিয়াছেন।

মনোহর উপন্যাস পাঠ চিত্তকে যেরূপ আকর্ষণ করে দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগের চিত্তকে সেরূপ আকর্ষণ করিয়াছিল, আমরা ঔৎসুক্য সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

পাঠকালে অনেকস্থলে গ্রন্থকারের নায়ক নায়িকা প্রভৃতির রূপ বর্ণনাদি ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া আমাদিগের অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়াছে, সে স্থলে যে ব্যক্তিরা যে বস্তুর সদ্ভাব অথবা যেরূপ বর্ণনা আবশ্যক গ্রন্থকার তত্তৎ স্থানে যথোচিত রূপে সে সকলকে সন্নিবেশাদি করিয়াছেন। জগৎ সিংহের নায়কোচিত সাহসিকতা, উন্নতভাব, বিনয়, আয়েষার সৌজন্য ও বিমলার বুদ্ধিচাতুর্য দেখিয়া পাঠকগণের মন যেমন বিস্ময়ে ভক্তি ও কৌতুক প্রভাবে স্তিমিত হইবে, গজপতি দিগ্‌গজের কাপুরুষোচিত ব্যবহার দেখিয়া তেমনি অধৈর্য হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীও সমান জগৎ সিংহের প্রতি তাঁহাকে অনুরক্ত অনুমান করিয়া ঈর্ষান্বিত হন এবং নির্জন অরণ্যমধ্যে জগৎ সিংহকে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণবধে উদ্যত হন। জগৎ সিংহ পূর্ব উপকার স্মরণ পূর্ব্বক ক্ষমা করিয়া রজঃপুত জাতিসুলভ যে মহামনস্কতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসক ঔষধের সঙ্গে বিষপান করাইবেন এইপত্র পাইয়াও আলেকজাণ্ডার ঔষধ সেবন করিয়া যে মহামনস্কতার প্রকাশ করেন তাহা

অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। বিমলা বুদ্ধিকৌশলে দুরাত্মা কতলু খাঁর প্রাণবধ করিয়া যেরূপে স্বামিবধবৈর শোধ এবং আপনার ও তিলোত্তমার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে কে না বিস্মিত হইবেন।

শুক্ল কৃষ্ণ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, পরস্পর সন্নিহিত না হইলে পরস্পরের মহিমা ও শোভা বৃদ্ধি হয় না। আমরা অতঃপর দুর্গেশনন্দিনীর দোষগুলি পার্শ্বে সন্নিবেশিত করিতে চলিলাম :

এদেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণন করিবার যে একটি রোগ আছে, গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে স্থানে স্থানে এতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিঘ্নপাত হইয়াছে। ভাষাটীও ললিত ও সর্বজন হৃদয়গ্রাহিনী হয় নাই। যাহা হউক, যদি কেহ দুর্গেশনন্দিনীর গুণদোষের পরিমাণ করেন গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানি সুজাপুর অপর সরকিউলার রোড নং ৫৮।৫ বিদ্যারত যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

সুরধুনী কাব্য, ৩ আশ্বিন ১২৭৮, ৪৪ সংখ্যা।

সুরধুনী কাব্য, প্রথম ভাগ, শ্রীদীনবন্ধু মিত্র রায় বাহাদুর ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন. ভীষ্ম জননী জাহ্নবীর গোমুখী হইতে অবতারণানন্তর ত্রিবেণী পর্যন্ত আগমন পদ্যে বর্ণন করিয়া প্রথম ভাগের সমাপ্তি করা হইয়াছে। যে যে স্থান দিয়া গঙ্গা আসিয়াছেন সেই সেই স্থানের নাম, তাহার উৎপত্তি বিবরণ, নগরের ঐশ্বর্যাদি ও তদানুসঙ্গিক ইতিবৃত্ত তত্রত্য অধিবাসিদিগের আচার ব্যবহার এবং স্থানীয় বাণিজ্য প্রভৃতি অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য, বিষয় অতি সংক্ষেপে ও মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

গঙ্গার ও তৎপার্শ্ববর্তীস্থান বিশেষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে হিন্দু ধর্মান্ধ ব্যক্তিদিগের যে সকল কুসংস্কার আছে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ ও হেতু প্রদর্শন করিয়া সেগুলির অপনয়ন করা হইয়াছে, ফলতঃ ইহাতে ভূগোল ইতিহাস সাহিত্য ও পুরাণ প্রভৃতি বহু বিষয়ের একত্র সমাবেশ দ্বারা গ্রন্থকার স্বীয় বহুদর্শিতা কবিত্বশক্তি লিপিনৈপুণ্য ও ধর্মতত্ত্বানুসন্ধানত্বের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, দীনবন্ধু বাবুর এই সকল গুণ অপ্রসিদ্ধ নয়। তাঁহার কৃত নীলদর্পণ লীলাবতী সধবার একাদশী প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। সুরধুনী ইহার অন্যতর কাহার অপেক্ষা কোনো বিষয়ে ন্যূন, প্রত্যুত বিষয় বিশেষ ইহাতে গ্রন্থকারের অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে।

কবিতাগুলি মিষ্ট সুরস ও কোমল হইয়াছে।

বাংলা সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা কীভাবে বাংলার একজন বিখ্যাত কবিকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার প্রমাণ নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র নিজে স্বীকার করেছেন, অমৃতবাজার ও তার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের মধ্যে স্বদেশের জন্য যে আন্তরিক আকুতি তিনি দেখেছিলেন তা তাকে উত্তরকালে পলাশীর যুদ্ধ লিখতে অনুপ্রাণিত করে।

"শিশিরকুমার সম্পাদিত 'অমৃত বাজার পত্রিকা' শিক্ষিত মহলে স্বদেশ ভক্তির প্রেরণা সঞ্চারে যে কিরূপ সহায়ক হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন এ সম্পর্কে লিখিয়া গিয়াছেন: শিশির তখন মাতৃভূমির দুঃখের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছাসে উন্মত্ত হইতেন।…যশাহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও পলাশির যুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশ ভক্তির পথপ্রদর্শক।"[৪৪]

বাংলা সাহিত্যে অমৃতবাজারের আর একটি অবদান বিশিষ্ট স্যাটায়ারের সৃষ্টি। পরিশীলিত ও মার্জিত বিদ্রূপাত্মক কলম পরবর্তী কালে বহু সংবাদপত্রেরই মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই ধরনের কলমের সূচনা হয় অমৃতবাজারে এবং পরবর্তী কালের সাহিত্যিকদের তা অনুপ্রাণিত করে।

রসরাজ অমৃতলাল বসু লিখেছেন রসসাহিত্য রচনার জন্য তিনি অমৃতবাজারের কাছে ঋণী। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' প্রকাশিত হত। তেমন সরস comic titbits আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ।[৪৫]

১২৮১ সালের ১০ আষাঢ় অমৃতবাজার পত্রিকায় হেমচন্দ্রের দাঁত ভাঙ্গা কাব্য প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনাও আবাল্য সাময়িকপত্র-নির্ভর ছিল। নবজাতকের একটি কবিতায় কবি নিজেই বলেছেন:

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী,
এ অপরাধের জন্য যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।

এই ছাপা অর্থে কবি সাময়িক পত্রিকার কথাই বলতে চেয়েছেন। কারণ সাময়িকপত্রের তাগিদই রবীন্দ্রনাথকে অজস্র রচনা সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে ছাপার অক্ষরে সর্বপ্রথম যে কবিতাটি প্রকাশিত হয় তার নাম হিন্দুমেলার উপহার। এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের অমৃতবাজারে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৩ বছর ৮ মাস।[৪৬]

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীর লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: "হিন্দুমেলা স্থাপনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর; সুতরাং বাল্যকাল হইতে হিন্দুমেলার উচ্ছাস উৎসাহের সহিত বালকের নিবিড় পরিচয় হয়। ক্রমে কিশোর বয়সে তাঁহারও একদিন আহ্বান আসিল মেলার সাহিত্যক্ষেত্রে। মেলার নবম অধিবেশনে বালক কবি 'হিন্দুমেলার উপহার' লইয়া উপস্থিত হইলেন।

সভা বসে পার্সিবাগানে ; শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব সভার দ্বার উদ্ঘাটন করেন, সভাপতি হন রাজনারায়ণ বসু। বালক রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি আবৃত্তি করেন, তাহা কবিতা হিসাবে তুচ্ছ—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ভারতসঙ্গীত' কবিতার ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। হেমচন্দ্রের 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন ও বিপুলভবে' এই পদগুলি সেদিন বাঙালির মুখে মুখে শোনা যাইত। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম মুদ্রিত কবিতা হেমচন্দ্রের সুরে বাঁধা ও বিহারীলালের রঙে রঞ্জিত।"

হিন্দুমেলার উপহার কবিতাটির প্রথম চারটি স্তবক :

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল,
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত—চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর, কানন,
সাগর উরমি হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস ! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।"[৪৭]

এই ধরনের মোট ২২টি স্তবক ছিল কবিতায়।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয় ও বিকাশের একটি মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল। তবে যদিও সাময়িকপত্র আমাদের আলোচনার বিষয়ভুক্ত নয় তবু সাহিত্য প্রসঙ্গে সাময়িকপত্রের ভূমিকার কথা একটু উল্লেখ না করলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সাহিত্য প্রকাশই সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য। এখন এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়ে সে সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে আপন লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত

হতে পারে। সে লক্ষ্য হল শুধু সাহিত্য প্রকাশ নয়—সৎ-সাহিত্য প্রকাশ ও শক্তিশালী তরুণ লেখকদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটি নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের লক্ষণ যে বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে এই সাময়িক-পত্রিকাগুলি বহুবিধ সীমিত সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তিগুলি এই সাময়িক পত্রিকারই ফসল। শুধু তাই নয়, এই সাময়িকপত্রগুলি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কালের বহু কৃতী লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শিক্ষিতসমাজের মধ্যে সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। বাঙ্গালী পাঠকসমাজ আপনার সাহিত্য এবং সাহিত্যের মাধ্যমে নিজের দেশ জাতি ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করার পাঠ গ্রহণ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্কেচধর্মী উপন্যাস আলালের ঘরের দুলালের কিছু অংশ 'মাসিক পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহ মাসিক পত্রিকাটিতে মধুসূদনের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের (প্রথম প্রকাশ ১৮৬০) প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়।

বিবিধার্থ সংগ্রহে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সহজ সরল চিত্তাকর্ষক রচনা প্রকাশিত হত। বলাবাহুল্য এই ধরনের লেখা পাঠকের মনকে সাহিত্যপাঠে প্রবল আগ্রহী করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি-মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।'[৪৮]

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের সমালোচনা বিবিধার্থ সংগ্রহের ১৭৭৬ শকের ৩৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ সমালোচনাটি ২৫৩ পৃষ্ঠা থেকে ২৬১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

সমালোচনার শেষে সমালোচক মন্তব্য করেন : "বঙ্গভাষায় যে সকল রূপক প্রকটিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'ই বঙ্গভূমিতে অভিনীত হওয়ার উপযুক্ত, তাহার অভিনয় সাদৃশ মনোহর বিদ্যাবিনোদের মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাদৃশ সদ বিনোদ অধুনা বঙ্গভাষায় আছে, এমত কিছুই আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে না। প্রস্তাবিত নাটক পাঠেও প্রায়শ সকলেই পরিতুষ্ট হইবেন, অতএব আমরা মুক্তকণ্ঠে অনুরোধ করিতেছি যে পাঠকগণ সকলেই 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' আলোচনায় আনন্দ লাভ করুন।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র রহস্য সন্দর্ভ নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। রঙ্গলাল এই পত্রিকার লেখক ছিলেন।

রহস্য সন্দর্ভের ২ পর্বে ২১ খণ্ডে আলালের ঘরের দুলালের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

"রহস্য সন্দর্ভের পাঠকমণ্ডলী মধ্যে অল্প ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুরের নাম শ্রুত হয়েন নাই। তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' অনেকের ঘরে আলালের ঘরের দুলাল হইয়া বিরাজ করিতেছে, এবং তিনি একজন সুচতুর রহস্যব্যঞ্জক লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

আমাদের ঠাকুরজী ব্যঙ্গ লিখিতে সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম, অতএব ব্যঙ্গ বিষয়ক যে কথা লিপিবদ্ধ করেন তাহা অবশ্যই সর্ব্বত্রই আদরণীয় হয়, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি তাদৃশ সফলতা লাভ করিতে পারেন না। এই প্রযুক্তই আমরা তাঁহার নূতন গ্রন্থ যৎকিঞ্চিৎকে সম্যক বিবেচনা সিদ্ধ বলিতে পারিলাম না।"

রহস্য সন্দর্ভের এই সংখ্যায় দুর্গেশনন্দিনীর বিস্তৃত সমালোচনাও (৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত হয়েছিল।

"গ্রন্থকারের বর্ণনা শক্তি বিলক্ষণ বলবতী এবং যে কোন বিষয়ের আদর্শ শব্দে চিত্রিত করিয়াছেন তাহাই মনোজ্ঞ বোধ হয়। নায়িকার রূপ বর্ণনা গ্রন্থকারদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এতদ্দেশের নব্য প্রচলিত প্রথায় তিল কলা তাল বেল প্রভৃতি কতক ফলমূলের সমাহার করিলেই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, কেহই তাহার পরিবর্ত্তন করেন না। বঙ্কিমবাবু তাহার অন্যথায় কি পর্য্যন্ত সিদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত তিলোত্তমার রূপবর্ণনে প্রতীত হইবে।

"তাহার গ্রন্থখানি যে রসব্যঞ্জক ভাবদ্যোতক ও নূতন প্রণালীর আদর্শস্বরূপ হইয়াছে এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে সম্যক সাধুবাদ করিলাম।"

বাংলা গীতিকবিতার জগতে বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪) ছিলেন 'ভোরের পাখি'। বাংলা সাহিত্যে অন্তরঙ্গ গীতিকবিতার সূত্রপাত তাঁর মাধ্যমে। বিহারীলাল পূর্ণিমা (১৮৫৮-৫৯) পত্রিকার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। পূর্ণিমা বন্ধ হয়ে গেলে বিহারীলাল অবোধবন্ধু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। অবোধবন্ধু ক্ষুদ্রাকৃতি সাহিত্য পত্রিকা। এই পত্রিকায় বিহারীলালের প্রেম প্রবাহিনী (১৮৭০) সম্পূর্ণরূপে ও বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিহারীলালের কিছু খণ্ড-কবিতাও অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "বাল্যকালে আর একটি ছোটো কাগজের পরিচয়লাভ করিয়াছিলাম। তাহার নাম অবোধবন্ধু। ইহার আবাঁধা খণ্ডগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণ দিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল।"[৪৯]

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে অবোধবন্ধু সম্পর্কে আবার লিখেছিলেন : "বাঙ্গালাভাষায়

বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ সঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।"[১০]

বঙ্গসুন্দরী অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৬ সালের আশ্বিন থেকে ফাল্গুনে। বঙ্গসুন্দরীর মাধ্যমে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'সর্ব্বদাই হু হু করে মন
বিশ্ব যেন মরার মতন
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জলন্ত জ্বালা
অগ্নি কুণ্ডে পতঙ্গ পতন।'

বাংলা কাব্যে সেই প্রথম লিরিক ঝঙ্কার সুরু। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীর কিছু অংশ ১২৭৪-এর অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের কোন নাম ছিল না। অবোধবন্ধুতে কোন রচনাতেই লেখকের নাম থাকত না।

প্রেমপ্রবাহিনী প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ সাল থেকে ভাদ্র ১২৭৫ পর্যন্ত। সমুদ্র সন্দর্শন প্রকাশিত হয় ১২৭৫ সালের কার্তিকে।

এ কিরে প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার
অসীম আকাশ প্রায় নীল জলরাশি
ভয়ানক তোলপাড় করে অনিবার,
মুহূর্ত্তকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি।

অবোধবন্ধু প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭২ সালের ফাল্গুনে পকেট বইয়ের সাইজে। পরের সংখ্যা থেকে বড় আকারে প্রকাশিত হয়। অবোধবন্ধুর বার্ষিক মূল্য ছিল কলকাতায় ১ টাকা। মফস্বলে এক টাকা বারো আনা। প্রতি সংখ্যা দু আনা।

অবোধবন্ধু সম্পাদক দ্বিতীয় বর্ষের প্রথমে বিহারীলালের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন: '...এবং আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর জন্য এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাঁহাব নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিল।'

প্রথম সংখ্যায় বিহারীলাল লেখেন 'অশ্বত্থামা বিলাপ ও দুরাশা'। অবোধবন্ধুতে 'বামাগণের রচনা' বলে মহিলাদের কবিতা প্রকাশিত হয়।

হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রের সুধাপান' কবিতাটি ১২৭৬-এর শ্রাবণ সংখ্যার অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বনফুল কবিতাটি 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা

(১২৮২ অগ্রহায়ণ) থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ দাস। জ্ঞানাঙ্কুর ১৮৭৩ সালে রাজসাহী বোয়ালিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রতিবিম্ব পত্রিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে ৫৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানাঙ্কুরে যখন বনফুল প্রকাশিত হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৩ বছর ৭ মাস। জ্ঞানাঙ্কুর সেযুগের একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যপত্রিকা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রজনীকান্ত গুপ্ত, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রমুখ এ পত্রিকায় লিখতেন।

জ্ঞানাঙ্কুরের ১২৮২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রলাপ নামে একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়।

ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়,
চপল নিঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া নাচিয়া বহিয়া যায়।
বসিব দুজনে—গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয় ব্যথা,
তটিনী শুনিবে ভূধর শুনিবে
জগৎ শুনিবে সেসব কথা।

এছাড়া 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' নামে রবীন্দ্রনাথ ১২৭৩ সালের জ্ঞানাঙ্কুরে একঠি গ্রন্থ সমালোচনা করেন। জ্ঞানাঙ্কুরে ১২৭৯ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গ বিজেতা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১২) বিদ্যাবিড়ম্বনা রচনাটি জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হয়। রচনাটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরকে বঙ্গদর্শনে লিখতে বলেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দের আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখরের শ্মশানে ভ্রমণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

রোম্যান্টিকতা থেকে সাহিত্যে বাস্তবে উত্তরণ সাংবাদিকতারই প্রভাব। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বাস্তব-ভিত্তিক উপন্যাস তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা (১৮৭৩)। সাংবাদিক চোখে যা দেখেন তাঁর সংবাদে হুবহু তার প্রতিচ্ছবি আঁকেন। বাস্তববাদী সাহিত্যিক এই চোখে-দেখা বাস্তব চরিত্রগুলিকে রসোত্তীর্ণ করে তোলার জন্য কিছু পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় নেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: 'Some characters of my novel are from the real life. My fri nd Suresh and Paresh two figures under the name of Ramesh and Debesh.'[৫১]

বাংলা উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যে যে সময় কল্পনাশ্রয়ী রোমান্টিকতার প্রভাব সেসময় এই বাস্তব-ভিত্তিক উপন্যাস স্বর্ণলতা বাংলা সাহিত্যের গতি নতুন পথে আবর্তিত করে।

স্বর্ণলতাও বাংলা সাময়িকপত্রের ফসল। শ্রীকৃষ্ণ দাস সম্পাদিত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় ১২৭৯ সালের আশ্বিন থেকে ১২৮০ সালের ভাদ্র পর্যন্ত একবছর ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখছেন : 'স্বর্ণলতার কল্যাণে 'জ্ঞানাঙ্কুরের' গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্বর্ণলতাই জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত তারকনাথের একমাত্র রচনা নহে তাঁহার গল্প প্রবন্ধাদি আরও অনেক রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।'[৫২]

স্বর্ণলতার জনপ্রিয়তার একটা বড় প্রমাণ গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতে (১৮৮০ সালের ১২ অক্টোবর পর্যন্ত) স্বর্ণলতার সাতটি সংস্করণ হয়।

১২৮০ সালের ১১ কার্তিক সাপ্তাহিক সাধারণীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের জাতিবৈর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণীতে লিখতেন ও বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সাধারণীতেই হাতে খড়ি।[৫৩] শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন সাধারণীর সম্পাদক।

গোবিন্দচন্দ্র রায় (১৮৩৮-১৯১৭) যমুনা লহরী ও ভারতবিলাপের (কতকাল পরে বল ভারত রে দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।) কবিতার জন্য খ্যাত। যমুনা লহরী ১২৮১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত বান্ধবে প্রকাশিত হয়। যমুনা লহরীর ছত্রগুলিও সাধারণের মুখে মুখে ফিরত।

শ্রাবণ সংখ্যার বান্ধবে 'বাদল' ও ভাদ্রতে 'তাজমহল' গোবিন্দ রায়ের এই দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বান্ধব ও আলোচনাতে গোবিন্দচন্দ্রের আরও কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

উৎকৃষ্ট সাহিত্যের প্রসারে বঙ্গদর্শনের ভূমিকা বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বঙ্গদর্শনের সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই গোলেবকাওলি সেই বালক ভুলানো কথা— কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য·· বঙ্গদর্শন যেন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগত রাজবদুন্নত ধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"[৫৪]

জীবনস্মৃতিতে বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটিও এখানে স্মরণীয়।

"অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একেতো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের

পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে খুশি সেই অনায়াসে একেবারে এক গ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর কেহ পাইবে না।"[৫৫]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র যদি সেদিন সুকৌশলী সেনাপতির মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন সেবকদের, বঙ্গদর্শনের ব্যূহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অত্যল্পকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভব হইত না। তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া একদিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর--মোহজাত পাশ্চাত্যের অনুকরণ বৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঙালি জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সুমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।'[৫৬]

বঙ্গদর্শনে অধিকাংশ লেখকের নাম প্রকাশিত হত না। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যে জানা গেছে যে বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখকসূচীর মধ্যে বঙ্কিম ছাড়া ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, জগদীশচন্দ্র রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়ের শৈশব সহচরী উপন্যাসটি বঙ্গদর্শনে ১২৮২-৮৪ মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১২৮০ সালে মধুসূদনের মৃত্যু হলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন : 'মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গ কবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবি শূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।' (বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০)

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর এক তালিকা দেওয়া হল।

১২৮৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের ১০টি কবিতা ও একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১।	কামিনী কুসুম	—	১২৭৯ বৈশাখ
২।	মনুষ্যজাতির মহত্ব কিসে হয় (প্রবন্ধ]		জ্যৈষ্ঠ
৩।	দেবনিদ্রা (অসম্পূর্ণ)	—	১২৭৯ ভাদ্র
৪।	ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা	—	১২৭৯ পৌষ
৫।	পরশমণি	—	মাঘ
৬।	অন্নদার শিবপূজা	—	১২৮০ জ্যৈষ্ঠ
৭।	(মধুসূদনের) স্বর্গারোহণ	—	ভাদ্র
৮।	দুর্গোৎসব		আশ্বিন
৯।	ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার	—	চৈত্র

১০। এই কি আমার সেই জীবন তোষিনী — ১২৮১ আশ্বিন
১১। কমল বিলাসী — ১২৮১ আষাঢ়
১২। সুহৃৎ সঙ্গম — ১২৮২ অগ্রহায়ণ
১৩। ভুলোনা ও কুহুস্বর ভুলোনা আমায় — ১২৮৪ আষাঢ়

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের কতগুলি কবিতা, উপন্যাস, বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে কমলাকান্তের দপ্তরের প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকেই বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি সুরু হয়।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রচনা :

১। বিষবৃক্ষ : ১২৮০ (১ জুন ১৮৮৩) পুস্তকাকারে প্রকাশিত। ১২৭৯ সালের বৈশাখ-ফাল্গুন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।
২। ইন্দিরা : ১২৭৯ সালের চৈত্র।
৩। যুগলাঙ্গুরীয় : ১২৮০ সালের বৈশাখ।
৪। লোকরহস্য : ১২৭৯-৮০।
৫। বিজ্ঞান রহস্য : ১২৭৯-৮০।
৬। চন্দ্রশেখর : ১২৮০ শ্রাবণ ১২৮১ ভাদ্র।
৭। কমলাকান্তের দপ্তর। ১২৮০-৮২ মধ্যে প্রকাশিত।
৮। রজনী : ১২৮১-৮২
৯। কৃষ্ণকান্তের উইল : ১২৮২ ও ১২৮৪ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত।
১০। রাজসিংহ : ১২৮৪-১২৮৫ ভাদ্রসংখ্যায় অংশত প্রকাশিত।
১১। আনন্দমঠ : ১২৮৮-৮৯।
১২। মুচিরাম গুড় : ১২৮৭
১৩। দেবী চৌধুরাণী : ১২৮৯-৯০ অংশত প্রকাশিত।
১৪। রাধারাণী : ১২৮২ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ।

অক্ষয়কুমার বড়ালের রজনীর মৃত্যু কবিতাটি ১২৮৯ অগ্রহায়ণ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তার আগে নবীনচন্দ্র সেন ১২৮২ সালে লেখেন ক্লিওপেট্রা।

১২৮৪ থেকে ১২৮৯ সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এই সময় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের জাল প্রতাপ চাঁদ, পালামৌ ও বৈদিকতত্ত্ব এই সময় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল।

১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত বঙ্গদর্শন বঙ্কিম সম্পাদিত হয়ে বিদায় নেয়। ১২৮৪ সালের বৈশাখে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হয়। বৈশাখে বার হয় বঙ্কিমের 'বুড়াবয়সের কথা'। পৌষে কমলাকান্তের পত্রে প্রকাশিত হয় 'এখন সে বয়স নাই সে রস নাই—এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই—এখন গলা ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ফাল্গুনে (১২৮৪) 'পলিটিক্স শীর্ষক পত্র'। ১২৮৫ সালের শ্রাবণে বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব—এই শেষ লেখা। 'আপাতত খ্যান খ্যানানি বন্ধ করিলাম—কিন্তু মধুসংগ্রহের আশাটা রহিল।' এরপর ১২৮৮ সালে ভাদ্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের জোবানবন্দী প্রকাশিত হয়। ঢেঁকি ১২৮৯ সালের বৈশাখে, কাকাতুয়া কার্ত্তিকে। ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে কমলাকান্তের দপ্তর পরিবর্দ্ধিত হয়ে কমলাকান্ত নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

নীচে কমলাকান্তের দপ্তরের কয়েকটি প্রবন্ধের প্রকাশ তারিখ দেওয়া হল।

১। একা—কে গায় ওই ?	ভাদ্র ১২৮০
২। মনুষ্য ফল	আশ্বিন ১২৮০
৩। ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন	কার্ত্তিক ১২৮০
৪। পতঙ্গ	অগ্রহায়ণ ২৮০
৫। আমার মন	মাঘ ১২৮০
৬। চন্দ্রালোকে	ফাল্গুন ১২৮০
৭। বসন্তের কোকিল	চৈত্র ১২৮০
৮। স্ত্রীলোকের রূপ	জ্যৈষ্ঠ ১২৮১
৯। বিবাহ	আষাঢ় ১২৮১
১০। বড়বাজার	আশ্বিন ১২৮১
১১। আমার দুর্গোৎসব	কার্ত্তিক ১২৮১
১২। একটি গীত	ফাল্গুন ১২৮১
১৩। বিড়াল	চৈত্র ১২৮১
১৪। মশক	বৈশাখ ১২৮২

চন্দ্রালোকে ও মশক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ও স্ত্রীলোকের রূপ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা।

বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সাহিত্য-সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ সমালোচক বঙ্কিমকে সম্মার্জনী হাতে দণ্ডায়মান বলে অভিহিত করেছেন। বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে উল্লেখযোগ্য সমালোচিত গ্রন্থগুলি হল—হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা : রাজনারায়ণ বসু ও কিঞ্চিৎ জলযোগ : (চৈত্র ১২৭৯) সকাশ রঞ্জিনী (বৈশাখ ১২৮০) নবীন সেন। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার : শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (আষাঢ় ১২৮০), চন্দ্রনাথ (উপন্যাস) : ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী (আষাঢ় ১২৮১), সেকাল আর একাল : রাজনারায়ণ বসু (পৌষ ১২৮১)। সমালোচনার ক্ষেত্র বঙ্কিমচন্দ্র নির্মম ও কঠোর ছিলেন। তাঁর লেখনী এ ক্ষেত্রে শাণিত ও প্রত্যক্ষ। নীচে কয়েকটি সমালোচনার উদাহরণ দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

কাব্যমালা। কলিকাতা বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানি। কাব্য মিষ্টান্নের ন্যায় অম্লমধুর। এ মিঠাইয়ের ময়রা কে তাহা গ্রন্থে প্রকাশ পায় নাই। আমরা জানিও

না। জানিতে পারিলে তাঁহার দোকানে কখন যাইব না। তাঁহার প্রবাণ্ডলিন একে তেলে ভাজা, তায় বাসী। তিনি নাম পত্রে বররুচি হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

—চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ।

কিন্তু যখন আমাদিগের হাতে তাহার গ্রন্থ পড়িয়াছে, তখন তাঁহার কপালে বিধাতা তাহাই লিখিয়াছেন। আমরা নিতান্ত অরসিক। তাঁহার কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলাম না। কবিতাগুলিন সকলই আদিরস ঘটিত। তাহা হইলেও দোষের হইল না। যাহা শারীরিক কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক, তাহাই দুষ্ট এবং কাব্যের অযোগ্য। (অগ্রহায়ণ ১২৭৯)

সৌদামিনী উপাখ্যান। শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং। এখানি কাব্য। ইহাতে প্রশংসার কিছু পাইলাম না। অনেক স্থানেই চর্বিত চর্বন। মধ্যে ২ অনুপ্রাসের ঘটা তজ্জন্য অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। (ফাল্গুন ১২৭৯)

নলদময়ন্তী কাব্য। শ্রীকিশোরীলাল রায় বিরচিত। কলিকাতা স্কুল বুক প্রেস। উপাখ্যান সেই মহাভারত মধ্যে শুরু করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানের জ্বালায় মুদ্রাযন্ত্র ঘূর্ণা হইয়া উঠিল। যাহার কোন বিশেষ কার্য্য না থাকে, তিনিই নলদময়ন্তীর কথা লেখেন। এক্ষণে জলের কল, মিউনিসিপাল বিল, রোডসেস প্রভৃতি অনেক লিখিবার বিষয় হইয়াছে—ভরসা করি আর কোন কাব্যকার নলদময়ন্তীকে লইয়া টানাটানি করিবেন না।

যিনি সাত ছত্র পদ্য লিখিতে অক্ষম, তিনি নলদময়ন্তী কাব্য না লিখিলে ভাল হইত। শ্রীহর্ষ ইহা লিখিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাতে সজ্জনগণের 'সন্তোষ সাধন' হইবে না—কেননা, অনর্থক কিশোরী বাবুর সময় নষ্ট হইয়াছে জানিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইবেন। বিদ্বানগণের পরিতোষলাভ হইবে না, কেননা তাঁহারা ইহা পড়িবেন না। তবে 'তরুণ বয়স্কদিগের কিছু উপদেশ লাভ হইল বটে' 'ভরসা করি' তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া আর সেই সেকালের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। (বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৭৯)

কৃষ্ণ ভক্তিসার। শ্রীউমানাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা হিতৈষী যন্ত্র। এখানি পদ্য গ্রন্থ। বৈষ্ণবদিগের কোন গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার ইহাতে কৃষ্ণ বিষয়ক কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন, বৈষ্ণবদিগের ইহা ভাল লাগিলেও লাগিতে পারে, কিন্তু অন্য কোন মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ইহার এক পৃষ্ঠা পড়ে। ইহা যদি কৃষ্ণভক্তির সার, তবে সাধারণ কৃষ্ণভক্তি না জানি কি পদার্থ। (শ্রাবণ ১২৮০)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগ্রহে ঠাকুর বাড়ির

সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের মাঝে ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ভারতী প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোল। এই ভারতীকে কেন্দ্র করেই রবিরশ্মির বিচ্ছুরণ। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার লিখেছেন: 'ভারতীর জন্য রচনা সংগ্রহ উপলক্ষে যেমন বিচিত্র লোকের সহিত পরিচয় হইল, তেমনি নিজেদের পারিবারিক পত্রিকা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিচিত্র রচনা নির্বিচারে প্রকাশ করিবার বাধা দূর হইল। দুই বৎসর পূর্বে জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বের পৃষ্ঠায় তাঁর গদ্য ও পদ্য প্রলাপ যেমন নির্বিচারে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভারতীতে সেই সুযোগ দেখা দিল শতগুণে। বালকের লিখিবার শক্তি ছিল অসাধারণ, প্রকাশের বাধা ছিল সামান্য, সাহিত্য বিচারের মানসূচী ছিল অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।"[৫৭]

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর অক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষায় আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। (ভূমিকা—ভারতী, শ্রাবণ-চৈত্র ১২৮৪)

সাময়িক সাহিত্যপত্রের যাবতীয় লক্ষণই ভারতীতে বর্তমান ছিল। প্রবন্ধ, কবিতা ছোটগল্প, রসরচনা, গ্রন্থ সমালোচনা, সংবাদ, সাহিত্য প্রতি সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত হত।

ভারতীর প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচী:

প্রথম সংখ্যার সূচী: শ্রাবণ ১২৮৪

১। ভূমিকা।
২। ভারতী: কবিতা।
৩। তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক: গ্রন্থ সমালোচনা।
৪। মেঘনাদ বধ কাব্য: গ্রন্থ সমালোচনা।
৫। জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা: প্রবন্ধ।
৬। বঙ্গ সাহিত্য: শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা।
৭। গঞ্জিকা অথবা তুরিতানন্দ বাবাজির আকড়া: রসরচনা।
৮। ভিখারিনী—গল্প: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (লেখকের নাম অপ্রকাশিত)
৯। স্বাস্থ্য: প্রবন্ধ।
১০। সম্পাদকের বৈঠক।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা লেখেন। রচনাটি তীব্র আক্রমণাত্মক ছিল। পরবর্তী কালে কবি লজ্জিত হয়ে লিখেছেন: "ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদ বধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক

সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।" (জীবন স্মৃতি : পৃঃ ৭১ দশম)

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার হাতেখড়ি ভারতীর প্রথম সংখ্যায়। গল্পের নাম 'ভিখারিনী'। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন, ভিখারিনী গল্পে ছোটো গল্পের ঠাট বজায় আছে।[৫৮] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারতী পর্যায়ের কোন লেখা সম্পর্কেই পরবর্তী কালে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে [৫৯]

এই সমস্ত রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সবিনয় উক্তি যাই-ই হোক না কেন, এগুলি তার উত্তরকালের সাহিত্য-কৃতির বীজ বপন করেছিল।

ভানুসিংহের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের ভারতীতে। প্রথম কবিতাটি ছিল মল্লার সজনিগো আঁধার রজনী ঘোর ঘন ঘটা চমকিত দামিনীরে।

দ্বিতীয় কবিতাটি প্রকাশিত হয় পৌষ সংখ্যায়, বাজাওরে মোহন বাঁশি। এর পরের কবিতাগুলির প্রকাশসূচী।

১। হম সখি দারিদ নারী—মাঘ ১২৮৪
২। সখিরে বিপরীত বুঝাবে কে ?—ফাল্গুন ঐ
৩। বার বার সখি বরণ করনু—বৈশাখ ১২৮৫

ভারতীর প্রথম বর্ষে (১২৮৪) পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্য প্রকাশিত হয়—কবি কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত পুস্তক কবি কাহিনী। ১৮৭৮ সালে তা প্রকাশিত হয়। কবি কাহিনী সম্পর্কে লেখক বলেছেন : 'যে বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা।'[৬০]

কবি কাহিনী সাহিত্য রসিকদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়নি। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ বান্ধব পত্রিকায় এই গ্রন্থের সমালোচনা করেন ও লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলে অভ্যর্থনা করেন।[৬১]

রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে করুণা উপন্যাসটি আরম্ভ করেন। কিন্তু ভারতী দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ বিলাত চলে যাওয়ায় উপন্যাসটি শেষ হয়নি। ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কবি বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর বিলাত যাত্রার বিবরণ য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র নামে ১২৮৬ সালের বৈশাখ থেকে ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

১২৮৫ অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যার ভারতীতে অক্ষয় চৌধুরীর সাগর সঙ্গমে গাঁথা কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

'পলকে পলকে বিজলী দলকে
অধরে মধুর হাসির ছটা
রূপের সাগরে অমৃতের ঢেউ
লহরে লহরে তুলিছে ঘটা।'

ভারতীর গ্রন্থ সমালোচনার প্রসঙ্গের অবতারণা করে এই পরিচ্ছেদ শেষ করব। ভারতী অত্যন্ত যত্ন করে গ্রন্থ সমালোচনা করতেন। রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গসাহিত্য গ্রন্থটি ভারতীর প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে কয়েকসংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত হয়।

১২৮৫ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা পুস্তকের সমালোচনা। বলাবাহুল্য ভারতী কাব্যগ্রন্থখানির নির্মম সমালোচনা করেন :

'বঙ্কিমবাবুর কবিতা পুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না—জ্ঞানের কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্যমাত্র, কিন্তু আমোদ সাধারণ সামান্য অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্য্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না—বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস নির্জ্জীব স্বাদ-গন্ধহীন কিছুই না হইবে, তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।'

"সমস্ত কবিতা পুস্তকের মধ্যে তিনটি গদ্য পদ্যই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। উপসংহার কালে আমরা একটিমাত্র কথা বলিব—বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতাখানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে ভাল একজন উপন্যাস লেখক ভাল কবি হইতে পারেন না। স্যর ওয়াল্টর স্কটের কবিতাগুলি পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের মতে ছন্দ গ্রন্থিত উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে স্যর ওয়াল্টর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি এবং উপন্যাস লেখক ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত—তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্নভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, একজন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্যসাধন হইবে, অপরজন ঘটনার প্রতি ঈষৎ মাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন—স্কটের 'লেডী অফ দি লেকে'র সহিত বাইরনের 'জওয়ারের' তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।"

বাংলা নাটক : নট্যামঞ্চ ও সংবাদপত্র

বাংলা গদ্য সাহিত্যের মত বাংলা নাটকও নবীন যুগের ফসল। ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার ভদ্রার্জুন লিখে বাংলায় মৌলিক নাট্য রচনার সূত্রপাত করেন। ১৮৫৪ সালে বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাস্তব উপকরণ অবলম্বন করে প্রথম নাটক রচিত হয়। লেখেন, রামনারায়ণ তর্করত্ন। নাটকের নাম কুলীনকুলসর্বস্ব। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়।

তার আগে নবজাগরণের ব্রাহ্মমুহূর্তে হেরাসিম লেবেডফের প্রচেষ্টায় কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছিল (১৭৯৫)। অবশ্য মৌলিক নাটকের অভাবে লেবেডফ ইংরাজী নাটকের বাংলা অনুবাদই মঞ্চস্থ করেন।

এরপর থেকে সামাজিক জীবনের নানান ঘূর্ণাবর্তের মাঝে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বাঙ্গালীর মনে রুচিশীল মৌলিক বাংলা নাটক ও নিজস্ব রঙ্গশালার জন্য বার বার আকুতি জেগেছিল। বাঙালির এই নাট্যভাবনা, মঞ্চ স্থাপনের জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা বার বার সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশেষে 'অলীক কুনাট্য রঙ্গ' থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য যখন সারস্বতসমাজ এগিয়ে এলেন এবং নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয় যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসবে পরিগণিত হল তখন সংবাদপত্র তার এই প্রচেষ্টাকে বার বার স্বাগত না জানিয়ে পারেনি। বর্তমানে বাংলা সংবাদপত্রে নাট্য সমালোচনার যে ধারা চলে আসছে সেযুগের সংবাদপত্রেই তার সূত্রপাত ঘটেছে। ইদানীং সংবাদপত্রের গ্রন্থ সমালোচনায় নাটক সমালোচনা বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু সেযুগের সংবাদপত্রে নাট্যগ্রন্থেরও আন্তরিক সমালোচনা হয়েছে।

বাংলা নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার যেমন প্রকাশ ঘটেছিল তেমনি বাঙালির নিজস্ব রঙ্গালয় স্থাপনকেও বাঙালি সে সময় সুগভীর আত্মমর্যাদার প্রতীক বলে অনুভব করেছিল। একারণেই জাতীয় রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের জন্য বাঙালি এতখানি গভীর আগ্রহী হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই কলকাতায় প্লে হাউস, ক্যালকাটা থিয়েটার, হার্মনিক্যাল ট্যাভার্ণ, মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার প্রভৃতি ইওরোপীয় চালিত রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ধরণের বিদেশী রঙ্গমঞ্চই শিক্ষিত বাঙালির বিনোদন তৃষ্ণা মেটাত। এছাড়া দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য ছিল যাত্রাভিনয়ের ঢালাও ব্যবস্থা। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষয়িষ্ণু সমাজে অপসংস্কৃতিরই ছিল প্রাধান্য। যে নিম্নরুচি সেদিন সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রুচির সে নিম্নগামিতা থেকে সাহিত্য কিছুটা মুক্ত হতে পারলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে মুক্তি আসেনি। কাজেই এই সব যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে বহুক্ষেত্রে আদিরসই প্রাধান্য পেয়েছে। কাজেই নবজাগরণের আলোকে জাতীয় রুচির যখন ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটল তখন বাঙালি দর্শক এই সব আদিরসাত্মক গীতাভিনয় বর্জন করে রুচিসম্মত নাট্যাভিনয় দেখতে আগ্রহী হয়েছে। অবশ্য এই রুচি পরিবর্তন একদিনে সম্ভব হয়নি। তার পিছনে নিঃশব্দ সাংস্কৃতিক আন্দোলন মন্ত্রের মত কাজ করেছে। এবং এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে বাংলা সংবাদপত্র নিম্নরুচির নাটকের বিরুদ্ধে বার বার কশাঘাত হেনেছে।

১৮৪৮ সালের ২৮ জুন সংবাদ প্রভাকর লেখেন : 'এতদ্দেশে পুরাকালে নাটকের ন্যায় অধুনা নাট্যক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না, কালীয়দমন, বিদ্যাসুন্দর নামোপাখ্যান

প্রভৃতি যাত্রায় আমোদ আছে, কিন্তু তত্তাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রমোদ প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না · ·।'

সংবাদপত্রের এই নিম্নরুচির বিরুদ্ধে যেমন নিয়মিত সমালোচনা হত তেমনি উচ্চমানের যাত্রাভিনয়েরও প্রশংসা করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের গবেষক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কিন্তু ক্রমেই রুচি শুদ্ধ হইতে থাকে এবং ভবানীপুরের 'নলদময়ন্তী পালা' (১৮২২) ও জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায় যাত্রা' (১৮৪৯) প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করে, রুচির দিক হইতে পূর্ব্বতন আদিরসাত্মক গীতাভিনয় হইতে এগুলি বোধ হয় পৃথক ধরনের ছিল। ১৮২২ সালে সমাচার দর্পণ ভবানীপুরের ভদ্ররুচির যাত্রাভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন।"[৬২]

শুধু নাটকের রুচির উন্নতি নয়, রেনেশাঁসের নবতর চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি চেয়েছিলেন—নিজস্ব নাট্যশালা। বস্তুত এই চেতনা স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের অনুভূতিরই ক্রমপরিণতি। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখেরা হিন্দু থিয়েটার স্থাপন করেন। বাঙালির উদ্যোগে স্থাপিত এই প্রথম নাট্যশালা। প্রসন্নকুমারের শুঁড়ার বাগানবাড়িতে নাট্যশালাটি স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ইংরাজি ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়।

সমাচার দর্পণ এই নাট্যশালা স্থাপনের সংবাদে বিশেষ উৎসাহিত হন। ১৮৩১ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁরা একটি প্রতিবেদন ছাপেন—'এতদ্দেশীয় নর্তনাগর।'

'কিয়ৎকালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্তনাগার গ্রন্থন নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরদের গত রবিবারের এক বৈঠক হয় এবং তৎসময়ে আনুষ্ঠানিক কর্ম সকল নির্বাহকরণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ সেন, শ্রীযুত বাবু মাধবচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঘোষ। ঐ নর্তনশালা ইংলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইংলণ্ডীয় ভাষায়।"

১৮২২ সালের জানুয়ারিতে সমাচার চন্দ্রিকা জনৈক পত্রলেখকের একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তাতে এই নাট্য প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করা হয়। তার কয়েকদিন পরে ১৪ জানুয়ারি সমাচার দর্পণ একটি চিঠি ছাপেন। এই দুটি চিঠিতে হিন্দু নাট্যশালা সম্পর্কে তৎকালীন জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া এবং সংবাদপত্রের মনোভাবের কথাও জানা যাবে।

১। মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের।···গত ১৪ পৌষ বুধবার (২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১) রজনী যোগে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগান হিন্দু থিয়েটরি

এক্ট অর্থাৎ হিন্দু নৃত্যাগারের কর্ম সম্পন্ন হইয়াছে আমি চক্ষে দেখি নাই আমার জনৈক আত্মীয় শ্রীরামযাত্রা দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা অবগত হইলাম••• রামলীলা নাটকের মত যাহা ২ ইংরেজী ভাষায় তর্জমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তর্জমা ভাষাভ্যাস করিয়া এই সকল বাক্য উচ্চারণপূর্বক রাম লক্ষ্মণ সীতা ইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন তাহাতে কে কোন সং সাজিয়াছিলেন তাহার বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিলে আগামীতে লিখিব।•••এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানাপ্রকার যাত্রা-দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থ সকল বর্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইহারা ধনিলোকের সন্তান ইঁহারদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিয়দমনের ছোঁড়াগুলা সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গ ভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না। সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষজনক হউক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই।

ইঁহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইংরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতক-গুলিন বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইংরেজাধিকারী তাহা হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাহারা যে ২ সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।•••১৫ পৌষ। কস্যচিৎ পাঠকস্য। ৭ জানুয়ারি ১৮৩২-এর সমাচার দর্পণে পুনর্মুদ্রিত।

২। শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। অস্মদ্দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন--বিষয়ক বার্তা শ্রবণে এবং যাত্রা কি পর্য্যন্ত প্রশংসা ও উৎসাহরূপে হইয়াছে তৎশ্রবণে নাট্যাসক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্তামোদী হইয়াছেন। ব্রিটন দেশজাত আমারদের ভ্রাতৃবর্গেরা যেরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন হিন্দুগণও তদ্রূপ সভ্যতা যে এইক্ষণে প্রাপ্ত হন ইহা আমরা শ্লাঘ্য করিয়া মানি। ইংলণ্ডীয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিরা কহিয়া থাকে যে তাঁহারা যাদৃশ সভ্য তাদৃশ কখন হিন্দুরা হইতে পারিবেন না অর্থাৎ ইংলণ্ড দেশজাত তাব-ল্লোকের মনোমধ্যে যে গুণ স্থাপিত হইয়াছে তাদৃশ গুণ কদাচ হিন্দুরদের মধ্যে নাই কিন্তু এ কেবল হাস্যাস্পদ কথা যেহেতুক অতিশয় তত্ত্বদর্শি ব্যক্তিরাও দেখিতেছেন যে ঈশ্বর পক্ষ-পাতী নহেন। যদি ইহাতে ঐ শ্রেষ্ঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং হিন্দুর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তৎকর্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। অল্পকালের মধ্যে বুঝি হিন্দু ঐচ্ছিক যাত্রাকারীরা চৌরঙ্গীর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরদের তুল্য হইবেন। যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিকা ও রত্নাকর সম্পাদকেরা হিন্দু হইয়া হিন্দুরদের

নাট্যশালা এবং ঐচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ ঐ নাট্যশালা সংস্থাপকরদের অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতিসহজ। প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাঁহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাঁহারদের বুদ্ধি অল্প কেবল গালাগালি দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ঐ অযুক্তধর্মি অথচ স্বীয় মতমাত্রে আসক্ত সম্পাদকের নাট্য পদার্থ যে কি ইহা বোধ করিতে পারেন না এবং দেশের উন্নতিবিষয়ে শত্রুতাচরণ করিয়া তাঁহারা অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন অতএব তাঁহারদের বিষয় আমার কিছু মনোযোগযোগ্য নহে।

অপর ঐ হিন্দু নাট্যশালার অধ্যক্ষেরা জুলের সিজর অথবা সেক্সপিয়র কোন কাব্য হইতে নীতি কথাদ্বারা যাত্রায়ম্ভ না করিয়া যে নাট্য অর্থাৎ এতদ্দেশীয় উত্তর রামচরিত্র-বিষয়ক কথা লইয়া নাট্যারম্ভ করিলেন ইহা ভ্রম হইয়াছে যগুপি তাঁহারা জুলের সিজর বা সেক্সপিয়রের কথা লইয়া আরম্ভ করিতেন তবে ঐ অযুক্তধর্মি ও স্বমতযাত্রাসক্ত সম্পাদকেরদের তিরস্কার করণের সম্ভাবনাই ছিল না যেহেতুক তাঁহারা উক্ত কাব্য সকলের কিছুমাত্র জানেন না। উত্তর রামচরিতবিষয়ক হিন্দুরদের নাট্যশালার যাত্রা হইবে ইহা শ্রবণে তাঁহারা রামযাত্রা জ্ঞান করিয়া নানা অকারণ কোলাহল করিতে লাগিলেন যে যা হউক অস্মদ্দেশীয় কর্তৃক কৃত নাট্যশালা দর্শনে আমরা পরমামোদী হইলাম এবং তৎ-সংস্থাপক মহাশয়েরদের ও ঐচ্ছিক যাত্রাকারী মহাশয়েরদের কর্ম যে সফল হইবে এমত আমাদের ভরসা। কস্যচিৎ বুলবুলস্য। (সমাচার দর্পণ, ২৮ জানুয়ারি, :৮:২)

প্রসন্নকুমারের এই নাট্যপ্রচেষ্টা বড় বেশী ফলবতী হয়নি। অল্পকালের মধ্যে হিন্দু থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ছড়িয়ে দিয়ে যায় প্রেরণা। ১৮৩৩ সালে শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে আর একটি নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। এখানে চেষ্টা হয় দেশীয় ভাষায় অভিনয়ের। অনুবাদ নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙালির নিজস্ব নাট্যভাবনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। ইংরাজী নাটকের মোহ সেকালের শিক্ষিত সমাজকে যেভাবে পেয়ে বসেছিল তা থেকে মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তন এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলেই পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার ভদ্রার্জ্জুন ও যোগেশচন্দ্র গুপ্ত কীর্তিবিলাস লিখে বাংলা নাট্যসাহিত্যের নবযুগের প্রবর্তন করলেন। ১৮৫৭ সালে ইওরোপীয় রীতিতে বাংলা নাটক শকুন্তলার অভিনয় হল। সমাচার চন্দ্রিকার মত রক্ষণশীল পত্রিকাও এই নাটকের প্রশংসা করে লিখলেন: 'ইয়ং বাঙ্গাল বাবু সাহেবরা নিশ্চয় করিয়াছেন, আমারদিগের বাঙ্গালীর কোন শাস্ত্রাদিতে পারমার্থিক রস ঘটিত কিছুই নাই, যাহা আছে, ইংরাজীতেই আছে। ডুমুরের মধ্যস্থ কীটের পক্ষে ডুমুরই ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবুদিগের ইংরাজীই সর্ব্ববিদ্যা অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যগুপি কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহার কি পর্য্যন্ত রসমাধুর্য্য আস্বাদে আশ্চর্য্য হইবেন।'[৬৩]

১৮৫৭ সালে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত বিক্রমোর্বশী

নাটকের অভিনয়ের (২৪ নভেম্বর, ১৮৫৭) প্রশংসা করেন সংবাদ প্রভাকর। প্রভাকরের নাট্য সমালোচনা ১৮৫৭ সালের ২৫ নবেম্বর অর্থাৎ অভিনয়ের পরদিনই প্রকাশিত হয়েছিল।

বিক্রমোর্ব্বশী নাট্যাভিনয়

যোড়াসাঁকো নিবাসী ধনরাশি বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুতবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠকখানাস্থিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্যন্ত নাট্যক্রীড়াচ্ছলে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়। তদ্দর্শনার্থ কয়েকজন সুধাভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহুসংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্যলোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নটনটী প্রভৃতি সমুদয় কেলিকিন অর্থাৎ ক্রীড়ক কদমের ক্রীড়ায় তাবতেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচর পথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি, কিন্তু এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে যে মহাশয় প্রাচীন কোনো সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদপূর্বক তাহার ক্রীড়া প্রকাশে উৎসুক হয়েন, দোহাই দোহাই সহস্র দোহাই, তাঁহারা অতি বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত তৎকার্য্যে যেন প্রবৃত্ত হয়েন এই ব্যাপারটি বড় সহজ নয়, অতি কঠিন, যে সকল পূর্ব্বতন পূজ্যপাদ মহাকবিগণ সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাকৃত ভাষার সংযোগপূর্ব্বক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের পুর্ব্বকার কবিত্ব পাণ্ডিত্যশক্তি, লিপিনৈপুণ্য এবং কৌশলাদি স্বতন্ত্র। ঐ সমস্ত গুণ তাঁহারদিগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থান করিয়াছে, বঙ্গভাষায় তাহার অবিকল অনুবাদ দূরের কথা, কেবলমাত্র মর্মানুবাদ করিতে হইলেও যে, কতদূর পর্যন্ত ক্ষমতা ও আর আর আনুসঙ্গিক ব্যাপারের প্রয়োজন করে, তাহা কেবল তাঁহারাই জানিতেছেন, জগদীশ্বর অনুকূল ব্যাপারের প্রয়োজন করে তাহা কেবল তাঁহারাই জানিতেছেন, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া যাঁহাদিগকে রচনাবিষয়ক সম্পূর্ণরূপ দৈবশক্তি অথবা তদ্বিষয়ক ভাবগ্রহণের যথার্থরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, কি গদ্য, কি পদ্য, এই উভয় বিষয়ের চরণ চালনা করিতে গিয়া প্রায় অনেকেই আছাড় খাইয়া থাকেন, তাহার কারণ পদের ও পদের দোষে বিপদে পড়িতে হয়, গদ্যে পদ্যে যে, কি প্রভেদ, তাহা এপর্যন্ত বহু লোকেরি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই যে গদ্যটি নিজ রচকের গদ্যজনক না হয়, সেই গদ্যই গদ্য, কবিতা কি? এইক্ষণকার কবিতা জানিলে আর কোনো ভাবনাই থাকে না। যিনি পদগুলিকে পদে রাখেন, তিনিই পদে থাকেন, নত বা পদহীন যে পদ, সে পদ বিষম বিপদ, যাহা হউক, নাটক কাব্যে কেহ কাব্য করিতে না পারেন এইরূপ করিয়া রচনা করিলেই হয়, বঙ্গভাষায় গদ্যের কতক কতক নূতন প্রণালী এই প্রকারে প্রকাশের প্রয়োজন করে, যাহা সর্বতোভাবেই সর্বজনের মনোরঞ্জক হয়, এবং কবিতাতেও নূতন পদ্ধতি ক্রমে বর্ণগত কতকগুলিন ছন্দের সৃষ্টিকরণের আবশ্যক

করে, নতুবা সকলি মিথ্যা হইবে, যে ক্রীড়ক, যে বিষয়ের ক্রীড়া করিবেন, তাঁহার উক্তি গদ্যই হউক, কিম্বা পদ্যই হউক, তাঁহার রচনাটি প্রকৃত স্বভাবানুযায়ি হইবে, তাহাতে প্রকৃতির কিছু মাত্রই যেন বিকৃতি না হয়, ভাব ভঙ্গিমাদি সর্ব্বসুলক্ষণ বিশিষ্ট হইবে, নাটকটি অতি সুমিষ্ট বিষয়, অতএব নাটক না টক হয় ইহার আদিবর্ণ লোপ হওয়া বড় দুঃখের ব্যাপার অতএব সাবধান সাবধান।

সমালোচনার ভাষাটি কঠোর এবং শ্লেষাত্মক ছিল। কিন্তু এই সমালোচনার মাধ্যমে বাংলা নাট্য সমালোচনার একটি সুউচ্চ মান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

১৮৫২ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে ১১টি বাংলা নাটক প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের মধ্য দিয়ে বাঙালীর সমাজসংস্কার আন্দোলনের পথ প্রশস্ততর করার চেষ্টা হয়েছে। সমাজসংস্কারক ও রাজনীতিবিদরা যেমন সংবাদপত্রকে ও সাহিত্যকে প্রকাশ মাধ্যম করেছিলেন তেমনি তাঁরা নাটককেও তাঁদের আন্দোলনের সামিল করে তোলেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলে, উমেশচন্দ্র মিত্র লেখেন বিধবা বিবাহ নাটক (১৮৫৬), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় লেখেন বিধবোধাহ, রাধামাধব মিত্র বিধবা মনোরঞ্জন (১৮৫৬), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় চপলা চিত্তচাঞ্চল্য (১৮৫৭) ও বিহারীলাল নন্দীর বিধবা পরিণয়োৎসব (১৮৫৭)। তার আগে ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় কুলীন কুলসর্ব্বস্ব। রংপুরের জমিদার কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পুরস্কার ঘোষণার উত্তরে রামনারায়ণ এই নাটক লিখে ৫০ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালে এই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সম্বাদ ভাস্কর ১৮৫৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর লেখেন: "এইক্ষণে বিদ্যোৎসাহি পাঠকবর্গকে অনুরোধ জানাই তাঁহারা এক টাকা মূল্য প্রদানে এই মনোহর নাটক সংগ্রহ করিয়া চিত্তবিনোদন করুন।"

দর্শকমানসে কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটকের আবেদন ছিল মর্মভেদী। নাটকটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে কুলীনসমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে রামজয় বসাকের বাড়িতে এ নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর, কিশোরীমোহন মিত্র প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলা নাটক সর্বপ্রথম উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজারা বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে নাট্যশালা স্থাপন করেন। উদ্বোধন হয় রামনারায়ণের রত্নাবলী দিয়ে। রত্নাবলী দেখে মধুসূদন হতাশ হয়েছিলেন। মৌলিক অথচ সাহিত্যগুণ-সম্পৃক্ত বাংলা নাটক লেখার চ্যালেঞ্জ জেগেছিল তাঁর মনে। মধুসূদন লিখেছিলেন শর্মিষ্ঠা। ১৮৫৯ সালের ৩ ডিসেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় শর্মিষ্ঠার অভিনয় হয়।

শর্মিষ্ঠা নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার মধুসূদনের আবির্ভাব। রেনেশাঁসের অন্যতম লক্ষণ নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং নারীর মুক্তি অধিকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। শর্মিষ্ঠা নাটকের মধ্য দিয়ে মধুসূদন নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন।

১২৬৬ সালের ১১ আশ্বিন সোমপ্রকাশে শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য বদান্য

পৃষ্ঠপোষকদের দানের কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের কাজে ধনবানদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। সোমপ্রকাশের সমালোচনাটি পড়লেই এটি বোঝা যাবে। এই সঙ্গে ১৭ পৌষ ১২৭৩ সালে প্রকাশিত মফস্বলে একটি নাট্যাভিনয়েরও সমালোচনার উদ্ধৃতি দেওয়া হল। এই দুটি উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণিত হবে নাট্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশ খুঁটিনাটি বিষয়ে কতখানি দৃষ্টি দিতেন।

শর্মিষ্ঠা নাটকাভিনয়। ১১ আশ্বিন ১২৬৬। ৪৬ সংখ্যা।

আমরা গত বুধবারে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগাছিয়া বাগানে শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয়ক্রিয়া অতি চমৎকারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে। বাদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যযাতি রাজার সভাভঙ্গ পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় আমরা একতান মনে শ্রবণ ও অবলোকন করিয়াছি। একবারও চিত্ত বিরক্তি হইয়া অন্যদিকে ধাবমান হয় নাই। কি সঙ্গীত, কি বাদ্য, কি অভিনয়, সকল বিষয়ই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যদি নাট্যোক্ত স্ত্রী ও পুরুষদিগের কথোপকথনগুলি সহজ ও স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, কাহারও কোন অংশে কিছুমাত্র অতৃপ্তি ও আপত্তি থাকিত না।

প্রথম বাদ্য আরম্ভ হয়। বাদ্য অতি চমৎকার ও নূতন তাললয়বিশুদ্ধ রাগপূর্ণ সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুতিমূলে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বোধ হইল, শর্মিষ্ঠার নাট্যাচার্য্য এতদ্দেশীয় ইউরোপীয় উভয়বিধ বাদ্যের যোগসম্পাদন করিয়া নূতনত্ব ও বিচিত্রতা বিধান করিয়াছেন।

হিমালয় পর্বত, তাহার উপত্যকা অধিত্যকা ভৃগু সানু প্রভৃতি প্রদেশে, শর্মিষ্ঠার ভবনপুরোবর্তী নিকুঞ্জ, যযাতির সভা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রাসাদ শ্রেণী, এই সকলের যে প্রতিরূপ করা হইয়াছিল, তাহা সর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোহর। যযাতি যখন জরামুক্ত হইয়া উভয় পার্শ্বে উভয় মহিষীকে লইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, ওদিকে দেবগণ তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্বেরা গান ও অপ্সরারা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, এদিকে যযাতির সভাস্থলে শুক্রাচার্য, কপিল, মাধব, মন্ত্রী ও অন্য অন্য সভাসদগণ উপবিষ্ট, সম্মুখে দুই নর্তকী নৃত্য করিতে লাগিল। এই সকল উদাত্ত কাণ্ড দেখিয়া তৎকালে মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছিল।

যে সকল ব্যক্তি অভিনয়ক্রিয়া সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাঁহারা বিদূষকের এবং শর্মিষ্ঠার বেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অধিকতর প্রশংসা করিতে হয়। আলঙ্কারিকেরা লিখিয়াছেন, বিদূষক বেশ ভাষা অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দ্বারা হাস্যকর হইবে। বেলগাছিয়া রঙ্গভূমির বিদূষক এমনি সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছিলেন, যে তাঁহাকে রঙ্গভূমিতে দেখিবামাত্র না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। শর্মিষ্ঠা বেশধারীর স্ত্রীলোকসদৃশ মধুর স্বর ও মিষ্ট কথাগুলি কাহার না হৃদয়গ্রাহী হয়।

উল্লিখিত অভিনয় দর্শন করিয়া কেবল যে এদেশের প্রাচীনকালের আচারব্যবহার ও

রীতিনীতি প্রভৃতি জানা যায় এরূপ নয়, তদানীন্তন লোকদিগের মনে ভাব সংস্কার ও চরিত্র প্রভৃতিরও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শর্মিষ্ঠার শান্ত ভাব, সস্নেহ ব্যবহার এবং বিশুদ্ধ চরিত্র দর্শন করিয়া কাহার মনে বিস্ময় ভক্তি ও করুণার উদয় না হয়? দেবযানী শর্মিষ্ঠার সপত্নী। তিনি বিবিধরূপে তাঁহার অপকার চেষ্টা ও ঈর্ষা করেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা একক্ষণের নিমিত্তও তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করেন নাই। বরং কেহ দেবযানীর নিন্দা করিলে শর্মিষ্ঠা তাহাতে বিরক্ত হন। ঈদৃশ উদার স্বভাব দর্শন করিলে কাহার মন ভক্তিভাবে আর্দ্র না হয়?

যেরূপ সুসম্বদ্ধ কাণ্ড দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল, রাজা বাহাদুরের অনেক ব্যয় হইয়াছে। গতবর্ষেও তিনি রত্নাবলীর অভিনয়ে যথেষ্ট ব্যয় করিয়াছিলেন, তাঁহার এই ব্যয় নিরর্থক হয় নাই। দর্শকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অর্থ ব্যয় সার্থক হইয়াছে আমরা একথা কহিতেছি না। আমাদিগের দেশের লোকের রুচিপরিবর্ত ও উত্তরোত্তর সমধিক সহৃদয়তা বৃদ্ধি হইবে তাহার আকার হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অর্থ ব্যয়ের এই বিশেষ ফল দর্শিয়াছে, অনেকে প্রোৎসাহিত হইয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উৎসাহদাতা না থাকিলে প্রতিভা গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতিভা প্রকাশ পায় না। পূর্বকালে এই ভারতবর্ষে অনেকে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া গিয়াছেন, এখন আর সেরূপ লোক জন্মিতেছে না, তাহার কারণ কি? এখন ভারতবর্ষে তেমন বুদ্ধিমান লোক জন্মেন না, একথা বলা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। সেকাল একাল বলিয়া সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি বিষয়ে ইতর বিশেষ করা নাই। তদানীন্তন হিন্দুরাজগণ সংস্কৃত শাস্ত্রের অতিশয় আদর করিতেন, তাঁহারা পণ্ডিতগণকে যারপরনাই উৎসাহদান করিতেন। সুতরাং সংস্কৃত শাস্ত্রেরও সমধিক অনুশীলন হইয়াছিল। এখন সেরূপ উৎসাহদান নাই, সুতরাং সংস্কৃতের হীন দশা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর যেরূপ উৎসাহদান করিতেছেন, এইরূপ উৎসাহদাতা ও সদাশয় লোক যদি দুই চারিজন পাওয়া যায়, তাহা হইলে স্বল্পকালমধ্যে বাঙ্গালা ভাষার সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠে। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া সভ্যতা সহচর সদগুণ গ্রহণে বিমুখ হইয়া কেবল দোষগুলি গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা সদ্ব্যয় করিতে নিতান্ত কাতর হন, কিন্তু অসদ্ব্যয়কালে এককালে মুক্ত হস্ত হইয়া পড়েন, যাঁহাদিগের অসচ্চরিত্রতা দেখিয়া এতদ্দেশীয় ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ লোকেরা মনে করেন, লোক ইংরাজী পড়িলেই অসচ্চরিত্র হয়, তাঁহারা একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরদিগের ব্যবহার দর্শন করুন।

এই প্রস্তাবের উপসংহারকালে আর একটি কথার উল্লেখ করা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। রাজবাহাদুরেরা যখন বারান্তরে এইরূপ রঙ্গভূমির সৃষ্টি করিবেন, তখন যাহাতে নাট্যোক্ত স্ত্রী পুরুষদিগের কথোপকথনগুলি নৈসর্গিক হয়, সে চেষ্টা করেন। দাসীর মুখে সংস্কৃত শব্দ ভাল লাগিবে কেন? কি সামান্য লোক, কি ইতর লোক সকলেই রূপক উৎপ্রেক্ষা উপমা না দিয়া কথা কহেন না, ইহাই বা কিরূপে মিষ্ট

লাগিতে পারে? এ সকল গ্রন্থকারের দোষ বটে, কিন্তু রাজবাহাদুরেরা যখন সকল বিষয়েই অসাধারণ সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে গ্রন্থকারের দোষ দিয়া আপনারা শুদ্ধ হইলে চলিবে কেন?

আগড়পাড়ার নাট্যশালা। (১৭ পৌষ ১২৭৩)

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় নাটক অভিনয়ের যে সুপ্রণালী হইয়াছে, মফস্বলে তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। অভিনয় যে প্রকার হওয়া উচিত তাহা সম্পূর্ণরূপে কোন স্থলেই হইতেছে না বটে, কিন্তু এ বিষয়ে দৈনন্দিন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। নাটকের ভাষারও উন্নতি হইবে এ আশাও করা যাইতে পারে। এবিষয়ে অনেকের কুসংস্কার আছে যথার্থ, কিন্তু বিশুদ্ধ রুচির নিকট ইহা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। রঙ্গভূমির বন্দোবস্ত, কাঠগড়া প্রভৃতির অভাব অদ্যাপিও রহিয়াছে। কিন্তু যখন লোকে এই অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন ইহা শীঘ্র দূর হইবে সন্দেহ নাই। ৮ই পৌষ শনিবার আগড়পাড়ায় 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে জোড়াশাঁকোর সঙ্গত দল উপস্থিত ছিলেন। এই দলটি নূতন হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ যুবক। তথাপি আমরা সঙ্গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ পর্যন্ত সচরাচর ঢোলক, তবলা, তানপুরা, বেহালা ও মন্দিরা আমাদিগের সঙ্গীত যন্ত্র মাত্র ছিল, কিন্তু নূতন দলে ইংরাজি ফ্লুট (বাঁশী) ফ্লাজেন্ট, পিকলু (ছোট বাঁশী) ও বাম (বড় বেহালা) ইংরাজি যন্ত্র সকল লওয়া হইয়াছে। আমাদিগের প্রাচীন বীণা ও করতাল গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঠকগণ বৈষ্ণবদিগের করতাল মনে করিবেন না, এই করতাল চারিখানি অষ্ট অঙ্গুলি পরিমাণ লৌহ খণ্ড, প্রতিহস্তে দুইখানি লইয়া বাজাইতে হয় এবং ইহা বাজানও কঠিন। ইহা ভিন্ন সেতার তানপুরা এসরাজ বেহালা ও ঢোলক ছিল। সঙ্গীত দল অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে যবনিকা পতিত হইলে বাদ্য করেন। শ্রোতামাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ বাবু নীলমাধব ঘোষের ফ্লুট, বাবু যদুনাথ দত্তের বেহালা ও সর্বাপেক্ষা বাবু হরিমোহন কর্মকারের ঢোলক বাদ্য বিশেষ মনোহর হইয়াছিল। যেখানে যন্ত্র বাজান হয়, সেখানে বাজনার স্পষ্ট বোলগুলি বিশেষ মিষ্ট লাগে। তবে আমরা সঙ্গীত দলের একটি বিশেষ দোষ দেখিয়াছি। অভিনয়ের এক এক অঙ্ক শেষ হইবামাত্র সঙ্গীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলাম প্রতিবার সঙ্গীত দল অপ্রস্তুত ছিলেন। যন্ত্র মিলাইতে, কোনমতে বাজাইতে হইবে তাহা স্থির করিতে অনেক সময় যায়। এ সকল পূর্বে স্থির করা উচিত এবং একজন প্রধান না হইলে চলে না। যেখানে অস্ত্রাদি প্রদর্শন করিতে চাহেন, সেখানে বিশৃঙ্খলা ঘটে। আর একটি দোষ এই বড় বাঁশীর সংখ্যা কমান উচিত। দুই দুইটি করিয়া উভয়বিধ ফ্লুট রাখিলে যথেষ্ট। আর করতাল অপেক্ষা মন্দিরা অধিক মিষ্ট, অথচ যিনি করতাল বাজান তাঁহাকে রাত্রি শেষে উর্দ্ধবাহু হইয়া এক ঘটিকা কাল থাকিতে হয়। এ যন্ত্রটি পরিত্যাগ করা উচিত। ইহার শব্দ মনোহর নহে।

আগড়পাড়ার অভিনয় প্রকৃত নাটকাভিনয় নয়। ইহা যাত্রা ও নাটক মিশ্রিত। অভিনয়ের পূর্বে সেই সেকেলে আকড়াই বাজনা ও বেহালার গৎ, তৎপরে ধুব পদে শ্যামা বিষয়ের গীত শ্রুত হয়। যখন সঙ্গীত ছিল, তখন ইহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং গীত দুইটি অসংলগ্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ রঙ্গভূমি ভাল হয় নাই। সঙ্গীত দলের আর এক দোষ এই তাঁহাদিগের গৎ সকল প্রায় একঘেয়ে। সেই সেকেলে সামিয়ানার নীচে মাদুর ও সতরঞ্চি মাত্র উপবেশন জন্য দেওয়া হয়! পৌষ মাসে এ প্রকার স্থানে বসা সকল শরীরে পোষায় না। ভোজ ও সঙ্গীত সকল দেশে সুখের হয়, কিন্তু আমাদিগের দেশে বিড়ম্বনা মাত্র। বাটীতে গেলে সন্তোষকর আসনে বসিয়া থালায় অন্ন আহার করেন, নিমন্ত্রণ হইলে সদ্য পরিষ্কৃত তৃণাঙ্কুরপূর্ণ প্রাঙ্গণে জলের উপরে নিরাসনে বসিয়া বেলা তিনটার সময়ে কদলীপত্রে আহার করিতে হয়। সঙ্গীত হইলে বসিবার কষ্ট, হিম ও দুর্গন্ধ কষ্টদায়ক হয়। এদেশে সর্বসাধারণকে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে দিবার প্রথা থাকাতে বসিবার কষ্টদায়ক হয়, কিন্তু নাটকের অভিনয় বিশুদ্ধ রুচিবিশিষ্ট লোকেদেরই আমোদের জন্য হয়। এস্থলে শ্রোতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিলে ক্ষতি নাই। আগড়পাড়ার নাটকে দৃশ্যের মধ্যে কিছুই ছিল না। তবে আসরের উত্তরাংশে একটি কাগজের পথ ছিল এবং একটি বকুলের শাখা তাহার সম্মুখে বসাইয়া দেওয়া হয়, সুন্দর প্রথমতঃ আসিয়া তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাংশে এক ছাদের উপর হইতে মালিনী বিদ্যাকে সুন্দর দর্শন করাইয়াছিলেন। এটি বাটীর গঠনে হইয়াছিল এবং অন্যত্র অভিনয় হইলে এ সুবিধা থাকিবে না। নাট্যোক্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রঘটিত অনেক দোষ ছিল। বিদ্যার বস্ত্র খেমটাওয়ালীদিগের ন্যায় হয় এবং যে রূপে বক্ষঃস্থলের গঠন হয় তাহা অস্বাভাবিক এবং সামান্য বেশ্যারাও এই প্রকারে স্তন প্রদর্শন করিতে পারে না। বিদ্যা সংস্কৃত উত্তমরূপে জানিবেন, এ প্রকার স্ত্রীলোকের এমত বস্ত্র নিতান্ত অরুচিকর। সুন্দরের বস্ত্র কাঞ্চীপুরের বস্ত্র নহে, ইহা বর্তমান যুবক বাঙ্গালীর বস্ত্র পেন্টলুন, চাপকান ও জরির টুপি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চাপকান. পাজামা ও পাগড়ী দিবার কি ক্ষতি ছিল। কিন্তু ইওরোপীয় স্ত্রীলোকেরা বক্ষঃস্থলে যে ব্রচ (অলঙ্কার বিশেষ) ধারণ করেন রাজার শরীরে তাহা দৃষ্ট হয়। কোটাল ও প্রহরীদিগের বস্ত্র উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী কনস্টাবুলরি পুলিশের কোরতা ও ফরেজ টুপি ও বন্দুক ধারণ করিয়াছিলেন। অভিনয়কারিগণ সর্তক হইবেন, পুলিশের বস্ত্র ব্যবহার করিলে দণ্ডবিধির সহিত গোলযোগ হইবে। মালিনীর বেশ ঠিক হইয়াছিল, বিধবার বস্ত্র, কিন্তু দুশ্চরিত্র বিধবাদিগের ন্যায় সোনার দানা ও কেশবিন্যাস ছিল। সখিদিগের বস্ত্র ভাল হয় নাই, বিদ্যার সময়ে বাণারসি বস্ত্রের চলন ছিল না, ঘাগরা এ স্থলের বস্ত্র। আর বিদ্যা ও সখিদিগের নাকের নোলোক পরিত্যাগ করা উচিত। বালিকারা নোলোক পরিয়া থাকে, কিন্তু যে যুবতী গোপনে নায়ক আনিতে সাহসী হন, এমন বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তাহার এ বেশ নহে, এবং কোথাও আমরা বিদ্যার এ অলঙ্কারের বিষয় পাঠ করি নাই। এ সকল সামান্য দোষ বটে, কিন্তু অনেকগুলি সামান্য দোষ একত্রিত করিলে গুরুতর হয়। অভিনয়ের ব্যক্তিদিগের মধ্যে মালিনী সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক

অভিনয় করিয়াছিলেন, তবে সুন্দরের সহিত 'মাসী' সম্পর্ক হইলেও 'ভাই' বলাটা বড় কটু শুনাইয়াছিল। বিদ্যার সহিত সুন্দরের কথা, তাঁহার মন আকর্ষণ করা ও দূতীর প্রকৃত চতুরতা মালিনী প্রকাশ করেন। কোটালেরা ধরিলে সুন্দরের স্কন্ধে দোষ নিক্ষেপের চেষ্টা ও কাল্পনিক ক্রন্দন প্রভৃতি স্বাভাবিক হইয়াছিল। বিদ্যাও আপনার অংশ মধ্যবিধরূপে সম্পাদন করেন, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিতে হয় এমত বিদ্যা সর্বদা প্রদর্শন করা উচিত নয়। আমরা সুন্দরের অংশে সন্তোষলাভ করি নাই, বিদ্যার সহিত প্রথম আলাপের অঙ্গভঙ্গি বাক্য ও শ্লোকে অনেক আত্ম বৈপরীত্য প্রদর্শিত হয়। তবে বিদ্যার বিবাহকালীন ছাদনাতলায় সুন্দর 'বরটির' ন্যায় স্বাভাবিকরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং পূর্বের অভিনয় ঘটিত দোষ স্ত্রী আচারের সময়ের কানমলায় ক্ষালিত হইয়াছিল। রাজার অংশ উত্তম হইয়াছিল, আমরা এ ব্যক্তির গাম্ভীর্য বাক্য ও অঙ্গভঙ্গিতে যথার্থ সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম, তবে ভবিষ্যতে তাঁহাকে শ্মশ্রুহীন অবস্থায় প্রদর্শন না করিয়া যথার্থ ক্ষত্রিয়ের বেশে প্রদর্শন করা কর্তব্য হইতেছে। কোটালদিগের অংশও উত্তম হইয়াছিল, দর্শকেরা শেষে হিজড়াকে দর্শন করিয়া অকৃত্রিম আনন্দভোগ করেন। উভয় আকৃতি ও বস্ত্রে হিজড়ার কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না, কথা ও গানের ত কথাই নাই। অভিনয়কালীন যে সকল গান হয়, তাহার অধিকাংশ উত্তম বোধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রোতৃবর্গ বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতে বিশেষ আনন্দলাভ করেন। ইনি নট সাজিয়া ছিলেন। বস্তুত ইনি অভিনয়ের জীবন স্বরূপ ··যাহার তাহার মুখে ভাল লাগে না, এবং অঙ্গভঙ্গি গ্রাহকের অহঙ্কারের স্বরূপ। যদুবাবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রশংসার উপযুক্ত। প্রাতঃকালে দুইটি স্ত্রীলোকবেশধারী বালক নৃত্য করে, নৃত্য উত্তম হইয়াছিল এবং সেই সময়ে সঙ্গীতদলের বাদ্য আরও মনোহর হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমরা আগড়পাড়ায় শনিবার রাত্রি সুখে যাপন করিয়াছিলাম। শিশির ও বসিবার কষ্ট পীড়াদায়ক হইয়াছিল। এ পর্যন্ত অভিনয় প্রকৃত প্রণালীতে হইতেছে না, ইহাকে উৎকৃষ্ট যাত্রা বলিলেও চলে। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের যত্ন আছে, যখন অল্পদিনে এতদূর হইয়াছে তখন শীঘ্র উন্নতি হইবে এ আশা করা যাইতে পারে, এস্থলে আমরা একথা বলা কর্তব্যকর্ম জ্ঞান করিতেছি, রাজা সাধু ভাষায় প্রায় কথা বলেন, ইহাতে শ্রোতৃগণ অসন্তুষ্ট হন নাই। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ইতর চালিত কথা রাখিয়া আর সকল সাধুভাষা দিলে উত্তম হয় সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি শীঘ্র সর্বত্র নাটক অভিনয়ে সাধারণও এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন। আর যাঁহার যে গীত বলা উচিত তাহা হইলে ভাল হয়। শীঘ্র ইহা হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এটি যেন দৃষ্টি পথের বহির্ভূত না হয়।

শর্মিষ্ঠা নাটক একদিকে যেমন মধুসূদনকে সফল নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে অন্যদিকে মৌলিক নাটক রচনায় অন্যান্য নাট্যকারদের সামনেও প্রেরণা স্থাপন করে। মধুসূদন এরপর লেখেন পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)। শর্মিষ্ঠার

সঙ্গে সঙ্গেই লেখা হয়েছিল একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন।

দীনবন্ধু মিত্র বাঙ্গালীর নাট্যপিপাসা মেটাতে স্বর্গের মন্দাকিনী স্রোতধারা বহন করে নিয়ে আসেন। তাঁর নীলদর্পণ (১৮৬০), নবীন তপস্বিনী (১৮৬০), সধবার একাদশী (১৮৬৬), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬), লীলাবতী, (১৮৬৭) জামাই বারিক (১৮৭২) প্রভৃতি নাটক কোমলে কঠোরে স্বর ঝঙ্কারে জাতীয় জীবনকে অনুরণিত করে তোলে। মধুসূদন দীনবন্ধুর পর একে একে বিশিষ্ট বাঙ্গালী নাট্যকারদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৭২ সালের মধ্যে মনমোহন বসু, সমাচার দর্পণ ও বীণা সম্পাদক রাজকৃষ্ণ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, মশারফ হোসেন প্রমুখ নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটে। হিন্দুমেলার মাধ্যমে মনমোহন বসু প্রমুখেরা তখন জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয়তাবোধের সূত্রে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সচেষ্ট। বাঙালির জাতীয় রঙ্গশালা এই চিন্তারই ফসল। সেসময় প্রগতিশীল ধর্ম আন্দোলন জাতিকে চিন্তার দৈন্য থেকে উদ্ধার করেছে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রণোদিত করেছে। ন্যাশনাল এই নামটি তখন জাতীয় জীবনে অভয়মন্ত্রের মত কাজ করছে। সুতরাং ন্যাশনাল থিয়েটারের মধ্যে জাতির আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে ফেরা বিন্দুমাত্র আশ্চর্য ছিল না। ১৮৭২ সালে ন্যাশনাল থিয়েটার নীলদর্পণ নাটক নিয়ে যাত্রা সুরু করে।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক। বিদ্রোহের নাটক নীলদর্পণ একযুগ হল প্রকাশিত হয়েছিল। এই একযুগ ধরে বিতর্কমূলক এই নাটকটি সম্পর্কে বাঙ্গালীর আগ্রহের অন্ত ছিল না। কাজেই সাধারণ রঙ্গালয়ে এই নাটকের অভিনয়ের ফলে সাধারণ রঙ্গালয় অচিরে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। রঙ্গমঞ্চের এই জনপ্রিয়তা নাট্যসৃষ্টি ও নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিস্তৃত হয়েছে। অচিরে বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের জোয়ার এসেছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন : সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে যত নাটক রচিত হইয়াছিল, সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যের একশত বৎসরের ইতিহাসে এত সংখ্যক নাটক আর কোন দুই বৎসরে রচিত হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা বাংলা নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির মূলে কি অভূতপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিল।'[৬৪]

সোমপ্রকাশের ১৯ ফাল্গুন ১২৮০ সংখ্যায় নীলদর্পণের যে সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল তা উদ্ধৃত করছি। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ তৎকালীন নাট্যচর্চার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি করেছিলেন সেগুলিও অনুধাবনযোগ্য।

আধুনিক রঙ্গভূমি। ১৯ ফাল্গুন ১২৮০। ১৫ সংখ্যা।

কয়েক বৎসর অবধি দেশের রঙ্গভূমির বড় শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। নানা দিকে নানা সম্প্রদায় উৎসাহের সহিত অভিনয়কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়

নাটক লেখা যেন দেশীয় গ্রন্থকারদিগের এবং নাটক অভিনয় করা ও অভিনয় দর্শন করাই যেন যুবকদিগের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের যুবকগণ যখন যেদিকে গমন করেন তখন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াই সেদিকে ধাবিত হন। দেখিতে দেখিতে এক কলিকাতাতেই তিনটি প্রকাশ্য রঙ্গভূমি নির্মিত হইয়াছে। তিন সম্প্রদায় অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছেন। এমন কি এক সম্প্রদায় রঙ্গভূমিতে কুলটা অভিনেত্রী নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরি দেখাইয়াছেন। ঐ তিন সম্প্রদায়ই রঙ্গভূমিকে ব্যবসায়ের দ্বার করিয়াছেন। তাহা মন্দ নহে, কিন্তু তাঁহারা লাভবান হইতে পারিবেন কি না বিশেষ সন্দেহ। আজিও বাঙ্গালিদিগের সেরূপ ধনবৃদ্ধি হয় নাই যে আমোদার্থে মাসে এত ব্যয় করিতে পারেন। এক সেরূপ সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অধিক নয়, তাহাতে আবার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গভূমি। সম্ভবতঃ তিন সম্প্রদায়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে লাভ ও ক্ষতির উপর রঙ্গভূমিগুলির জীবন মৃত্যু নির্ভর করে তাহা হইলে তিনটি কখনই দীর্ঘজীবী হইবে না। যে সম্প্রদায়ের অভিনেতারা অপেক্ষাকৃত দক্ষতা দেখাইতে পারিবেন এবং যাঁহারা ভাল ভাল গ্রন্থকারদিগকে হস্তগত করিতে পারিবেন তাহাদেরই রক্ষা পাইবার অধিক সম্ভাবনা।

এক সময়ে ভারতবর্ষে দৃশ্যকাব্যের যথেষ্ট চর্চা হইয়াছিল। কালক্রমে সে সমুদায় বিকৃতভাব ধারণ করে। সম্প্রতি দেশের লোকের চিন্তার ও রুচির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় কার্য্যের উৎকর্ষ আবশ্যক রহিয়াছে এবং সেজন্য চেষ্টা হইতেছে। এই রঙ্গভূমি-গুলি তাহার ফলস্বরূপ। রঙ্গভূমির পুনরুজ্জীবনের আনুষঙ্গিক দেশের অনেক উন্নতি হইবে। প্রথম এই উত্তেজনায় অনেক গ্রন্থকারের শক্তি বিকশিত হইবে। অনেক ভাল ভাল নাটক রচিত হইবে, চিত্রবিদ্যা এবং সঙ্গীতবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইবে। অপরদিকে লোকের রুচি পরিষ্কৃত হইবে এবং ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হইলে দেশের ধর্ম্মনীতিরও উন্নতি হইতে পারে। ইহা ভিন্ন বঙ্গভূমির শ্রীবৃদ্ধি হইলে দেশের একটি বহু দিনের অভাব দূর হইবে। তাহা এই বালককে এক একবার খেলিতে না দিলে যেমন সে প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় সেইরূপ যে জনসমাজে লোকের বিনোদনের কোন প্রকার নির্দোষ উপায় নাই সে জনসমাজ প্রায় অকর্ম্মণ্য কিম্বা ধর্ম্মনীতিভ্রষ্ট হইয়া যায়। আমোদ চিরকাল মনুষ্যকে আকর্ষণ করিবেই করিবে কোনপ্রকার নির্দোষ আমোদের উপায় না রাখ, লোকে সদোষ আমোদের অন্বেষণে অগ্রসর হইবে। রঙ্গভূমির উৎকর্ষ হইলে সেই মহৎ অনিষ্ট নিবারিত হইবে। সভ্যসমাজ মাত্রেরই রঙ্গভূমি একটি প্রধান অঙ্গ। এই জন্য কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল সভ্যসমাজ মাত্রেরই রঙ্গভূমির উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যে উপলক্ষে রঙ্গভূমি সম্বন্ধে এত কথা বলিতেছি তাহা এই। আমরা গত বুধবার বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির রঙ্গভূমিতে মৃত দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। রঙ্গভূমিটি নির্ম্মিত ও

সজ্জিত করিতে অধ্যক্ষদিগের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। আলেখ্য পট, সমবেত বাদ্য প্রভৃতি অভিনয়ের সকল অঙ্গই সুন্দর ও মনোরম হইয়াছিল। মূল অভিনয়টির সম্বন্ধে কিছু বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। অভিনয় উৎকৃষ্ট লইলে কিম্বা অপকৃষ্ট হইলে তাহা বুঝিবার দুইটি লক্ষণ আছে। প্রথম নাটকখানি পড়িয়া না গেলেও যদি অভিনেতারা গ্রন্থকারের বর্ণিত চরিত্রগুলি ও ঘটনাগুলি দর্শকদিগের মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিতে পারেন তাহা হইলে সে অভিনয়কে উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেখিতে দেখিতে অভিনয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া দর্শকেরা যদি সে সমুদায়কে বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া মনে করেন এবং তদনুসারে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে হর্ষ-শোকে আন্দোলিত হইতে থাকে, চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে কিম্বা ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ হইতে থাকে তাহা হইলে সে অভিনয় উৎকৃষ্ট। এই দুইটি লক্ষণ অনুসারে বিচার করিতে গেলে সেদিনের অভিনয়কে উৎকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কেবল ক্ষেত্রমণির উদ্ধার প্রভৃতি দুই এক স্থানে অভিনয় বলিয়া মনে হয় নাই, নতুবা সকল স্থানেই অভিনয় বলিয়া মনে হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ করিয়া বলিতে গেলে ক্ষেত্রমণির মৃত্যুশয্যা, নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যা, বালকদিগের হস্তে ময়রাণীর নিগ্রহ, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এই কয়টা দ্বিতীয় শ্রেণী গণ্য, অপর সকলগুলি তৃতীয় শ্রেণী গণ্য। অভিনেতাদিগের মধ্যে তোরপ, উড সাহেব, রোগ সাহেব, পাত্রী, ক্ষেত্রমণি প্রথম শ্রেণী গণ্য, নবীনমাধব, গোলক বসু, সৈরিন্ধ্রী, সরলা, সাধুচরণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। অপর সকলে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

অভিনয় দেখিলে নাটককর্তার দোষগুণ অনেক জানা যায়। দীনবন্ধু বাবু নবীনমাধব ও তোরাপের চরিত্র দুইটি বড় চমৎকার করিয়াছেন। তোরাপের কথা বোধ হয় চিরদিন মনে থাকিবে। বড় বড় কথার আড়ম্বর না থাকিলে নবীন-মাধবের অভিনয়টি আরও উৎকৃষ্ট হইত। যাহা হউক সাধারণতঃ বলিতে গেলে অভিনয়টি সন্তোষজনক হইয়াছে। আমরা রঙ্গভূমির অধ্যক্ষদিগকে একটা পরামর্শ দিতেছি। তাঁহারা উত্তম উত্তম গ্রন্থ সংগ্রহের চেষ্টা করুন। কোন ক্ষমতাশালী গ্রন্থকারকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করুন এবং শিক্ষিত ও সুচতুর লোক দেখিয়া অভিনেতা নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের রঙ্গভূমির নিশ্চয় উন্নতি হইবে।

নাট্য-আন্দোলনের এই পরিবেশ গড়ে তুলতে বাংলা সংবাদপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে সংবাদপত্র নাট্য সমালোচনা প্রসঙ্গে নাটক অভিনয়ের জন্য নাট্যামোদীদের উৎসাহিত করেছেন এবং সে নাটক অভিনয় হলে সযত্নে নাট্য সমালোচনা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত এখানে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ও রুক্মিণী হরণ নাটক প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করব। ১৮৭২ সালের ১৬ জানুয়ারি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের রুক্মিণী হরণ নাটকটির সমালোচনা প্রসঙ্গে নাটকটি অভিনয়ের জন্য নাট্যমোদীদের উৎসাহিত করেন। অবশেষে নাটকটি ৫ মার্চ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটা

বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। পূর্ণচন্দ্রোদয় আবার ৮ মার্চ তারিখের সাংবাদপত্রে নাট্য সমালোচনা প্রকাশ করেন।

দুটি সমালোচনাই আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম।

রুক্মিণী হরণ নাটক

শ্রীযুক্ত বাবু সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় উপহার স্বরূপ উক্ত নাটকের একখণ্ড আমাদিগের নিকট অনুগ্রহপূর্বক প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তৎপ্রাপ্তে সৌরেন্দ্রবাবুর প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। নাটকখানি সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে এবং রাজা শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়কে উৎসর্গীকৃত। আমরা নাটকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।

…নাটকের রচনা অতি মধুর, বাক্য কৌশল অতি চমৎকার এবং নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি বৃন্দের মুখ বিনির্গত বচনগুলি যে প্রণালীতে রচিত হইয়াছে তাহার কিছুই অস্বাভাবিক নহে, বিশেষতঃ ধনদাসের বচনগুলি আমাদিগের আনন্দ অতুলপ্রদ হইয়াছে। …আমরা অনুরোধ করি সৌরেন্দ্রবাবু উক্ত নাটকখানির অভিনয় বিষয়ে মনোযোগী ও উৎসাহী হইয়া গ্রন্থকর্ত্তার সন্তোষ উৎপাদন এবং সাধারণের চিত্তবিনোদন করুন। নাটকখানি সাধারণের যে গ্রহণযোগ্য তাহা আর বলা বাহুল্য। (সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ১৬ জানুয়ারি ১৮৭২)

পূর্ণচন্দ্রোদয় নাটকটি অভিনয় করতে লিখেছিলেন। ১৮৭২ সালের ৫ মার্চ রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে নাটকটির অভিনয় হয়। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় নাটকটির যে সমালোচনা করেন তা হল এই :

রুক্মিণী হরণ নাটকাভিনয়

গত ৫ই মার্চ মঙ্গলবার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের পাথুরিয়াঘাটাস্থ ভবনে উক্ত নাটকের অভিনয় অতি সুন্দরভাবে নির্বাহ হইয়াছে নাটকখানি যেমন সুরসিক কবি কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে তেমনি তাহার অভিনয়ও সুবিজ্ঞ অভিনেতৃগণ দ্বারা অভিনীত হইয়াছে। সঙ্গীত এবং ঐকতান বাদনে শ্রোতৃগণ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। অভিনেতৃগণের মধ্যে ধনদাসের অভিনয়ে স্বভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই এবং তাহার ভাব প্রকৃষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান হইয়াছিল ও তাহাতে অভিনেতা অভিনয় চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে, অন্যান্য অভিনেতৃগণ যে অভিনয় বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন আমরা এরূপ বলিতেছি না, তাহাদিগেরও অভিনয় সুন্দররূপে নির্বাহ হইয়াছিল তবে ধনদাসের অভিনয় সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল এতদ্ব্যতীত প্রতিরূপগুলিও সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল রাজা বাহাদুর এই অভিনয় দ্বারা সময়ে ২ এতদ্দেশীয় জনগণের আমোদ…কেবল যে বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের পূর্বশ্রী বর্তমান সময়ে প্রবর্তিত করিতেছেন এমত নহে ইহা দ্বারা তাহার সারগ্রাহিতা এবং বিদ্যোৎসাহিতারও পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

একটি বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই ভবিষ্যতে যখন তিনি নাট্যাভিনয় করাইবেন কোন একটি প্রশস্ত স্থানে অভিনয়ের যে বন্দোবস্ত করিবেন, যাহাতে অধিক সংখ্যক দর্শক ও শ্রোতৃগণের সমাবেশ হইতে পারে।

শুভ গত পরশ্ব দিবসে সম্পাদকীয় প্রথম স্তম্ভে যে সুচারু বক্তৃতা প্রকাশ করিয়াছি তাহা গত মঙ্গলবারের টৌন হালে মহতী সভায় শোভাবাজারস্থ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর করেন তাহাতে হিন্দুসমাজে বহুতর আদৃত হইয়াছেন। (৩৭ খণ্ড, ৮ মার্চ ১৮৭২ সাল)

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা ও নাট্য-আন্দোলনের ফলে খেউড় হাফ-আখড়াই বিদ্যাসুন্দর পালার আদিরসপূর্ণ কুরুচিকর অপসংস্কৃতি থেকে সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের পথে বাঙালির যাত্রা সুরু হয়েছিল। শুধু মাত্র বিনোদনের মধ্যে সংস্কৃতিকে আবদ্ধ না রেখে তাকে জাতীয় বিকাশের সোপানে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল। ১২৮১ সালের ১ বৈশাখ সোমপ্রকাশে জনৈক পত্রলেখক লিখছেন :

"মহাশয়! চতুর্দ্দিকেই নাটকাভিনয়ের ধুম পড়িয়াছে। দিন দিন কত নাটকই অভিনীত হইতেছে এবং কতই নাটকাভিনয় সমাজ দেশময় সংস্থাপিত হইতেছে। দেশস্থ যুবকগণ একচিত্তে কেবল রঙ্গভূমির উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। এ প্রকার আমোদ নিন্দনীয় নহে। বৃদ্ধপিতামহকালের ক্রমাগত কুৎসিত পাঁচালী হাফ-আখড়াই প্রভৃতির উচ্ছেদ হইয়া দেশের রুচি ভিন্ন পথাবলম্বী হইয়াছে ইহা দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? সেকালের বৃদ্ধপিতামহের ন্যায় দেশীয়গণ অশ্লীল খেউড় গান বা ছড়াকাটাকাটি লইয়া আর বিবাদ করেন না। কবির লড়াই প্রভৃতির আমোদে বঙ্গবাসীগণের মন আর আমোদিত হইতে দেখা যায় না। এ সকল সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল আমোদের মধ্যে আমাদিগের একটি বক্তব্য আছে অদ্য তাহারই অবতারণা করিব।"

এই বক্তব্য হল পত্রলেখক এই সাংস্কৃতিক জোয়ারের মধ্যে কিছু কিছু শেওলা ভেসে আসতে দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে নতুন যুগের কয়েকটি বিখ্যাত নাটকের মধ্যেও অশ্লীলতা প্রশ্রয় পাচ্ছে। রঙ্গালয়ের পরিবেশের মধ্যেও কিছু কিছু রুচিবিকৃতি প্রকাশ পেতে থাকে। একথা ঠিক বাঙালি রক্ষণশীল সমাজ রঙ্গমঞ্চকে ঠিক খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। সংবাদপত্রের বহু চিঠিপত্রে সেযুগের বাঙালির এই রক্ষণশীলতার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেক প্রগতিশীল মতাবলম্বীও ছিলেন যাঁরা মনে করেছেন, 'আমাদের নাট্যশালাগুলি বিশেষরূপে সংস্কৃত ও নৈতিক অনুশাসনে পরিচালিত হইয়া পরিমার্জ্জিত রুচিবান ব্যক্তিবৃন্দের দর্শনোপযোগী হউক। উল্লিখিত নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিশেষ যত্ন পাইলেই প্রস্তাবিত বিষয়টি অতি সহজেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।' (সোমপ্রকাশ, চিঠি, ২৩ কার্ত্তিক ১২৮৮)

সে সময় ন্যাশনাল থিয়েটর সম্পর্কেও জনসাধারণের পক্ষ থেকে নানান অভিযোগ

উঠেছিল। রঙ্গমঞ্চ থেকে অভিনয়ের উচ্চ আদর্শ যদি দূরে সরে যায় তবে তার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। সুলভ সমাচার রঙ্গালয়ে সুরুচি ফিরিয়ে আনার জন্য বারবার আবেদন করেছেন। সুলভ সমাচার লেখেন :

"আমরা ন্যাশন্যাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে পাঁচ ছয়খানি পত্র পাইয়াছি। ঢাকা, চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান, বাঁশবেড়ে, শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েকস্থান হইতে পত্র আসিয়াছে। সকলেই একবাক্যে তীব্র রকমে অভিযোগ করিয়াছেন। আমাদের পাঠকদের এ বিষয়ে অপেক্ষা করা বৃথা। আজকাল লোকের রুচিই এই দিকে যাইতেছে। থিয়েটারের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া মদ খায় ও অভিনয় হলে মারামারি হুড়াহুড়ি করিয়া দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার করিয়া তুলে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন আমোদ করেন তখন আর এ দুরাচার কে নিবারণ করিবে? এখন আবার বাবুরা নিজের পরিবার লইয়া এই থিয়েটার করিয়া না বসেন এই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। আর দেশের লোকের নীতি ও পবিত্রতার উপর কি তেমন অনুরাগ আছে? কে ইহার প্রতিবাদ করিবে? (সুলভ সমাচার, ১৯ আশ্বিন ১২৮৬, ৪ অক্টোবর ১৮৭৯)

সুলভ সমাচার যে শুধু প্রতিবাদ করেছিলেন তাই নয় নিকৃষ্ট নাটকের তীব্র সমালোচনাও করেছিলেন। ১২৭৯ সালের ১৭ পৌষ সোমপ্রকাশেও উচ্চনাট্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হয়। এই প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা তা হুবহু উদ্ধৃত করলাম।

নাটকাভিনয়

জ্বর, ওলাওঠা, বসন্ত এ সকলের এক এক সময়ে মরসুম পড়ে, আজিকালি নাটকাভিনয়ের মরসুম পড়িয়াছে। যেখানে অভিনয়কারীর দল না হইয়াছে, সে গ্রাম বিরল। আমাদিগের পত্রপ্রেরকেরা স্থানে স্থানে অভিনয় হইতেছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এ আনন্দ প্রকাশ সুসংহত হইতেছে কি না? এ সকল অভিনয়ে দেশের ইষ্ট অথবা অনিষ্ট ইহার অন্যতর কি হইতেছে? নাটকাভিনয়ে উপকার আছে কি না? প্রায়শঃ এইগুলি বিবেচনা করা যাইতেছে।

মানুষ সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া যে সমস্ত বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করেন, নাটকাভিনয় তাহার অন্যতর মুখ্যতম কারণ। আলঙ্কারিকেরা "কাব্য রসাত্মক বাক্য" কাব্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন। দৃশ্য ও শ্রাব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। নাটক রূপকাদি দৃশ্যকাব্যের অনেকগুলি ভেদ আছে। শৃঙ্গার বীর করুণ রৌদ্র হাস্য ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত শান্ত এই নয় প্রকার রস। এক এক রসের এক একটি স্থায়ী ভাব আছে। রতি শৃঙ্গাররসের উৎসাহ বীররসের শোক করুণরসের ক্রোধ রৌদ্ররসের হাস হাস্যরসের জুগুপ্সা বীভৎসরসের বিস্ময় অদ্ভুতরসের শম শান্তরসের স্থায়ী ভাব। এই স্থায়ী ভাবগুলি বিভাব অনুভাব সঞ্চারিতভাবে মিলিত হইয়া সামাজিকদিগের হৃদয়ে রসতা প্রাপ্ত হয়। বিভাব দুই প্রকার আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন নায়ক নায়িকাদি,

উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রসের উদয় হয়। চন্দ্র চন্দন কোকিলাদি উদ্দীপন বিভাব। ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদি অনুভাব। শ্রম মত্ততা জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাব। অভিনয় শব্দের অর্থ অবস্থার অনুকরণ। এক ব্যক্তি রামের ও এক ব্যক্তি রাবণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গভূমিতে উপনীত হইল। রাম ও রাবণ যেরূপ পরস্পরের ক্রোধোদ্দীপক বাক্ প্রয়োগ ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন ভূমিকা গ্রাহীরাও সেইরূপ করিতে লাগিল কবির বর্ণনা চমৎকারিতাও অভিনয়কারিদিগের অভিনয় নৈপুণ্যের গুণে সামাজিকদিগের তন্ময়তা হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের মনে এমনি উৎসাহ বৃদ্ধি হইল, তাঁহারাই যেন রাম-ভাব প্রাপ্ত হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। কতক্ষণে রাবণ বধ হইবে তদর্থ তাঁহাদিগের অতিশয় ব্যগ্রতা জন্মিল। তৎকালে সামাজিকদিগের যে প্রকার মনোভাব হয়, সে সকল সহৃদয় ব্যক্তির অভিনয় দর্শনকালে ঐরূপ মনের ভাব হইয়াছে, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। তৎকালে যে কি অনির্বচনীয় আনন্দ ভোগ হয়, তাহা কহিয়া দিবার নয়, বুঝাইয়া দিবার নয়। যাঁহাদিগের সহৃদয়তা নাই, তাঁহারা তাহা কখন বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিবেন সে সম্ভাবনাও নাই। অভিনস সভ্য সমাজের অনির্বচনীর বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগের উপায় বলিয়া কালিদাস, সেক্সপিয়ার প্রভৃতি অনেক মহাকবি হইয়া গিয়াছেন। অভিনয়গত উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হিন্দু, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি এই আনন্দভোগ করিয়াছিলেন।

পাঠকগণ দেখিলে, অভিনয়ের কেমন উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে। এই অভিনয়প্রথা থাকাতে অনেক মহাকবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, এবং এক এক সভ্য সমাজ এক এক সময়ে বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে যে সকল অভিনয় হইতেছে, ইহার এই প্রকার উপযোগিতা আছে কি না, এখনকার এই জিজ্ঞাসা এদেশে বহুদিন অবধি যে একটি যাত্রা প্রথা হইয়াছে, উহা এই অভিনয়ের অপভ্রংশ। অপভ্রংশে বিশুদ্ধ ভাব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। উহাতে অনেক গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতাদি দোষ প্রবেশ করিয়াছে। উহা সভ্য সমাজের সমুচিত নহে। ঐ প্রথা থাকাতে রুচিবিকার জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব উহার উচ্ছেদ হইলেই সমাজের পরম মঙ্গল। উল্লিখিত অভিনয়প্রথা উহার উচ্ছেদ করিবার সুন্দর উপায় হইয়াছে। অনেকের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিয়াছে। কালক্রমে ভারতচন্দ্রের ন্যায় মহাকবিও জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু দুটি দোষের নিমিত্ত বর্তমান অভিনয়গুলি আমাদিগের রুচিকর হইতেছে না। প্রথম; যে নাটক রচিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ অপকৃষ্ট। সেগুলির রচনা যে কেমন চমৎকার, নিম্নলিখিত কবিতা দুটি পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

"কাস্তে হাতে নাচতে নাচতে কৃষ্ণ আসছে ঐ।
চূড়া ধড়া সব আছে ময়ুর পাখা কৈ?"
"বাড়ীর কাছে আছে তাল বোনা,
ডেক নারে কোকিল পাখী করি রে মানা।"

ইদানীন্তন অধিকাংশ বাংলা নাটকে এই প্রকার রচনা প্রবেশ করিয়াছে। গল্প রচনারও চাতুরী নাই। এরূপ রচনাপূর্ণ গ্রন্থ দ্বারা সমাজের উপকার না হইয়া রুচিবিকাররূপ অপকার ঘটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়, অধিকাংশ স্থলে বিদ্যালয়ের বালক ও শিক্ষক লইয়া অভিনয় করা হইতেছে। ইহাতে সমাজের যারপরনাই অপকারের সম্ভাবনা। লেখাপড়ার সময়ে আমোদের দিকে মন গেলে পড়াশুনা হয় না, এটি সিদ্ধান্ত বাক্য। আমরা বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি, যাহার মনে কাব্যরস প্রবেশ করে, তাহার ব্যাকরণ পাঠে প্রবৃত্তি থাকে না। বিশেষতঃ এদেশের লোকের শ্রমসাধ্য কার্যে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি নাই, আমোদেরই অনুরাগ অধিক। বাল্যকালে যদি সেই আমোদের পথের পথিক করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকে? আমরা দেখিয়াছি, অনেক বালক বিদ্যালয়ে দিব্য পড়াশুনা করিতেছিল, অভিনয় ধরিয়া লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া যারপরনাই জঘন্য হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ের বালক ও শিক্ষকগণ কোথায় সর্বদা পড়াশুনা লইয়া থাকিবেন, তাহা না হইয়া কেহ নাগরিকা সাজিতেছেন, কেহ ভগী চাকরানী হইতেছেন, কেহ গুরুমহাশয়ের পাঠশালার পড়ো সাজিয়া ময়রাণীকে ক্ষেপাইতেছেন, ইহা কি বিড়ম্বনা নয়? যাহারা অভিনয় করিতে যায়, তাহাদিগের অধিকাংশের চরিত্র মন্দ হইয়া যায়। যে প্রকার লোকের সংসর্গ হয়, তাহাতে যে চরিত্র মন্দ হইবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। যদি বিদ্যালয়ের বালক ও শিক্ষক ধরিয়া অভিনয় করিবার প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ী লোক দ্বারা অভিনয় করা হয়, আমাদিগের কোন আপত্তি থাকে না। পূর্বে ব্যবসায়ী লোক দ্বারা অভিনয় করাইবারই রীতি ছিল। প্রাচীন নাটকাদি পাঠ করিলে তাহাই স্পষ্ট বোধগম্য হইয়া থাকে।

বসন্তকুমারী নাটক। ১৪ ফাল্গুন ১২৭১। ১৫ সংখ্যা

ভাষার বিশেষজ্ঞতা ও আচার ব্যবহারাদির সবিশেষ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কাহার নাটক ও রচনা করিয়া কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এক সমাজের লোকের অপর সমাজের এসকল বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের এই সংস্কার ছিল, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি অন্য সমাজের লোকেরা আমাদিগের সমাজের বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচনা করিয়া কখন কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু বসন্ত-কুমারী নাটকখানি আমাদিগের এ সংস্কারকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার প্রণয়নকর্তা মুসলমান। নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার আমাদিগের আচার ব্যবহারাদিগত নিগূঢ় বৃত্তান্তগুলি সূক্ষ্মরূপে অবগত হইয়াছেন। নাটকোক্ত প্রতি ব্যক্তির আচরণ কথাবার্তা ভাবভঙ্গী আমাদিগের সমাজের অনুরূপ হইয়াছে। পাঠকালে কোনরূপেই এরূপ বোধ হয় না যে মুসলমানে এখানি লিখিতেছেন। রচনাতেও মুসলমানগন্ধ নাই। যাঁহারা বলেন, আমরা যে ভাষায় কথোপকথন করি, সেই ভাষায় গ্রন্থ না লিখিলে বাংলা ভাষার উন্নতি হইবে না, তাঁহারা দেখুন, তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত কেমন অপসিদ্ধান্ত। বসন্তকুমারী নাটককার সাধু

বাংলায় গ্রন্থ না লিখিয়া যদি চলিত ভাষায় লিখিতে যাইতেন, তিনি নিঃসংশয় মুসলমান বলিয়া ধরা পড়িতেন, তাঁহার গ্রন্থ অনাদরোপহৃত হইত সন্দেহ নাই। সাধু বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন প্রবৃত্তি ও চেষ্টা ব্যতিরেকে বাংলা ভাষার উন্নতি সম্ভাবনা নাই, এতদ্দ্বারা এ সিদ্ধান্তও অজ্ঞাত বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতেছে।

আমরা গ্রন্থের প্রশংসা বিষয়ে এতক্ষণ অনেক বলিলাম, এখন দোষের বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই একটি প্রস্তাবনা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এটি লিখিয়া যে কি ইষ্টলাভ হইয়াছে, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, সংস্কৃত নাটককারদিগের অনুকরণ করিয়া গ্রন্থকার ইহার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃত কবিরা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, ইনি সে পথে যান নাই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা প্রস্তাবনার এই লক্ষণ করিয়াছেন :

"নটী বিদূষকোবাপি পারিপার্শিক এববা।'
সূত্রধারণে সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে।

একথা ঠিক রঙ্গভূমিতে অনেক অভদ্র আচরণ, অভিনেত্রীদের কুৎসিত কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী, বিলোল কটাক্ষ এবং দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা হৈ হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের একটি নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দর্শকরুচির এই নিম্নগামিতা অনেক রক্ষণশীল বাঙালির মত বাংলা সংবাদপত্রও বরদাস্ত করতে পারেননি। সে সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমে বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয়ে কলানৈপুণ্যের সঙ্গে রুচিশীলতার সার্থক প্রয়োগ ঘটে। সোমপ্রকাশের জনৈক নাট্য সমালোচক বলেছিলেন, 'যতদিন ভারত সমাজ উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ সভ্যতার সুবিমল আলোকে সমুজ্জল না হইবে, যতদিন ভারতের সম্ভ্রান্ত বংশজাত নরনারী রঙ্গভূমিতে না নামিবেন ততদিন সেইরূপ পূর্ণ উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র।' (২৩ কার্তিক ১২৮৮)

সোমপ্রকাশের ওই পত্রলেখক আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের কুয়াশা কেটে গেছে। এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী উত্তরোত্তর নাট্য-আন্দোলনের পথে ব্রতী হয়েছেন। নাটক ও মঞ্চ ক্রমশ জাতীয় আন্দোলনের অনুবর্তী হয়ে পড়েছে। তার সাহিত্যগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সৃজনের যুগে বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের সজাগ প্রহরা না থাকলে তা অতি দ্রুত ব্যাপ্তি ও পুষ্টিলাভ করতে পারত কি না সন্দেহ।

———

উপসংহার

১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত নবজাগরণের ভাববন্যা-প্লাবিত বঙ্গদেশে বাঙালির সংবাদপত্র সাধনার দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত করলাম। ষাট বছরের বাংলা সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখিয়েছি, বাঙালির নবজাগরণ বাংলা সংবাদপত্রকে অবলম্বন করেই সঞ্চারিণী লতার মত পল্লবিত হয়েছে। বাঙালি রেনেশাঁস ছিল মূলতঃ সাহিত্য নির্ভর—শিল্পে বা স্থাপত্যে রেনেশাঁসের প্রভাব সাহিত্যের মত অতখানি গভীর ছিল না। প্রগতিশীল সংস্কার কর্মে, মানবমুক্তির যে কোন প্রচেষ্টায় চিন্তাবিদদের আত্মপ্রকাশের সঙ্গত প্রয়োজন ছিল এবং সাধারণ্যে এই আত্মপ্রকাশের একমাত্র সেতুবন্ধ ছিল সাহিত্য ও সংবাদপত্র। দ্বিতীয়ত বাঙালির রেনেশাঁস সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই আপন পথের হদিশ পেয়েছিল। একদিকে যেমন কর্মযজ্ঞে পূর্ণ ঘৃতাহুতি দেবার জন্য বহু মনীষী আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, অন্যদিকে বিতর্ক এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রেনেশাঁসের পথকে তাঁরা সুবিস্তৃত করেছিলেন। এই বিতর্ক, আলোচনা ও সম্প্রচার ত্রিবিধ দায়িত্ব পালনের জন্য যে গণমাধ্যমের প্রয়োজন ছিল বাংলা সংবাদপত্র সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার ও ইংরাজী সংবাদপত্রের ঐতিহ্যের প্রতি অনুসরণ, রেনেশাঁস প্লাবিত বাংলাদেশের চিন্তানায়কদের বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে।

সেদিন বাংলা সংবাদপত্র এযুগের সংবাদপত্রের মত বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়নি। বিজ্ঞাপনদাতাদের উদার হস্ত পত্রিকার আর্থিক দৈন্য দূর করে তাকে স্বয়ংনির্ভর করে তুলতে পারে নি। অভিজ্ঞ কারিগরিবিদ্যার অভাব ছিল। বৃত্তিগত ব্যুৎপত্তিও ছিল অনুপস্থিত। সেসময় দীর্ঘকালের সঞ্চিত পরাধীনতা অন্তরের দীনতার পরিধিকে এতখানি বিস্তৃত করে তুলেছিল যে শিক্ষিত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ আপন মাতৃভাষা সম্পর্কে হয় উদাসীন না হয় বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ জার্মানির মার্টিন লুথার, ইংলণ্ডের উইক্লিফ, আয়ারল্যাণ্ডের সেণ্ট প্যাটরিক, ফ্রান্সের ম্যারট প্রমুখেরা যেমন মাতৃভাষাকে গণসংযোগের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি উনিশ শতকের বাংলাদেশের রেনেশাঁসের পথপ্রদর্শকরাও বাংলাভাষাকে উপেক্ষা ও অবহেলার পথের ধূলা থেকে উদ্ধার করে তাকে জাতির হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁদের এই যাত্রা পথ সর্বদা নির্বিঘ্ন ছিল না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আদর্শবাদী মিশনারীদের মত আন্তরিক ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় পত্র সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেই লিখেছিলেন : "যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িকপত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনাপাঠে বিমুখ। ইংরাজী প্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান

আছে যে, যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল শূন্য, নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র, ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাংলায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব? ইংরাজি লেখক ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন খাঁটি বাঙালির সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

একথা কৃতবিদ্য বাঙালিরা কেন যে বোঝেন না, তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজিতে হয়, তাহা কয়জন বাঙালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়সঙ্গত না করিতে পারে? যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল শিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সকল কথা নয়, তবে তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিনকালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিনকোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না।"

এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে গণমাধ্যম বা মাস মিডিয়াতে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যানুসারী সমাজব্যবস্থায় স্বভাবতই কতকগুলি বিপদ দেখা দিয়ে থাকে। লোকসঙ্গীতে, কাব্যে, পাঁচালীতে, ছড়ায় এবং পরস্পরের প্রতি আলাপ ব্যবহারে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা প্রথা-সম্মত এবং স্বীকৃত। সংবাদপত্র যে দেশে নবীন সৃষ্টি সেখানে কোন প্রথা নেই। তাই বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদকদের কাছে গোটা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত হয়েছিল। সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করলে তা জনসাধারণের বোধগম্য হওয়া মুশকিল আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করলে তা 'ভালগার' বলে গণ্য হবার সম্ভাবনা। এজন্য অনেক দেশে এমত পরিস্থিতিতে সংবাদপত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন বিদগ্ধ জনের ভাষাকে সংবাদপত্রের বাহন করেছেন এবং তার ফলে সাধারণ মানুষ থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু বাঙালি সাংবাদিকেরা এক্ষেত্রে মধ্যপথ অনুসরণ করায় তাঁরা স্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণ থেকে দূরে সরে যান নি। সংবাদপত্রের ভাষাকে সংস্কৃতের জটাজ্‌ট থেকে মুক্ত করায় সে ভাষা শিক্ষিত জনসাধারণের কাজে হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য চলিত ভাষা বা সাধারণের মুখের ভাষা সংবাদপত্রের ভাষা হয়ে উঠতে অন্তত আরও একশ বছর সময় লেগেছে।

অবশ্য উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনাকালে কোন পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে এইসব সংবাদপত্রগুলির প্রকৃত গণমাধ্যম হিসাবে পরিগণিত হতে পারে কী না? প্রচারসংখ্যার স্বল্পতা এবং দেশজুড়ে নিরক্ষর জনসংখ্যার আধিক্য এইসব সংবাদপত্রকে প্রচলিত অর্থে গণমাধ্যমে পরিণত করেনি। এগুলির প্রচার প্রধানত বিশেষ শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব পত্রিকাগুলি রেনেশাঁসের আদর্শে জনগণকে প্রণোদিত করে তুলেছিল কী করে? এর উত্তর গণমাধ্যম কখনই সরাসরিভাবে সমাজ পরিবর্তনে সাহায্য করে না। গণমাধ্যম একধরনের চেতনা বা উপলব্ধির সৃষ্টি করে। পরিবর্তন যে প্রয়োজন এই মর্মে এক চেতনা পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

Ithel de Sola Pool বলেছেন, গণমাধ্যমের দ্বারা ব্যক্তিমানসের ওপর আট রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সেগুলি হল, attention, saliency, information, skills, tastes, images, attitudes ও action। এর মধ্যে attention ও information-এর ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের আবেদন প্রত্যক্ষ। উনিশ শতকের এই সংবাদপত্রগুলি দেশবাসীর মনকে যে সমাজমুখী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই এবং তথ্য ও জ্ঞানের প্রচারেও এই সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

তবে নতুন কোন মত বা পথ গ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তিগত উৎসাহ দান বা pursuation একান্ত প্রয়োজন। আর এই pursuation সম্ভব। সম্মানীয় কোন অভিমত নেতার (opinion leader) হস্তক্ষেপের ফলে, উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকাগুলির পাশাপাশি এই ওপিনিয়ন লিডারদের কাজকর্ম সমাজ পরিবর্তনে অনেকখানি সাহায্য করেছে। সংবাদপত্রে যে পরিবর্তনের বাণী ধ্বনিত হয়েছে এবং তার ফলে যে সামাজিক চেতনাবোধের সৃষ্টি হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়েছেন সমাজনেতারা। যেমন বিদ্যাসাগর তাঁর লেখার দ্বারা যে সামাজিক চেতনাবোধের সৃষ্টি করেছিলেন শুধুমাত্র সেই চেতনা কখনই বিধবা বিবাহে সমাজকে প্রণোদিত করত না, যদি না বিদ্যাসাগর স্বয়ং সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে না নেমে পড়তেন। শুধু গত শতাব্দী কেন, পরবর্তী কালেও ইউনেসকো সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভারতবর্ষের গ্রামে রেডিও ব্রডকাস্ট কোন শ্রোতার মনে রেখাপাত করেনি। কিন্তু যখন শ্রোতাদের মধ্য থেকে গোষ্ঠী নির্বাচন করে কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তখন শ্রোতারা কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। (J. C. Mathur and Paul Neurath, An American Experiment in Farm Radio Forums, Unesco, Paris, 1959)

এছাড়া গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে জ্ঞান ও তথ্যের যে দিগন্ত উন্মোচিত হয় তার ফলে নাটক সাধারণের মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ (common set of values and attitude) গড়ে ওঠে। দূর ও নিকটের মানুষের

মধ্যে আত্মিক মেলবন্ধন ঘটে এবং সব মিলে গোটা সমাজ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই ঐকমত্যকে সমাজতাত্ত্বিকরা বলেছেন consensus বা ঐক্যচেতনা। এই ঐক্যচেতনা পরিণত হয় সাংস্কৃতিক সাযুজ্যবোধে (Cultural homogenity)। উনিশ শতকে সংবাদপত্র যে জাতিকে কীভাবে ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে তা আমরা পূর্বেকার পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি।

তবে গণমাধ্যমের পক্ষে সামাজিক পরিবর্তনের বাণীকে একমাত্র অবলম্বন করে তোলার আবার বিপদও আছে। এর ফলে গণমাধ্যমের সার্বজনীন চাহিদা বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

Walter Gieber তাঁর People, Society and Mass Communication গ্রন্থে বলেছেন, জনসাধারণ গণমাধ্যমকে বিনোদন হিসাবেই গ্রহণ করে এবং তাঁরা যা বিশ্বাস করে তার মূলে কুঠারাঘাত করলে তখন তার বিনোদন মূল্য থাকে না বলে অধিকাংশ গণমাধ্যমই জনসাধারণ যা বিশ্বাস করে তাকেই সমর্থন করে চলে। এর ব্যতিক্রম ঘটাতে গেলেই সংবাদপত্রের চাহিদা হ্রাস পায় (পৃঃ ১২), একারণে উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকার মধ্যে চন্দ্রিকা কৌমুদী অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তবে তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত কোন পরিবর্তনের বাণী কার্যকর হবে কিনা তা নির্ভর করে বক্তব্য বিষয়, বক্তব্য প্রকাশভঙ্গি ও সামাজিক পরিবেশের ওপর (পৃঃ ১৩)। এখানে ব্যক্তিত্বের বড় ভূমিকা। Gieber বলেছেন, cross pressure অনেককে mass media-র প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। নেতার প্রতি আনুগত্যের জন্য একদল ব্যক্তি cross pressure-এর বশবর্তী হন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর অনুগামীরা এ কারণেই সংবাদপত্রের বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এ ছাড়া আগের কথার সূত্র ধরে আরও বলা যেতে পারে উনিশ শতকে বাঙালির রেনেশাঁস সম্ভব হত না যদি গণমাধ্যম ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রচার ও সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠন না থাকত। কারণ mass media alone unlinked to word of mouth communication fail in producing action but do create information and desires. (The Mass Media and Their Inter personal Social Functions in the Process of Modernisation, Ithel de Sola Pool. People Society and Mass Communication, Lewis Anthony Dexter, p. 431.)

সমাজ পরিবর্তনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উনিশ শতকে যেসব সংগঠনগুলি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি সংবাদপত্রের পরিপূরক হিসাবে যথাযথ কর্তব্য পালন করেছে। দ্বিতীয়ত সংবাদপত্র হল গণজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যম। এবং গণজ্ঞাপনের প্রধান শর্ত হল: তা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা সমাজে গৃহীত হবে, তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা থাকবে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হবে (বাংলা সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত যাবতীয় মেসেজ বা বার্তা এই চতুর্বিধ শর্তই পালন করেছে, বিশেষ করে

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও মন্তব্য অতি দ্রুত সরকারের নজরে এসেছে। এবং সরকার বাংলা সংবাদপত্রের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েও ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮৭৩ সালের ১৭ আগস্ট ভারত সরকারের সচিব বাংলা সরকারের কাছে এক চিঠি লিখেছিলেন, বাংলা সরকার যেন বাংলা সংবাদপত্রগুলিকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেন। তার উত্তরে ১৮৭৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বাংলা সরকারের অস্থায়ী সচিব সি. ই. বার্নার্ড যে চিঠি লেখেন, তাতে এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাংলা সংবাদপত্রকে সরকারী প্রভাবাধীনে আনা অত্যন্ত মুশকিল ছিল। "With reference to paragraph 3 of your letter which expresses a belief that the Government and its officers can by the influence of their position, prevent Native Journalists from abusing the freedom of the Press, the Lieutentant Governor must ask leave to disclaim the power of thus influencing the Native Press. He is very decidedly of opinion that, as things now stand, he could not attempt to do so without entailing worse evils than those we desire to remedy.

The Lieutenant Governor therefore trusts that he will be excused from attempting this task."

সুতরাং এর দ্বারাই প্রমাণ হবে যে সংবাদপত্রগুলি আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি ক্ষুদ্র ছিল না। সুতরাং বাংলা সংবাদপত্র সহজেই শাসকশ্রেণী ও শিক্ষিত জনসাধারণের নজরে এসেছে। এবং তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সমাজ পরিবর্তনের বাণী সমাজে গৃহীত হয়েছে। এই বাণীর যথার্থ ব্যাখ্যান হয়েছে সম্পাদকীয় কলমে, বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং চিঠিপত্রের স্তম্ভে। এই সব আলোচনা ও ব্যাখ্যান অংশগুলি এত সারগর্ভ ছিল যে তার গুণগত মূল্য পরিমাণগত মূল্যকে ছাপিয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয়ত সংবাদপত্রের কারিগরি উৎকর্ষের অভাব পূরণ করেছিল 'সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি'। কঠিন-কোমল, তিক্তকষায় এবং কখনও অম্লমধুর এবং সর্বদাই সাহিত্য-রসসম্পৃক্ত এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি বাঙালির সংবাদপত্র পাঠের অভ্যাসকে যথেষ্টই প্রভাবিত করেছে। সংবাদের চেয়ে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ফিচার এবং বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনের প্রতি বাঙালি যে আজও অধিকতর আগ্রহ পোষণ করে নবজাগরণের ব্রাহ্মমুহূর্তের সাংবাদিকরীতি থেকেই তার উদ্ভব। সংবাদপত্রের প্রতি আস্থা এবং তার মন্তব্য ও মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্বদান বাঙালি চরিত্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি সহ সেযুগের সাংবাদিক রচনাগুলি যে তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছিল তার কারণ এটি নয় যে সেগুলি শুধু সাহিত্যগুণ-সম্পৃক্ত ছিল, তার বড় কারণ সেযুগের সম্পাদকেরা প্রকৃত অর্থে মুক্ত ছিলেন। সংবাদপত্র বৃহৎ পুঁজির অঙ্গীভূত ছিল না এবং পুঁজিবাদের স্বার্থে সম্পাদকীয় কলমকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়নি। দ্বিতীয়ত জনরুচির মুখাপেক্ষী সাংবাদিককে গ্যালারির দর্শকদের তুষ্ট করার দায়ভাগ পোহাতে হয়নি। সম্পাদকেরা অধিকাংশই

সংবাদপত্রের মালিকানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাজেই কী লেখা হবে তার দৈনন্দিন নির্দেশের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হত না। H. Bagikian তাঁর 'The press and its Crisis of Identity' প্রবন্ধে বলেছেন: "আজকের বৃহৎ সংবাদপত্র পুঁজির মালিকেরা নিঃসন্দেহে সম্মানীয়। তবে হারসট, পুলিৎজার ও স্ক্রিপস আজ আর তাঁদের আমলের মতে করে সংবাদপত্র চালাতে পারতেন না। এর কারণ তাঁরা খারাপ লিখতেন তা নয়, তাঁদের লেখাগুলো আজকের দিনের মাপকাঠিতে বড় বেশী বৈপ্লবিক ও বিদ্রোহী বলে গণ্য হত।" (Mass Media in a Free Society, Edited by Warren K. Agee, p. 10)

একথা তৎকালীন বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তবে অন্তর সম্পদে যথেষ্ট বলীয়ান হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক দৈন্য এবং পরিচালনাগত নানান ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে ওই সব সংবাদপত্রের অধিকাংশের পক্ষেই দীর্ঘজীবন লাভ সম্ভব হয়নি। বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের মহাসমুদ্রে ক্ষণিকের জন্য আবর্ত তুলে এই পত্র-পত্রিকাগুলি আবার সমুদ্রের অতলে নিঃশব্দে বিদায় নিয়েছে। বিশেষ করে প্রচলিত ভাবনা অনুসারে সংবাদ তো ক্ষণিকের ফসল। তার আয়ু চব্বিশ ঘণ্টা—বড় জোড় এক সপ্তাহ। ক্ষণিকের আবর্ত থেমে গেলে মহাকাল সমুদ্রের বুকে আর পূর্বের আলোড়নের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি তা বিস্ময়করভাবে মহাকালকে অতিক্রম করেছে। শুধু সংবাদপত্রের গবেষকের কাছেই নয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি-অনুসন্ধানী যে কোন পাঠকের কাছে তার আবেদন এখনও অম্লান। উনিশ শতকের সংবাদপত্র থেকে নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ ও বঙ্গদর্শনের সম্পূর্ণ সেটের পুনঃপ্রকাশ এবং এযুগের পাঠকসমাজে তার সমাদর এই ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রমাণ করে।

আর উনিশ শতকের এইসব সংবাদপত্রের ক্ষুদ্র জীবন এবং পরিমিত সঙ্গতির প্রতি কটাক্ষ না করে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার সঠিক পরিমাপ করাই উচিত। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র আরও যে কথা বলেছিলেন সেই কথার মধ্যেই উনিশ শতকের সংবাদপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেই কথার পুনরাবৃত্তি করে এই গ্রন্থ শেষ করলাম।

"এ জগতে কিছুই নিষ্ফল নহে। একখানি সাময়িকপত্রের ক্ষণিক জীবনও নিষ্ফল হইবে না। যেসকল নিয়মের বলে, আধুনিক সামাজিক উন্নতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই সকল পত্রের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু তাহারই প্রতিক্রিয়া। এই সকল সামান্য ক্ষণিক পত্রেরও জন্ম অলঙ্ঘ্য সামাজিক নিয়মাধীন, মৃত্যু ঐ নিয়মাধীন, জীবনের পরিণাম ঐ অলঙ্ঘ্য নিয়মের অধীন। কালস্রোতে এই সকল জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদস্বরূপ ভাসিল, নিয়মবলে বিলীন হইবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত বা হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এ সংসারে জলবুদ্বুদও নিষ্কারণ বা নিষ্ফল নহে।"

নির্দেশিকা : মুখবন্ধ ও প্রারম্ভ

১। Development of American Journalism Sidney Kobre. W. M. C. Brown Company. N. Y. P: Peropective.

২। ঐ পৃ: ১৫১

৩। দি প্রেস অ্যাণ্ড অ্যামেরিকা গ্রন্থে অধ্যাপক এডউইন ইমরে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত সংবাদপত্রের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন এইভাবে। (১) পত্রিকাটি অন্তত সপ্তাহে একবার প্রকাশিত হবে। (২) পত্রিকাটি মুদ্রিত হবে। (৩) যে কোন ব্যক্তি দাম দিয়ে পত্রিকাটি কিনতে পারবেন। (৪) জনসাধারণের আগ্রহ আছে এমন জ্ঞাতব্য যে কোন বিষয়ই এতে ছাপা হবে। (৫) সাধারণ পাঠকের কাছে তার প্রকাশভঙ্গি বোধগম্য হবে। (৬) পত্রিকাটির প্রকাশ নিয়মিত হবে। (৭) পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হবে (পৃ: ৫)। এই সংজ্ঞার বাইরে কোন পত্রপত্রিকা পড়লে তাকে বাংলায় সাময়িকপত্র বলা হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনা মোটামুটি সংবাদপত্রের ওপরেই নিবদ্ধ। তবে কয়েকটি সাময়িকপত্রের ওপর আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে গেছে।

৪। রামমোহনের কলকাতায় বসবাসের তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। অধ্যাপক এইচ ডি. উডওয়েল তাঁর পলিটিক্যাল ইণ্ডিয়া ১৮৩২—১৯৩২ : এডিটেড বাই স্যর জন কমিং গ্রন্থের পৃষ্ঠায় রামমোহনের কলকাতা আগমনের সময় ১৮১৪ বলেছেন। শ্রী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থেও ১৮১৪ বলা হয়েছে। আবার রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য (প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়) গ্রন্থে রামমোহনের কলকাতা আগমন ও বসবাসের তারিখ ১৮১৫ বলা হয়েছে।

৫। তুহফাৎ উল মুওয়াহিদ্দিন (লিথোছাপা) আরবী গ্রন্থ। ১৮০৩—০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায় ১৮২১ শক বৈশাখ —ভাদ্র মধ্যে ৮ সংখ্যায় অনূদিত হয়। রামমোহন রায় ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৬। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ৫১

৭। দিগ্‌দর্শন। দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা, শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : জনক্লার্ক মার্শম্যান। বাঁ দিকে ইংরাজী রচনা ডানদিকে তার বাংলা তর্জমা থাকত। প্রথম সংখ্যার কয়েকটি বিষয়সূচী : পৃথিবীর বিভাগের কথা। আমেরিকার প্রথম দর্শন। চুম্বক পাথরের প্রথম অনুভব। চুম্বক পাথর হইতে কোম্পাস সৃষ্টি। কোম্পাসের আকার ইত্যাদি।

৮। সমাচর দর্পন প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ১৮১৮ সালের ১৮মে হরচন্দ্র রায় নামে এক ব্যক্তি বাঙ্গাল গেজেটি নামে যে সাপ্তাহিক

পত্রিকা প্রকাশ করেন তাকেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। এই পত্রিকার মুদ্রক ছিলেন তৎকালীন মুদ্রণ-দক্ষ বাঙালী গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই পত্রিকার কোন সংখ্যা আবিষ্কৃত হয়নি, এমনকি মাত্র ৮ দিন পরে প্রকাশিত সমাচার দর্পণের কোন সংখ্যাতেও এই পত্রিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে ১৮১৮ সালের ৯ জুলাই গভর্ণমেন্ট গেজেটে এই পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া আছে। এশিয়াটিক জার্নালে বলা হয়েছে রামমোহনের সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ পুস্তিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বাঙালি পরিচালিত একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এ থেকে অনুমান করা হয়, বাঙ্গাল গেজেটিই ওই পত্রিকা, সম্ভবত ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল।

কিন্তু যেহেতু ওই পত্রিকার কোন সংখ্যা আর পাওয়া যায় না সেহেতু সমাচার দর্পণকেই আমরা প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে অভিহিত করছি। শ্রীরামপুর কেরী লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সমাচার দর্পণের প্রথম কয়েক বছরের সংখ্যাগুলি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

৯। The Good Old Days of John Company, W. H. Carey. p. 53.

১০। Corporation of Calcutta Year Book, 1972-73 p. 8.

১১। John Company At Work, Holden Furber, Cambridge, Harvard University Press. p. 25. According to survey made by Grandpres, the population of Calcutta in 1800 was 5 lakhs, Corporation Year Book.

১২। Ibid, p. 25.

১৩। Appendix to the Report from the Select Committee. 1833. p. 316.

১৪। History of American Press : James Melvinlee.

১৫। The Indian Press. Margarita Barns. George Allen and Unwin Ltd. p. 44.

১৬। Echoes from Old Calcutta : Busteed, p. 183.

১৭। ১৬৯০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বেঞ্জামিন হ্যারিস প্রথম মার্কিন সাময়িকপত্র বার করার চেষ্টা করলে সেটিকে বন্ধ করার চেষ্টা হয়। History of American Journalism By James Melvinlee.

১৮। Dev of American Journalism. S. Kobre p. p. 6.

১৯। The March of Journalism, Harold Herd, George Allen & Unwin Ltd. London. p. 24.

২০। The Newspaper in India, Hemendra Prosad Ghosh. p. 4.

২১। The Press in England, Kurt Von Stutterhein, p. 30.

২২। Encyclopaedia Britanica. Vol. 16, p. 335.
২৩। The March of Journalism, Harold Herd. p. 52.
২৪। Ibid p. 53.
২৫। The Indian Press, p. 46.
২৬। Ibid p. 49
২৭। Ibid p. 48.
২৮। Echoes From Old Calcutta, Busteed. p. 167.
২৯। The Indian Press.
৩০। Calcutta Journal, Sept. 22, 1818.
৩১। Parliamentary Inquiry into Claims of Mr. Buckingham on the East India Company. p. 4, London 1834.
৩২। Calcutta Journal. Sept. 22, 1818.
৩৩। Speech of Mr. Buckingham, Carey library. p 5.
৩৪। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ: বিনয় ঘোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৪৫
৩৫। Speech of Mr. Buckingham. p 5.
৩৬। কলকাতা গেজেটের ইতিহাস: পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত। ১৭৫ বর্ষ-পূর্তি সংখ্যা।
৩৭। ইণ্ডিয়া গেজেটের প্রকাশক হেষ্টিংসের কাছে দরখাস্ত করেছিলেন যে বাৎসরিক বিল মিটিয়ে দেবার চুক্তিতে তাকে কাগজ পাঠাবার সুবিধা দেওয়া হোক। The Indian Press by M. Barns, p 56.
৩৮। Home Public, 20th Aug 1819, No. 56.
৩৯। Parliamentary Inquiry into claims uf Mr Buckingham on the East India Company, p IV.
৪০। Speech of Mr. Buckingham, p 12. Carcy Library.
৪১। Ibid.
৪২। State of Indian Press from Pamphlets Relating to India, Srerampore. p 48.
৪৩। এই তালিকাটি ডেভিড কফের ওরিয়েণ্টালিজম অ্যাণ্ড দি বেঙ্গল রেনেসাঁ গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় আছে।
৪৪। ঐ, ৩০ পৃষ্ঠা। ৪৫। ঐ, ৪০ পৃষ্ঠা। ৪৬। ঐ, ১৪৬-১৪৭ পৃষ্ঠা।
৪৭। প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলতেন, এমন কি কোন হিন্দু সরকারের চেয়ে আমি ব্রিটিশ সরকারকে অধিকতর গ্রহণীয় মনে করি।
৪৮। Selections from Calcutta Gazette. W. S. Seton Kerr, pp 201-202.

৪৯। Review of the Affairs of India. 1798-1806, Vol LXIX of India Office Library Tracts (London: T. Cadwell, 1807) p. 14, Quoted in British Orientalism and Bengal Renaissance. p. 46.

৫০। Life and Times of Carey Marshman and Ward, Vol. I, p. 75.

৫১। The Story of Carey Marshman and Ward, London 1864. p. 23. By John Clerk Marshman.

৫২। The Danes of Bengal: Lalit Mohun Mitra.

৫৩। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ। সজনীকান্ত দাস, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ২৭১

৫৪। The life and Times of Carey Marshman and Ward. p. 80.

৫৫। The Story of Srerampore and its College, Published by Srerampore College. p. 14. 16.

৫৬। মঙ্গল সমাচার: মতীয়ের রচিত।

৫ । বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশকের গোড়ার কথা। মহম্মদ সিদ্দিক খান। বাঙলা একাডমি ঢাকা, ১৬১ পৃষ্ঠার তালিকা দ্রষ্টব্য। বর্তমান গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫৮। Twelve Indian Statesmen by George Smith. p. 230.

৫৯। Ibid, p 231. ৬০। Ibid, p. 231. ৬১। Ibid, pp. 232-233.

৬২। General Characteristic of the Native Newspapers. The Caleutta Christian Observer. Vol I. No. 5. Oct 1832.

৬৩। Prospectus, Friend of India. 1818. ৬৩। Ibid.

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবজাগরণের কালের বাংলা সংবাদপত্র

১। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও তারিণীচরণ শিরোমণি সমাচার দর্পণের সম্পাদকীয় বিভাগে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়গোপাল ১৭৭৫ সালের ৭ অক্টোবর নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যসাধক চরিতমালায় লিখেছেন, 'জয়গোপাল প্রথম তিন বৎসর কাল কোন ব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন। শ্রীরামপুরে অবস্থান-

কালে তিনি কিছুদিন মিশন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর জে. সি মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ মে সমাচার দর্পণ নামে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইলে তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭০ বছর বয়সে জয়গোপাল পরলোক গমন করেন।'

পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পর (১৮২৮, জুন) ৫ জুলাই সমাচার দর্পণ লেখে, "পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি ইংরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানা দেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য ২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তিদ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালক কালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জ্জমা করলে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য ২ কর্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।" তারিণীচরণ মাত্র ৩২ বছর বয়সে ক্ষয়রোগে মারা যান। সমাচার দর্পণ প্রকাশের কৃতিত্ব মিশনারিদের প্রাপ্য হলেও তার অধিকাংশ রচনাই স্বদেশীয় পণ্ডিতদের। তাঁরা ছুটিতে থাকলে কাগজ প্রকাশই বন্ধ থাকত। ১৮৩৩ সালের ২৬ অক্টোবর সমাচার দর্পণ জানাচ্ছে, "আমাদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবার পর্য্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না। অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

আবার ১৮৩৯ সালের ১৯ অক্টোবর আর একটি বিজ্ঞপ্তি: "সাম্বৎসরিক রীত্যনুসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছুটি দেওনের আবশ্যকতা প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে অত্যল্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সম্বাদ প্রকাশ পাইবেক।"

২। ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় যে দ্বিতীয় পর্যায়ে দর্পণের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন তার উল্লেখ ১৮৪৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ও ১৮৫২ সালের ১৭ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকরে আছে। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থের ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এর উল্লেখ করেছেন। ভগবতীচরণ দর্পণ বেশী দিন চালাতে পারেননি। ১৮৪৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সংবাদ প্রভাকর লিখছেন, 'মার্সম্যান সাহেব ভগবতীর খর্পরে সমাচার দর্পণ অর্পণ করিলে তাহার মৃত্যুর পূর্বেই তর্পণ পর্যন্ত শেষ হইয়াছিল।'

৩। The Bengalee Translation of the Vedant or resolution of all the Veds. The most celebrated and Revered work of Brahmunical Theology establishing the unity of the Supreme Being. Calcutta. From the Press of Press and Co. 1815.

৪। রামমোহন রচনাবলী। হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ৬

৫। Calcutta Journal 13. 10. 1818.

৬। A Tract against the Prevailing System of Hindoo Idolatory, Stephen Hay. Firma K. L. Mukhopadhyaya, 1963.

৭। রামমোহন ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪১২

৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮। ৯। ঐ, পৃঃ ১৬৯।

১০। রামমোহন রচনাবলী : ভূমিকা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত।

১১। ব্রাহ্মণ সেবধি : ব্রাহ্মণ ও মিসিনিরি সম্বাদ। তিনটি সংখ্যা দ্বিভাষায় ও আর একটি সংখ্যা ইংরাজীতে প্রকাশিত হয় বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অভিমত।

১২। সম্বাদ কৌমুদী প্রথম প্রকাশের এই তারিখটি নিয়ে বিতর্ক আছে। ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িকপত্র গ্রন্থে ও ডঃ যতীন্দ্রকুমার মজুমদার সম্পাদিত রামমোহন অ্যাণ্ড প্রগ্রেসিভ মুভমেণ্টস ইন ইণ্ডিয়া গ্রন্থে কৌমুদী প্রকাশের তারিখ ১৮২১-এর ৪ ডিসেম্বর বলে উল্লেখ আছে। তবে পাদ্রী লং-এর ক্যাটালগ অনুসারে কৌমুদী ১৮১৯ সালে প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত রামমোহন গ্রন্থাবলীতে কৌমুদীর প্রথম প্রকাশ ১৮২২ সালে। মিস কোলেট রামমোহন জীবনীতে কৌমুদী প্রকাশের তারিখ ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর বলেছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির মতে কৌমুদীর প্রকাশকাল ১৮১৮। ভারতী, ভাদ্র ১৩২৯ সালে ডাঃ এস. কে. দের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮৩২ সালের ২১ জানুয়ারি সমাচার দর্পণ সংবাদ তিমিরনাশকের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করেন, তাতে কৌমুদীর প্রকাশকাল ১২২৮-এর কার্তিক বলা হয়েছে। বাংলা ১২২৮-এর অর্থ ইং ১৮২১। কার্তিক হলে নবেম্বর হওয়াই স্বাভাবিক। এই তারিখটি অধিকতর গ্রহণীয়। কারণ এটি সমসাময়িক কালের রিপোর্ট।

১৩। The Indian Press. Margarita Barns, p. 111.

১৪। বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূলভূমিকা বা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন : শ্রীযোগানন্দ দাস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৮৯-৯০। ডঃ যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের সম্পাদিত রামমোহন রায় অ্যাণ্ড প্রগ্রেসিভ মুভমেণ্টস ইন ইণ্ডিয়া গ্রন্থ থেকে ঐ ভূমিকা ও বিষয়সূচী সংগৃহীত।

১৫। তিমিরনাশক। ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ সমাচার দর্পণে পুনঃমুদ্রিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩১। ১৬। ঐ, পৃঃ ৩১১।

১৭। The Twelve Statesmen, George Smith. p 233.

১৮। Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India (Patna : Patna Law Press, 1936) p. 111. Quoted in British Orientalism and Bengal Renaissance,

p. 175. Wilson said "the Principal of purer morality, as well as of a more virtuous and exulted rule of action, now a actively inclucated by European Education and knowledge will receive a fatal check."

১৯। তিমিরনাশক, সমাচার দর্পণ, ২১ জানুয়ারি ১৮৩২ সালে উদ্ধৃত, সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১

২০। Pamphlets Relating to India. State of Indian Press. Available at Carey Library Srerampore. p. 50.

২১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ১৩৩৯, পৃঃ ১৯৪

২২। ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩১ ২৩। ঐ

২৪। সমাচার চন্দ্রিকা, সমাচার দর্পণ, ২২ অক্টোবর ১৮৩১ থেকে উদ্ধৃত। ২৫। ঐ

২৬। ঐ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৯

২৭। সংবাদ প্রভাকর, ১২ এপ্রিল, ১৮৫৬

২৮। এনকোয়ারের এই মন্তব্য ১৫ আগস্ট ১৮৩১ সালের ইণ্ডিয়া গেজেটে পুনর্মুদ্রিত হয়। ২৯। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩০ ৩০। ঐ, পৃঃ ২২।

৩১। ঈশ্বরগুপ্ত মোট তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন, এছাড়া সংবাদ রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কাজকর্ম তিনিই দেখতেন, ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৬। এ সম্পর্কে আরও তথ্য পরিশিষ্টে বাংলা সংবাদপত্রের তালিকায় দেওয়া হয়েছে।

৩২। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ২৫।

৩৩। Freedom Movement in Bengal. N. K. Sinha, p. 47.

৩৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২

৩৫। সংবাদ প্রভাকর, ৯ মে ১৮৪৯

৩৬। বাংলা সাময়িকপত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৪২-এ উদ্ধৃত ক্যালক্যাটা কুরিয়র ১৮৪০ সালের ২৬ নভেম্বরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

৩৭। যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গ্রন্থের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখছেন, ১৮৩৩ সালের জানুয়ারি থেকে রসিককৃষ্ণ মল্লিক জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক হয়েছিলেন।

তবে গৌরীশঙ্কর ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদনার কাজে জড়িত ছিলেন তাঁর প্রমাণ আছে। রামগোপাল সান্যাল তাঁর বেঙ্গল সেলিব্রিটিশ গ্রন্থের ১৭৮—১৮০ পৃষ্ঠায় বলছেন,, ১৮৩৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রামগোপাল ঘোষকে জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো

হয়। কারণ জ্ঞানান্বেষণের সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র বসাক হুগলিতে কালেকটরির চাকরি পেয়ে চলে যাচ্ছেন।

৩৮। সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪৬। সমাচার দর্পণ, ২৩ মার্চ ১৮৩৯ পুনর্মুদ্রিত জ্ঞানান্বেষণের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

৩৯। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মন্মথনাথ ঘোষ ; পৃঃ ৪১-৪৩।

৪০। জ্ঞানান্বেষণ, ১৮ জুন ১৮৩১।

৪১। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৭ সালে ডেপুটি কালেকটরের চাকরি নেন। ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য।

মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৭৫ দ্রষ্টব্য।

৪২। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সাহিত্য সাধক চরিতমালা। পৃঃ ২৫ : ৪৩। ঐ

৪৪। Report on the Native Press. XXXVII. Available at Carey Library Srerampore. ৪৫। সম্বাদ ভাস্কর, ৯ মার্চ ১৮৫৪। ৪৬। ঐ ১২ অক্টোবর, ১৮৫৪। ৪৭। ঐ ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৪। ৪৮। সংবাদ প্রভাকর ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭।

৪৯। বেঙ্গল স্পেকটেটর, এপ্রিল ১৮৪২, ১ম সংখ্যা।

৫০। রাজা দক্ষিণারঞ্জন। মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ৭৭-৭৯।

৫১। বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রমনিরাশ : শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বুক ল্যাণ্ড।

৫২। বেঙ্গল স্পেকটেটর, ১০ অক্টোবর ১৮৪৩।

৫৩। রাজা দক্ষিণারঞ্জন : ৭৭-৭৯।

৫৪। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৩৬।

৫৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৯৯-২০০।

৫৬। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। পৃঃ ২২।

৫৭। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭১।

৫৮। অক্ষয় চরিত, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, পৃঃ ১৮-২০। ৫৯। ঐ। ৬০। ঐ।

৬১। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ২৯-৩০।

৬২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৯ শক, কার্তিক।

৬৩। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয় চরিত, পৃঃ ৩০।

৬৪। তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকীয়, ১ আষাঢ় ১৭৬৭ শক।

৬৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ১৯৯-২০০।

৬৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ৪৫৩

৬৭। ঐ।

৬৮। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস: অক্ষয় চরিত। পৃঃ ২৬। অক্ষয়কুমারের তত্ত্ববোধিনী সম্পাদনা সংক্রান্ত তথ্যগুলি এই গ্রন্থের ২০-২৬ পৃঃ থেকে সংগৃহীত।
৬৯। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ২১।
৭০। ভূদেব চরিত, শ্রীকুমার দেব মুখোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, চু চুড়া বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড পৃঃ ৩৪০।
৭১। ঐ পৃঃ ৩৩৮। ৭২। ঐ পৃঃ ৩৩৯-৪১
৭৩। এডুকেশন গেজেট। ৩১ অক্টোবর ১৮৭৩
৭৪। ঐ, ৯ জানুয়ারি ১৮৮০।
৭৫। ঐ, ৪ ডিসেম্বর, ১৮৬৮
৭৬। কবি হেমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার সরকার, পৃঃ ৭
৭৭। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী : সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৭৮। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য : শিপ্রা লাহিড়ী, পৃঃ ৩২
৭৯। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে গ্রন্থের ২০৬ পৃষ্ঠায় লিখছেন : ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ সোমপ্রকাশ সম্পাদনায় ব্রতী হন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাঁহার সহিত নানাভাবে সহযোগিতা করিতেছেন।
৮০। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ : সাহিত্য সাধক চরিতমালা।
৮১। মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে : শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ১৯৯—২০০
৮২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃঃ ২৮৬-২৮৭ সং ১৯০৯।
৮৩। আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ৭৫।
৮৪। Home Public 1789. March 221-222. ৮৫। ঐ।
৮৬। Latter no. 1776 from Horace A. Cockrell, Secretary to Government of Bengal, Judicial and Political to the Secretary Government of India, Home and Revenue dated 3rd April 1880. Home Public 1879. March, 221-221. National Archives.
৮৭। সাহিত্য সাধক চরিতমালা : দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
৮৮। মহাত্মা শিশির ঘোষ : অনাথ নাথ বসু।
৮৯। সুলভ সমাচার। ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১।
৯০। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, পৃঃ ৫২।
৯১। পত্রিকা একটি প্রতীক, দক্ষিণারঞ্জন বসু। অমৃত, শুক্রবার ৩ ফাল্গুন, ১৩৭৪।
৯২। মহাত্মা শিশিরকুমার। পৃঃ ৭০।

১৩। রামগোপাল সান্যাল বেঙ্গল সেলিব্রিটিশ গ্রন্থে লিখেছেন, মহামারীর জন্য শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকা কলকাতায় নিয়ে আসেন ও রাজা দিগম্বর মিত্রের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা উপলব্ধি করেছিলেন অমৃতবাজারের মত স্পষ্টবাদী ও উচিত বক্তা একটি সংবাদপত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই অমৃতবাজারের প্রতি তিনি নৈতিক সমর্থন জানান।

১৪। মহাত্মা শিশিরকুমার, পৃঃ ১৫১।

১৫। অমৃতবাজার সম্পর্কে ইংরাজী উদ্ধৃতিগুলি ও ভার্নাকুলার প্রেস আইনের পশ্চাদপট জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত ফাইলটি থেকে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। ফাইল নং : Home Judicial 1878. 203-206.

১৬। March of Journalism : Harold Herd, George Allen Unwin p. 206.

১৭। সুলভ সমাচার, ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবজাগরণের অভ্যুদয় বিকাশ ও বাংলা সংবাদপত্র

1. Nineteenth Century Bengal and Fifteenth Century Europe by David Kopf. p. 8.
2. Portraits of Renaissance life and thought : M. M. Checksfield p. 2.
3. Nineteenth Century Bengal and Fifteenth Century Europe. by David Kopf. p. 2.
4. The Renaissance : Edith Sichel. p. 1.
5. The Dawn of the French Renaissance. Arthur Tilley. p. 82-83.
6. The Renaissance in France. 1488-1559. Anne Denieul—Cormier, p. 16.
7. British Orientalism and Bengal Renaissance. David Kopf. p. 146.
8. Ibid. p. 103.
9. Extract from a letter in the Public Department from the Court of Directors to the Governor General in Council of Bengal. June 3, 1814. Quoted in David Kopf. p. 151. by David Kopf.

10. Nineteenth Century Bengal and Fifteenth Century Europe By David Kopf.
11. The Renaissance and Reformation V. H· H. Green. p. 30.
12. Freedom Movement in Bengal Edited by Nirmal Sinha. Education Department. Govt. of West Bengal. pp 16-17.
13. Unabinsa Satabdir Bangla. Jogesh Chandra Bagal. p. 115.
14. Samachar Durpan. 14th October, 1837.
15. Freedom Movement of Bengal p. 145.
16. Ibid p. 183.
17. Ibid p. 189.
18. Alfred Von Martin : Sociology of Renaissance. p. 36.
19. Robert Ergane. The Renaissance. p. 54.
20. Ibid p. 55.
21. Calcutta Old and New, Hea Cotton p. 83.
22. Samachar Durpan. 20 October, 1838.
23. Ibid 14th May 1825.
24. Ibid 12 Feb. 1820.
25. Banglar Samajik Itihasher Dhara (Bengali) Benoy Ghosh. p. 164-165.
26. Sociology of the Renaissance. Alfred Von Martin. p. 32.
27. The Renaissance. Robert Ergna. p. 55.
28. The Good Old Days of John Company. p. 60.
29. Supplement to the Government Gazette, March 20. 1817. As quoted in Unabinsha Satabdir Bangla By J. C. Bagal p. 100.
30. Ram Mohan Rachanabali. Haraf Prakashani. p. 586.
31. Sanbad Timir Nashak quoted in Samachar Durpan. January 21, 1832.
32. Sangbad Pravakar. 12 April 1846.
33. Navajiban. Asadh. 1293 Bs.
34. Mahatma Sisir Kumar. Anath Nath Basu. p. 70.
35. Sociology of Renaissance. Alfred Von Martin. p. 34.
36. Ibid.

37. The Fall of the Mogul Empire, Jadunath Sarkar, Vol. IV. p. 346.
38. The Book of knowledge Vol 6 The Waverly Book Company Ltd. Farringdom Street, London Ec 4. p. 318. (ভুলবশত ৮৬ পৃষ্ঠায় ৩২ নং হিসাবে উল্লিখিত।)
39. Ibid.
40. The Indian Press. By Margarita Barns. pp. 7-8.
41. Ibid.
42. Regulations For the Administration of Justice in the Courts of Dewance Adaulat.
43. Bangla Mudran Prokashaner Gorar Katha. p. 47.
44. Hooghly Jelar Itihash. Sudhir Kumar Mitra, 1st part. pp. 473—74.
45. Friend of India quarterly series. Vol. 1. p. 119.
46. Essays relative to the habits and character and moral improvement of the Hindoos. London p. 145, Carey Library, Serampore. Friend of India Vol No 1. Quarterly series.
47. See appendix.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা সংবাদপত্রের চরিত্র লক্ষণ

1. The Life and Times of Carey, Marshman and Ward : John Clark Marshman. Vol. 1 (1859) pp. 21-22.
2. Report on the Native Press in Bengal. p. XIII.
3. Ibid.
4. Annual Report of the vernacular Newspapers in Bengali during 1867. Prepared by Mr. J. Robinson Bengalee Translator on the 2nd April 1867, and forwarded to the under Secretary, Govt. of India by the Assistant Secretary Govt. of Bengal on 14th June, 1867. Fort William, Home Pub. 1867. July No 180. 182. Home Pub. Records proceedings October. No 143-161. N. A I.

Report from J. G. Charles Esq. under secretary, Govt. of Bengal to Home secretary, Govt. of India, 27th June 1870. Home Pub. 16th July No 167-8.

5. Pamphlet relating to India. Vol 54. Available at Carey Library Srerampore.
6. History of British India. P. E. Roberts. Oxford University Press. p. 278.
7. The Indian Press : Margareta Barns. p. 181. From the official Minute signed by G. Stockell. dated September 24, 1828.
8. সমাচার চন্দ্রিকা। ১ নভেম্বর ১৮৩৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৯৬।
9. Ibid.
10. Statement exhibiting the moral and material progress and condition of India. p. 96. Carey Library.
11. Report on the Native Press in Bengal, p.XXXIX-XL.
12. Minute by Dalhousie Parliamentary papers. Vol 45. Paper 245.
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Ibid.
17. Ibid.
18. Home public Dept. Records proceedings. Oct. 1877 No 143-161.
19. Home Public Papers, January 1876. 188-189.
20. Memorandum prepared by the under Secretary, Government of Bengal. Dated 27.2.68. Home Political, 14th March. pp. 86-87.
21. Return submitted on Aug 22, 1866. by A. Mackenzie, under Secretary to Secy. Govt. of India. Home Sept. 1866. 15. 16.
22. From the Report of the Bengalee Translator. National Archives File.

23. সংবাদপত্রে সেকালের কথা ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩০। সমাচার দর্পণ ২১ জানুয়ারী ১৮৩২।
24. সংবাদ ভাস্কর ১৮৪৯ সালের ২৬ জুন সংখ্যায় রাজকৃষ্ণের পুত্রের বিবাহের সংবাদ আছে।
25. The Press and America by Edwin Emery, p. 65.
26. The March of Journalism, p. 86.
27. Ibid p. 87.
28. Ibid p. 162.
29. Ibid p. 165.
30. Sulabh Samachur, 29 Paush, 1277 B. S.
31. Ibid. 8 Agrahayan, 1277 BS.
32. Samachar Durpun. 3 July 1819.
33. Press and people. Donald Read. p. 201.
34. The March of Journalism p. 166.
35. Home (1879) proceedings No. 292. 302.
36. Report on the Native Press.
Carey Library. p. XL1.
37. Home 1835. Judicial (Civil) 18th May 1 to 10 (A)
38. Ibid.
39. Ibid.
40. Ibid.
41. Ibid.
42. Home (Public) 25th Aug, 1863. 101-106.
43. Ibid.
44. Home Public 5. Nov. 1863 A No. 9.
45. From the Report of Mr. J. Rabinson, Government Bengalee Translator to J. Geoghegam Esq under Secretary to Government of Bengal dated 13th Feb. 1866.
Home Public. Sept. 1866. 15.16 (B) ?
46. Ibid.
47. Ibid.
48. Freedom of the Press. Ranjit Gupta, working Journalist Nov. 1966.

49. Home Public. 1867. July No 180 182.
50. Ibid.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র

1. রামমোহন রচনাবলী, পৃঃ ৪৬২, হরফ প্রকাশনী।
2. Calcutta Past and Present by Kathleen Blechynden p.159. ১৮৪৩ সালের পঞ্চম আইনে ভারতে দাসপ্রথা বেআইনী ঘোষণা হয়।
3. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃঃ ৩।
4. Collection of Facts of Opinions related to Burning of Widows. Carey Library.
5. Ibid. p. 40.
6. Ibid. p. 40.
7. A letter to the Right Honourable J. C. Villiers on the Education and improvement of the natives of India: The Friend of India. June 1820
8. Ibid.
9. রামমোহন রচনাবলী। হরফ প্রকাশনী। পৃঃ ১৭৫।
10. ঐ, পৃঃ ২০৫।
11. The Manners and Customs of Society in India by Major Clemons. London. 1841. p. 72.
12. Letters on India by Maria Graham. London. p. 303-304.
13. The Burning of Widows. Essays relative to the Habits Character and Moral Improvement. Carey Library. p. 28.
14. The Manners and Customs of Society in India p. 72.
15. Selections from Calcutta Gazette. Vol II. p. 224.
16. Collection of Facts and Opinions Relative to the Burning of Widows. By William Johns. Burmingham 1816. Page 26 and 101.
17. Suttees Cry to Britain By J. Peggs. p. 13.
18. Periodical Accounts of the Baptist Missionary Societies. Vol. III. p. 325.
19. Collection of Facts and Opinions Relative to the Burning of Widows. pp. 93-97.

20. Suttees Cry to Britain P. 13.
21. The Good Old Days of John Company p. 202.
22. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
23. Friend of India Vol I. p. 301 Vol II, p. 319, Vol III p. 453. দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধগুলি Essays Relative to the Habits Character and Moral Improvement of the Hindoos, London 1823. গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।
24. Friend of India. Vol I. p. 301.
25. Ibid Oct. 1819.
26. Lower Province Actg Superintendent of Police W. Ewer Esq-এর এই বক্তব্য Parliamentary Papers. Vol I. p. 229; দ্রষ্টব্য। Quoted in Suttees Cry to Britain.
27. Suttees Cry to Britain p. 232.
28. Parliamentary Reports Relating to Hindoo Widows 1821-1827. Quoted in Suttees Cry to Britain. p. 46.
29. Suttees Cry to Britain. p. 54.
30. Ibid p 94.
31. Ibid p 16. Retranslated into Bengali.
32. Quoted in The Days of John Company. 1824-1832. A. C. Das Gupta.
33. Regulations of the Government of Fort William. Bengal. Vol II. p. 878-879.
34. সমাচার চন্দ্রিকা। ২৩ জানুয়ারী ১৮৩০ সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪৯
35. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পৃঃ ১৩৪।
36. ঐ পৃঃ ১৫২-১৫৩।
37. Bengal Celebrities p. 13.
38. সমাচার দর্পণ ২৫ জুন ১৮৩২।
39. ঐ, ১২ জানুয়ারী ১৮৩৩।
40. সমাচার চন্দ্রিকা ১২ মে ১৮৭১।
41. ঐ। 42. ঐ।
43. বিদ্যাসাগর জীবন চরিত ও ভ্রমনিরাশ : শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃঃ ১০৭।
44. বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ : শ্রী বিনয় ঘোষ। ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৬৮।

৪৫। এই প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। পত্রিকাটি বিদ্যাসাগর ও তাঁর কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির ভাষা ও যুক্তি দেখে গবেষকগণ প্রবন্ধটিকে বিদ্যাসাগরের রচনা বলে সাব্যস্ত করেন। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ। পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।
৪৬। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা।
৪৭। এই গণদরখাস্তটি জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আছে। দরখাস্তের বক্তব্য বিষয় আমি মহাফেজখানা থেকে সংগ্রহ করি।
48. ঐ।
49. Home Public A 1856. 25 July. p, 9-10.
50. Home Public A 1856. 1st Aug. No. 3.
৫১। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজে উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ। ৩য় পর্ব। পৃঃ ২০৯-২১০।
৫২। ঐ পৃঃ ২২৬।
53. Letters on India Maria Graham p. 306.
54. Speech by Alexender Duff at Edinburg, 1835.
৫৫। বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। বিজ্ঞাপন। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, পৃঃ `৬৮।
৫৬। বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ। ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৩৭।
৫৭। ঐ পৃঃ ২৪০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র

1. Twelve Indian Statesmen. George Smith. London. 1897. p. 228.
2. Bengal Celebrities : Ram Gopal Sanyal. p. 46.
3. Bengal in the 19th Century. Ramesh Chandra Majumdar, p. 12-13.
4. সেকালের কলকাতায় ইংরাজী স্কুল, প্রবাসী, ১৩৩৬ পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগর, ফাল্গুন।
5. Selecions From Calcutta Gazette. Vol III p. 544.
6. Minutes of Evidence on East India Company. 1832 No. 3. pp. 325-486.

7. Public letter from the Court of Directors. 3rd July 1814.
8. Presidency College Centenary Volume. p. 1.
9. Review of Public Instructions in the Bengal Presidency. J. Kerr. Part II. Calcutta 1853. p. 2.
10. Ibid. p. 6.
11. Ibid p. 44.
12. Political India. 1832-1932. Edited by Sir John Coming. S. Chand & Co. Delhi, Chap. II. article by Prof. H. H. Dodwell. M.A. pp. 23.
13. Rammohun Rachanabali, Published by Haraph Prakashni, Calcutta. pp. 433-436.
14. Ibid.
15. Selections from Educational Records. Vol l. pp. 130-1.
16. Review of Public Instuctions. Vol I pp 130-1.
17. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃঃ ১৫৪। ১৯০৯ সংস্করণ।
18. Review of Public Instructions. Vol 2. p 9.
19. Ibid. p. 29.
20. Ibid. p. 33.
21. Documents preserved in the Presidency College. Vol I.
22. দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন চরিত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কোং। পৃঃ ৩৭ এবং বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তার পরিজন; স্বনীল চট্টোপাধ্যায়।
23. Review of Public Instructions. Vol 2 p 56
24. কোম্পানির আমলের বাংলা ভাষা। শিশির দাস। বিশ্বভারতী পত্রিকা। শ্রাবণ-আশ্বিন।
25. Third Report or the State of Education in Bengal. William Adam. Calcutta (1838) pp 37-38.
26. A letter to the Right Honourable J. C. Villiers on the Education and improvement of the natives in India by William Ward. Friend of India. Monthly. June 1820.
27. Sixth Report from the Select Committe on Indian Territories. p. 5.

২৮। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, বিনয় ঘোষ—প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩১০। সংবাদ প্রভাকর ১২.৫.১৮৪৯ রিপোরট দ্রষ্টব্য।

২৯। সংবাদ প্রভাকর, ৭ জুলাই ১৮৫১

৩০। নবকৃষ্ণ ঘোষ রচিত প্যারীচরণ সরকার। পৃঃ ৬ -৬৪।

৩১। সাহিত্য সাধক চরিত মালা। বিদ্যাসাগর পৃঃ ৭৪।

৩২। ঐ

৩৩। ঐ

৩৪। সোমপ্রকাশ আশ্বিন ১২৭৬।

৩৫. Minute, Parliamentary Papers, House of Commons.; Vol. 45. 1856.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা সংবাদপত্র

১। A History of English literature. Arthor Compton Rickett Nelson. p. 78.

২। Ibid.

৩। Book of knowledge. The Waverley Book Company. London Reformation. p. 401.

৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৯।

৫। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৯, ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত: রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থে জুলাই ১৯৫৭ সংস্করণে ভুলবশত ১৭৫১ শক ছাপা হয়েছে।

৬। ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরে পরীক্ষিত বৃত্তান্ত: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ২৩।

৭। ঐ পৃঃ ২৩।

৮। তত্ত্ববোধিনী, আশ্বিন ১৭৬৯ শক।

৯। ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত। রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ২২।

১০। রামমোহন রচনাবলী পৃঃ ৪১৫-৪১৬, হরফ প্রকাশনী।

১১। ঐ পৃঃ ৩৭।

১২। Calcutta Journal. 13. 10. 1818. রামমোহনের গ্রন্থের সমালোচনা দ্রষ্টব্য। ১৩। ঐ।

১৪। The Last Days of Raja Ram Mohun Ray, Mary Carpenter pp. 28-29।

১৫। Ibid. ১৬। Ibid p. 32। ১৭। Letter to John Digby.

রামমোহন গ্রন্থাবলী, পৃঃ ৪৬১।

১৮। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৫।

১৯। রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য ; প্রভাত মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪০৭-৮।

২০। ঐ পৃঃ ৪০৭। ২১। Friend of India. February, 1820।

২২। Speech Before the Unitarian Association London. রামমোহন গ্রন্থাবলী পৃঃ ৫৬৭।

২৩। ব্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত : রাজনারায়ণ বসু পৃঃ ২৫।

২৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা। ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১২।

২৫। Renascent Bengal. Young Bengal A Self Estimate. Chitta Ranjan Palit. p. 67.

২৬। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১১৮।

২৭। Life of David Hare, Peary Ch. Mitra, pp. 17-18.

২৮। India Gazette. Oct 20, 1831 as quoted from The Enquirer.

২৯। Ibid, February. p. 1832.

৩০। Ibid.

৩১। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১১৮।

৩২। Alexender Duff. Pioneer of Missionary Education. William Paton, George H Doran Company N. Y. p. 84.

৩৩। Ibid p. 72. ৩৪। Alexender Duff by George Smith, Vol I p. 145.

৩৫। Ibid p. 80. ৩৬। Ibid p. 81.

৩৭। From Enquirer Quoted in the India Gazettes Feb 14, 1832.

৩৮। Alexender Duff by Paton. p. 85.

৩৯। হরকরা, ১৮ জুলাই ১৮৩৮।

৪০। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান। ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। পৃঃ ৮, ভূমিকা।

৪১। George Smith p. 256

৫২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পৃঃ ৬৫।

৪৩। British Attitudes Towards India By George D. Bearce. p. 78

৪৪। Ibid p. 79. ৪৫। Ibid p. 80. ৪৬। Ibid p. 82. ৪৭। Ibid p. 236.

৪৮। সংবাদ প্রভাকর। ২৫।৬।১২৬১ ৪৯। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত পৃঃ ১১।

৫০। আত্মজীবনী : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৬৬। ৫১। ঐ পৃঃ ৩০ ৫২। ঐ পৃঃ ৪৭।

৫৩। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃঃ ৬৫

৫৪। ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত। তত্ত্ববোধিনী ফাল্গুন ১৭৮২ শক ২১১ সংখ্যা।

৫৫। মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে। শিবনাথ শাস্ত্রী। মায়া রায় অনূদিত পৃঃ ৫২।

৫৬। তত্ত্বকৌমুদী ১৬ আষাঢ় ১৮০১ শক।

৫৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। পৃঃ ৮৪। ৫৮। ঐ পৃঃ ৯।

৫৯। History of Bramha Samaj. By Shivnath Sastri Vol 1. p. 108

৬০। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পৃঃ ৩৭।

৬১। History of Bramha Samaj Vol I p. 108.

৬২। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট, ৩৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬৩। দেবেন্দ্রনাথ নিজেও লাল হাজারিলালকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৪৭-এর সেপ্টেম্বরে বেদ অধ্যয়নের জন্য কাশী গিয়েছিলেন। আত্মজীবনী দ্রষ্টব্য।

৬৪। ঐ পরিশিষ্ট, ৩৭৮ পৃষ্ঠা। ৬৫। ঐ পৃঃ ২০০। ৬৬। ঐ।

৬৭। History of Bramho Samaj. Vol 1 p. 127.

৬৮। Ibid p. 120. ৬৯। Ibid p. 142. ৭০। Ibid p. 152. ৭১। Ibid p. 156.

৭২। কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫৮, ১৯৭৭ সংস্করণ।

৭৩। আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ২১৩।

৭৪। Hinduism Past and Present, J. Murray. Mitchell. The Religious Tract Society : London, 1885.

৭৫। আত্মচরিত রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ১২৩। ৭৬। ঐ পৃঃ ২১৪। ৭৭। ঐ পৃঃ ২১৫।

৭৮। আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২১৫।

৭৯। তত্ত্বপ্রকাশিকা, ১৮৬-৮৭।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসজনীকান্ত দাস গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ২১৫।

৮০। মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে, পৃঃ ১৪০

৮১। সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৮২। ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বছর, শ্রীনাথ চন্দ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। কলিকাতা-৬। পৃঃ ১৯৯। ৮৩। উপরোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৮৪। অ্যালবার্ট হলের সম্পাদক ছিলেন কেশব সেন। তিনি সভা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্যাসলাইট জ্বালাবার অনুমতি নেই এই অজুহাতে কর্মচারীরা গ্যাসলাইট জ্বালাতে অস্বীকার করলে সভা হতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা

1. Views on Settlement in India By Europeans Ram Mohun Rachanabali, published by Haraph Prakashani, p 529.
2. Lecture on the life and labours of Rammohun Roy by William Adam in Boston. U. S. A. Edited by Rakhaldas Halder and published in Calcutta, 1879.
3. রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাব, সোমেন্দ্রনাথ বসু, 'রাষ্ট্র' শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৭৯ প্রবন্ধটিতে এ সম্পর্কে প্রমাণ সহ বিস্তৃত আলোচনা আছে।
4. Letter to Mr. James Silkh Buckinghum. Ram Mohun Rachanabali, Haraph. p. 454.
5. মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশ চন্দ্র বাগল পৃঃ ৯৭।
6. Beyelys Minute. 17th Oct 1822. Home Public No 8.
7. Ibid.
8. Historical Essays on the Rise progress and probable results of the British Dominion in India, John Baptist. London, 1824 p. 5.
9. Speehes of Mr. Buckingham. Available at Carey Library Srerampore. p. 8.
10. Adam's Second Minute. 17th Oct, 1822. Home Public.
11. Beleys Minute, p. 23.
12. Petitions Against The Press Regulation. See Ram Mohun Rachanabali. pp. 502-507. 13. Ibid. 14. Ibid.
15. বাংলা সাময়িকপত্র প্রথম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৬।
16. Home Public. 6th Oct 1835, No 38.
17. Copy of the Minutes in connection with the Act XI of 1835. Parliamentary papers. East India Native Press, p. 6.
18. সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বিতীয় খণ্ড) পৃঃ ২৮৩
19. মুক্তির সন্ধানে ভারত : যোগেশ বাগল পৃঃ ৪৭।
20. The India. Press by M. Barns p. 226.
21. A Nation in Making Surendranath Banerjee. p. 59.

22. It indeed marked a definite and progressive stage in National evolution; and was the creation of the builders of the Indian Association. 'A Nation in Making' p. 62.
23. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা। বিনয় ঘোষ। পৃঃ ২৫৭।
24. Samachar Durpan, 8th March 1823.
25. Ibid 7th January. 1837.
26. Indian Political Association. B. B. Majumdar.
27. Rajan Rajendralal Mitra's speech. by Jogeshwar Mitter 1892. p. 25.
28. Indian Political Association. p. 23.
29. The Bengal Harukara. Dec. 14. 1839.
30. সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, বিনয় ঘোষ, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৩২।
31. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ২৬৮।
32. মুক্তির সন্ধানে ভারত পৃঃ ৫৮।
33. Bengal Harukara. Dec 14. 1839.
34. Shomaprakash. 14th Bhadra. 1270 BS.
35. সাহিত্য সাধক চরিত মালা, হরিনাথ মজুমদার দ্রষ্টব্য।
36. ভূম্যধিকারী সভা এবং স্ত্রীবিদ্যা, সংবাদ প্রভাকর ২২,৫,১৮৪৯।
37. বহু দেশীয় প্রজাগণের এত দুরবস্থা কেন? ৪ আশ্বিন ১২৭১, ৪৫ সংখ্যা।
38. Shome Prakash. 1 Asada, 1271 and 4 Aswin, 1271.
39. Home Public No 38 and 39. 11th March 1859.
40. Indian Political Association and Reform of legislature, p. 40.
41. Selections From the State papers of the Governor General of India. G. W. Forest. p. 6.
42. Despatch From the Court dated 10th December, 1834.
43. The Employment of Natives of India in the service of Government. Calcutta 1848. p. 20.
44. East India Gazetter. Walter Hamilton. p. 134.
45. Indian Political Association. p. 62.
46. মুক্তির সন্ধানে ভারত পৃঃ ১৪১।
47. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা পৃঃ ১৭৮।
48. Sambad Pravakar. 12. 10. 1258.
49. History of Bengal, Edited by Narendra Krishna Sinha. p. 348.

50. তত্ত্ববোধিনী জ্যৈষ্ঠ ১৭৯২ শক।
51. জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা : যোগানন্দ দাস, পৃঃ ১১২
52. The Good Old Days of John Company. p. 60.
53. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, পরিশিষ্ট পৃঃ ৪৬৫-৪৬৬।
54. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : বিনয় ঘোষ পৃঃ ১৪৪।
55. Industry in West Bengal, Jyoti Sengupta. 25 years of Freedom. Govt of West Bengal Publication. p. 33.
56. English Social History, G.M. Trevelyanland 1948. pp. 479-80.
57. Renascent Bengal, Edited by R.C. Majumdar. p. 25.
58. British Attitude towards India. 1784-1856. By George D. Beach. p. 231.
59. Ibid p. 232.
60. Indian Political Association. p. 61.
61. Quoted in History of Bengal, Edited. by Prof. N. K. Sinha. p. 173.
62. History of Bengal. Prof. N. K. Sinha. p. 199.
63. মুক্তির সন্ধানে ভারত। পৃঃ ১০১।
64. আধুনিক ভারত : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
65. সংবাদ প্রভাকর ২৬ মে ১৮৫৭।
66. মুক্তির সন্ধানে ভারত ১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।
67. ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ : স্কুমার মিত্র ১২১।
68. Selections from writings of Girish Chunder Ghosh, p. 111, As quoted in 1857-0 Bangladesh Sukumar Mitra p. 121.
69. Indian Journalism. By M. Barns. Chapter XI.
70. Historical Geography of India. P. E. Roberts. p. 383.
71. The Mutiny. Blair B. Kling. pp. 33-34.
72. Calcutta Journal. 16th Oct. 1818.
73. Calcutta Courior. Sept 8, 1832.
74. The Blue Mutiny. pp. 33-34.
75. Views on settlement in India by Europeans.
76. শ্রী শিবশঙ্কর মিত্র যশোহর খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন প্রথমদিকে অধিকাংশ নীলকর প্রজার মঙ্গলের দিকে নজর দিতেন কিন্তু অতিরিক্ত লোভে পড়ে তাঁদের মাথা ঘুরে যায়। পৃঃ ৭৭৯-৭৮০।

77. The Blue Mutiny. p. 34.
78. Bengal under the Lt. Governors. Buckland. Vol I p. 241.
79. Report of the Indigo Commission. p. 15.
80. Bengal under the Lt. Governors. Vol. I. p. 241.
81. Minutes and Evidence taken before Indigo Commission-এর সামনে রাণাঘাটে জমিদার গোপাল পাল চৌধুরীর সাক্ষ্য।
82. Sisir Kumar Ghosh and Indigo Planters. Feb. 21, 1968.
83. Indigo Disturbance in Bengal, Lalit Chandra Mitra. pp. 43-44.
84. Bengal Celebrities. p. 79.
85. Bengal under the Lt. Governors. p. 184. 86. Ibid. p. 189.
87. Blue Mutiny p. 148.
88. Bengal under the Lt. Governors. p. 189.
89. Minutes and Evidence taken before Indigo Commission.
90. মহাত্মা শিশিরকুমার : অনাথনাথ বসু। পৃঃ ৩৪ ৩৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বাংলা গদ্য ও সাহিত্য বিবর্ধনে সংবাদপত্র

১। বাঙ্গলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দী। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ নভেম্বর, ১৯৩৮।

২। অ্যালফ্রেড দি গ্রেট (৮৪৮-৯০১) কে ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়ে থাকে। অ্যালফ্রেড বীডের একটি বিখ্যাত ল্যাটিন গ্রন্থ ও বোয়েথিয়াসের 'কনসোলেশন অফ ফিলজফি' ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। আর্থার কম্পটন রিকেটের 'এ হিসট্রি অব ইংলিশ লিটারেচর' ৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইংরাজী সংবাদপত্রের সূচনা ১৬৬০-১৬৬৫ সালের মধ্যে।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য : সুকুমার সেন, পৃঃ ২০।

৪। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ : ডঃ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৫।

৫। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস : সজনীকান্ত দাস, পৃঃ ৩১।

৬। হিতোপদেশ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, পৃঃ ৮৭-৮৮ উপরোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৭। পৃঃ ১২০। ৮। দিগ্‌দর্শন, সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৯। দিগ্‌দর্শন, জুন ১৮১৮।

১০। সমাচার দর্পণ, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩০।

১১। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সিরিজ, কলকাতা কমলালয় : পৃঃ ১। সমাচার দর্পণ, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০।

১২। চারি প্রশ্নের উত্তর, রামমোহন রচনাবলী, হ[illegible]ফ প্রকাশনী পৃঃ ২৫২।

১৩। সমাচার দর্পণ, ৪ জুন ১৮২৫ তারিখে উদ্ধৃত সম্বাদ কৌমুদীর রিপোর্ট।
১৪। ১২ ডিসেম্বর ১৮২৯ সমাচার দর্পণে উদ্ধৃত।
১৫। জে সি ঘোষ : বেঙ্গলি লিটারেচর, পৃঃ ১২০।
১৬। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, শ্রীগোপাল হালদার সম্পাদিত, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃঃ ১১৪৬।
১৭। বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক, পৃঃ ৬১।
১৮। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ১৮৫।
১৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৫৩।
২০। বাংলা সাহিত্য, ডঃ মনমোহন ঘোষ, পৃঃ ২৬৫।
২১। ঐ
২২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫।
২৩। অক্ষয় চরিত, পৃঃ ৩৪।
২৪। বিদ্যাসাগর চরিত। সাধনা, ভাদ্র ১৩০২।
২৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২৫৩-২৫৪।
২৬। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ন্যায়রত্ন তর্করত্ন, পৃঃ ২৮০।
২৭। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃঃ ১০২।
২৮। বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ। ২৯। ঐ
৩০। সোজাসুজি, সন্তোষকুমার ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকা (৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৯)
৩১। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী। ভূমিকা, সজনীকান্ত দাস। ৩২। সমাচার দর্পণ, ৩০ জানুয়ারি, ১৮১৯। ৩৩। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা : বঙ্কিম রচনাবলী, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, পৃঃ ১০৭, ২য় খণ্ড। ৩৪। ঐ। ৩৫। সাহিত্য সাধক চরিত মালা, বঙ্কিমচন্দ্র : পৃঃ ৩৫। ৩৬। ঐ, দীনবন্ধু মিত্র, পৃঃ ১৪৭। ৩৭। ঐ। ৩৮। ঐ। ৩৯। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, পৃঃ ১১২৯ ৪০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৫। ৪১। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ৩৬। ৪২। আমার জীবন, দ্বিতীয় ভাগ—পৃঃ ১৭৯-৮০ ৪৩। নবীনচন্দ্র সেন : সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ১০। ৪৪। শিশিরকুমার ঘোষ। সাহিত্য সাধক চরিত মালা, পৃঃ ৩৩। ৪৫। পুরাতন প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় পর্য্যায় : অমৃতলাল বসু। ৪৬। রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪১। ৪৭। প্রবাসী ১৩৩৮, মাঘ সংখ্যায় সম্পূর্ণ কবিতাটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেছেন। ৪৮। জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড। ৪৯। জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃঃ ৫৫ ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ৫০। আধুনিক সাহিত্য : বিহারীলাল, পৃঃ ১৮। ৫১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ১০। ৫২। ঐ।

পৃঃ ১১। ৫৩। অক্ষয় সরকার : সাহিত্য সাধক চরিতমালা, পৃঃ ১০৩ পৃঃ ও ১০৪। ৫৪। আধুনিক সাহিত্য : পৃঃ ২, ২য় সং। ৫৫। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃঃ ৫৫-৫৬। ৫৬। সাহিত্যসাধক চরিতমালা : বঙ্কিমচন্দ্র পৃঃ ৫১। ৫৭। রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯। ৫৮। জীবন-স্মৃতি, রঃ রঃ ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৭১। ৫৯। রবীন্দ্র জীবনী, পৃঃ ৬০, প্রথম খণ্ড। ৬০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮২। ৬১। জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৭২। ৬২ জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৭১। ৬৩। রবীন্দ্র জীবনী, পৃঃ ৬১। ৬৪। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ৪৫। ৬৫। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ ৩৩-এ উদ্ধৃত। ৬৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৪৩।

পরিশিষ্ট

১৮১৮-১৮৭৮-এর বাংলা সাময়িকপত্র

১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত মোট কত বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে তার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার পথিকৃৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তালিকা সংগ্রহ করেছেন তাতে ৪৬৪টি বাংলা সাময়িকপত্রের নাম পাওয়া যায়।

কিন্তু ১৮৫৩ সালের ১২ এপ্রিল সংবাদ প্রভাকর মৃত ও জীবিত বাংলা পত্রিকার একটি তালিকা করেন, তাতে সবশুদ্ধ ৯৫টি বাংলা সাময়িকপত্রের নাম দেওয়া আছে। তার মধ্যে ১৯টি পত্রিকা তখন চালু ছিল। এই তালিকার মধ্যে ব্রাহ্মণ সেবধিকে ধরা হয়নি।

সংবাদ প্রভাকর মফস্বল থেকে প্রকাশিত পত্রিকারও তালিকা করেছেন। তবে তাঁদের তালিকাও সম্পূর্ণ কিনা সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। কারণ ১৮৫৭ সালের ১৫নং আইন পাশ হওয়ার আগে পত্রপত্রিকার সরকারী হিসাব পাওরা সম্ভব ছিলন না। বিশেষ করে মফস্বল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার হিসাব সব সময় কলকাতায় বসে সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। ওই আইন অনুসারে ১৮৫৭ সালের আইনে প্রতি বছর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে প্রত্যেক কমিশনারকে তাঁর এলাকার সংবাদপত্রের রিটার্ন পাঠাবার জন্য বলা হয়। তবে ১৮৬১ সালের আগে এই আইন কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ ১৮৬১ সালের ১৯ জানুয়ারি ভারত সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারি সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারিদের কাছে এই রিটার্ন দেবার আদেশ দিয়ে চিঠি দেন। চিঠির সঙ্গে রিটার্নের একটি প্রোফর্মাও জুড়ে দেওরা হয়। তাতে জেলা, প্রেসের নাম, মালিকের নাম, সাময়িকপত্রের নাম, প্রচার সংখ্যা ইত্যাদি দিতে বলা হয়।

তবে এইসব তালিকা থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানও পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, সম্পাদকরা সর্বদা সরকারকে হয় রিটার্ন দাখিল করতেন না, না হয় ইচ্ছা করে প্রকৃত তথ্য গোপন করতেন।

তবে উনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্র সম্পর্কে পরিসংখ্যান নিতে হলে এই সরকারী নথিপত্র ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ১৮৭৩ সালে ২৮ সেপ্টেম্বর হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রচলিত ৩৮খানি বাংলা সংবাদপত্রের তালিকা দেন। জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত বাংলা অনুবাদকের বিবরণী থেকে ১৮৭৭ সালে ৫২টি বাংলা সংবাদপত্রের তালিকা পাই, তার মধ্যে একটি দ্বিভাষিকপত্র।

১৮৭৮ সালে কুখ্যাত ভার্নাকুলার প্রেস আইন চালু হবার পর কয়েকখানি বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৯ সালে ৩৩টি সংবাদপত্রের নাম পাওয়া যায়। তার মধ্যে একটি দ্বিভাষিক। এই তালিকার মধ্যে কিছু নূতন পত্রিকার নামও আছে। তবে ১৮৭৭ সালে চালু ছিল এরকম অন্তত ১০খানি পত্রিকার নাম

১৮৭১ সালে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার তালিকায় পাওয়া যায়নি। এই সবগুলি পত্রিকাই যে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের ফলে উঠে গিয়েছিল তা বলা যায় না। কিছু পত্রিকা অন্য কারণেও উঠে যেতে পারে। আবার কিছু চালু পত্রিকা তালিকাভুক্ত নাও হতে পারে। তবে বাংলা অমৃতবাজার, সোমপ্রকাশ, সম্বাদ ভাস্কর ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের জন্যই বন্ধ হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে অমৃতবাজার ইংরাজীতে প্রকাশিত হতে থাকে। সোমপ্রকাশ পরে আবার প্রকাশিত হয় তবে তার জন্য দ্বারকানাথকে মুচলেকা দিতে হয়েছিল।

পাদ্রী লঙ বাংলা সংবাদপত্রের একটি তালিকা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর তালিকা সম্পূর্ণ নয়। বেঙ্গল সেলিব্রিটিস গ্রন্থে রামগোপাল সান্যাল ১৮৭৫ সালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা দেন। তাতে দেখা যায় ওই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ইংরাজীর চেয়ে বেশী বার হচ্ছে। ওই বছর সারা ভারতে ১৫৫টি ইংরাজী, ৬১টি দ্বিভাষিক পত্রিকা ও ২৫৪টি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা ছিল। ইংরাজী ও বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা ছিল ৬১। বোম্বায়ে ৬২টি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা ছিল। ইংরাজী পত্রিকা ৩৫টি। শুধু মাদ্রাজে দেশী পত্রিকা কম। ইংরাজী ৩৬।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসরণে আমরা দীর্ঘ ষাট বছরের বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের এক তালিকা দিলাম।

১৮১৮

১। দিগ্দর্শন, মাসিক। জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত ও শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত, ১৮১৮ সালের এপ্রিলে প্রথম প্রকাশিত। ২। সমাচার দর্পণ, সাপ্তাহিক। সম্পাদক জে সি মার্শম্যান। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত। প্রথম পর্যায় ১৮১৮-৪১। দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৪২-৪৩। সম্পাদক ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় পর্যায় ১৮৫১-৫২। ৩। বাঙ্গাল গেজেটি। সাপ্তাহিক। প্রকাশক: হরচন্দ্র রায়। সম্পাদক: গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। কলিকাতা ১৮১৮-১৮১৯।

১৮১৯

১। গসপেল ম্যাগাজিন। ৩৮ নং মটস গ্যালি, ধর্মতলা থেকে প্রকাশিত। খ্রীষ্টতত্ত্ব বিষয়ক মাসিকপত্র।

১৮২১

১। ব্রাহ্মণসেবধি বা ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন। সম্পাদক শিবপ্রসাদ শর্মা (রামমোহন রায়)। ১৮২১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ২। সম্বাদ কৌমুদী। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে হরিহর দত্ত, পরে আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮২১

সালের ৪ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ১৮৩০ থেকে দ্বিসাপ্তাহিক। ১৮৩২ সাল পর্যন্ত কাগজটি চালু ছিল।

১৮২২

১। পশ্বাবলী। মাসিক। ১৮২২ সালে ফেব্রুয়ারি, প্রকাশিত। পাদরি লং কর্তৃক সঙ্কলিত পরবর্তী পর্যায়ে পরিচালক রামচন্দ্র মিত্র। ২। সমাচার চন্দ্রিকা। সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২২-১৮৪৮)। পরে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২)। সাপ্তাহিক পত্রিকা। পরে প্রাত্যহিক পত্রে রূপান্তরিত। ৩। খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত মাসিক।

১৮২৩

১। সম্বাদ তিমির নাশক, ৪০ মীর্জাপুর থেকে প্রকাশিত। প্রকাশক: কৃষ্ণমোহন দাস।

১৮২৯

১। বঙ্গদূত। ৭ বাঁশতলা গলি কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ইংরাজী, বাংলা, ফার্সী ও নাগরী ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক। প্রকাশক আর মণ্টগোমারী মার্টিন। সম্পাদক নীলরত্ন হালদার। পরে ভোলানাথ সেন ও তারপরে মহেশচন্দ্র রায়।

১৮৩০

১। শাস্ত্রপ্রকাশ। সাপ্তাহিক। লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পরিচালিত শাস্ত্র আলোচনার পত্রিকা। কলকাতা থেকে প্রকাশিত।

১৮৩১

১। সংবাদ প্রভাকর। সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিকপত্র। সম্পাদক শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ৩২নং সিমলা, কলকাতা থেকে ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১ সালে প্রথম প্রকাশ। ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ। ১৮৩৬ সালের ১০ অগস্ট থেকে বারত্রয়িক হিসাবে প্রকাশিত, ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন থেকে দৈনিক। ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি থেকে রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক। ২। সম্বাদ সুধাকর। প্রেমচাঁদ রায় প্রকাশিত। সাপ্তাহিক। ১১ জোড়াবাগান, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ১৮৩১-১৮৩৫। ৩। সমাচার সভারাজেন্দ্র। বাংলা ও ফার্সীতে প্রকাশিত দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক। প্রকাশক শেখ অবলী মুল্লা। ৪। জ্ঞানান্বেষণ। সাপ্তাহিক। ১৮৩১ সালের ১৮ জুন চোরাবাগান, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। পরিচালক দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায়। পরে রসিককৃষ্ণ মল্লিক। পরে মাধবচন্দ্র মল্লিক। বেশ কিছুকাল সম্পাদক হিসাবে ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভাট্টাচার্য। প্রকাশকল ১৮৩১-১৮৪০। ৫। অনুবাদিকা। ভোলানাথ সেন কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক। ইংরাজী রিফর্মারের অনুবাদ। ১৮৩২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত চলে। ৬। সম্বাদ রত্নাকর। ৭১ পাথুরিয়াঘাটা

ষ্ট্রীট থেকে মধুসূদন দাস কর্তৃক প্রকাশিত। সাপ্তাহিক। ১৮৩২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চলে। সম্পাদক রামচন্দ্র পাল। ৭। সম্বাদ সার সংগ্রহ। সাপ্তাহিক। ১৮৩১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে স্বরূপচাঁদ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ৮। জ্ঞানোদয়। মাসিক। কৃষ্ণধন মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৮৩১-১৮৩৩।

১৮৩২

১। বিজ্ঞান সেবধি। মাসিক। বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা। লর্ড ব্রোহেমের বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাগুলি অমলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই পত্রিকায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ২। দলবৃত্তান্ত। সাপ্তাহিক। ৩। সংবাদ রত্নাবলী। মেছুয়াবাজার বড়তলা লেনের রত্নাবলী প্রেস থেকে ২৪ জুলাই জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও মহেশচন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকৃত সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। প্রকাশকাল প্রথম পর্যায়ে ১ বছর ৮ মাস ৩ দিন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদকত্বে পুনঃ প্রচারিত। ৪। জ্ঞান সিন্ধু তরঙ্গ।

১৮৩৩

১। বিজ্ঞানসার সংগ্রহ। বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা। প্রথমে পাক্ষিক। পরে মাসিক। ২। চার আনা পত্রিকা।

১৮৩৪

১। বৃত্তান্ত বাহক। দ্বিভাষিক দ্বিসাপ্তাহিক। ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত।

১৮৩৫

১। সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়। ১৯ নং পঞ্চাননতলা থেকে প্রকাশিত। প্রথমে মাসিক, পরে সাপ্তাহিক। পরে বায়ত্রয়িক, অবশেষে দৈনিক পত্রিকাটি ৭৩ বছর (১৯০৮ সালের ১৩ এপ্রিল) পর্যন্ত চলে। সম্পাদকগণ: হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয় চন্দ্র আঢ্য, অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য, গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য। ২। ভক্তিসূচক। সাপ্তাহিক। ধর্মতত্ত্বের পত্রিকা।

১৮৩৭

১। সম্বাদ সুধাসিন্ধু। ১৮৩৭ সালের ১৩ এপ্রিল প্রকাশিত। কালীশঙ্কর দত্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক। ২। সম্বাদগুণাকর। দ্বিসাপ্তাহিক। গিরিশচন্দ্র বসু সম্পাদিত।

১৮৩৮

১। সংবাদ দিবাকর। গঙ্গানারায়ণ বসু কর্তৃক কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ২। সংবাদ সৌদামিনী। দ্বিভাষিক। তিন বছর জীবিত ছিল। ৩। সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী। সাপ্তাহিক। পার্বতী চরণদাস সম্পাদিত।

১৮৩৯

১। সম্বাদ ভাস্কর, শ্রীনাথ রায় সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৮৩৯। প্রকৃত সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৫৯-৫ ফেব্রুয়ারি) তাঁর পুত্র ক্ষেত্র-

মোহন ভট্টাচার্য এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। শিমুলিয়া আশুতোষ দেবের বাড়িতে সম্বাদ ভাস্কর প্রকাশিত হত। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে বারত্রয়িক। ২। সম্বাদ রসরাজ। সাপ্তাহিক, পরে দ্বিসাপ্তাহিক। সম্পাদক প্রথমে কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। পরে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ৩। সংবাদ অরুণোদয়। দৈনিক। জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৮৪০

১। মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী। প্রথম মফস্বল সংবাদপত্র। গুরুদয়াল চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক। ২। সংবাদ সুজন রঞ্জন, হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (মে, ১৮৪০), সাপ্তাহিক। ৩। আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ। মাসিক। শ্রীনারায়ণ রায় প্রকাশিত। ৪। গবর্নমেন্ট গেজেট। সাপ্তাহিক। ১৮৪০-এর ১ জুলাই থেকে শ্রীরামপুর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। সম্পাদক প্রথমে জে সি মার্শম্যান, পরে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫। জ্ঞানদীপিকা। সাপ্তাহিক। ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১৮৪১

১। সংবাদ ভারতবন্ধু। সাপ্তাহিক। সম্পাদক শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অল্পদিন স্থায়ী। ২। সংবাদ নিশাকর, নিলকমল দাস কর্তৃক প্রকাশিত॥ সাপ্তাহিক।

১৮৪২

১। বেঙ্গল স্পেকটেটর। দ্বিভাষিক মাসিক। পরে পাক্ষিক ও সপ্তাহিক। ১৮৪১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত চলে। ২। বিদ্যাদর্শন। অক্ষয়কুমার দত্ত এবং প্রসন্ন কুমার ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। ছয়মাস চলে। মাসিকপত্র। ৩। সংবাদ ভৃঙ্গদূত। নীলকমল দাস সম্পাদিত। মাত্র দেড় বছর চলে।

১৮৪৩

১। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র। দ্বিভাষিক সম্পাদক জে রবিনসন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সংবাদপত্র। মাসিক। ২। তত্ত্ববোধিনী। মাসিক। প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৮৪৪

১। কায়স্থকৌস্তভ। ২। সর্ব্বরসরঞ্জিনী। সাপ্তাহিক। ৩। সংবাদ রাজরানী। সম্পাদক গঙ্গানারায়ণ বসু। ৪। পক্ষির বিবরণ।

১৮৪৬

১। নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা। পাক্ষিক। নন্দকুমার কবিরত্ন কর্তৃক সম্পাদিত ও পাথুরিয়াঘাটার শ্রীশিবচন্দ্র কারফারমা কর্তৃক প্রকাশিত। ২। জগদ্দীপক ভাস্কর। ইংরাজি, হিন্দি, ফারসি, উর্দু হিন্দি ও এই চার ভাষায় প্রকাশিত। মুসলমান

সমাজের মুখপত্র। ৬। পাষণ্ড পীড়ণ। ২০ জুন ১৮৪৬ প্রভাকর যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ৪। সত্য সঞ্চারিণী পত্রিকা। মাসিক। সম্পাদক শ্যামাচরণ বসু। ৫। সমাচার জ্ঞানদর্পণ। ১৭ অক্টোবর, উমাকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত। সাপ্তাহিক। ১৮৪৯-এর সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত চলে। ৬। জগবন্ধু মাসিক। দুবছর চলে।

১৮৪৭

১। উপদেশক। পাদরি জে ওয়েঙ্গার সম্পাদিত। মাসিক খ্রীষ্টতত্ত্ব পত্রিকা। ২। দুর্জ্জন দমন মহানবমী। মথুরামোহন দাসগুহ কর্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। ১৮৪৭-এর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ঠাকুরদাস বসু সম্পাদক। চার বছর চলে। ৩। সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন। দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক। চৈতন্য অধিকারী প্রকাশিত। ৪। হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয়। প্রকাশক হরিনারায়ণ গোস্বামী, ধর্মবিষয়ক মাসিক। ৫। সংবাদ কাব্যরত্নাকর। সপ্তাহিক। ৬। হিন্দুবন্ধু। সাপ্তাহিক। ৭। জ্ঞানসঞ্চারিণী। গঙ্গানারায়ণ বসু প্রকাশিত। ৮। রঙ্গপুর বার্তাবহ সাপ্তাহিক। ৯। সংবাদ সাধুরঞ্জন: ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত। তবে সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল নবকৃষ্ণ রায়ের। ১০। সংবাদ সুজনবন্ধু। সাপ্তাহিক। নবীনচন্দ্র দে প্রকাশিত। ১১। সংবাদ দিগ্বিজয়। সাপ্তাহিক। দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। ১২। সংবাদ মনোরঞ্জন। সাপ্তাহিক। প্রকাশক গোপালচন্দ্র দে। ১৩। আক্কেল গুড়ুম। দ্বিভাষিক। সাপ্তাহিক।

১৮৪৮

১। সংবাদ রত্নবর্ষণ। মাধবচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। পাক্ষিক। ২। সংবাদ মুক্তাবলী। কালীকান্ত ভট্টাচার্য পরিচালিত। সাপ্তাহিক। ৩। সংবাদ অরুণোদয়। সাপ্তাহিক। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত। ৪। সংবাদ কৌস্তভ। মহেশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। ৫। জ্ঞানচন্দ্রোদয়। রাধানাথ বসু প্রকাশিত। ৬। সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর। সাপ্তাহিক। ৭। সংবাদ দিনমণি। শম্ভুচন্দ্র মিত্র পরিচালিত। ৮। সংবাদ রসসাগর। ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে বারত্রয়িক। ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পর (শ্রাবণ ১২৭৫) রঙ্গলাল সম্পাদক হন। নাম হয় রসসাগর। ১২৬০ সালের পূর্বে এই পত্রিকার প্রচার রহিত হয়।

১৮৪৯

১। বারাণসী চন্দোদয়। ২। সত্যধর্মপ্রকাশিকা। মাসিক। ৩। সংবাদ রসমুদ্গার। সাপ্তাহিক ও পরে অর্ধসাপ্তাহিক। গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত ৪। কৌস্তভ কিরণ। মাসিক। ৫। মহাজন দর্পণ। দৈনিক। বাজার দরের পত্রিকা। জয়কালী বসু সম্পাদিত। ৬। ভৈরব দণ্ড সাপ্তাহিক। ৭। সংবাদ সজ্জানরঞ্জন। সাপ্তাহিক, পরে অর্ধ সাপ্তাহিক। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত।

৮। বর্ধমান চন্দ্রোদয়। সাপ্তাহিক। রামতারণ ভট্টাচার্য প্রকাশিত। ৯। সংবাদ রসরত্নাকর। পাক্ষিক।

১৮৫০

১। সত্য প্রদীপ। সাপ্তাহিক। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে মেরিডিব টাউন সেণ্ড কর্তৃক প্রকাশিত। ২। দূরবীক্ষণিকা। মাসিক। ৩। ধর্মমর্ম প্রকাশিকা, মাসিক। ৪। সত্যার্ণব। মাসিক। রেভারেণ্ড লঙ কর্তৃক সম্পাদিত. পাঁচবছর চলে। ৫। সর্বশুভকরী। মাসিক। সম্পাদক মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫১ পর্যন্ত চলে। ৬। সংবাদ সুধাংশু। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাপ্তাহিক। খ্রীষ্টতত্ত্বের পত্রিকা। ১১ মাস চলে। ৭। সংবাদ বর্ধমান। সাপ্তাহিক। কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১৮৫১

১। জ্ঞানদর্শন। পাক্ষিক। ২। কাশীবার্তা প্রকাশিকা। কাশীদাস মিত্র প্রকাশিত। পাক্ষিকপত্র। ৩। সংবাদ জ্ঞানোদয়। সাপ্তাহিক। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৪। মেদিনীপুর ও হিজলির অধ্যক্ষ। দ্বিভাষিক, মাসিক। ৫। বিবিধার্থ সংগ্রহ। কার্তিক ১২৫৮ থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দ্বারা সম্পাদিত, রাজেন্দ্রলালের পর কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৬১ থেকে সম্পাদক হন।

১৮৫২

১। জ্ঞানারুণোদয়। মাসিক। শ্রীরামপুরের চন্দোদয় যন্ত্র থেকে প্রকাশিত। ২। বিশ্ববিলোকন। সম্ভবত সাপ্তাহিক : ৩। সংবাদ বিভাকর। অর্ধসাপ্তাহিক। সম্পাদক মনমোহন বসু।

১৮৫৩

১। বিদ্যার্পণ। মাসিক। ২। সুলভ পত্রিকা। মাসিক। ৪, হরিঘোষের ষ্ট্রীট, হোগলকুড়িয়া, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। দ্বারকানাথ রায় সম্পাদক, পরে লালবিহারী দে সম্পাদক হন। ৩। ছোট জাগলিয়া হিতৈষি। মাসিক। ৪। পাষণ্ড দলন। অর্ধসাপ্তাহিক। ৫। চিকিৎসা রত্নাকর। হলধর সেন সম্পাদিত।

১৮৫৪

১। রসার্ণব। মাসিক। ২। সংবাদ দিনকর। কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাপ্তাহিক। ৩। সমাচার সুধাবর্ষণ। বড়বাজার, কলকাতার কোমলনয়নের বেড নং ১৬।১০ ভবন থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন। বাংলা ও হিন্দি প্রাত্যহিক পত্র। ১০ আগস্ট ১৮৫৪ প্রথম প্রকাশিত হয়। ৪। মাসিক

পত্রিকা। প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত। ৫। প্রকৃতি মুদ্গর। মাসিক।

১৮৫৫

১। সিদ্ধান্ত দর্পণ। মাসিকপত্র। ২। বিদ্যোৎসাহী পত্রিকা। মাসিক। কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত। জোড়াসাঁকো বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র। ৩। সর্বার্থপূর্ণচন্দ্র। মাসিক। ৪। জ্ঞানবোধিনী। সাপ্তাহিক। ৫। বঙ্গ বার্তাবহ। পাক্ষিক। ৬। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা। মাসিক।

১৮৫৬

১। মর্ম ধুরন্ধর। মাসিক। ২। বেহালা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা ৩। সত্য জ্ঞানসঞ্চারিণী। মাসিক। ৪। এডুকেশন গেজেট। ৪ জুলাই ১৮৫৬। ৫। সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা। মাসিক। ৬। অরুণোদয়। পাক্ষিক। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সম্পাদিত। ১৮৬২ পর্যন্ত চলে। ৭। অদ্বয়তত্ত্বপ্রদর্শিকা পত্রিকা। মাসিক। ৮। উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিকা। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৭

১। হিন্দু রত্ন কমলাকর। সাপ্তাহিক। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ২। বিজ্ঞান মিহিরোদয়। মাসিক। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত, সম্পাদক নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি। ৩। সর্বার্থ প্রকাশিকা। কানাইলাল পাইন পরিচালিত মাসিক। ৪। লোক লোচন চন্দ্রিকা। মাসিকপত্র। সম্পাদক। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৮

১। সুবোধিনী। চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক। ২। রচনা রত্নাবলি। মাসিক। প্রাণনাথ দত্ত পরিচালিত। ৩। বিচারক। সাপ্তাহিক। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য প্রকাশিত। ৪। কলিকাতা বার্তাবহ। দ্বিসাপ্তাহিক। ৫। হিতৈষিণী পত্রিকা। মাসিক। ৬। চমৎকার মোহন। দ্বিভাষিক ইংরাজি ও বাংলা। ৭। কলিকাতা পত্রিকা। মাসিক। ৮। সোমপ্রকাশ। দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ ১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ প্রথম প্রকাশ।

১৮৫৯

১। পূর্ণিমা মাসিক। বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত। ২। ধর্মরাজ। মাসিক। তারকনাথ দত্ত সম্পাদিত। ৩। হিতবিলাসিনী পত্রিকা। মাসিক হিতবিলাসিনী সভার মুখপত্র। ৪। ভারতবর্ষীয় সভা মাসিক বিজ্ঞাপনী। ভারতবর্ষীয় সভার মুখপত্র। ৫। সৌদামিনী। দ্বিসাপ্তাহিক। শ্যামাচরণ সান্যাল ও বিপিনবিহারী সরকার সম্পাদিত। ৬। সংবাদ দ্বিজরাজ। সাপ্তাহিক। গোঁসাইদাস গুপ্ত সম্পাদিত।

১৮৬০

১। সত্য প্রদীপ। শিশু মাসিক। ২। রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ। সাপ্তাহিক। ৩। জ্ঞানচন্দ্রিকা। মাসিক। কবি বলাইচাঁদ সেন সম্পাদিত। ৪। কবিতা কুসুমবলী। মাসিক। ৫। রাজপুর পত্রিকা। মাসিক। ৬। মনোরঞ্জিকা। মাসিক। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। ৭। বিজ্ঞান কৌমুদী। মাসিক। ৮। ত্রিপুরাজ্ঞান প্রসারিণী। মাসিক। ৯। বিক্রমপুর কুকুটীয়া সংস্কার শোধিনী।

১৮৬১

১। মনোহর। সাপ্তাহিক। ২। ঢাকা প্রকাশ। সাপ্তাহিক। সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। পরে দীননাথ সেন। জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী। গোবিন্দপ্রসাদ রায়। ৩। বঙ্গ হিতার্থিনী। সাপ্তাহিক। ৪। ভারতবর্ষীয় সম্বাদপত্র। পাক্ষিক। ৫। পরিদর্শক, দৈনিক। পরে সাপ্তাহিক। জগমোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত। ৬। সুধাকর। সাপ্তাহিক। ৭। ফরিদপুর দর্পণ। পাক্ষিক। ৮। যেমন ধর্ম তেমনি ফল। সাপ্তাহিক। ৯। শ্রীচৈতন্যকীর্তি কৌমুদী পত্রিকা। ১০। গন্ধ প্রসূন। মাসিক।

১৮৬২

১। বিশ্বমনোরঞ্জন। সাপ্তাহিক। ২। ভারতরঞ্জন। ৩। মঙ্গলোদয়। সাপ্তাহিক। ৪। শুভকরী। মাসিক। সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র ৫। চিত্তরঞ্জিনী। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক। ৬। অমাবস্যা। মাসিক। ৭। বঙ্গোজ্জ্বল। সাপ্তাহিক। ৮। ঢাকা বার্তা প্রকাশিকা। সাপ্তাহিক। ৯। অবকাশ রঞ্জিকা। মাসিক। সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র। ১০। অমৃত প্রবাহিনী। পাক্ষিক। যশোহর থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক বসন্তকুমার ঘোষ। ১১। সংবাদ ভারতবন্ধু। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত। সাপ্তাহিক। ১২। আয়ুর্বেদ পত্রিকা। সাপ্তাহিক। ১৩। রহস্য সন্দর্ভ। কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটির আনুকূল্যে প্রচারিত। প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পরে প্রাণনাথ দত্ত সম্পাদক হন। মাসিক। ১৪। গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা। হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত। মাসিক। কুমরখালি থেকে প্রকাশিত। ১৫। অবোধবন্ধু। মাসিক। ১২৭৫ সালের পৌষ সংখ্যার পর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীকে অর্পণ করেন। ১৬। সাহিত্য সংক্রান্তি। মাসিক। ১৭। ভারতপরিদর্শন। সাপ্তাহিক। ১৮। ঢাকা দর্পণ। সাপ্তাহিক। ১৯। বামাবোধিনী। বামাবোধিনী সভার মুখপত্র। মাসিক। ২০। সচিত্র ভারত সংবাদ। ২৩।১ সিকদার পাড়া থেকে প্রকাশিত। পাক্ষিক।

১৮৬৪

১। রচনাবলী। রংপুর থেকে প্রকাশিত। মাসিক। ২। কাব্য প্রকাশ। ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মাসিক। ৩। পাবনা দর্পণ। মাসিক। ৪। শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। মাসিকা। ৫। ধর্মপ্রচারিণী, বেঙ্গল ব্রাহ্মসমাজের অধীনে

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারিণী সভার মুখপত্র। ৬। হিন্দু ইন্টারপ্রীটার। দ্বিভাষিক। ৭। পাক্ষিক। বিদ্যোন্নতি সাধিনী। ময়মন সিংহের শেরপুরে বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভার মুখপত্র। মাসিক। ৮। ধর্মতত্ত্ব। মাসিক।

১৮৬৫

১। সত্যান্বেষণ। মাসিক। ২। বিজ্ঞাপনী। সাপ্তাহিক। ৩। হিন্দু হিতৈষিণী। হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। সাপ্তাহিক। ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৪। রাজনীতি সংগ্রহ। সাপ্তাহিক। ৫। সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী। ত্রৈমাসিক। ৬। হিন্দুরঞ্জিকা। প্রথমে মাসিক, পরে সাপ্তাহিক। ৭। চিকিৎসক। মাসিক।

১৮৬৬

১। সর্বার্থসংগ্রহ। মাসিক। ২। নব প্রবন্ধ। মাসিক। ৩। বর্ধমান মাসিক পত্রিকা। ৪। মুর্শিদাবাদ সংবাদসার। পাক্ষিক।

১৮৬৭

১। তত্ত্ববিকাশিনী। মাসিক। ২। পল্লীবিজ্ঞান। ঢাকা বিক্রমপুর থেকে প্রকাশিত। মাসিকপত্র। ৩। প্রত্নকমুনন্দিনী। মাসিক। ৪। অবকাশ বন্ধু। মাসিক। সম্পাদক। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৮৬৮

১। সাপ্তাহিক সম্বাদ। প্রথমে সাপ্তাহিক পরে পাক্ষিক। মিশনারী পত্রিকা। ২। সমালোচনী মাসিক। বহরমপুর থেকে প্রকাশিত। ৩। পত্ত প্রকাশিকা। মাসিক। ৪। প্রয়োগ দূত। এলাহাবাদ। পাক্ষিক। ৫। পল্লীগ্রাম বার্তাবহ। পাক্ষিক। বৈদ্যবাটী। ৬। উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা। ৭। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা। মাসিক। সম্পাদক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ৮। হিতসাধিনী। সংস্কৃত ও বাংলা মাসিক। ৯। বোধ কিশিনী, মাসিক। ১০। কল্পলতিকা। পাক্ষিক। ১১। অমৃতবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক।

১৮৬৯

১। হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষিণী। মাসিক। জিরাট হিন্দু হিতৈষিণী সভার মুখপত্র। ২। অবলাবান্ধব। পাক্ষিক। ঢাকা। ৩। জ্যোতিরিঙ্গণ। মাসিক। ৪। বঙ্গদূত। সাপ্তাহিক। ৫। জ্ঞানলহরী, মাসিক। ৬। চিকিৎসা সংগ্রহ। মাসিক। ৭। জ্ঞান প্রদায়িনী পত্রিকা। মাসিক। ৮। দেশ হিতৈষিণী। মাসিক। রাজকৃষ্ণ দাস কর্তৃক সম্পাদিত।

১৮৭০

১। মধুকরী। মাসিক, পরে পাক্ষিক। ২। বরিশাল বার্তাবহ। পাক্ষিক। ৩। বঙ্গমহিলা। পাক্ষিক। ৪। পাক্ষিক প্রকাশিকা। ৫। সঙ্গীত চিত্ত সন্তোষ। মাসিক। উমাচরণ সেন ও যোগেন্দ্র বসু পরিচালিত। ৬। আর্যধর্ম প্রকাশিকা। ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার মুখপত্র। মাসিক। ৭। মিত্র প্রকাশ। ঢাকা

থেকে প্রকাশিত সাহিত্য মাসিক। ৮। রাজসাহী সম্বাদ। পাক্ষিক। ৯। নিত্যানন্দ দায়িনী। ত্রৈমাসিক। ১০। শাস্ত্র প্রকাশ। মাসিক। ১১। সজ্জনচিত্ত বিনোদিনী। মাসিক। ১২। বঙ্গবন্ধু। ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভার মুখপত্র। প্রথমে পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক। ১৩। সাহিত্যসংগ্রহ। মাসিক। ১৪। নারীশিক্ষা পত্রিকা। মাসিক। ঢাকা। ১৫। মাসিক প্রকাশিকা। ১৬। মুর্শিদাবাদ হিতৈষিণী (পাক্ষিক)। ১৭। সনাতন ধর্মোপদেশিনী মাসিক। সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ১৮। সুলভসমাচার। সাপ্তাহিক। কেশব-চন্দ্র সেন সম্পাদিত। ১৯। বিদূষক। মাসিক।

১৮৭১

১। বিশ্বদূত। মাসত্রয়িক। ২। সাহিত্যমুকুর। সাপ্তাহিক। ৩। হিতবাদী। মাসিক ধর্মপত্রিকা। ৪। শুভসাধিনী। ঢাকা শুভসাধিনী সভার মুখপত্র। ৫। হিতকরী। সাপ্তাহিক। ৬। প্রাত্যহিক সম্বাদ। দৈনিক। ৭। হিতমিহির। সাপ্তাহিক। ৮। ভারতপরিদর্শক। মাসিক। ৯। চিকিৎসা দর্পণ। মাসিক। ১০। হালিশহর পত্রিকা। মাসিক। ১১। হিতসাধিনী। মাসত্রয়িক। বরিশালের কুলকাটি থেকে প্রকাশিত। ১২। মদনা গরল। মাসিক। ১৩। বিভাকর। মাসিক। ১৪। দুর্লভ সমাচার। সাপ্তাহিক। ১৫। বিজ্ঞান চক্রবান্ধব। মাসিক। ১৬। বরাহনগর বার্তাবহ। পাক্ষিক। ১৭। হিন্দু প্রদর্শক। মাসিক। ১৮। চুঁচুড়া প্রকাশিকা। মাসিক। ১৯। চিকিৎসা সংগ্রহ। মাসিক। ২০। গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিধান। মাসিক। ২১। আর্য্যোদয়। মাসিক। ২২। ধূমকেতু। মাসিক। ২৩। দেশহিতৈষিণী। পাক্ষিক। ২৪। রসতরঙ্গ। সাপ্তাহিক। ২৫। বিজ্ঞান রহস্য। মাসিক। ২৬। আর্যাবর্তরীতিবোধিকা। মাসিক ধর্মপত্রিকা। সম্পাদক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৮৭২

১। বিশ্বদর্পণ। পাক্ষিক, পরে মাসিক। ২। জ্ঞানপ্রভা। সিরাগঞ্জের কাছে ঘোড়াচরা থেকে প্রকাশিত। ৩। বঙ্গদর্শন। সম্পাদকগণ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: ১২৭৯-১২৮২, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: ১২৮৪-১২৮৫, ১২৮৭, ১২৮৮ (বৈশাখ-আশ্বিন) ও ১২৮৯ (বৈশাখ-চৈত্র), শ্রীশচন্দ্র মজুমদার: ১২৯০ (কার্তিক-মাঘ)। ৪। মধ্যস্থ। সাপ্তাহিক। মনমোহন বসু সম্পাদিত। ৫। সাপ্তাহিক পরিদর্শক। ৬। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা। সাপ্তাহিক। ৭। ধর্মসাধন। সাপ্তাহিক। ৮। সর্বার্থ সঙ্কলন। মাসিক। ৯। হিতব্রত। মাসিক ধর্মপত্রিকা। ১০। পরিমল বাহিনী। পাক্ষিক। বরিশালের কেওরা থেকে প্রকাশিত। ১১। বঙ্গসুহৃদ। মাসিক। ১২। ভারতভৃত্য। সাপ্তাহিক। ১৩। আসাম মিহির। আসাম থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক। ১৪। আর্যপ্রবর। দর্শন ও ধর্ম মাসিক। ১৫। জ্ঞানাঙ্কুর। মাসিক। প্রথম দুই সংখ্যা রাজশাহী বোয়ালিয়ায় প্রকাশিত।

তারপর থেকে কলকাতায় প্রকাশিত। ১৮৮২ সালের অগ্রহায়ণে প্রতিবিম্ব পত্রিকার সঙ্গে মিলে নাম হয় জ্ঞানাঙ্কুর প্রতিবিম্ব। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ক্যানিং লাইব্রেরী যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত হত। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বনফুল, রাজনারায়ণ বসুর অমৃতাঙ্কুর উপন্যাস ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ললিত সৌদামিনী উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, পৌষ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হয় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বিমলা উপন্যাস। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় জ্ঞানাঙ্কুরে রসরচনা লিখতেন। ১৬। সঙ্গীত সমালোচনী। মাসিক। ১৭। বঙ্গ দর্পণ। সাপ্তাহিক। ১৮। সমাজ দর্পণ সাপ্তাহিক। ১৯। আর্যবোধক। মাসিক।

১৮৭৩

১। বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার। ২। গ্রামদূত। পাক্ষিক। বরিশাল পোনাবলিয়া থেকে প্রকাশিত। ৩। অবকাশ সহচরী। মাসিক। ৪। সর্বার্থ সংগ্রহ। মাসিক। ৫। ভারত সংস্কারক। সাপ্তাহিক। ৬। দূত। সাপ্তাহিক। ৭। বঙ্গমিহির। মাসিক। ৮। বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব। পাক্ষিক। ৯। মহাপাপ বাল্যবিবাহ। মাসিক। ১০। গ্রামবাসী। পাক্ষিক। রাণাঘাট। ১১। গ্রামবাসী। মাসিক। ১২। বালারঞ্জিকা। সাপ্তাহিক। ১৩। গ্রামদূত। পাক্ষিক। ১৪। বিশ্বদর্শন। পাক্ষিক। ১৫। বঙ্গবিধান। মাসিক। ১৬। বিজ্ঞান বিকাশ। পাক্ষিক। খড়দহ। ১৭। সহচর। সাপ্তাহিক। ১৮। সাপ্তাহিক সমাচার। ১৯। সমবেদক। সাপ্তাহিক। ২০। তমোলুক পত্রিকা। মাসিক। তমলুক। ২১। অবকাশ তোষিণী। মাসিক। ২২। বঙ্গদর্শন। সাপ্তাহিক। ২৩। পল্লীদর্শন। মাসিক। ২৪। প্রমোদিনী। চাতুর্মাসিক। ২৫। সমাজ দর্পণ। পাক্ষিক। ২৬। সাধারণী সাপ্তাহিক। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত। চুঁচুড়া। ২৭। পূর্ণশশী। মাসিক। ২৮। কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা। মাসিক। ২৯। সুবোধিনী। মাসিক। ৩০। সিহাড়সোল পত্রিকা। পাক্ষিক। ৩১। ভারত দর্পণ ও পুলিশ বার্তাবহ। পাক্ষিক। চুঁচুড়া।

১৮৭৪

১। হাবড়া হিতকরী। সাপ্তাহিক। ২। হরবোলা ভাঁড়। মাসিক। ৩। বসন্তক। মাসিক। ৪। ভ্রমর: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৫। আর্যদর্শন। মাসিক। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ১১ বছর চলে। ৬। ভারত শ্রমজীবী। মাসিক। বরাহনগর। ৭। গোয়াল পাড়া হিতসাধিনী। পাক্ষিক। ৮। আজীবন নেহার। মাসিক। চুঁচুড়া থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক। মীর মশাররফ হোসেন। ৯। ভারতদর্পণ। মাসিক। ১০। পরিদর্শক। সাপ্তাহিক। ১১। বান্ধব। মাসিক। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ১২। বাঙ্গালী খ্রীষ্টিয়ান। মাসিক। ১৩। হিন্দুবিলাসী মাসিক। ১৪। সুহৃদ। মাসিক। ১৫। হিন্দুরঞ্জন। মাসিক। ১৬। কুমুদিনী।

মাসিক। ১৭। সহোদর। মাসিক। ১৮। সরোজিনী। মাসিক। ১৯। উচিত বক্তা। পাক্ষিক। ২০। প্রতিধ্বনি। সাপ্তাহিক। ২১। বাঙ্গালি। মাসিক ময়মনসিংহ। ২২। চিকিৎসাতত্ত্ব। মাসিক। ২৩। হিতবোধ। মাসিক। ২৪। সমদর্শী। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত। মাসিক। ২৫। দর্শক। মাসিক ২৬। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। মাসিক। ২৭। হিন্দু দর্পণ। মাসিক। ২৮। কুমুদ বান্ধব। মাসিক। ২৯। ভারতহিতৈষিণী। মাসিক। ৩০। সত্যপ্রকাশ। পাক্ষিক। বরিশাল। ৩১। পারিল বার্তাবহ। পাক্ষিক। ঢাকা, মাণিকগঞ্জ।

১৮৭৫

১। সুদর্শন। মাসিক। ২। প্রভাত সমীর। দৈনিক। ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত সম্পাদিত। মাত্র চারমাস চলে। ৩। বঙ্গহিতৈষিণী। পাক্ষিক। ৪। বিচারক। সাপ্তাহিক। ৫। দুর্লভ। সাপ্তাহিক। ৬। হিন্দুদর্পণ। পাক্ষিক। ৭। বিস্তীয়াপত্র। মাসিক। ৮। সুহৃদ। সাপ্তাহিক। ময়মনসিংহ। ৯। রাজসাহী সমাচার। সাপ্তাহিক। ১০। হুতম। সপ্তাহিক। ১১। সম্মিলনী। সাপ্তাহিক। ১২। প্রতিবিম্ব। রামসর্বস্ব বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। মাসিক। জ্ঞানাঙ্কুরের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ১৩। বিনোদিনী। মাসিক। ১৪। বহুমহিলা। মাসিক। ১৫। হিতৈষিণী। মাসিক। ১৬। প্রিয়দর্শন। মাসিক। ১৭। শুভাকাঙ্ক্ষী। মাসিক ১৮। ভারতবর্ষীয় আর্য পত্রিকা। হরিনাভি ভারতবর্ষীয় আর্যসভার মুখপত্র। মাসিক। ১৯। মধুমক্ষিকা। মাসিক। গোয়াল পাড়া। ২০। রাজসাহীবাসী। মাসিক। ২১। রত্নাকর। সাপ্তহিক। ২২। মধুকর। সাপ্তাহিক। ২৩। ঢাকা দর্শক। সাপ্তাহিক। ২৪। ষ্টার অব ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র। দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক। ২৫। অনাথিনী। মাসিক। ধুলিয়ান। ২৬। অণুবীক্ষণ। মাসিক। ২৭। মানবমোহিনী। মাসিক। ২৮। বনকুসুম। মাসিক। ২৯। ভিখারিনী। মাসিক। ৩০। প্রমোদী। মাসিক। ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা। ৩১। সুধাকর। মাসিক। বহরমপুর। ৩২। যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ। সাপ্তাহিক। ৩৩। ভাবী সম্রাটের ভারতভ্রমণ। সাপ্তাহিক। ৩৪। ভারতমিহির। সাপ্তাহিক। ৩৫। জ্ঞান-দীপিকা পত্রিকা। সাম্বৎসরিক।

১৮৭৬

১। রত্নাকর। মাসিক। ২। একাকিনী। মাসিক। বঙ্গীয় ভাঁড়। মাসিক। ৪। হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষী মাসিক। ৫। হোমিওপেথি। মাসিক। ৬। বাঁদরামী। মাসিক। ৭। বিহারদূত। মাসিক। বাঁকিপুর। ৮। মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি। ৯। প্রতিকার সাপ্তাহিক। বহরমপুর। ১০। চুম্বক নজীর। মাসিক। শ্রীরামপুর। ১১। ভারতসুহৃদ। মাসিক। ফরিদপুর। ১২। বাঙ্গালা রাজকীয় গেজেট। সাপ্তাহিক। ১৩। ধর্মপ্রকাশ। মাসিক। মেদিনীপুর। ১৪। আদর্শ। মাসিক। ১৫। ব্যবসায়ী। মাসিক। ১৬। বিজ্ঞানদর্পণ। মাসিক। ১৭। ভারতজাতি। মাসিক। বর্ধমান। ১৮।

মিত্রোদয়। মাসিক। ১৯। চিত্রকর। মাসিক। ফরিদপুর উলপুর থেকে প্রকাশিত। ২০। মনোহরা। পাক্ষিক। ২১। বিশ্বসুহৃৎ। সাপ্তাহিক। বর্ধমান। ২২। ত্রিপুরা পত্রিকা। পাক্ষিক। ২৩। সঞ্জীবনী।

১৮৭৭

১। দুরাশা। মাসিক। ২। জ্ঞানদীপিকা। মাসিক। ৩। কুসুম। মাসিক। ৪। বঙ্গহিতৈষী। সাপ্তাহিক। ৫। কুশদহ। পাক্ষিক। ৬। আর্যপ্রতিভা মাসিক। ৭। সর্বার্থদায়িনী। মাসিক। ৮। সমাজরঞ্জন, সাপ্তাহিক। ৯। আর্যদর্পণ ১০। নববার্ষিকী। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১১। ভারতী। সম্পাদকগণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর: ১২৮৪-১১৯০। স্বর্ণকুমারী দেবী; ১২৯১-১৩০১ হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী; ১৩০২-১৩০৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; ১৩০৫ সরলাদেবী ১৩০৬-১৩১৪; স্বর্ণকুমার দেবী; ১৩১৫-১৩২১। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৩২২-১৩৩০ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও সরলা দেবী; ১৩৩১-১৩৩৩। ১২। সুধাকর। পাক্ষিক। ১৩। কোচবিহার মাসিক পত্রিকা। ১৪। ধর্মপ্রচারক। মাসিক। ১৫। ভারত চিকিৎসক। মাসিক। ১৬। পথিক। মাসিক।

১৮৭৮

১। হিতৈষী। মাসিক। ২। হিন্দুললনা। পাক্ষিক ৩। কমলিনী। মাসিক। ৪। বিশ্বদর্শন। দ্বিমাসিক। ৫। সমালোচক। সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। সাপ্তাহিক। ৬। আনন্দবাজার পত্রিকা। সাপ্তাহিক ৭। বীণা। মাসিক। ৮। বালকবন্ধু। পাক্ষিক। কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদিত। কিছুদিন পর প্রচার রহিত। ১৮৮১ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে মাসিক হিসাবে পুনঃপ্রচার। ৯। বর্ধমান সঞ্জীবনী। সাপ্তাহিক। ১০। পরিচারিকা। মাসিক। ১১। তত্ত্বকৌমুদী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র। সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী। ১২। চিকিৎসা কল্পদ্রুম। মাসিক। ১৩। কল্পদ্রুম। মাসিক। ১৪। পঞ্চানন্দ। মাসিক। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক চুঁচুড়া থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। এক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ। ১৮৭৯ কলকাতা থেকে পুনঃপ্রকাশিত। ১৫। চন্দ্রশেখর। মাসিক। ১৬। আর্যপ্রদীপ। মাসিক। ১৭। বঙ্গদর্পণ। মাসিক। ১৮। আর্য বিদ্যাসুধানিধি। মাসিক। ১৯। দিবাকর। সাপ্তাহিক।

এই তালিকায় উল্লিখিত পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলির অধিকাংশই সংবাদপত্র ছিল।

উল্লেখযোগ্য মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ

১৭৮৫-১৮৮

১। ১৭৮৫ সালে মুদ্রিত জোনাথান ডানকানের আইন-সংক্রান্ত অনুবাদ গ্রন্থ। ডানকান। বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের আইন পুস্তিকা ইম্পেকোডের অনুবাদ করেন। বাংলা অক্ষরে এই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

২। ১৭৯১ সালে প্রকাশিত এন. বি. এড়মনস্টোনের বাঙ্গলা, বিহার ও ওড়িষ্যার প্রচলিত ফৌজদারি আইনের অনুবাদ।

১। ১৭৯২ সালে ম্যাজিস্ট্রেটদের আচরণবিধি-সংক্রান্ত গ্রন্থের অনুবাদ।

৪। ১৭৯৩ সালে হেনরি পিটস ফরস্টার অনুদিত "১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গবর্নর বাহাদুরের হুজুর কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন।"

৫। এ. আপজন কর্তৃক ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি গ্রন্থের অনুবাদ।

৬। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জন মিলার রচিত শিক্ষাগুরু।

৭। ১৭৯৯ সালে হেনরি ফরস্টারের ইংরাজী বাংলা ভোকাব্যুলরির প্রথম খণ্ড।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন ও ছাপাখানার পত্তন হলে, বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্ব সুরু হয়ে যায়। ১৮০০ সালেই শ্রীরামপুর প্রেস থেকে বাইবেলের আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে একের পর এক গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। অপ্রাসঙ্গিক বলে আমরা তার আলোচনায় গেলাম না। ১৮১৮ সালে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের আগে বাংলা গদ্যের কী অবস্থা ছিল তার পরিচয় দেবার জন্য ১৭০০ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত বাংলা গদ্য গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হল। ওই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন লেখকের ধর্মপুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে উইলিয়ম কেরী অনূদিত স্যামুয়েল পীয়ার্সের লেখা লেটার টু দি লষ্করস একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১০০০ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়া টমাস, কেরী ও রামরাম বসুর যৌথ প্রচেষ্টায় ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে উদ্ধৃত খ্রীষ্টবাণী-সম্বলিত বাংলা বাইবেল 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের' এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে ১৮০১ সালে ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে কিছু মৌলিক গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হতে সুরু করে ও এই পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলার প্রথম যুগের শক্তিশালী গদ্যলেখকদের আবির্ভাব ঘটে। ১৮০০ সালে রামরাম বসুর হরকরা বা গসপেল মেসেঞ্জার নামে সর্বপ্রথম মুদ্রিত কাব্য গ্রন্থ বার হয়। রামরাম বসু জ্ঞানোদয় নামে আর একটি পুস্তিকাও লেখেন। ওই দুটি গ্রন্থই গদ্য। ১৮০১ সাল থেকে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থগুলি হল :

১৮০১

১। কথোপকথন : উইলিয়ম কেরী কর্তৃক লিখিত অথবা সম্পাদিত। এই গ্রন্থে সেকালের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনা সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। ২। এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ. উইলিয়াম কেরী সঙ্কলিত। ৩। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত : সাগরদ্বীপের সর্বশেষ রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন বৃত্তান্ত। বাংলা ভাষায় রচিত এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক গ্রন্থ। লেখক : রামরাম বসু।

১৮০২

১। বত্রিশ সিংহাসন : মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ। ২। ধর্মপুস্তক বা বাংলায় রচিত নিউ টেস্টামেণ্ট। বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাইবেল। অনুবাদ করেন কেরী, জন, ফাউলটেন ও রামরাম বসু। ৩। হিতোপদেশ : গোলোকনাথ শর্মা। সংস্কৃত থেকে বাংলা অনুবাদ। ৪। লিপিমালা : রামরাম বসু পত্ররচনা রীতি ও লিপিকৌশল শিক্ষার বই। এছাড়া এই বছর কাশী-দাসী মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পুনর্মুদ্রিত হয়।

১৮০৩

১। জব টু সং অফ সোলেমন : বাংলায় অনূদিত। ২। ঈশপের গল্প : তারিণী চরণ মিত্র।

১৮০৪

১। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ। ২। দাউদের গীত : ওল্ড টেসটামেনটের দ্বিতীয় খণ্ড। এটি মূলতঃ প্রার্থনা সঙ্গীত।

১৮০৫

১। কেরীর বাংলা ব্যাকরণ। দ্বিতীয় সং (মতান্তরে এই গ্রন্থের প্রকাশ ১৮০৩)। ২। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়স্য চরিত্রং : রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের জীবনী। ৩। তোতা ইতিহাস : চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়। কাদির বকশ-এর মূল ফরাসী গ্রন্থ তুতিনামার অনুবাদ। এছাড়া 'খ্রীষ্টীয়ানদের মত কি ?' নামে একটি পুস্তিকা।

১৮০৬

১। ডায়ালগস ইনটেনডেড টু ফেসিলিটেট দি অ্যাকোয়ারিং অব দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ। ২। নিউটেসটামেণ্ট (বাংলা) ২য় সং।

১৮০৭

১। ল্যুক অ্যাকটস এবং রোমানস (বাংলা)। ২। প্রফেটিক বুকস (বাংলা) বাইবেলে বর্ণিত প্রেরিত পুরুষদের জীবনকথা। এটি ওল্ড টেস্টামেণ্টের চতুর্থ ভাগ।

১৮০৮

১। হিতোপদেশ : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। ২ রাজাবলী : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা ভারতের ইতিহাস।

১৮১২

১। ইতিহাস মালা : সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা ১৫০টি গল্পের সংকলন। সম্পাদনা করেন উইলিয়ম কেরী।

১৮১৫

১। পুরুষ পরীক্ষা : হরপ্রসাদ রায়। অনুবাদগ্রন্থ। ২। জ্যোতিষ। জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত বাংলা গ্রন্থ। ৩। লিপিধারা : বাংলা বানান শিক্ষার গ্রন্থ। ৪। দি বেঙ্গল ইংলিশ ডিকসনারি : উইলিয়ম কেরী। ৫। বেদান্ত গ্রন্থ : রামমোহন রায়। ৬। বেদান্ত সার : রামমোহন রায়।

১৮১৭

১। বেদান্ত চন্দ্রিকা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ২। পদার্থ কৌমুদী : কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন।

১৮১৮

১। যীশুখ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত, তাহার ভাগ। দ্বিতীয় চেম্বার লেন সাহেবের রচিত। ২। নীতি বাক্য। বাইবেল থেকে নির্বাচিত।

সরকারী অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত বাংলা সংবাদপত্রের কয়েকটি 'আপত্তিকর' মন্তব্য

Suhrit—During the long period of about two hundred years, from the commencement of the companys' rule up to present time we hrve not witnessed any change in their behaviour toward us. Looking the interests of men of their own race only they hold the lives of the Natives in very light esteem. Who is there that does lament the sad case of Nndo Coomer, when he remembers the futile cause that was assigned and considered sufficient for executing him ? And in these days wherever we turn our eyes we see dark oppression and injustice prevailing throughout India. The hostility of Government towards the Natives, and its favouritism to Englishmen, have become palpable in various instances.

Sadharani—Whatever faults may disfigure the British character, the Chief defect is a party spirit, which becomes more striking when contrested with the rule of the Mahomedans, who never carried it to such an extent, and though there was no toleration under some of the Mogul Emperors, still there was not, as now, such an intense display of race partiality. Their feeling has wrapped their sense of justice, which is administered in one way to the British and in another to the Native. As a consequence of this selfish policy of the rulers India is impoverished. She has no power. The native princes are effete ; while industry and commerce are ruined by British competition. This is a fruitful source of popular discontent. The British Government has destroyed the respect and honour hitherto enjoyed by the respectable middle classes of the Hindu Society. A common constable now arrests a respectable Zamindar. Such a state of things would have been impossible if the doors of the Civil services were open to educated Natives of respectable percentage. Justice is sold and denied to the poor. The expenses of litigation

are heavy. What with the stamp fees and the pleaders fees, and numerous other items of expense, a suitor is ruined. Justice is also tardily administered.

Somoprakash—But look to the feelings of the people. Almost all of them are unhappy and discontented. In the mofussil especially the dissatisfaction knows no bounds under the Mahomedans there was indeed much oppression. The will of the despotic emperors and their representatives were the law. The rights of the people and the claims of the subjects were all swept away by their avarice and sen suality. It is therefore asked, why does their prevail so much dissatisfaction now when these evils no longer exists ? We believe we were far more happy under the Mahomedans than at the present time. Only wealthy living in cities, were oppressed by Mahomedan Officers ; but the current of that oppression did not reach the mofussil. The zeminders in the interior ; indeed, were sometimes, on account of failure to pay their revenue, summoned before the Nawab and ther punished or imprisioned though they were as often released and rewarded for a witty saying or a well-timed act of flattery to the Nawab. The common people in the interior, however, had not much to suffer from Mahomedan oppression ; they enjoyed much more freedon and security. But all that happiness has disappeared under the British Government. Injustice and oppression are now more extensively practised in the Mofussil then anywhere else. There are at the present time police officers in every village, District Magistrates. Deputy Megistrates in Subdivisions and joint Magistrates. These have taken the place of the Nawabs and the Fouzdars of the Mohomeden days. Whether a man be rich or poor ; landlord or peasant, respectable or low, all are equally oppressed by them. Again the subordinate officers of the police oppress the voiceless starving poor more than the rich and the respectable Bribes, sometimes in the shape of rewards, often by force, are extorted from the people. Their families are constantly insulted and oppressed ; quiet and

inoffensive, the poor have not the courage to oppose or complain against them.

Amrita Bazar Patrika—We do not know whether we should be sorry or glad at the increasing oppressions of the officers in the mofussil. The natural law is that progress is often times preceded by some great revolution, so it might happen that the outrages committed on the helpless Natives will ultimately result in their welfare and progress. Hitherto, however, it has tended to nothing but our degradation. It is doubtful whether one in a thousand in the mofussil will be found bold enough to resist the most oppressive and unjust measures of a magistrate. Many tremble at his very name. Consequently no feeling of gladness can arise in our minds when we see oppressions prevail. But there is a limit to everything, a reaction must take place, and though we have become, dispirited, and our whole frame trembles at the very name of a magisterial officer, still it is pleasant to know the latter can·not commit oppression on us with impunity, and though the Government has placed a thunderbolt in his hands, we endeavour to defend ourselves from its most terrible shock. This gives rise to some hope in our minds. If not unfrequently occures that a man, even on the point of death, may survive, so who can say that we will not yet be able to recover our energies ? Hence we hear of any oppression in the mofussil, these hopes are raised. But no good cun come to a nation that depends entirely upon hopes and not on any active exertions. If we are really aggrieved by the oppressions of public officers, we ought to exert ourselves to take measures against them independent of Government. Disunion is the Chief cause of our weakness. If we could but be united, even a magistrate could not commit any further oppression on us. The policy of the British Government is to destroy our national life, and to keep us under their subjection for ever ; for they know that they will not be able to do so by mere force of arms or by any other means.

We are, however, now placed in a very delicate position, because 'it we can preserve our national liveliness I we might not

probably arise some day and win our happy liberty', but if we lose it will be ruined for ever.

Amrita Bazar : This is especially the case with Natives of Bengal, who a century ago, disloyal to the Mahomedan Government of the day, gave over the Kingdom to British rule. There can not be, indeed any doubt that in this the Hindus showed a lamentable ignorance of their own interests, the more so. as the occasion was most favourable for subverting Mahomedan rule altogether, and regaining their independence.

Amrita Bazar Patrika : Considering the mutual inimical feelings that now exist between the rulers and ourselves, it might not in one way be led to submit to extinction. But the extinction of the Aryan race will affect the creation of God of Providence and be an unspeakable loss to the world ; we will not say the loss could never be repaired, but certainly not easily, and disgrace on the English race will be infinite. On the otherhand, unless we make an effort to avoid such extinction, our sin too will be infinite. But either there must be extinction, or it will be necessary for us so to strengthen ourselves as to counteract the harsh measures of Government. We could not secure extinction even if we tried it, and our efforts woule certainly not be less—they may be given greater—than those we should have to make to counteract the harsh measures of Government.

নির্ঘণ্ট

———